ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

২৭তম সংখ্যা ■ জুন ২০১৯

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal
Faculty of Arts
University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা ২৭তম সংখ্যা ■ জুন ২০১৯ কলা অনুষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

২৭তম সংখ্যা ❑ জুন ২০১৯

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 27
June 2019

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Md. Asaduzzaman
Chairman
Department of Philosophy

Professor Mortuza Khaled
Chairman
Department of History

Professor Abdullah Al Mamun
Chairman
Department of English

Professor P.M. Shafiqul Islam
Chairman
Department of Bengali

Professor Md. Fazlul Haque
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Md. Nizam Uddin
Chairman
Department of Arabic

Professor Muhammad Rafiqul Islam
Chairman
Department of Islamic Studies

Dr. Dino Bandhu Pal
Chairman
Department of Music

Dr. Md. Ataur Rahman
Chairman
Department of Theater

Professor Md. Ataullah
Chairman
Department of Persian Language and Literature

Professor Md. Nasir Uddin
Chairman
Department of Urdu

Professor Bipul kumar Biswas
Chairman
Department of Sanskrit

Message from the Chief Editor

The 27th volume of the Research Journal of the Faculty of Arts is published with 29 research articles contributed by the faculty members of the Departments of Philosophy, Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Theater, Persian Language & Literature and Sanskrit. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the officers of the faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. আরিফুল ইসলাম	বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব : একটি বিচারমূলক অনুসন্ধান	১
সৈয়দ তৌফিক জুহরী	বুদ্ধদেব বসুর কবিতার কৃৎকৌশল	১৯
তানিয়া তহমিনা সরকার	মুক্তিযুদ্ধের যুগল উপন্যাস: জীবনসংগ্রাম ও মুক্তির পরিলেখ	৪১
মাহমুদা আকতার	ঠাকুরমা'র ঝুলিতে নারীর প্রতিকৃতি	৫১
ড. মো. সুজা উদ-দৌলা	শহীদ কাদরীর কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা	৬৫
ড. ইমতিয়াজ আহমেদ	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের বিস্তারে স্থানীয় শাসকবর্গের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা	৭৫
ড. মু. খলিলুর রহমান	আদর্শ নগর রূপান্তরের সমস্যা ও সম্ভাবনা: প্রসঙ্গ রাজশাহী মহানগর	৮৫
মো. রবিউল ইসলাম	ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন ও আলজেরিয়দের প্রতিরোধ আন্দোলন	৯৯
Dr. Md. Fazlul Haque	Democratization in The Middle East : The case of Iraq	১১৫
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	শিক্ষানগরী রাজশাহী: ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণ	১২৫
ড. মো. সাজিদুল হক	আহমদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	১৩৯
ড. মো. মতিউর রহমান	আল-হাদীছের শব্দালংকার: একটি পর্যালোচনা	১৫৩
ড. মুহা. বিলাল হুসাইন	মুখাদরাম কবিদের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য: একটি বিশ্লেষণ	১৬৫
ড. ছালেকুজ্জামান খান	'ইমরু'উল কায়স ও 'আনতারার কাব্যে অশ্ববন্দনা: একটি পর্যালোচনা	১৭৩
মো. কামারুজ্জামান	আরবী আত্মজীবনী সাহিত্য: উৎপত্তি ও বিকাশ	১৮৫
ড. আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান	মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর তাফসীর চর্চা	১৯৭
Dr. Shah Mukhtar Ahmad	Tasawuf in the light of the Holy Qur'an and Hadith : An Overview	২০৯
ড. মো. আব্দুল হান্নান	আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: লক্ষ্য ও মূলনীতি	২১৯
ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	ইসলামী দা'ওয়াহ-এর প্রয়োগ ও পদ্ধতি	২৩১
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	হাফিয ইউসুফ আল-মিয্যী (র): 'ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান	২৬১
ড. মো. আমিরুজ্জামান	সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্রের সমাজবাস্তবতা	২৭৫
মুহম্মদ আলমগীর পিএইচ.ডি.	দেশাত্মবোধক বাংলা নাটকের ধারায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা: পটভূমি	২৯৫
ড. তাহমিনা বেগম	আধুনিক ফারসি কাব্যে প্রেম	৩০৯
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	ফারসি কাব্য সাহিত্যে হাফিজ শিরাজীর অবদান	৩১৯
ড. মো. আতাউল্যাহ	নিযামী গাঞ্জুবীর দার্শনিক চিন্তাধারা : একটি পর্যালোচনা	৩৩১
ড. জুয়েলী বিশ্বাস	ঈশ্বরের স্বরূপ: হিন্দু ধর্ম-দর্শনের আলোকে একটি পর্যালোচনা	৩৪৩
ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস	ভাসের অবিমারক নাটকে সমাজ ভাবনা	৩৫৫
ড. বেবী বিশ্বাস	ভবভূতির মহবীরচরিত নাটকে রাবণ চরিত্র	৩৬৯
ড. জয়শ্রী দাষ	মনুসংহিতায় নারীর মর্যাদা ও অমর্যাদা: একটি পর্যালোচনা	৩৭৭

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব : একটি বিচারমূলক অনুসন্ধান

ড. মো. আরিফুল ইসলাম*

Abstract: According to Bertrand Russell since the day of antiquity state is a power organization and its aim is to become totalitarian. The state as it is built even today is not suitable for the enjoyment of freedom. Its essence is power which is the creation of possessive impulse of human nature. Russell saw the present day state structure as the most harmful institution for the best interest of humanity. The power that the so called welfare states have been exercising is not only unnecessary but also harmful for its subjects and therefore it should be greatly reduced. The purpose of the state should serve its people and facilitate opportunities to exercise of their freedom and liberty. Apart from this, as a power institution the sole function of a state is to preserve internal law and order and provide security when it is attacked by the foreign forces. Besides, a state should provide some other services to its citizens such as sanitation, public hygiene, prevention of infectious diseases, compulsory education, development of human resources, encouragement of scientific research and above all a state should make space for the people to exercise their freedom at individual, institutional and social levels. If the state is to serve the above purposes for the interest of individual liberty and progress, then a reconstruction is drastically needed. In this cotext the aim of this article is to enquire Russell's theory of state critically.

ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের (১৮৭২-১৯৭০) মতানুসারে প্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং তার প্রকৃতি মোটের উপর সমগ্রতাবাদী (totalitarian)। এমনকি বর্তমান যুগেও রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতির কারণেই তা মোটেই ব্যক্তির স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সহায়ক নয়। এজন্য তিনি রাষ্ট্রের সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো রাসেলের রাষ্ট্রচিন্তায় 'রাষ্ট্র' নামক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের মূলনীতি বা আদর্শ কী এবং কীভাবে তিনি এই নীতি বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করেছেন তা অনুসন্ধান করা। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, প্রচলিত রাষ্ট্রের মূল সঙ্কট কী এবং এই রাষ্ট্রকে কল্যাণকর হতে হলে তার প্রকৃতি ও কার্যাবলী কেমন হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন তা খুঁজে বের করার একটি প্রয়াস এই প্রবন্ধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি মনে করেন রাষ্ট্র সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এর স্বরূপ কেমন হবে; কারণ এর উপরই অনেকটা নির্ভর করছে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা।[১] আমরা জানি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি, স্বাধীনতা, সম্পত্তি, ক্ষমতা, ন্যায়বিচার, আইন, সংবিধান প্রভৃতি সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন ও সমাধান দেবার প্রচেষ্টা থাকে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বে। একটি সমাজ বা রাষ্ট্র কীভাবে গঠিত হওয়া উচিত এবং ঐ সমাজ-রাষ্ট্রে ব্যক্তির আচরণ কেমন হওয়া উচিত তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হয় এখানে। রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে একজন তার ব্যক্তি-অধিকারকে বিশেষত জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি, সুখ-স্বচ্ছন্দ, বাক-স্বাধীনতা, নিরাপত্তা প্রভৃতি অধিকারগুলোকে ভোগ করতে চায়। সে হিসেবে রাষ্ট্র (state) একটি অত্যাবশকীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে মানুষের নিকট রাষ্ট্রবিহীন জীবন কল্পনার অতীত। যদিও এই রাষ্ট্রের স্বরূপ সবসময় এক রকম ছিল না। প্রাচীন গ্রিক যুগে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র দেখতে পাই। মধ্যযুগে রাজতন্ত্রের যুগে এক ধরনের বৃহৎ রাষ্ট্র পাই, আর এখন দেখি জাতি রাষ্ট্র। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের স্বরূপ ও কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। এবং কি ধরনের রাষ্ট্র মানুষের জন্য

---

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কল্যাণকর হবে তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্বগুলোতে মূলত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয় -

১. রাষ্ট্র কী?

২. রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত?

৩. রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো কীভাবে?

৪. রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন?

৫. কেন মানুষ রাষ্ট্রের অধীনে জোটবদ্ধভাবে বাস করতে চায়?

৬. রাষ্ট্রে নাগরিকের মর্যাদা কি হওয়া উচিত?

৭. সামষ্টিক কল্যাণ(general good) নাকি ব্যষ্টিক কল্যাণ(individual good) কোন্‌টি মূখ্য হওয়া উচিত?

৮. সামগ্রিক কল্যাণের সাথে ব্যষ্টিক কল্যাণের সমন্বয় কীভাবে সম্ভব?

৯. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে একটি রাষ্ট্রকে কল্যাণকর হতে হলে তার স্বরূপ ও কার্যাবলী কেমন হওয়া উচিত? ইত্যাদি।

কোনো একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে উপর্যুক্ত সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এমনটা নয়। আমরা রাসেলের চিন্তায় উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো। এই প্রবন্ধের পদ্ধতি হলো মূলত অনুসন্ধানমূলক ও বিচারমূলক। কারণ, এখানে অন্যান্য রাষ্ট্রদার্শনিকের তত্ত্বের সাথে রাসেলের চিন্তার তুলনা ও বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্র সম্পর্কে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হবে এবং রাসেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। আমরা জানি রাসেল রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করেননি যেমনটি করেছিলেন প্লেটো, হেগেল, লক, মার্কস প্রমুখ দার্শনিক। কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কিত মৌলিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর চিন্তা ও কর্মে। এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের ভিত্তি হিসাবে কোনো না কোনো আদর্শ বা নৈতিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কাজেই তাঁকে একজন রাষ্ট্রদার্শনিক বলা যেতেই পারে। এখন দেখা যাক রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী?

দুই

রাষ্ট্র কী এই সম্পর্কে রাসেলের স্পষ্ট জবাব আমরা পাই যখন তিনি বলেন রাষ্ট্র হলো একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবদিক থেকেই নিরাপদ বোধ করে, "Almost every man finds it essential to his happiness to feel himself a member of a group, animated by common friendship and enmities and banded together for defence and attack."[২] গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার সাথে তাঁর এই বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে ব্যক্তির উন্নত জীবনের জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে।[৩] এখন প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র কি প্রয়োজনীয়? ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তায় দেখা যায় কোনো কোনো তত্ত্বে সমগ্র তথা রাষ্ট্রের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (যেমন; গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা, সামাজিক চুক্তিবাদ বা হেগেলের ভাববাদ) আবার কোনো কোনো মতবাদে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন চেয়েছে (যেমন নৈরাজ্যবাদ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মার্কসবাদ)। রাসেল সমগ্রতাবাদী নন এবং চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ধারণার বিরোধী; যার কারণে সামাজিক চুক্তিবাদীদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ সমর্থন করেননি।[৪] এবং রাষ্ট্রকে 'পরম মন' হিসেবে উল্লেখ

করায় হেগেলের তীব্র সমালোচনা করেন।[৫] হেগেলের দর্শনে ব্যক্তি মানুষের চেয়ে রাষ্ট্র মূল্যবান অথচ রাসেল তাঁর সমস্ত দর্শন দাঁড় করাতে চেয়েছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে। আবার রাষ্ট্রকে ‘শোষণের হাতিয়ার’ হিসেবে উল্লেখ করায় তিনি মার্কসের সমালোচনা করেন।[৬] অন্যদিকে, সামাজিক চুক্তিবাদী ও ভাববাদীদের সমগ্রতাবাদের বিপরীতে অবস্থান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী নৈরাজ্যবাদীদের[৭]; যাঁরা ‘আবশ্যকীয় অমঙ্গল’ (necessary evil) বিবেচনায় রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপের পক্ষপাতী। তাঁদের মত হলো রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্রের কাজ স্বেচ্ছায় সংগঠিত সংঘই চালিয়ে যেতে পারে। রাসেল নিজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কিন্তু তাই বলে নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন সমর্থন করেননি। তবে তাঁদের সংঘের গুরুত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। রাসেল জন স্টুয়ার্ট মিলের উদারনৈতিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কারণ মিল উদারনৈতিক দর্শনে প্রথম দিকে মানুষের জীবনে স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হবার আশঙ্কায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন না করলেও পরবর্তীতে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের স্বার্থেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছেন।[৮] এভাবে স্বাধীনতা ও কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয় রাসেলের দর্শনেও লক্ষণীয়। অর্থাৎ রাসেল রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করছেন।

প্রশ্ন হলো কেন একটি সমাজ বা একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন বা কেন মানুষ এর অধীনে বাস করতে চায়? এ জোটবদ্ধতার পেছনের যুক্তি কি? সামাজিক চুক্তিবাদীরা মনে করেন এই জোটবদ্ধতার কারণ হলো জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ। ভাববাদী হেগেলের মতে রাষ্ট্র ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলেই মানুষ এর অধীনে নিরাপদ বোধ করে এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় ও স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পায়। অন্যদিকে রাসেলের লেখনীতে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হলো সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা, উপজাতিগত অনুভূতি, অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় এবং দেশপ্রেম প্রভৃতি।[৯] তাঁর যুক্তি হলো এসব উপাদানের প্রভাবে জনগণ জোটবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে, বিদেশীর প্রতি কঠোর হলেও স্বদেশীর প্রতি কোমল মনোভাব পোষণ করে, নিজ রাষ্ট্রের সফলতায় গৌরববোধ করে, স্বদেশকে অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং এজন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। কিন্তু এর ফলস্বরূপ সমস্ত জনগণের সম্মিলিত ক্ষমতা রাষ্ট্রের নিকট এসে কেন্দ্রীভূত হয় এবং রাষ্ট্র হয়ে পড়ে ক্ষমতার চূড়ান্ত আধার।

রাসেল রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও এভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ এই কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতার (centralised tendency) ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং রাষ্ট্র হয়ে উঠে চরম ক্ষমতার মালিক। রাসেল পুঁজিবাদকে এই ধরনের সমাজ বলে চিহ্নিত করে পুঁজিবাদী সমাজকে মানবদেহের সাথে তুলনা করেন। মানবদেহ যেমন বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে গড়ে উঠে তেমনি সমাজও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। তবে বিভিন্ন অঙ্গ বা কোষের সমন্বয়ে দেহ গঠিত হলেও পরে দেহই সব অঙ্গকে পরিচালিত করে। তেমনি বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সমাজ গড়ে উঠলেও গঠিত হবার পর সমাজই সব সংস্থাকে পরিচালিত করে।[১০] হেগেলের তত্ত্বে এটি সমর্থিত হয়েছে, কারণ তিনি মনে করেন সমগ্রের (রাষ্ট্র) মধ্যেই অংশের (ব্যক্তি) কল্যাণ নিহিত। কিন্তু রাসেল এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর এভাবে স্বাধীনতা বিলিয়ে দেয়ার ফলে রাষ্ট্র প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে এবং ব্যক্তি হয়ে পড়ে সামষ্টিক কল্যাণের হাতিয়ার।

এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায় কী? রাসেল এজন্য রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন। প্রশ্ন হলো এই পুনর্গঠনের মূলনীতি বা আদর্শ কী হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে রাসেলের আস্থা কান্টের সেই নৈতিক অনুজ্ঞায় যেখানে বলা হয় “এমনভাবে কাজ কর যেনো তুমি নিজ বা অন্য কোনো মানুষকে সবসময় কেবল উপায় হিসেবে বিবেচনা না করে উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করবে।”[১১] তাঁর মতে, “রাজনৈতিক আদর্শকে অবশ্যই

ব্যক্তিজীবনের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ব্যক্তিজীবনকে যতদূর সম্ভব উত্তম করে তোলাই হবে রাজনীতির উদ্দেশ্য।"[১২] এর অর্থ হলো- রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর নীতি হচ্ছে জনগণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে জনগণ মুক্তি ও স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। অর্থাৎ রাসেলের রাষ্ট্রের প্রকৃতি সমগ্রতাবাদী নয়। আবার পুরোপুরভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীও নয়। দেখার বিষয় তিনি কীভাবে এ দুই'র মধ্যে সমন্বয় করেন? রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং সে কাজ কীভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত তা আলোচনার মাধ্যমে এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

তিন

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

একটি রাষ্ট্র বা সরকারকে অভ্যন্তরীণ অনেক কাজ করতে হয়। আবার জনকল্যাণের জন্যেই বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হয়। রাসেল রাষ্ট্রের কার্যক্রমের মধ্যে বিদ্যমান মন্দ উপাদানগুলো চিহ্নিত ও তা দূর করার চেষ্টা করেছেন। কীভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যায় তার পথও নির্দেশ করেছেন।

অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষিতে কার্যাবলী

নাগরিকদের জীবন সহজ, স্বচ্ছন্দময় ও নিরাপদ করতে একটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র অনেক কাজই করে থাকে; এ কাজগুলো সম্পাদন করা কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না; যেমন, জনকল্যাণমুলক কাজ, আইন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ প্রভৃতি।[১৩] এখানে উপযোগবাদী জন স্টুয়ার্ট মিল এর চিন্তার সাথে রাসেলের অনেক সাদৃশ্য। কারণ মিলও এরকম অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন করেছেন।[১৪] যাইহোক, রাসেল এক্ষেত্রগুলো ছাড়া অবশিষ্ট কাজগুলো ব্যক্তি উদ্যোগে করাই বাঞ্চনীয় বলে মনে করেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্যসেবা এবং সংক্রামক ব্যধি প্রতিরোধ। এসব কাজের উদ্দেশ্য কেবল স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তির কল্যাণ নয় বরং সমগ্র জনসমাজের মঙ্গল। একটি রাষ্ট্রে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা কিংবা কোনো সংক্রামক ব্যধি ছড়িয়ে পড়লে তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। কোনো একক ব্যক্তি বা ছোট-খাটো কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ কাজ সফলভাবে করা সম্ভব হয় না। রাসেল প্লেগের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্লেগ একটি সংক্রামক ব্যধি। কোনো অঞ্চলে প্লেগ দেখা দেওয়ার পরও এর প্রতিরোধে অবহেলা করলে রোগটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য সকলকে বিপর্যয়কর পরিণতি ভোগ করতে হয়। তাই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জনগণের উপর বলপ্রয়োগের প্রয়োজনকেও রাসেল সমর্থন করেছেন। সমাজে মানুষের স্বাধীনতা আছে বলেই প্লেগ বা এর মতো কোনো সংক্রামক ব্যধি ছড়িয়ে দেবার অধিকার কারো থাকা উচিৎ নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মন্দ, কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কারণে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়; "The interference with liberty remains an evil, but in some cases it is clearly a smaller evil than the spread of disease which liberty would produce."[১৫] এছাড়া, ম্যালোরিয়াসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত ব্যক্তির স্বাধীনতা নয় বরং সর্বজনীন স্বার্থের দিকে লক্ষ রাখা। এখানে ব্যক্তির তুলনায় জনসমষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়ায় জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ' এ সুখবাদী দর্শনের সাথে রাসেলে চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষাও রাষ্ট্রের একটি জনকল্যাণমুখী কাজ। অশিক্ষা ও অজ্ঞতা যে কোনো জাতির জন্য অশুভ। কারণ জনগণ যদি দেশ, সমাজ, নিজেদের সঙ্কট সম্পর্কে সচেতন না হয় এবং যদি শাসক তথা রাজনীতিবিদদের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণ সঠিক তথ্য না রাখে তবে একটি রাষ্ট্র বড়

ধরনের সঙ্কটের মধ্যে নিপতিত হতে পারে। জনগণ সচেতনতার অভাবে এবং অনেক সময় আবেগতাড়িত হয়ে মন্দ ব্যক্তিদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করতে পারে। আর ঐ শাসকের নির্বাচিত হয়ে গণবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এটা বলা যায় যে, অধিকাংশ জনগণ অসচেতন ও অশিক্ষিত হলে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়ে। একারণে রাসেল মনে করেন একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশিরভাগ অশিক্ষিত হলে সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চর্চা সম্পূর্ণ অসম্ভব।[১৬] বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান ও অর্থায়নও রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। বিজ্ঞানের গবেষণা ব্যয়বহুল, যার কারণে ব্যক্তিগতভাবে কারো পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বড় ধরনের সাফল্য লাভ সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফল সবাই উপভোগ করতে পারে, তাই রাসেলের মতে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান ও অর্থায়ন রাষ্ট্রের করা উচিত।

অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা: রাসেলের মতে "সম্ভবত অর্থনৈতিক অবিচারই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় অন্যায়।"[১৭] তারপরও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন হলো- এ সমাজ পুঁজিপতিদের সম্পদ উপার্জনের ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে এবং দরিদ্র মানুষকে সব সময়ই অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। এজন্য সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাকে দায়ী করে এর বিলোপ সাধন চেয়েছেন। এক্ষেত্রে রাসেল সমাজতন্ত্রীদের সাথে একমত। তাঁর প্রধান অভিযোগ হলো "… it stunts the lives of men and women, that it enshrines a ruthless possessiveness."[১৮] সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার কারণেই মানুষের মধ্যে অধিকার লিপ্সা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, কাজেই এধরনের অধিকারকে রাষ্ট্রের অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়। তবে একই সাথে ন্যায়বিচার (justice) প্রত্যয়টির দ্ব্যার্থবোধকতার ব্যাপারে রাসেল সচেতন ছিলেন কারণ ন্যায়বিচার একটি আপেক্ষিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও দ্ব্যার্থবোধক প্রত্যয়; "... when we wish to remedy an injustice, it is important to consider whether, in so doing, we shall be destroying the incentive to some form of vigorous action which is on the whole useful to the community."[১৯] রাসেল মনে করেন, সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা ও সমাজ থেকে পুঁজিপতিদের অর্থ আদায়ের যেকোনো পন্থাই মন্দ। তাই রাষ্ট্রই হবে সব ধরনের করের প্রাথমিক প্রাপক।[২০] তবে এ রাষ্ট্রের চরিত্র হতে হবে গণতান্ত্রিক। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং ভূমি ও পুঁজির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থাকবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে। রাসেল সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমর্থন করেননি। তবে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে আয়বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করেছেন।[২১]

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ: অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ একমাত্র রাষ্ট্র বা সরকারই করতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। জনগণ সবসময় চুরি-ডাকাতী, খুন-খারাবি প্রভৃতি আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করবে এটা কেউই চায় না। মধ্যযুগীয় পন্থায় লুণ্ঠন বা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে যদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই কোনো গোষ্ঠী সামরিক ক্ষমতা অর্জন করে তবে সভ্য জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ অরাজকতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়ে। রাজনৈতিক তত্ত্বের নামে বিভিন্ন ধরনের স্যাবোটাজ ও রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার ফলে জনগণ আতঙ্কিত থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সব থেকে কার্যকর ও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা রাষ্ট্র। এছাড়া, একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকেই অনেক সময় বৈদেশিক আগ্রাসনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রকে সব সময়ই বহিঃশত্রুর আক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। এ আতঙ্ক থেকে জনগণকে মুক্তি দেয়াও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

উপর্যুক্ত কার্যাবলীর আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। আর এই রাষ্ট্রের অপরিহার্য ভিত্তি হলো ক্ষমতা। তাই কোনোভাবেই একটি রাষ্ট্রের অধিকার থেকে সকল ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যায় না। তাহলে সেই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা কীভাবে সুরক্ষা পাবে? সেটাই হলো বড় প্রশ্ন। কারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা রাজনীতি ও অর্থনীতি চরমভাবে প্রভাবিত হলে ব্যক্তি ক্ষমতাহীন হয়ে দ্রুত বিপদের সম্মুখীন হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান মানুষের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি তার মধ্যে রাষ্ট্র অন্যতম। বড় রাষ্ট্রগুলোতে শাসকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েই চরমভাবে তা প্রয়োগের সুযোগ খোঁজে, "The few men who achieve power in such states are men of abnormal ambition and thirst for domination, combined with skill in cajolery and subtlety in negotiation. All the rest are dwarfed by knowledge of their own impotence."[২২] তারপরও রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র না থাকলে জনগণ নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্যে পড়ত, আর রাষ্ট্রের কারণেই আবার জনগণকে বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। অর্থাৎ নৈরাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচার সমানভাবে ক্ষতিকর। "একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজন হলো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্টীগত উদ্যোগ উভয়ই; নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত নৈরাজ্য অবশ্যম্ভাবী এবং উদ্যেগ ব্যতিত স্থবিরতা অনিবার্য।"[২৩] সবার কল্যাণের জন্য তাই প্রয়োজন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয়। কিন্তু কীভাবে সম্ভব? এজন্য রাসেল সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেছেন। কারণ রাষ্ট্র ও সমাজের চরম মানসিকতার পরিবর্তন এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধে গণতন্ত্র তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর। এবং এ ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের (authority) সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতার (individual liberty) সমন্বয়ের সুযোগ থাকে। তারপরও গণতন্ত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারও ক্ষমতা পাবার পর স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে; জাতীয়, ধর্মীয়, রাজনৈতিক সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতন চালানো হতে পারে। এসব আচরণ নিয়ন্ত্রণের উপায় কী? এক্ষেত্রে রাসেলের চিন্তায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পাওয়া যায়।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা

সরকারের ক্ষমতা দু'রকমের; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক। প্রাথমিক ক্ষমতাই চূড়ান্ত ক্ষমতা (ultimate power) বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। আর মাধ্যমিক ক্ষমতা হলো প্রাথমিক ক্ষমতা থেকে উপজাত (derivative power) যা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা।[২৪] একটি রাষ্ট্রে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর সরকারের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। তাত্ত্বিকভাবে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটার বা সাধারণ জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী কেননা তারাই সরকার নির্বাচিত করে। তবে এটা আংশিকভাবে সত্য।[২৫] কারণ প্রচলিত কেন্দ্রাভিমুখী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সরকার গঠন করলেও এরপর ঐসব প্রতিনিধি বা সরকারের উপর জনগণের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রতিনিধিরাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। তাছাড়া রাষ্ট্র আয়তনে বড় হলে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী না হলে বেশিরভাগ মানুষই ব্যক্তি পর্যায়ে মত প্রকাশের সুযোগ পায় না। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে মত প্রকাশের সুযোগ না পাওয়ায় মানুষ তার সামাজিক শক্তি হারিয়ে ফেলে, জনগণের সমস্যার বিষয়ে তাদের আগ্রহ কমে যায়। তারা দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ দ্বারা প্রতারিত হয়। উপরন্তু একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের স্বার্থ, মানসিক চেতনা, সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন সব অঞ্চলের মানুষের সব সমস্যার সমাধান তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই রাসেল বলছেন, "The essential merit of the state is that it presents the internal use of force by private persons. Its essential demerits are,

that it promotes the external use of force, and that, by its great size, it makes each individual feel impotent even in democracy.” [২৬]

রাষ্ট্র বা সরকারের এককেন্দ্রীকতার উপর্যুক্ত সমস্যার সমাধানে রাসেল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করেছেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতে শক্তিশালী স্থানীয় শাসন (local government) প্রতিষ্ঠা করলে ঐসব অঞ্চলের মানুষ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পাবে এবং নিজেকে মূল্যবান ভাবার অবকাশ পাবে। রাসেল এই ধারণাটি নিয়েছেন মূলত ফরাসী সংঘবাদীদের (syndicalists) নিকট থেকে। তবে সংঘবাদীদের সাথে তাঁর পার্থক্য হলো সংঘবাদীরা যেখানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা কি করে বিকেন্দ্রীকরণ করা যাবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পথ দেখাতে না পারলেও তিনি বিশ্ব সরকারের ধারণার মাধ্যমে সে চেষ্টা করেছেন। যাইহোক, রাসেল মনে করতেন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ বেশি পরিমাণে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণির উপর শক্তিশালী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্মম প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।[২৭] তিনি উল্লেখ করেন,

> I have no doubt whatever that, in the best system, groups will have a great deal of control over all matters that primarily concern themselves. The modern state is so large and impersonal that its decisions as to any particular group are likely to be harsh and ignorant. ...The due distribution of primary power is to be obtained through democracy tempered by group autonomy. Autonomy for local groups having a separate local sentiment is a recognized principle of federal government.[২৮]

তবে রাসেল মনে করেন কেবল যেসব বিষয়ের সাথে আঞ্চলিক ও স্থানীয় অনুভূতি জড়িত সেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষকের নিকট থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ, বৈদেশিক নীতি, শুল্ক প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে।

এ পর্যন্ত দেখা গেলো কেন এবং কীভাবে চূড়ান্ত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এরপর আশা যাক চূড়ান্ত ক্ষমতা থেকেই উপজাত কিছু ক্ষমতা বা কার্যাবলীর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে। যে কাজগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো- আমলাতন্ত্র, পুলিশ, ট্রেড ইউনিয়ন, রেলওয়ে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। এগুলো ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠান (voluntary organization)। এসব প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ও শক্তিশালী হলে রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সংগঠন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। রাসেলের মতে, “All strong organizations which embody a sectional public opinion, such as trade unions, co-operative societies, professions, and universities, are to be welcomed as safeguards of liberty and opportunities for initiative.”[২৯] রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান হওয়াই তার পক্ষে পুরোপুরি ঐচ্ছিক সংগঠন হওয়া সম্ভব নয়। তবে ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে বাধ্য করার ব্যাপারে জনমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

রাসেল রাষ্ট্র পরিচালনায় ‘ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব’র সাথে সাথে ‘বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব’র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩০] এবং বলছেন, “All powers which are not in essence geographical are likely to be better exercised by organizations of those interested.”[৩১] এ বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন গ্রুপ বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ধারণাটি রাসেল নিয়েছেন মূলত ফরাসী সিণ্ডিক্যালিষ্ট বা সংঘবাদী এবং গিল্ড সমাজতন্ত্রীদের নিকট থেকে। রাসেল ট্রেড

ইউনিয়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী সিণ্ডিক্যালিষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন। কারণ তিনি মনে করেন সত্যিকার গণতন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় ট্রেড ইউনিয়নে। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিটি শাখায় আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এর সদস্যরা অনুভব করেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার একটা ভূমিকা আছে।[৩২] রাসেলের মতানুসারে, গণতন্ত্রকে মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকতে হলে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সংগঠন এবং প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এরা অংশ গ্রহণ করবে রাজনৈতিক দরকষাকষির প্রক্রিয়ায়।[৩৩]

ঐ একটি গোষ্ঠী হিসেবে আমলাতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রবণতা সম্পর্কে রাসেল সচেতন ছিলেন। একটি সমগ্রতাবাদী বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র খুবই শক্তিশালী গোষ্ঠী।[৩৪] প্রতিটি রাষ্ট্রে এ ধরনের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান নির্বাহী দায়িত্ব পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকর প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয়। যেমন রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সবথেকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হলো পুলিশ। তারা দক্ষতার সাথে কাজটি করতে পারে। অপরাধী ধরে এবং স্বাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে তার শাস্তির বিধান করতে পারা পুলিশের দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত। এর উপর ভিত্তি করে তার পদোন্নতিও হয়। এটি ইতিবাচক ও সমর্থনযোগ্য কাজ। তবে এই পুলিশ কখনো কখনো ব্যক্তির প্রতি অমানবিক আচরণ করে থাকে যা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য খুবই ক্ষতিকর। যেমন পুলিশ নিজ স্বার্থে (পুরস্কৃত হবার আশায় বা অন্যকোনো স্বার্থে) কখনো কখনো আসামীকে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করে। এই অন্যায় প্রায় সব দেশেই লক্ষণীয়। তাই রাসেল কোনো অবস্থাতেই আসামীর স্বীকারোক্তিকে স্বাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের ঘোর বিরোধী। তার মতে "For the taming of the power of the police, one essential is that a confession shall never, in any circumstances, be accepted as evidence."[৩৫] আবার অপরাধীর শাস্তি যেমন সবাই চাই, তেমনি নিরাপরাধী মুক্তি সবার নিকট অতি আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এজন্য রাসেল নিরাপরাধীকে মুক্ত করার জন্য বিকল্প আরেকটি পুলিশ বাহিনী গঠনের সুপারিশ করেছেন যারা নিরাপরাধ ব্যক্তি যাতে অন্যায়ভাবে শাস্তি না পায় সেজন্য কাজ করবে।[৩৬]

উপর্যুক্তভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা গেলে সাধারণ জনগণ ক্ষমতায়িত হতে পারে এবং আমলাতন্ত্রসহ অন্যান্য ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার প্রয়োগ নিয়মতান্ত্রিক করতে পারলে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে। স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে এটা ঠিক। তবে "মানুষ যদি উপলব্ধি করতে না পারে যে স্বাধীনতা অতি মূল্যবান এবং স্বাধীনতা তাদের জীবন্ত ও সতেজ রাখবে তবে কোনো প্রতিষ্ঠানই স্বাধীনতা সংরক্ষণ করতে পারবে না"[৩৭] বলে রাসেল মনে করেন। কারণ কেবল প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার সমাজকে পরিবর্তন করতে পারেনা। ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগের উপযোগী সমাজে বিনির্মাণের জন্য জনগণের মানসিকতারও পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যেমন মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়তা করে তেমনি মানুষের চরিত্রই প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি বিশেষ রূপ দান করে। এই উভয় ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।[৩৮]

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্মিলন

একুশ শতক বিশ্বায়নের কাল। এখন বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-নিরাপত্তা-মানবসম্পদ নানা কারণে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতিতে একটি রাষ্ট্রের সাথে অপর একটি রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রকৃতি বা মূলনীতি কী হওয়া উচিৎ? এ ব্যাপারে রাসেল দুটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, প্রথমত; যুদ্ধ এড়ানো ও দ্বিতীয়ত; শক্তিশালী জাতীর অত্যাচার-অবিচার থেকে দুর্বল জাতিকে রক্ষা করা।[৩৯] তিনি উপলব্ধি করেছেন যে এক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাষ্ট্রের ভূমিকা নেতিবাচক এবং মানবতার জন্য অহিতকর। তাই তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর মন্দ উপাদানগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা, সামরিক শক্তির অপপ্রয়োগ, স্বার্থপরতা,

স্বাধীনতাকামীদের প্রতি নির্মম আচরণ, কট্টর দেশপ্রেম, চরম জাতীয়তাবাদ ও চরম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রভৃতি ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন হলো এই উপদানগুলোকে ক্ষতিকর বলার পেছনে রাসেলের যুক্তি কী? আমরা তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণ করেই এর উত্তর পেতে পারি।

রাসেল বলছেন, ক্ষমতার প্রতি রাষ্ট্রসমূহের চরম আকাঙ্ক্ষা হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।[৪০] কারণ একটি রাষ্ট্রের নিকট যতোই অধিক পরিমাণে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হোক সেই রাষ্ট্র আরো বেশি ক্ষমতাবান হতে চায়। ক্ষমতাবান হবার একটা উপায় হলো নিজ জনগণের উপর ব্যাপক প্রভাব এবং অপর রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের সামর্থ্য। এবং যুদ্ধ করার সামর্থ্য যে রাষ্ট্রের বেশি সে রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ, ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই বৃদ্ধি পায় যুদ্ধের আশঙ্কা। রাসেলের বক্তব্য হলো- প্রতিটি রাষ্ট্র যদি সমানভাবে যুদ্ধের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হত তবে ক্ষমতার ভারসাম্যে তেমন কোনো পরিবর্তন হত না। কিন্তু সেটা হয় না।

একটি রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও এর অপব্যবহার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার নামে আরো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এ সামরিক শক্তির প্রবণতা হলো যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা। আবার একটি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী নিজ দেশের জনগণের সাথে ভালো আচরণ করলেও বিদেশীদের সাথে রূঢ় ও নির্মম আচরণ করে। রাসেল উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি স্বদেশীকে হত্যা করে অথবা যে বিদেশীকে হত্যা করতে অস্বীকার করে রাষ্ট্র উভয়কেই শাস্তি দেয়। বিশেষত পরেরটি গুরুতর অপরাধ বলে চিহ্নিত হয়।[৪১] এসময় মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, যুদ্ধকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। যুদ্ধটি যে অন্যায় তা জানার পরও বেশিরভাগ মানুষই এসময় সরকারের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যায় না। গেলে শাস্তি পেতে হয়। চার্চ তার বিরোধী চিন্তার জন্য একসময় মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিত, রাসেল রাষ্ট্রকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাঁর মতে, “The power of the state, which makes this impossible, is a wholly evil thing, quite as evil as the power of the Church which in former days put men to death for unorthodox thought.”[৪২] সব বড় রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্যই হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দমন করা হয় এবং যাঁরা সামরিক ক্ষমতা’র বিপক্ষে প্রচারণা চালান তাঁদেরকে নির্মমভাবে শাস্তি পেতে হয়। অহংকারবোধ ও ভয়কে এ ধরনের আচরণের পেছনের কারণ হিসেবে রাসেল উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, “This attitude is rooted in pride and fear : pride, which refuses to be conciliatory, and fear, which dreads the results of foreign pride conflicting with our own pride.”[৪৩]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি মন্দ উপাদান স্বার্থপরতা। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি মন্দ হবে যদি অপর রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় সেই রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। “It is of the essence of the state to suppress violence within and facilitate it without.”[৪৪] সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সব রাষ্ট্রই এসব ক্ষেত্রে স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়।[৪৫] পারস্পরিক লেন-দেনের কারণে এই স্বার্থপরতা কখনো কখনো কিছুটা হ্রাস পেলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমুহের মূল প্রবণতাই হলো অন্য রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা।

চরম সার্বভৌমত্বের আদর্শকেও রাসেল সমালোচনা করেছেন। কারণ একটি উত্তম বিশ্ব গঠনের জন্য রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমত্ব কাঙ্ক্ষিত নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর যুক্তি হলো- প্রতিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র চরম সার্বভৌমত্বের দাবী করে। এই দাবী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেই। এ ধরনের দাবী বিবাদমান

পক্ষগুলোকে আরো উস্কে দেয়। ফলে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। যার পরিণতি হলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। তাই রাসেল ব্যক্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যকে যেমন স্বীকার করেননি তেমনি রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমত্বের দাবীকেও অস্বীকার করেছেন, "There is no more justification for the claim to absolute sovereignty on the part of a state than there would be for a similar claim on the part of an individual."[৪৬] রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমত্বের দাবী মেনে নিলে আন্তর্জাতিক সমস্যায় বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে শক্তিশালী পক্ষই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জয়লাভ করে। তখন ন্যায়বিচারের কোনো প্রশ্নই বিবেচনায় থাকে না। এক্ষেত্রে নিজেদের চরম সার্বভৌমত্বের দাবী কিছুটা ত্যাগের সুপারিশ করেন রাসেল।

স্বাধীনতাকামীদের প্রতি রাষ্ট্রের নির্মম আচরণের সমালোচনা করেছেন রাসেল। একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কোনো একটি এলাকার জনগণ যদি মূল রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন হতে চায় তবে তাদের প্রতি প্রাচীন রাজতন্ত্রের যুগের মত বর্বর আচরণ করা হয়। স্বাধীনতাকামীদের চরম বিশ্বাসঘাতক (high treason)[৪৭] হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে সব ক্ষেত্রেই এই আচরণ লক্ষণীয়। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মূল লক্ষ্য চরম ক্ষমতা অর্জন হওয়ায় তারা স্বাধীনতাকামীদের নির্মমভাবে দমন করে। জনগণের ভালমন্দ নির্ধারণের দায়িত্ব জনগণের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন রাসেল। আর এই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের একটি মূল আশংকা দূর করা যায়। সাথে সাথে রাষ্ট্রের একটি স্বৈরাচারী ক্ষমতার উপাদানের বিলোপ সাধন হয়। তাঁর ভাষায়,

> If the well-being of the citizens were the end in view, the question whether a certain area should be included, or should form a separate state, would be left freely to the decision of that area. If this principle were adopted, one of the main reasons for war would be obviated, and one of the most tyrannical elements in the state would be removed.[৪৮]

কট্টর দেশপ্রেমও রাসেলের মতে আন্তার্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক উপাদান। তিনি দেশপ্রেমকে সমর্থন করলেও যে দেশপ্রেম সর্বজনীন নয় এবং অন্যদেশকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে তার সমালোচনা করেন। সাধারণত একজন দেশপ্রেমিকের নিকট তার দেশের মঙ্গলই গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ নয়। কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষা একজন বাংলাদেশীকে উদ্দিপ্ত করবে সেই আকাঙ্ক্ষা একজন ভারতীয়কে উদ্দিপ্ত নাও করতে পারে। সবাই যদি কট্টর দেশপ্রেমিক হয়ে যায় তবে এক দেশের মানুষের সাথে অন্য দেশের মানুষের শত্রুতাও চরম আকার ধারণ করবে। একটি জাতি যত কট্টর দেশপ্রেমী ও গোঁড়া হবে ততই তার দ্বারা অন্যরা আক্রান্ত হবে। তাই রাসেল বলছেন, "A world full of patriots may be a world full of strife."[৪৯] তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ধর্মের মতোই দেশপ্রেমও মানুষকে হীনমন্ন করে তোলে বলে এই দেশপ্রেমের মাধ্যমে মানবতাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, "We cannot avoid having more love for our own country than for other countries, and there is no reason why we should wish to avoid it, any more than we should wish to love all individual men and women equally."[৫০]

এখন প্রশ্ন হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার ব্যাপারে রাসেলের প্রস্তাব কী? চরম দেশপ্রেম ও কট্টর জাতীয়তাবাদের বোধকে পরিশীলিত করার পরামর্শ দিয়েছেন রাসেল। তিনি মনে করেন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মন থেকে ক্ষতিকর চরম দেশপ্রেম ও কট্টর জাতীয়তাবাদের উপাদান দূর করা যায়। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার পেছনেই থাকে অহংকার, ঘৃণা, প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রভৃতি উপাদান। এ শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার্থীর মনে অন্য জাতির মানুষের প্রতি ঘৃণার উদ্রেগ করে। রাসেল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত

ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছেন যেমন, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় চরম সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতার প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি বিশ্ব সরকার[৫১] (world government) গঠনের সুপারিশ করে তার হাতে কিছু ক্ষমতা ন্যাস্ত করার প্রস্তাব করেছেন (রাসেল এ প্রস্তাব করেন ১৯১৬ সালে)। এ সরকারের হাতে থাকবে রাষ্ট্রের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের দায়িত্ব, প্রধান প্রধান যুদ্ধাস্ত্রগুলোর উপর একচ্ছত্র অধিকার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক শক্তি, আইন প্রণয়ন ও বিচারিক ক্ষমতা। এমনকি কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো বাহিনী থাকুক এটাও তিনি চাননি। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ভবিষ্যতের যুদ্ধ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে বাধ্য। এবং এই ধরনের যুদ্ধের হাত থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হলো প্রধান প্রধান যুদ্ধাস্ত্রগুলো মালিকানা একটি বিশ্ব সরকারের নিকট ন্যস্ত করা।[৫২] রাসেল মনে করতেন রাষ্ট্রগুলোকে হয় ধ্বংস না হয় সহযোগিতার পথ বেছে নিতে হবে। তিনি বিশ্ব সরকারকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এ সরকারের উদ্যোগে বিশ্বজুড়ে অন্যায় ও বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেন, "A world full of happiness is not beyond human power to creat: the obstacles imposed by inanimate nature are not insuperable. The real obstacles lie in the heart of man, and the cure for these is a firm hope informed and fortified by thought."[৫৩] রাসেল আশা করেছিলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর লক্ষ্য যেনো হয় একটি সুখী বিশ্ব গঠন।

উল্লেখ্য হবস, রুশো, হেগেলের রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমত্বের ধারণার সমালোচনা করে রাসেল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে সীমিতকরণ ও বণ্টনের সুপারিশ করেছেন। এতে দেখা যায় রাজনৈতিক বহুত্ববাদের (political pluralism)[৫৪] চিন্তার সাথে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। ম্যাকাইভার, গিয়ারকে, মেটল্যাণ্ড, বার্কার, লাসকি, লিন্ডসে প্রমুখ বহুত্ববাদী চিন্তাবিদ। বর্তমানে জাতি রাষ্ট্রের যুগ বলে বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, বিশ্বজনমত ও অন্য রাষ্ট্রের অধিকার এসব কিছু মানতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব সীমিত হয়ে যায়। আমরা রাসেলের অবস্থানের প্রতি সমর্থন পাই লাস্কি'র মন্তব্যে, "কোনো রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য অনুকুল নয়।"[৫৫] এমনকি নোয়াম চমস্কির বক্তব্যও এখানে প্রণিধানযোগ্য যেখানে তিনি বলছেন পরমাণু যুদ্ধ, পরিবেশ বিপর্যয় ও বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের সরকারগুলোর বিধ্বংসীমুখী প্রবণতার জন্য মূলত সরকারই দায়ী, কারণ এসব বিষয়ে জনগণের সম্মতি থাকে না। এর সাথে যুক্ত হয় জনমত ও জননীতির (সরকারি) মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ। ফলস্বরূপ, চমস্কি মত প্রকাশ করেছেন যে, আমেরিকা এমন এক পথে চলছে যার পরিণামে তার ঐতিহাসিক মূল্যবোধ: সমতা, স্বাধীনতা ও অর্থবহ গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।[৫৬] চমস্কি আরো উল্লেখ করেন যে, ব্যর্থ রাষ্ট্রের প্রাথমিক কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই চিহ্নিত করা যায়; একটি হলো সহিংসতা ও ধ্বংস থেকে জনগণকে রক্ষা করার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা, আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইনের উর্ধ্বে নিজেদের বিবেচনা করা এবং ফল হিসাবে যেকোনো আগ্রাসন এবং সহিংসতা ঘটানোর অধিকার বোধ করা। যেমন সাধারণভাবে ইরাককে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করা হয় এবং হাইতির জনগণকে তার অভ্যন্তরীণ ভীতি থেকে উদ্ধার করা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে গিয়েছে। যদিও ধারণাটিকে নৈরাশ্যজনকভাবে অসত্য বিবেচনা করা হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকলেও সেখানে ভয়াবহ গণতান্ত্রিক ঘাটতি রয়েছে যা সুষ্ঠু ও ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করছে।[৫৭] একটি কল্যাণকর ও সুখী বিশ্ব গঠনের জন্য রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে রাসেলের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা চর্চার আদর্শের প্রতি সমর্থন লক্ষ করা যাচ্ছে নোয়ম চমস্কির উপর্যুক্ত বক্তব্যে।

চার

এখন দেখা যাক রাষ্ট্র প্রসঙ্গে রাসেলের চিন্তা ও কর্মে সীমাবদ্ধতার যায়গাটি কীভাবে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথমেই 'বিশ্ব সরকার' প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনা যেতে পারে যা একই সাথে তাঁর চিন্তার শক্তিশালী ও দুর্বল দিক- উভয়ই। রাসেল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে বিশ্ব সরকারের ধারণা দিয়েছেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালেই (১৯১৪-১৮)। এ সরকার বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদমান সমস্যাগুলোর সমাধানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে জাতিসংঘ এই কাজটি করে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত জাতিপুঞ্জ বা ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হবার পূর্বেই রাসেল এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এটি রাসেলের চিন্তার শক্তিশালী দিক। কিন্তু এই বিশ্ব সরকারের হাতে যে ক্ষমতাগুলো রাখার প্রস্তাব করেছেন তাতেই তাঁর চিন্তার প্রয়োগ হয়ে পড়ে জটিল ও দুর্বোধ্য। কারণ, বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রই নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী তৈরী করে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব সামরিক বাহিনীকে রাসেল সমর্থন করেননি। এক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব হলো রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ সার্বভৌম দাবী কিছুটা ত্যাগ করবে, একটি সামরিক বাহিনী থাকবে এবং ঐ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক হবে ঐ বিশ্ব সরকার। কোনো রাষ্ট্রের হাতেই পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না, পারমাণবিক অস্ত্র ও ইউরোনিয়াম প্রভৃতির মালিক-নিয়ন্ত্রণকর্তা হবে বিশ্ব সরকার। কিন্তু, বর্তমানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রের সামরিক-পারমাণবিক-অর্থনৈতিক সক্ষমতা এক রকম নয়। রাষ্ট্রসমূহের শক্তিমত্তার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। এরকম অবস্থায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর নিকট থেকে সামরিক-পারমাণবিক ক্ষমতা বিশ্ব সরকারের নিকট হস্তান্তর একটি আদর্শবাদী ও কাল্পনিক চিন্তা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না। আর যেখানে একটি জাতি রাষ্ট্র ও তার শাসক নিজ নিজ সামরিক ও পারমাণবিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছেনা, সেখানে বিশ্ব সরকারের মতো একটি বহুরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে এ ধরনের সামরিক-পারমাণবিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব তা ভাববার বিষয়। উপরন্তু, বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাসেল শক্তি প্রয়োগকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে যারা শক্তিশালী তাদের হাতে দুর্বলেরা অবিচারের শিকার হবে না এটা তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি। হয়তো মানুষের উপর আস্থা থাকার কারণে তিনি আশাবাদী ছিলেন। স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে রাসেলের মত মানলে বিছিন্নতাবাদী আন্দোলন বৃদ্ধি পাবে কি না সেটা ভাববার বিষয়। রাসেল রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও সম্পত্তির মালিকানার বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর ভরসা করেননি। কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যক্তিমালিকানাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা সহজে বাস্তবায়নযোগ্য বলে মনে হয় না।

তবে উপর্যুক্ত সমালোচনার পরও রাষ্ট্র প্রসঙ্গে রাসেলের চিন্তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক একথা বলা সহজ নয়। বরং দিন দিন আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। বিশেষ করে রাসেলের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা কার্যকর করতে পারলে কতিপয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে অন্যদের উপর অবিচার করার সুযোগ রহিত হত। সাধারণ মানুষ ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে পারতো। উপরন্তু তাঁর চিন্তার অনুসরণে রাষ্ট্রসমূহ চরম সার্বভৌমত্ব, কট্টর জাতীয়তাবাদ ও চরম দেশপ্রেমকে পরিশীলিত করে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করতে পারলে বর্তমানের জাতিসংঘের নেতৃত্বেই আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হতে পারে। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার নামে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করছে। কিন্তু এই শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে ধনী রাষ্ট্রগুলোর, দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো আরো নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে। অধিকন্তু মধ্যবর্তী আয়ের যেসব রাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে ফেলেছে, সেই শক্তিও কখনো কখনো তাদের নিজেদের জন্যও হুমকি হয়ে

দেখা দিচ্ছে। এই সমস্ত অশুভ হুমকির প্রেক্ষিতে নোয়াম চমস্কি মনে করেন রাসেলের সামাজিক ও রাজনৈতিক লেখাগুলো দিনদিন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে।[৫৮]

পাঁচ

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্র সম্পর্কে রাসেলের মতকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

১. রাষ্ট্র একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠন;

২. এ রাষ্ট্রের অধীনে মানুষের জোটবদ্ধতার কারণ হলো কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতাবোধ, উপজাতিগত অনুভূতি, অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় এবং দেশপ্রেম প্রভৃতি।

৩. ফলস্বরূপ, রাষ্ট্র একটি ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার জন্য হয়ে পড়ে হুমকিস্বরূপ। এটাই প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামোর বড় সংকট;

৪. কিন্তু রাষ্ট্রবিহীন মানুষের জীবন অকল্পনীয়ও বটে;

৫. এজন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন; সমন্বয়ের স্বার্থে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত;

৬. জনগণের ক্ষমতায় অংশগ্রহণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা;

৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম দেশপ্রম, চরম জাতীয়তাবাদ, কট্টর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, স্বার্থপরতা পরিত্যগ করা উচিত। এজন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী তথা নাগরিকের মনে অন্য জাতির প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি না হয়। এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রয়োজন বিশ্ব সরকার।

তবে রাসেল কেবল প্রতিষ্ঠানগতভাবে রাষ্ট্রের সংস্কারকে পর্যাপ্ত বলেননি বরং কল্যাণকর রাষ্ট্র তৈরীর জন্য জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে অন্যদিকে মানুষের চরিত্রই প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করবে। একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন সমান্তরালভাবে হওয়া উচিত বলেই রাসেলের অভিমত। পরিশেষে বলা যায়, রাসেলের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তার অনুসরণ করতে পারলে সামষ্টিক কল্যাণ ও ব্যষ্টিক কল্যাণের মধ্যে একটি সুসম সমন্বয় সম্ভব হতে পারে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করতে পারলে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল ও সুখী বিশ্ব গঠনের দিকে হয়তো এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ Harold J. Laski, *A Grammer of Politics* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1970), p. 2.

২ Bertrand Russell, *Principles of Social Reconstruction* (London: Allen & Unwin Ltd, 1960 Reprint), p. 39.

৩ দ্রষ্টব্য: সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর রিপাবলিক* (ঢাকা: বর্ণমিছিল, ১৯৭৪), পৃ. ১৭৯-১৮৪।

৪ সামাজিক চুক্তিবাদী হবস, লক, রুশো মনে করেন জনগণের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সমাজ-রাষ্ট্র এবং সরকার গঠিত হয়েছে। এবং জনগণ তাদের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা'র অধিকার রক্ষার শর্তে সরকারের নিকট তাদের স্বাধীনতা অর্পন করেছে। ফলস্বরূপ, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রের নিকট সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। হবসের (১৫৮৮-১৬৭৯) মতে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে জনগণকে একটি চরম ক্ষমতা সম্পন্ন রাজনৈতিক সার্বভৌমের অধীনে থাকতে হবে। কারণ তিনি মনে করতেন এটি একমাত্র শাসন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে এবং গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

(Thomas Hobbes, *Leviathan* (London: np, 1691), http:// socserv2. socsci. mcmaster. ca/ econ/ugcm/3ll3/hobbes/Leviathan.pdf, date: 05.02.2017.)

রুশো (১৭১২-১৭৭৮) মনে করেন, প্রত্যেকে তার নিজ ব্যক্তিসত্তাকে এবং তার সব ধরনের কার্যক্ষমতা সমাজের সমষ্টিগত চেতনার 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will) দ্বারা পরিচালিত করলে সমষ্টিগত শক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে পূর্ণ সমাজ-সংস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ফিরে পাবে।

(Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, G.D.H. Cole (Trans.), Public Domain 1762 https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Rousseau_contrat-social.pdf, date: 05.02.2017).

৫ ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) রাষ্ট্রকে একটি মহান ও ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তবে সামাজিক চুক্তিবাদীদের মত তিনি মনে করেন না যে রাষ্ট্র কোনো চুক্তির ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। বরং তাঁর মতে, রাষ্ট্র হলো একটি ঐশ্বরিক ধারণা এবং এই জগতে পরম সত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে এই রাষ্ট্রের মধ্যে। তাই তিনি মনে করেন রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। এবং রাষ্ট্রই হলো সেই বাস্তব সত্তা যাকে অবলম্বন করে মানুষের স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। হেগেলের দর্শনে রাষ্ট্র হলো 'পরম মন' (Absolute Mind)।

(William Ebenstein, *Great Political Thinkers, Plato to the Present* (Calcutta, Bombay, New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1972), pp. 591-592).

৬ মার্কসের মতে, রাষ্ট্র যেকোনো সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে গড়া একটি সংগঠন এবং অন্যান্য শ্রেণির উপর শাসন ও শোষণকে মজবুত করাই এর লক্ষ্য। পুঁজিবাদী সমাজে যেহেতু ধনীরা সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী শ্রেণি এবং দুর্বল শ্রেণিগুলোকে শোষণ করাই যেহেতু এই শ্রেণির মূল লক্ষ্য, তাই রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের শোষণ করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। লেনিনের মত হলো, "বিরোধপূর্ণ শ্রেণি সমাজে রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। একটি শ্রেণির উপর অন্য একটি শ্রেণির শাসন বজায় রাখার যন্ত্র।" (V. I. Lenin, *The State, Collected Works*, in: V.G. Afanasyev, *Marxist Philosophy* (Moscow: Progress Publishers, 1980), p. 282.) এ শোষণকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বদলিয়ে তদস্থলে বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা মার্কসের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি মালিক শ্রেণির বিপক্ষে শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র এবং সবশেষে সাম্যবাদে পৌঁছানো যাবে বলে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর মতে, সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে রাষ্ট্র থাকলেও সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। তখন শ্রেণিহীন ও রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭ নৈরাজ্যবাদ (Anarchism) : নৈরাজ্যবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি চরম রূপ। এঁরা কখনোই নৈরাজ্যবাদকে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সাথে এক করে দেখেননি। এঁদের মতে, রাষ্ট্র হলো একটি 'আবশ্যকীয় অমঙ্গল'। শ্রেণিহীন ও রাষ্ট্রবিহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো নৈরাজ্যবাদীদের আদর্শ। নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন, রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন নেই এবং রাষ্ট্রের কাজ স্বেচ্ছায় সংগঠিত সংঘই চালিয়ে যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা, সম্পদের বণ্টন সুনিশ্চিত করা, অন্যান্য দেশের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করা প্রভৃতি সবই সংঘ সম্পাদন করতে পারে বলে নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন। আধুনিক নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে অন্যতম হলেন গডউইন (১৭৫৬-'৩৬), প্রুধোঁ (১৮০৯-'৬৫), বাকুনিন (১৮১৪-'৭৬), পিটার ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১)।

৮ D. R. Bhandari, *History of European Political Philosophy* (Lohor: Evernew Book Stall, 1969 9th ed.), p. 463.

---

[৯] দ্রষ্টব্য: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৪২।

[১০] Bertrand Russell (With Dora Russell), *The Prospects of Industrial Civilization* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1923), pp. 34-35.

[১১] A.D. Lindsa, *The Modern Democratic State* (London: Oxford University Press, 1951 5th ed.), p. 90.

[১২] Bertrand Russell, *Political Ideals* (London: Allen & Unwin Ltd, 1963 Reprint), p. 9.

[১৩] Russell, *Principles of Social Reconstruction*, pp. 48-49. এবং Russell, *Authority and the Individual* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1964), p. 68.

[১৪] দ্রষ্টব্য: Bhandari, *History of European Political Philosophy*, p. 463.

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

[১৬] *প্রাগুক্ত*।

[১৭] Russell, *Political Ideals*, p.31.

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

[১৯] Russell, *Principles of Social Reconstruction*, p. 50.

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

[২১] মো. আরিফুল ইসলাম, 'সম্পত্তি প্রসঙ্গে জন লক: একটি রাষ্ট্রদার্শনিক বিশ্লেষণ', *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এণ্ড ল'*, সখ্যা ৪২ (২০১৪), পৃ. ৫৭-৬৮।

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

[২৩] Russell, *Authority and the Individual*, p. 44.

[২৪] Russell (With Dora Russell), *The Prospects of Industrial Civilization*, p.223.

[২৫] *প্রাগুক্ত*।

[২৬] Russell, *Principles of Social Reconstruction*, p. 53.

[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

Russell (With Dora Russell), *The Prospects of Industrial Civilization*, pp. 224-226.

[২৯] Russell, *Principles of Social Reconstruction*, p. 52.

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২।

[৩১] Russell (With Dora Russell), *The Prospects of Industrial Civilization*, p. 232.

[৩২] Russell, *Power- A new Social Analysis* ((London: George Allen & Unwin Ltd, 1957, 17th impression), p. 292.

[৩৩] *প্রাগুক্ত*।

[৩৪] Russell (With Dora Russell), *The Prospects of Industrial Civilization*, p. 225.

৩৫ Russell, *Power*, p. 295.

৩৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।

৩৭ Russell, *Principles of Social Reconstruction*, p. 53.

38 Bertrand Russell, *Autobiography* (London: Routledge, 2004 Reprint), pp.726-27.

৩৯ Bertrand Russell, *Roads to Freedom* ((London: Allen & Unwin Ltd, 1970 Reprint), p. 98.

৪০ Russell, *Principles of Social Reconstruction*, p.45.

৪১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

৪২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৪৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৪৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৪৬ Russell, *Political Ideals*, p. 81.

৪৭ Russell, *Principles of Social Reconstruction*, p. 44.

৪৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৪৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৫০ *প্রাগুক্ত*।

৫১ এ প্রস্তাব তিনি প্রথম করেন ১৯১৬ সালে প্রকাশিত *Principles of Social Reconstruction* ও ১৯১৭ সালে প্রকাশিত *Political Ideals* এ। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে এই ধরনের একটি সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘের আবির্ভাব হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Russell, *Political Ideals*, p. 81-89., Russell, *New Hopes for A Changing World* (London: G. Allen & Unwin Ltd., 1951), pp. 97-98.

৫২ Russell, *Authority and the Individual*, p. 44.

৫৩ Russell, *Roads to Freedom*, p.111.

৫৪ রাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব ও চরম সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রচার করেন একত্ববাদী (Monist) দার্শনিকরা। হবস্, রুশো, হেগেল, বোঁদা, হল্যাণ্ড, অষ্টিন প্রমুখ চিন্তাবিদ হলেন একত্ববাদী সার্বভৌমিকতার ধারণার প্রচারক। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সীমিত ও বিভক্ত করার আন্দোলনে যুক্ত বহুত্ববাদীরা (Pluralist)। ম্যাকাইভার, বার্কার, লিন্ডসে, ডুগুই, লাসকি ও রাসেল প্রমুখ এ ধারার অন্যতম হলেন চিন্তাবিদ।

৫৫ Laski, *A Grammer of Politics*, p. 65.

৫৬ দ্রষ্টব্যঃ Noam Chomsky, *Failed States* (New York: Henry Holt and Company, 2006), preface.

৫৭ *প্রাগুক্ত*।

৫৮ গৃহীত: Bertrand Russell, *Common Sense and Nuclear Warfare* (London: Allen & Unwin Ltd, 1959, 2010 1st Indian Reprint), p. vii.

আরো দেখুনঃ Noam Chomsky, *Failed States*, chapter 1.

গ্রন্থপঞ্জি

১. Afanasyev, V.G. *Marxist Philosophy*, Moscow: Progress Publishers, 1980.

২. Bhandari, D. R. *History of European Political Philosophy*, Lohor: Evernew Book Stall, 1969 9th ed.

৩. Chomsky, N. *Failed States*, New York: Henry Holt and Company, 2006.

৪. Ebenstein, W. *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, Calcutta, Bombay, New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1972.

৫. Hobbes, T. *Leviathan*, London: np, 1691.

৬. Laski, H. J. *A Grammer of Politics*, London: George Allen and Unwin Ltd., 1970.

৭. Lenin, V. I. *The State, Collected Works.*

৮. Lindsa, A.D. *The Modern Democratic State*, London: Oxford University Press, 1951 5th ed.

৯. Rousseau, J. J. *The Social Contract*, G.D.H. Cole (Trans.), Public Domain 1762.

১০. Russell, B. *Authority and the Individual*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1964.

১১. Russell, B. *Roads to Freedom*, London: Allen & Unwin Ltd, 1970 Reprint.

১২. Russell, B. (With Dora Russell), *The Prospects of Industrial Civilization*, London: Allen & Unwin Ltd, 1923.

১৩. Russell, B. *Autobiography*, London: Routledge, 2004 Reprint.

১৪. Russell, B. *Common Sense and Nuclear Warfare*, London: Allen & Unwin Ltd, (1959), 2010 1st Indian Reprint.

১৫. Russell, B. *New Hopes for A Changing World*, London: G. Allen & Unwin Ltd., 1951.

১৬. Russell, B. *Political Ideals*, London: Allen & Unwin Ltd, 1963 Reprint.

১৭. Russell, B. *Power- A New Social Analysis*, London: G. Allen & Unwin Ltd, 1957, 17th impression.

১৮. Russell, B. *Principles of Social Reconstruction*, London: Allen & Unwin Ltd, 1960 Reprint.

১৯. সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর রিপাবলিক*, ঢাকা: বর্ণমিছিল, ১৯৭৪.

২০. ইসলাম, মো. আ. 'সম্পত্তি প্রসঙ্গে জন লক: একটি রাষ্ট্রদার্শনিক বিশ্লেষণ', *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এণ্ড ল'*, সখ্যা ৪২, ২০১৪.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার কৃৎকৌশল

সৈয়দ তৌফিক জুহরী*

Abstract: Buddhadeb Bosu, a Bengali poet and a versatile writer of the 20th century, also wrote novels, short stories, plays, essays, and he was also an eminent editor and critic of his time. With his poetry he always played a significant role in shaping the literary movement of modern Bengali poetry, and established himself as one of five poets who moved to introduce modernity into Bengali poetry. It is also significant that his most widely well-known *Bandir Bandana* was published when he was only seventeen years old. Although in his early works he showed the clear influence of Rabindranath Tagore, but at last phase of his life he created a poetic style and constituted the modern era of Bengali poetry. He wrote poetry by the influence of Ezra Pound, William Butler Yeats and T. S. Eliot, but he had a unique style of free verse, and was great in command of rhyme and rhythm. Our object in this paper is not to deal with the entire canvas of his poetic-self but to attempt, in a modest way, an identification of the principal qualities, style and form of his works.

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত সৃষ্টিশীল কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রত্যক্ষ করেছেন আধুনিক বিশ্বের জটিল জীবন পরিক্রমা ও গতিশীল সভ্যতার ক্রমবিকাশ। তাঁর কাব্য-প্রত্যয়ও গড়ে উঠেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মড়ক-মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির অভিঘাতে। একদিকে যেমন সমকালীন ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সম্মুখীন হয়েছেন দ্বন্দ্বচৈতন্যে, অন্যদিকে তেমনই বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিক সংকট-সংঘাত ও জড়যন্ত্রনায় সিক্ত হয়েছেন। আমরা জানি, 'শিল্পসাহিত্যে যুদ্ধ একটি বীক্ষণাগার হিসেবে বিবেচ্য, যেখানে জীবন ও সমাজে আত্মপরীক্ষার সময়সন্ধি সৃষ্টি হয়ে মানুষের ব্যক্তিতাকে অস্তিত্বের অণুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে।'[১] সুতরাং অস্তিত্ব-বিশ্লিষ্ট অভিঘাত তাঁকে আধুনিক সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি যেমন অনুসন্ধিৎসু করে তোলে, ঠিক তেমনই আপন সাহিত্যচর্চায় করে অব্যাহত পথিক। এর ফলে সাহিত্যপথে নিরন্তর যাত্রায়, নিজস্ব কাব্যলোক সৃজনে, বিষয় ও প্রকরণকলার অনুসন্ধানে তাঁর দীর্ঘজীবন উৎসর্গ হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মর্মবাণী* (১৯২৫) প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে *কল্লোল* পত্রিকায় তরুণ কবি হিসেবে সাধুবাদ লাভ করেন। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয় এভাবে,'শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কিছু কিছু লেখা বোধ হয় আজকাল পত্রিকায় পড়ছ। মর্মবাণীর কবিতা সংগ্রহে এই কিশোর কবির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বয়সের তারুণ্য মনে না রেখে বইখানা পড়ে দেখো।... ভাল কবিতা যে মানুষের অপূর্ব সৃষ্টি, ধ্যানলোকের নিবিড় প্রকাশ, তা আজকালকার অনেক নবীন কবির রচনা পড়ে অনুভব করা যায়।'[২] অর্থাৎ, তখনও *কল্লোল*-এ সাহিত্যচর্চার সূচনা না ঘটলেও কাব্যচর্চার মাধ্যমে যথেষ্ট সুপরিচিতি লাভ করেছিলেন, সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন গুণমুগ্ধ পাঠশ্রেণি। ক্রমে তিনি রচনা করলেন *বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৩০), *একটি কথা* (১৯৩২), *পৃথিবীর পথে* (১৯৩৩), *কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৩৭), *নতুন পাতা* (১৯৪০), *এক পয়সায় একটি* (১৯৪২), *২২ শে শ্রাবণ* (১৯৪২), *দয়মন্তী* (১৯৪৩), *রূপান্তর* (১৯৪৪), *দ্রৌপদীর শাড়ি* (১৯৪৮), *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* (১৯৫৫), *যে-আঁধার আলোর অধিক* (১৯৫৮), *মরচে-পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬), *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* (১৯৬৬), *একদিন : চিরদিন* (১৯৭১), *স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবার 'কবিকে শুধু বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফেরালেই চলবে না, ডুব দিতে হবে অর্ন্তলোকে যেখানে বাইরের পৃথিবীর অনিত্য সৌন্দর্য স্মৃতির মধ্যে নিত্য হ'য়ে আছে।'[৩] এই চেতনার ধারাজলে সমসাময়িক জীবন-প্রসঙ্গকে অবলম্বন করেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচর্চার সূচনা ঘটেছিল, পাশ্চাত্য সাহিত্যে এবং সাহিত্যালোচনায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের মাধ্যমে তা স্থির ভিত্তি অর্জন করে। প্রথম জীবনের কবিতায় কবি রোমান্টিকতায় পর্যবসিত এবং একজন রোমান্টিক কবির শক্তিমত্তার মৌলকণা যে কল্পনামনীষা তার চর্চায় নিবিষ্ট থেকেছেন একাগ্রচিত্তে। ক্রমে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, এলিয়ট প্রমুখ সাহিত্য-শিল্পীর রচনা-পাঠ তাঁকে দান করে প্রবল সৃষ্টিপ্রেরণা, যার প্রভাবে আবিষ্কার করেন বাংলা কবিতার জীবনদেবতা-প্রেরণার রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাবলয় থেকে পৃথক এক অনুপ্রেরণা-স্রোত। সমকালে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বাংলা কাব্যজগতে সংগঠিত সর্বময় আধিপত্য-বিস্তারের গতি এবং অক্ষম রবীন্দ্র-অনুকরণের প্রচেষ্টা সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাই তো কাব্যচর্চার সূচনাকালেই 'বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টত অনুভব করলেন নতুনভাবে কবিতাকে গড়তে হবে এবং এ ব্যাপারে পাউন্ডের ইমেজিস্ট কবিতার অনুসরণে ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিতার সঙ্গে এবং ক্রমে ক্রমে বিশ্বকবিতার ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এক আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে তুললেন।'[৪] আসলে আধুনিক কবিদের সর্বাপেক্ষা বড়ো সংগ্রাম রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাকে সর্বদা তিনি সমুন্নত রেখেছেন। এক দিকে তিনি নুতন পথের দিশারীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, অন্যদিকে কবিতা-সংগঠকরূপে *কবিতা* (১৯৩৫) পত্রিকার মাধ্যমে আধুনিক কবিতাচর্চার পথ উন্মুক্ত করেছেন। কেবল আত্মবিকাশ নয়, নতুন কাব্যপ্রতিভার আবিষ্কারে ও নতুন কাব্যপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা দানে সময়-শ্রম-প্রতিভা ব্যয় করেছেন। এমনকি তাঁর কালের কবিদের কবিতা সম্পর্কে করেছেন আলোচনা, তাঁদের কবি-পরিচিতিকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত এবং পাঠক-অন্তরে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে সৃষ্টি করেছেন সচেতন ঔৎসুক্য। একজন সমালোচক এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যইতিহাস পাঠ করলে একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে– কবির সারাজীবনের অন্বেষ্য ছিল এক বিশুদ্ধ শিল্পী-আত্মা; যে শিল্পী আত্মার উন্মোচনে বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম হয়। শিল্পী আত্মার আলোক বিচ্ছুরণে কবিতার উদ্দীপ্তি ঘটে। বুদ্ধদেব এই কবিতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সাধনা করেছেন আজীবন। কবিতা তাঁর কাছে 'সর্বেশ্বরী'।'[৫]

কবি কেবল বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকেন না, বিষয়কে তিনি বিন্যস্ত করেন ভাষা-ছন্দ-অলংকার ও প্রকরণকলার স্থাপত্যে। গতানুগতিক কাব্যভাষার বেড়াজাল ছিন্ন করে নবতর ভাষাপদ্ধতি নির্মাণ ও আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ হিসেবে আমরা জানি, 'কাব্যের প্রধান লক্ষ্য বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে পাঠকের মনে অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগ্রত করা।'[৬] ত্রিশোত্তর কবিরা আধুনিকতার দিক থেকে যেমন বিষয়বস্তুকে ধারণ করেছেন, ঠিক তেমনই কবিতার প্রকরণকলায় সঞ্চার করেছেন মননশীল জটিলতা। *বন্দীর বন্দনা* থেকে *নতুন পাতা* পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেছেন আবেগতাড়িত রোমান্টিক সংবেদনা। যদিও আধুনিক কবি কাব্যকলায় বর্ণনা পরিহার করেন তথাপি তিনি অবাধ বর্ণনা ও রোমান্টিক-সংবেদনায় কাব্যসৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতে গল্পের উপাদানও খুঁজে পাই; বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক গদ্যকবিতায় ব্যবহৃত গল্পের আঙ্গিকে বুদ্ধদেব এই সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বর্ণনার ফাঁকে-ফাঁকে গীতিকবিতার হার্দ্য-মননশীল আবেগ ও চিত্র-ধ্বনি-ছন্দের শারীরী কাঠামো মন্ত্রগুণে প্রতিমায় রূপান্তরিত করেছেন। প্রথম পর্যায়ের এই আবেগ-সংবেদনা পরবর্তী পর্যায়েও দৃশ্যমান হয়েছে, তবে তা অনেক সংহত, কিন্তু অন্তর্লীন এক রোমান্টিক আবেগ কবির সমস্ত কবিতা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এর ফলেই আসলে লিরিক-সেন্স এবং গভীর গীতলতার পাশাপাশি গল্পের উপাদানের ব্যবহার দৃশ্যমান হয়েছে। এভাবে মননশীল আবেগ এবং সাংগীতিক দোলের ব্যবহারের মাধ্যমে– যুক্তির কাঠিন্য, মেধা-প্রজ্ঞার শুষ্ক-প্রয়োগ থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। শব্দ-ধ্বনি-ছন্দের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ দ্বারা তিনি কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন বর্ণনার

তারল্য ও স্থবিরতা থেকেও। এভাবেই বুদ্ধদেব বসুর প্রকরণ-ভাবনা সমন্বয় এবং বিন্যাসে, আহরণ এবং বর্জনে, সংশ্লেষণে এবং পরিপাকে পরিপুষ্ট হয়ে কবি-মনোভূমের অনিবার্য ও প্রবল তাড়নায় রূপান্তরিত হয়েছে কবিতায়।

২.

লিরিকের স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় দৃশ্যমান হয়েছে *কঙ্কাবতী* কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা, 'সেরেনাদ', 'শেষের রাত্রি', 'কবিতা', 'বিবাহ' ইত্যাদি কবিতায়, অন্যদিকে আবেগ-সংবেদনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে *নতুন পাতা কাব্যগ্রন্থের* 'চিল্কায় সকাল', 'ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা', 'বিচ্ছেদের দিন', 'সমুদ্রস্নান' ইত্যাদি কবিতায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায়ও বুদ্ধদেব বসু গীতলতা, রোমন্টিক অনুভূতির প্রকাশ প্রভৃতি পরিত্যাগ করেননি। *দময়ন্তী*-কাব্যগ্রন্থের 'চলচ্চিত্র', 'ছিন্নসূত্র', 'বিকাল' এবং 'পদ্মা' কবিতায় গল্পের উপাদান স্থান পেয়েছে। আবার *দ্রৌপদীর শাড়ি* কাব্যগ্রন্থে গল্প-কাঠামো পরিহারে সচেষ্ট হলেও 'উদ্বাস্ত', 'বিদেশিনী', 'বন্ধু' এবং 'স্ত্রী' কবিতায় বর্ণনাধর্মীতা, গল্প-উপাদান ও রোমন্টিকতা স্থান পেয়েছে অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, বিশেষভাবে সপ্তদশ শতকের চিত্রশিল্পী রেমব্রান্টের (১৬০৬-১৬৬৯) আত্মপ্রকৃতি পর্যায়ের চিত্রকর্ম তিনি পছন্দ করতেন। তবে কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে আলো ও রঙের ব্যবহারবৈচিত্র্য, স্পন্দনশীলতা, হাওয়ার ঘনত্ব, চাঁদ-নক্ষত্রলোক-মহাকাশ, আলো-ছায়ার খেলা, আঁধারের ছন্দ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যচর্চায় কবি এঁকেছেন প্রচুর আত্মপ্রকৃতি, যেখানে বার্ধক্যের বেদনা, একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ও জীবন-সম্পর্কে মোহমুক্তির দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, তা চিত্রশিল্পী রেমব্রান্টের চিত্রপটে চিত্রিত আত্মপ্রকৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। আরও প্রকাশ পেয়েছে আত্মিক-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং পার্থিব-বঞ্চনার প্রতি নির্মোহ মনোভাব। আসলে এই সাযুজ্য স্থাপন ভারতীয় চেতনার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যকলা ও সাহিত্যপ্রেরণার সাথে সংযোজ-স্থাপনের লক্ষ্য থেকে সৃজিত হয়েছে। আধুনিকতার প্রাথমিক প্রয়াসে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যশিল্পীর মাধ্যমে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনচেতনার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু প্রথম কবিতা রচনা করেন নয়-দশ বছর বয়সে। ছয় থেকে সাত স্তবকের একটি ইংরেজি কবিতা, তার প্রথম স্তবক হল:

> Adieu, adieu, Deloney House dear,
> We leave you because the sea is near,
> And the sea will swallow you, we fear,
> Adieu, adieu.[৭]

কবিতাটি রচিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে, কবির তৎকালীন বাসস্থান 'ডেলনি হাউস' অকস্মাৎ মেঘনার ভাঙনের সম্মুখীন হলে। তখন বাড়িটির আসন্ন অবলুপ্তির বেদনায় কাতর কবি এই ইংরেজি কবিতাটি রচনা করেন, যা তাঁকে পরিবারের মধ্যে কবি-পরিচিতি দেয়। এই ডেলনি হাউসেই কবি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রামায়ণের অনুকরণে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন, যার মাধ্যমে কিশোর-চৈতন্যের কবিতা-উন্মাদনার প্রথম প্রকাশ ঘটে। আকৈশোর বুদ্ধদেব বসু অধ্যয়ন করেছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের রচনাবলি,যার ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতি-ঐতিহ্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ যেমন ছিলো অবাধ– আবার ঠিক তেমনই ভারতীয় সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতি-ঐতিহ্য ও দর্শনের সাথেও তিনি করেছিলেন সংযোগ-স্থাপন। এভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় আরও ব্যবহৃত হয়েছে মনোসমীক্ষন পদ্ধতি, Internal Monologue যা অন্তঃস্বগতোক্তি দ্বারা সৃজিত। যেখানে একস্থানে বক্তা শোনাচ্ছেন নিজের কথা, অন্যস্থানে নিজেই নিজের সাথে কথা বলছেন। এইঅন্তঃস্বগতোক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় 'কাল', 'কখনো, 'বেহায়া', মধ্যবর্তী' ইত্যাদি কবিতায়। আবার মনোবিজ্ঞানের ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি বা Association of ideas-এর ব্যবহারও তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। 'ভাবানুষঙ্গ উপমাতে

যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাকধ্বনিতে, পুনরাবৃত্ত বাকপ্রতিমায় বা উল্লেখে, বিশেষ শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও পাওয়া যায়।'[৮] এর প্রাথমিক ব্যবহার যেমন লক্ষ্য করা যায় *দয়মন্তী*-র 'চলচ্চিত্র' কবিতায় এবং তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাতেও তেমন সন্ধান পাওয়া যায়।

মরচে-পড়া পেরেকের গান কাব্যগ্রন্থের 'ইকারুস'; *স্বগতবিদায়*-এ 'কিম্পুরুষ', 'হনুমানের জন্ম', 'মৃত্যু' এবং *একদিন : চিরদিন* কাব্যগ্রন্থের 'দেকানিরা' প্রভৃতি কবিতায় ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির সন্ধানলাভ করা যায়। আবার *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* কাব্যগ্রন্থে এসে কবি সন্ধান দিয়েছেন নবতর প্রকরণ ভাবনার। সেখানে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের টানাপোড়েনে দোলায়িত কবি অমরত্বের প্রার্থনায় হলেন উদ্বেলিত, আপাত-বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে নতুন সৃষ্টির প্রার্থনা করলেন। এখানে যেমন রোমান্টিক আবহ প্রকাশমান আবার ঠিক তেমনই কাব্যের ফর্মেও লক্ষ্য করা যায় গল্পের আবহ। আবার *যে-আঁধার আলোর অধিক*-কাব্যগ্রন্থে এক সংহত প্রকরণকলা ব্যবহার করেছেন, এছাড়া ভাষারীতির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ের চেয়ে কবি ভাষার সারল্য ও বর্ণনার আধিক্যও পরিত্যাগ করেছেন। বাক্যগঠনরীতি হয়েছে জটিল এবং প্রতীকায়িত– আবার সনেটের রূপকল্পেও ভাষা পেয়েছে সংহত ও সংযত রূপ। তৃতীয় পর্যায়ে কাব্যগ্রন্থ রচনাকালে তিনি অনুবাদকর্মে মনোনিবেশ করেন, যার মাধ্যমে কবির প্রকরণরীতি শাণিত হয়েছে। কবি বুদ্ধদেব বসু অনূদিত *মেঘদূত* প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। আবার ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ কালপর্বে প্রকাশিত হয় বোদলেয়ারের অনূদিত কবিতাসমূহ। অুনবাদকর্মে মনোনিবেশ করে কবি অভিধানচর্চার গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন, যা তাকে বহু নতুন শব্দ শিখতে ও নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুগভীর পাঠ-অভিজ্ঞতা, জীবন-অভিজ্ঞতা, শাণিত অনুবাদকর্ম-চর্চা ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় পর্যায়ের কাব্যসমূহে। একজন সমালোচক এ-প্রসঙ্গে বলেছেন,'বুদ্ধদেব বসুর বোদল্যার অনুবাদ একসময় বাঙালি পাঠকের মনে সাড়া জাগিয়েছিল, বুদ্ধদেব বসু ফরাসিতে মূল বোদল্যার পড়েন নি, একাধিক ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে তিনি একটি উল্লেখের মতো কাজ করেছেন, বাংলা কাব্য-অনুবাদের ক্ষেত্রে নতুন দিক খুলে দিয়েছে তাঁর এ জাতীয় বই।'[৯] তাঁর ব্যবহৃত শব্দ-ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র ভাবনার বিচ্ছুরণ; পাশাপাশি মিথ-প্রয়োগে বিস্তৃতি, রোমান্টিকতা, বর্ণনাধর্মীতা, গাল্পিক কাঠামো ইত্যাদির চেয়ে সংহত প্রকাশভঙ্গীর দিকেই অধিক দৃষ্টিপাত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে কবির উক্তি স্মরণযোগ্য:

> অনুবাদের কারণেই আমি প্রথম বুঝেছিলাম কোনো কবির পক্ষে অভিধানচর্চার অভ্যাসটি কত উপকারী, ভাষাতত্ত্বে অল্পবিস্তর জ্ঞান কত প্রয়োজনীয়; শিখেছিলাম মাতৃভাষায় অনেক নতুনশব্দ, এবং নতুন শব্দ তৈরি ক'রে নেবার উপায়; বুঝেছিলাম শব্দ ব্যবহারে যাথার্থের মূল্য : বাংলা ছন্দকে আরো একটু সাবলীলভাবে চালাতেও হয়তো শিখেছিলাম। আজকের দিনে রচনাকর্মকে আমি যেভাবে দেখি এবং চিন্তা করি, যেসব সমস্যা তা উপস্থিত করে এবং যেভাবে তার সমাধানের পথ খুঁজে পাই; যেভাবে ধরা যাক, আমার সাম্প্রতিক কবিতা ও গদ্য–কবিতা ও কাব্যনাট্য, এমনকি কোনো কোনো গদ্যরচনা আমি লিখেছিলাম, তার মধ্যে কতখানি আমার অনুবাদকর্মের অবদান আছে, আমি তা মনে মনে ভালোই জানি।[১০]

এভাবে কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদকার্মের অভ্যাস তাঁকে বিশেষ স্বতঃস্ফূর্ততা দান করেছে। তবে গঠনগত দিক থেকে আবেগতাড়িত রোমান্টিকতা উচ্ছ্বাস, বর্ণনাধর্মীতা প্রকাশ পেলেও অন্তর্লীন গীতিধর্মীতাই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যের প্রাণ। প্রথম পর্যায়ের কবিতার স্থবিরতা থেকে মুক্তিলাভ করে শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর কবিতা-ভাষা শাণিত ও শক্তিশালী হয়েছে। এক কথায়, কবিতার সামগ্রিক বলয় নির্মিত হয়েছে আবেগ-অনুষঙ্গে ও এলিয়টিয় অভিঘাতে, যার প্রভাবে মধ্য পর্যায় থেকেই জটিল ভাষারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এভাবে প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্প, মিথকলা ইত্যাদি এবং সুনির্বাচিত শব্দ ও সংহত-সংযত বাক্যগঠনরীতির মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু ক্রমে মৌলিক কাব্যশিল্পের জন্ম দিতে সক্ষম হন।

ত্রিশোত্তর কবিরা কবিতায় গদ্য-পদ্যের মিথষ্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন সচেতনভাবে, তাই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি প্রধানত এলিয়ট ও এজরা পাউন্ডের প্রবর্তনায় কবিতায় কথ্য-

ভাষারীতির সরল-স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সাধু ক্রিয়াপদের বর্জনে, কথ্য বাক্যরীতির অনুসরণে *দময়ন্তী* কাব্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। এই কাব্যগ্রন্থে বর্জন করেছেন– কাব্য-প্রচলিত ক্রিয়াপদ 'ফুটি','হতেছে', 'চলিছে'; চলিত বাংলা শব্দের তৎসম প্রতিশব্দ 'পুষ্প', 'তরু', 'হস্ত'; নামশব্দ, প্রাচীন শব্দ ও অব্যয় পদ 'মম', 'মোদের', 'পরাণ'; উপভাষার পদ 'নারি', 'এনু', 'নারি' প্রভৃতি। তিনি শব্দের অভিধানগত অর্থকে অতিক্রম করে ইঙ্গিতময় রসপ্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য কথ্য-ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির মিশ্রণের উদাহরণ *দময়ন্তী* কাব্য-পূর্ব কাব্যগ্রন্থসমূহেও লক্ষ্য করা যায় :

ক) হলদে শাড়িটা– না,না আলোয়
যাবে নাকো দেখা ওর রং,
লাল? তা বড্ডা! নীল, তা-ও নয়–
খয়েরিটা মানাবে বরং!
যাকগে,– শাদাই ভালো, –কালো- পেড়ে শাড়ি। ('বেহায়া' /*কঙ্কাবতী*)
খ) কালো চোখ তার পড়েছিলো মোর মুখের পরে
ক্ষণেক তরে,
– কে যে সে, সে–কথা ক'বে না।– ('কালো চোখ' / *কঙ্কাবতী*)
গ) মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে।
দুটি ঠোঁট, ফুরফুরে ঠোঁট টুকটুক– রঙিন হ'লো,
ঠোকরাই পাখির মতো, খুটখাট চরা কিনারে। ('গান' / *একটি কথা*)

উপরের উদাহরণসমূহে কথ্য ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাব্যগন্ধী শব্দের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে কথ্য-বাক্‌ভঙ্গির– যেখানে অন্তঃস্বগতোক্তির মাধ্যমে বক্তা নিজেই নিজের সাথে কথা বলছে। কথক প্রেয়সীর কথা ভেবে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ভাবিত, তাই কখনো বলছেন,'হলদে শাড়িটা– না,না হলদে আলোয়/যাবে নাকো দেখা ওর রং' আবার কখনো বলছেন,'যাকগে,– শাদাই ভালো'। 'ফুরফুরে', 'টুকটুক', 'ঠোকরাই', 'খুটখাট', 'ক'বে','হলদে', 'চড়া' প্রভৃতি কথ্যশব্দ ব্যভহার করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে। একদিকে যেমন 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে' পঙ্‌ক্তিতে 'চাখবো' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অন্যদিকে 'কে যে সে, সে–কথা ক'বে না'– উক্তিতে প্রেয়সীর সাথে নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। এখানে দৃশ্যমান,'গীতল শব্দ' কিংবা 'রাবীন্দ্রিক কাব্যগন্ধী' শব্দ পুরোপুরি পরিত্যাগ করেননি; এর উদাহরণ– 'খ' সংখ্যক পঙ্‌ক্তি 'কালো চোখ তার পড়েছিলো মোর মুখের পরে'-তে রাবীন্দ্রিক অব্যয় 'মোর' এর ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করছি। আসলে *বন্দীর বন্দনা* ও *কঙ্কাবতী*– এই দুটি কাব্যগ্রন্থে উপর্যুক্ত গীতল-কাব্যগন্ধী ও রাবীন্দ্রিক শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। এই কারণে 'একই সঙ্গে তাঁকে বলা হয়েছে রবীন্দ্রবিদ্বেষী এবং রবীন্দ্রনাথের সমাচ্ছন্ন কবি।'[১১] অন্যদিকে *নতুন পাতা*-কাব্যগ্রন্থে সাধুক্রিয়াপদ ও সাধুরীতির প্রয়োগ একেবারে কমে গেছে, কবিতাও পেয়েছে স্বাভাবিক হার্দ্যগুণের স্পর্শ। তিনি অবশ্য ইংরেজি ছাড়া তেমন একটা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেননি। *নতুন পাতা* ও *একদিন : চিরদিন* কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক) এই ক্যামেরা-কণ্টকিত প্রগল্‌ভ জনারণ্য ('টাইগার হিল্‌-এ সূর্যোদয়'/ *নতুন পাতা*)
খ) ডায়ালেকটিক-দর্শন! ('ডি.এইচ.আর.'/*নতুন পাতা*)
গ) পকেটে লুকিয়ে রাখি ব্রাউন পেপারে জড়িয়ে। ('একটি বায়রনিক কবিতা', *নতুন পাতা*)
ঘ) তেমনি সে তৈরি করুক তোমাকে, তোমার ব্রাউন-মসৃণ শরীর। ('সমুদ্রস্নান'/ *নতুন পাতা*)

'ক্যামেরা', 'ডায়ালেকটিক', 'পকেট', 'ব্রাউন', 'পেপার', 'লটারি', 'মিলিয়নেয়ার' প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে রয়েছে, তবে এই শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে নব্যশিক্ষিত তলাবিহীন উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণির ফাঁপা-বুলিসম্বলিত মানসকে ব্যঙ্গ করার নিমিত্তে। আবার অনেক সময় ইংরেজি শব্দের অনূদিত শব্দও তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান হয়েছে। *নতুন পাতা* কাব্যগ্রন্থের 'সমুদ্রস্নান' কবিতায় 'Sandy-brown'-এর

বঙ্গানুবাদ করেছেন 'বালু-বাদামি' হিসেবে। তিনি বেশকিছু শব্দ নির্মাণ করেছেন, তার অধিকাংশ 'অ' এবং 'নি' উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে, তা হলো– 'অনাকার', 'অতরুণ', 'অচন্দ্রচেতন', 'নিস্তেল', 'নির্মন', 'নিরুপাধি', 'অত্বর', 'অব্রণ', 'অফেন', 'নির্জর' ইত্যাদি শব্দমালা। নিম্নের এ-সংআন্ত তিনটি উদাহরণ উপস্থাপিত হলো :

ক) তাছাড়া সমুদ্রে আর ক্ষত নেই, নীলিমায় জ্যোতির কম্পন
শুধু
অব্রণ ভূমধ্যদিন, অফুরান সুবর্ণমদিরা। ('ইকারুস'/ *মরচে-পড়া পেরেকের গান*)

খ) অদহন দীপ্তির উদ্ভাসে
উদাসীন, স্বাধীন, অফেন
দেবতারা এখনো আছেন। ('হ্যেল্ডার্লি' / *মরচে-পড়া পেরেকের গান*)

গ) আর তার স্তন দুটি– ছোট, ভীরু, অস্পৃষ্ট নূতন;
প'ড়ে আছে সমুদ্র শিলার মতো উঁচু ও নির্জন,
অনাবৃত, অকুণ্ঠিত, নির্জর, নিস্পৃহ–('কুমারীর মৃত্যু'/ *স্বাগতবিদায়*)

বুদ্ধদেব বসুর ব্যবহৃত কিছু অপ্রচলিত শব্দ 'নির্মন', 'নিরুপাধি', 'অত্বর', 'অব্রণ', 'অফেন', 'নির্জর' ইত্যাদি আমাদেরকে তাঁর শব্দপ্রয়োগ দক্ষতা ও শব্দ-নির্মানকলার বিশেষ উদাহরণ হিসেবে সচকিত করে। আসলে শব্দ ও ধ্বনির প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করেই তিনি নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। এভাবে বিশেষণ-ব্যবহাররীতিতেও তাঁর নানামাত্রিক প্রয়োগ সুস্পষ্ট :

ক) তৎসম বিশেষণের উদাহরণ–
১. তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত– ('প্রেমিক' / *বন্দীর বন্দনা*)
২. রাত্রি এলো– অতল, নিবিড়–
সুন্দর, গভীর। ('পূর্বরাগ' / *পৃথিবীর পথে*)
৩. আকাশ কোমল, আকাশ কালো।('কঙ্কাবতী' /*কঙ্কাবতী*)
৪. আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।('শাপভ্রষ্ট', *বন্দীর বন্দনা*)

খ) বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণ ব্যবহারের ফলে সৃজিত অর্থদ্যোতনার উদাহরণ–
১. স্পর্শরসতৃষ্ণাতুর দেহ মোর কাঁদিলো নীরবে ('নীলিমা পূর্ণিমা'/ *বন্দীর বন্দনা*)
২. শ্লথ তন্দ্রা জড়ালো নয়ন; ('মিলনে বিরহে'/ *একটি কথা*)
৩. কী নির্মল নীল এই নীল আকাশ, ('চিল্কায় সকাল'/ *নতুন পাতা*)

গ) বিশেষণের বিপ্রতীপ ব্যবহারের উদাহরণ–
১. দিনের মুখের উপর একটা ধোঁয়াটে, মৃত নিশ্চলতা, শূন্যতা। ('আশঙ্কা ও আশ্বাস'/ *নতুন পাতা*)
২. আগ্নেয়, দুঃসহ, তীব্র, উত্তাল, বিশাল এই রাত্রি। ('রাত্রি'/ *নতুন পাতা*)
৩. ফেলিবো তোমার মুখে তুষার-নিশ্বাস ('বন্দীর বন্দনা'/ *বন্দীর বন্দনা*)
৪. মেশা উষ্ণ তুষার তব লাল কপোলে, ('আমন্ত্রণ'/ *বন্দীর বন্দনা*)

আসলে গুণ বা অবস্থাবাচক শব্দ কথ্যভাষার মতো কাব্যভাষায়ও অপরিহার্য, কারণ বিশেষণের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ছাড়া ভাষা তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশক্ষমতা হারায়। বুদ্ধদেব বসু প্রথম পর্যায়ের কবিতায় অতি রোমান্টিক বর্ণনাপ্রধান কাব্যকলায় বিশেষণের অবিরল ব্যবহার করেছেন। 'ক' সংখ্যক উদাহরণের উদ্ধৃতিসমূহে তৎসম বিশেষণের এমন প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়– যা তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে বিশেষণ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য ত্রিশোত্তর কবিদের রচনায় বিশেষণের ঘটেছে ব্যবহার-বিপর্যয়, যার ফলে সংহত ব্যবহারে প্রায়শ বিপর্যয় এবং এই প্রয়োগ-ভিন্নতার ফলে নতুন এক অর্থ-সঙ্গতি গড়ে উঠেছে, যা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কাব্যভাষার প্রকাশক্ষমতা। এ-কারণে বুদ্ধদেব বসু কবিতায় বিশেষণের নানামাত্রিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যা নতুন অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। আবার উপরিউক্ত 'গ' সংখ্যক উদাহরণের

উদ্ধৃতিসমূহে বিপ্রতীপ বিশেষণের ব্যবহারে বর্ণনাত্মক কাব্য-পঙ্‌ক্তিসমূহে বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা ও প্রতীকী অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে কাব্যপঙ্‌ক্তিতে শব্দ সঞ্চারিত করেছে অর্থের চমৎকারিত্ব– যা আভিধানিক অর্থে অতিরিক্ত অভিপ্রায় সঞ্চারিত করে। আসলে 'শব্দে ব্যক্তার্থ ও বিশেষ অভিধাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, তার গূঢ়ার্থের যে কালগত পরিবর্তন ঘটে, কবি, আধুনিক কবি, তাকে ধ'রে ফেলেন আশ্চর্য সংবেদিতায়।'[১২] আর এভাবেই আধুনিক বিশ্বকে কবিতায় ধারণ করতে গিয়ে প্রচলিত কাব্যভাষা এবং কাব্যনির্মাণকৌশলের বিপর্যয় ঘটিয়ে নিজের ভাষারীতি গড়ার ক্ষেত্রে কবি থেকেছেন শ্রমনিষ্ঠ ও প্রত্যয়ী।

ফরাসী প্রতীকী কাব্যপ্রকরণ ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করেছে, যার ফলে বোদলেয়ারের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছেন কবি বুদ্ধদেব বসু। আসলে প্রতীকী কাব্যান্দোলন তো বোদলেয়ারকে কেন্দ্র করেই রূপলাভ করেছে, আর মালার্মে এ আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। প্রথম পর্যায়ের রচনায় প্রতীকী-প্রকরণরীতির পরিপোষণ না ঘটলেও বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করে বাংলা কবিতাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ফরাসি ছন্দ-বোধ ও চেতনাকে ভেঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুর ভাষারূপের মাধ্যমে অতি-প্রাকৃত অভিজ্ঞতার জগতকে স্পর্শ করেছেন। আমরা জানি, বোদলেয়ারের নিকট প্রতীকী-ভাণ্ডার দৃশ্যমান ও অনুভূতিগ্রাহ্য পৃথিবী, কারণ তা সহজে মানব-হৃদয় আনন্দবেদনাকে আপ্লুত করে। তাছাড়া কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক সহজে মানবচৈতন্যের গহীনতম প্রদেশে পৌঁছে যায়। যার ফলে দেখা যায়, প্রতীকী অনুষঙ্গসমূহ টি.এস. এলিয়টের কবিতাতেও অনুসৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুও কবিতায় সুচিহ্নিত প্রতীকী অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন– তা হলো 'বিষাদ', 'বিতৃষ্ণা', 'নির্বেদ', 'কামপ্রাবল্য', 'ইন্দ্রিয়বিলাস', 'ভিখিরি', 'দারিদ্র্য', 'মৃত্যু', 'বেশ্যা' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত এসব বিষয় ও উপকরণ আধুনিক সাহিত্যেরও উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। 'প্রতীক বলতে বোঝায় এমন কিছু যার একটা আলাদা ব্যঞ্জনা আছে, এক হিসাবে ভাষার ব্যবহৃত শব্দগুলিও প্রতীক, কারণ প্রতীকদ্যোতনাই ভাষার প্রধান ধর্ম।'[১৩] তবে যা প্রকৃত-অর্থে প্রতীক তা তাঁর কবিতার প্রথম পর্যায়ে ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতীকী-তাৎপর্য ঘনীভূত হয়েছে আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে, বিশেষ অভিনিবেশ ও পরিচর্যার মাধ্যমে – কবিতার স্তবকে-স্তবকে সঞ্চারিত ব্যঞ্জনায়।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচর্চার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় *দময়ন্তী* কাব্যগ্রন্থের 'দময়ন্তী' কবিতায়। যেখানে পার্থিব দেহবাদী প্রেম পেয়েছে ভিন্নমাত্রা- স্বর্গকে প্রত্যাখ্যান করে পরিণত হয়েছে পার্থিব সুখ-তৃপ্তির প্রতীকে। আবার *দ্রৌপদীর শাড়ি* কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় প্রকৃতির অনন্ত রহস্যভাণ্ডারকে উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন কবি। যেখানে মহাভারতের মিথ-তাড়িত অন্তহীন দ্রৌপদীর শাড়ির মতো প্রকৃতির অনন্ত রহস্য-সৌন্দর্য-রূপ-লীলা ও মাধুর্য উন্মোচন অসম্ভব বলে কবি মনে করেছেন। তিনি আরও মনে করেছেন, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হলেই সেই রহস্য-উন্মোচন সম্ভব– তবে তিনি এখানে মিথ-কাহিনীর অবয়বে এক প্রতীকী রহস্যজাল সৃষ্টি করেছেন। যে রহস্যজাল দ্রৌপদীর সৌন্দর্যের উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রকৃতির সৌন্দর্য-উন্মোচনকে একই কাতারে রেখেছেন। এখানে কামনা-বসনার প্রতীকী উপস্থাপনও লক্ষ্যণীয়, যার ফলে 'দময়ন্তী' কবিতাটি সমসাময়িক বার্ধক্যচেতনা ও অবাস্তব অনুষঙ্গ থেকে পেয়েছে পৃথক অবয়ব। যেখানে 'জন্তুর গুহায়' এবং 'যজ্ঞবেদী' ফ্রয়েডীয় আদিম কামনার প্রতীকী উপস্থাপন :

> স্বর্গ তোকে চায়, যজ্ঞ তোকে চায়, মৃত্যু তোকে চায়।
> কিন্তু যৌবনের জাদু রচে জন্তুর গুহায়,
> নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে। ('দয়মন্তী'/ *দয়মন্তী*)

কবি এখানে প্রেয়সীকে তিনটি অনুষঙ্গের সম্মুখীন করেছেন– তা হলো 'স্বর্গ', 'যজ্ঞ', ও 'মৃত্যু'। এই তিন অনুষঙ্গ স্পর্শ করেও কেবলমাত্র আদিম, বর্বর, জান্তব প্রেমলীলা এখানে স্বচ্ছ-প্রেমরূপে উপস্থিত। একদিকে যেমন আদিম কামনার প্রতীকসমূহ উপস্থিত রয়েছে, অন্যদিকে তেমন প্রকৃতির সাথে একাত্ম হবার অবদমিত

বসনাও সুপ্ত রয়েছে। আবার কবিতার জন্ম-প্রক্রিয়ার সাথে প্রাণীকুলের যৌন-জন্মপ্রক্রিয়ার অনুষঙ্গের প্রতিতুলনা করেছেন কবি– আর এই যৌন-অনুষঙ্গের প্রতিতুলনা উপস্থাপিত হয়েছে প্রতীকের মাধ্যমে:

বালিকার মতো কৌতূহলে
এখনো দেখতে চাও কতদূর প্রস্তুত প্রয়াস?
এসো না, আঘাত করো, ধ'রে নাও আমাকে উদাস,
হানো এক মুহূর্তে বাঁধন-ছেঁড়া বিদ্যুতের মতো বলাৎকার;
না যদি স্বর্গের মধু, উর্বশীর ধীর অভিসার,
নিয়ে এসো গন্ধকে লবণে জ্বলা নরকের প্রকট নিশ্বাস। ('না-লেখা কবিতার প্রতি'-৩/*যে আঁধার আলোর অধিক*)

এখানে কবিতার প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে এক 'বালিকা'র প্রসঙ্গ, যা প্রকৃতপক্ষে যৌন-ইঙ্গিত এর রূপলক্ষণ। নারী বা তার প্রতীকী আগমনকে যে কোনোভাবেই হোক প্রত্যাশা করেছেন কবি। কবি 'কৌতুহলী বালিকা'কে প্রশ্ন করেছেন– 'এখনো দেখতে চাও কতদূর প্রস্তুত প্রয়াস?' তারপর পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন এভাবে– 'আঘাত করো', 'ধ'রে নাও আমাকে উদাস', 'হানো এক মুহূর্তে বাঁধন-ছেঁড়া বিদ্যুতের মতো বলাৎকার' ইত্যাদি পঙ্ক্তিমালায়। 'কৌতুহলী বালিকা'র প্রতীকে আগত এই নারী যদি উর্বশীর স্বর্গীয় প্রেম না-এনে 'গন্ধকে লবণে জ্বলা নরকের প্রকট নিশ্বাস' নিয়ে আসে, তথাপি তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন নির্দ্বিধায়। আসলে বোদলেয়ারের কাব্যচেতনার নান্দনিক-অভিপ্রায়কে বুদ্ধদেব বসু এভাবে নিজের কবিতাতেও সঞ্চারিত করেছেন। বোদলেয়ার কবিদের বলেছেন,'মাতাল হও।' অর্থাৎ 'নেশা' ও মাতলামিকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। 'সুরা, অহিফেন ও গঞ্জিকা নিয়ে, আমরা জানি, বহুবিধ পরীক্ষা তিনি করেছেন– প্রায়, তাঁর নিজেরই উপর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা; সে-সবের উদ্দেশ্য চৈতন্যেরই তীক্ষ্নতা-সাধন; তিনি যেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন এমন এক তুরীয় অবস্থা যাতে সময় পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হবে না, অনুভূত হবে প্রতিটি মুহূর্তের নিঃসরণ, শ্রুতিগম্য হবে বর্ণ, এবং শব্দ দৃশ্যমান।'[১৪] যার মধ্য দিয়ে পুণ্য, প্রেম ও মদিরা হয়েছে ক্ষণিক লক্ষ্মীলাভের মাধ্যম। সেজন্য 'নেশা' কবিতায় এই 'নেশা' শব্দের প্রতীকী উপস্থাপন আমাদের সচকিত করে:

বাকি থাকে কবিতা– অস্তিত্বময় অণুর বন্ধন,
হলাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, ক্ষণিক লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকি–
মেটাতে আমার তৃষ্ণা আমাকে করে সে মন্থন!
ভালো। –কিন্তু বলো দেখি, হ'তে হবে আর কতকাল
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল। ('*নেশা*'/*যে আঁধার আলোর অধিক*)

কবি 'ক্ষণিক লক্ষ্মী' লাভের বাসনায় 'অনন্ত বাসুকি'র বিষে জর্জরিত হবার প্রতীকী উপস্থাপনে 'নেশা' কবিতার পঙ্ক্তিমালায় একজন কবিকে 'শুঁড়ি' ও 'মাতাল' হিসেবে চিহ্নিত করেন। এখানে কবি হলেন ' ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর অসুখী', তাই তো প্রয়োজন পড়েছে 'সরস্বতী', 'ভেনাস', 'ক্ষণিক লক্ষ্মী' ও 'অনন্ত বাসুকি' সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। *মরচে-পড়া পেরেকের গান* কাব্যগ্রন্থে প্রতীকী কবিতা কম, তবে এখানে কিছু খণ্ড-প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন– দুই মহাদেশের মধ্যবর্তী এয়ারপোর্টের হোটেলের প্রতীক, বিমানবন্দরের প্রতীক ইত্যাদি। বিশেষভাবে *একদিন : চিরদিন* কাব্যগ্রন্থের 'আমার জীবন' কবিতাটি স্মরণযোগ্য, এখানে 'জনসভা', 'পাতাল', 'লম্বাগলি', 'গুহা' ইত্যাদি শব্দ-ব্যবহারের চাতুর্য সাধারণ অভিপ্রায় ও অভিধাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে মন-স্মৃতি-অবচেতনের লীলাভূমিতে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় প্রকৃতি ও নারীকে একই কাতারে রেখে একটি চিরন্তন নারীমূর্তি গড়েছেন কবি। যার সাথে অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতা, অতৃপ্তি ও বিষাদময় বিষণ্ন-বেদনা জড়িয়ে আছে। অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা

বুকে কবি এই নারীকে এঁকেছেন 'চিরদিনে'র প্রতীকে, তাই তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত হয়েছে একটি বিন্দুতে বৃত্তাবদ্ধ। কবির ভাষায় :

আমি নিচু হয়ে জুতো খুলতে শুরু করি।
কিন্তু কেবলই জট বাঁধে, গিঁটের পর গিঁট, যতো টানি
তত আরো আঁকড়ে ধরে। আমার চেষ্টা বটগাছের মতো
বেড়ে ওঠে, হাতের মধ্যে পাথর আমার ধৈর্য। তাকে বলি :
'এই যে- এক্ষুনি– ময়লা জিনের প্যান্টালুন থেকে
বেরিয়ে আসবে তলোয়ার, জ্বলবে আমার আগুন
তোমার জোয়ারে।' (**'একদিন : চিরদিন'**/ *একদিন : চিরদিন*)

আসলে 'মানুষের সংসারে কবি নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছেন চির নিঃসঙ্গ একাকী মানুষ হিসেবে। কবির অতল অতুল নিঃসঙ্গতা এভারেস্ট শৃঙ্গের মতোই আকাশমুখী ও বন্ধুহীন। এভারেস্টের শৃঙ্গের মতোই কবি একক, অনুপম, অদ্বিতীয়, নিঃসঙ্গ, নির্বিকার।'[১৫] এর ফলে 'একদিন : চিরদিন' কবিতায় ব্যবহৃত 'গিঁট', 'জট', 'জুতোর ফিতে', 'ময়লা জিনের প্যান্টালুন', 'তলোয়ার' ইত্যাদি পরাবাস্তব উপকরণ-সমৃদ্ধ প্রতীকপুঞ্জ দ্বারা কবি প্রকৃতির কাছে ফিরতে না পারা এক আবদ্ধ জীবনের চিত্র এঁকেছেন। 'গিঁট', 'জট', 'জুতোর ফিতে', ইত্যাদি নাগরিক জীবনের জটিলতার প্রতীকী উপস্থাপন। *বন্দীর বন্দনা* কাব্য থেকে সূচনা করে প্রতীকী শব্দ-চয়নের এই প্রচেষ্টায় কবি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি আরও ব্যবহার করেছেন 'অন্ধকার', 'চাঁদ', 'সাপ', 'বিদ্যুৎ', 'আগুন', 'পদ্ম', 'বীজ' ইত্যাদি প্রতীক। নিম্নে উদাহরণ উপস্থাপিত হল :

ক) 'অন্ধকার' ও 'চাঁদ' প্রতীকের ব্যবহার-

১. যদিও তার শরীর থেকে সবুজ ডালপালা বেরিয়ে
নুয়ে-নুয়ে মিলিয়ে গেলো না তাঁর অন্ধকারে। ('বৃদ্ধ রাজা'/*মরচে-পড়া পেরেকের গান*)

২. আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক; ('স্মৃতির প্রতি-১'/ *যে-আঁধার আলোর অধিক*)

৩. কিন্তু অন্ধকার,
তাও নিথর একত্বময়, নিরঞ্জন– স্তব্ধ নয়, স্বরগ্রামে পরিবর্তনমান। ('বিলাপ'/ *স্বাগতবিদায়*)

৪. জ্বলছে নতুন চাঁদ, ঝিলমিল ক'রে ওঠে পাৎলা কাপড়,
হাওয়ায় হঠাৎ যায় সরে ('মেয়েরা'/ *কঙ্কাবতী*)

৫. শীতের রাতের চাঁদের আলো যেমন আকাশে মগ্ন একা। ('নেপথ্যনাটক', *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*)

খ) 'সাপ','বিদ্যুৎ', 'আগুন, 'পদ্ম' ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহার–

১. চুম্বনের তিক্ত বিষ সঞ্চিত করিয়া রাখে অধরের ফণা, ('মোহমুক্ত'/ *বন্দীর বন্দনা*)

২. রাত্রি লাফিয়ে উঠছে কেউটের কালো ফণার মতো,
আমাকে শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে; ('বিচ্ছেদের দিন'/ *নতুন পাত*)।

৩. স্পর্শ যেন বিদ্যুতের
অত্যাচারে গড়া। ('স্বয়ংবরা'/*দ্রৌপদীর শাড়ি*)

৪. ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা, ('রূপান্তর'/*দ্রৌপদীর শাড়ি*)

৫. চিরন্তনের বৃন্তের পরে
ক্ষণিক পদ্ম কাঁপে। ('রাত্রি'/*শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*)

সুতরাং, 'অন্ধকার', 'চাঁদ', 'সাপ', 'বিদ্যুৎ', 'আগুন', 'পদ্ম', 'বীজ' ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা বুদ্ধদেব বসু কবিতায় বহু-বিচিত্র বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন। কবি 'অন্ধকার' প্রতীকে একদিকে যেমন কামনা-বাসনা, যৌন-চেতনা, পাশবপ্রবৃত্তি ইত্যাদি চেতন কে চিহ্নিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনই চিত্রিত করেছেন ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান-অন্ধকার মনোজগৎ ঘিরে জাগ্রত সত্যতাকে। আবার আঁধারেই 'চাঁদ'-এর আবির্ভাব, তাই 'চাঁদ', জ্যোৎস্না' প্রভৃতি পেয়েছে বিভিন্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনা। কখনো চাঁদ ব্যবহৃত হয়েছে কামনা-বাসনা, যৌনতা, যৌবনের নিঃসঙ্গতার প্রতীকে– আবার কখনো নারীর স্তন বা নবিকের প্রতীকে। আর 'সাপ' কামনা-বাসনা ও

যৌনতার পঙ্কিল-অশুচি-আদিম রূপ-প্রকাশ, তবে শেষ পর্যায়ের কবিতাসমূহে এই প্রতীকের ব্যবহার তেমন একটা দেখা যায় না। অন্যদিকে 'বিদ্যুৎ' ও 'আগুন' এই দুটি প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে– 'প্রেমের অস্থির-চাঞ্চল্য', 'কামনার দীপ্তি', জৈবতা ও যৌবনের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশক হিসেবে । আর 'পদ্ম' শব্দটি সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পের ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন কবি। যার ফলে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কামনা-বাসনা, যৌন-চেতনা, পাশবপ্রবৃত্তি, পাপবোধ, যৌনতা, যৌবনের নিঃসঙ্গতা, প্রেমের অস্থির-চাঞ্চল্য, কামনার দীপ্তি, বিচ্ছিন্নতা, সৃষ্টিশীলতা, শিল্পের ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি অনুষঙ্গ পেয়েছে দ্যুতিবদ্ধ আভাসন এবং প্রতীকের প্রয়োগে তা অর্জন করেছেন সার্থকতা।

আধুনিক সাহিত্যে মিথ-প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে শাশ্বত অভিজ্ঞতার মিলনের পথ খুঁজতে কাব্যদেহে মিথকে স্থান দিয়েছেন– কারণ যুদ্ধ-ধ্বংস-মৃত্যুতে বিধ্বস্ত বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ও অন্তঃসারশূন্যর পরিপ্রেক্ষিতে মিথ-এর কাছে প্রত্যাবর্তন একপ্রকার আবশ্যিক। আধুনিক বাংলা কবিতায় ত্রিশোত্তর কবিগোষ্ঠীর কবিতায় এই মিথমুখী প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ও বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) তাঁদের কবিতায় প্রচুর পরিমাণে মিথ-এর ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তেমন একটা মিথের ব্যবহার নেই। অন্যদিকে 'পুরাণ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়।'[১৬] তবে বুদ্ধদেব বসুর মিথ-প্রয়োগরীতি বিষ্ণু দে হতে ভিন্ন– কারণ বিষ্ণু দে যখন ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও আধুনিক পৃথিবীর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য মিথাশ্রয়ী হয়েছেন, তখন তিনি জনবিচ্ছিন্নতার কারণে মিথাশ্রয়ী হয়েছেন এবং জনতার সঙ্গে পুনঃসংযোগস্থাপনে তাঁর আগ্রহ নেই। কিন্তু কবিতা ছাড়াও নাটক ও কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রচুর পরিমাণে মিথের ব্যবহার করেছেন– তার উদাহরণ পাওয়া যায় *কালসন্ধ্যা*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, *প্রথম পার্থ*, *সংক্রান্তি* ও *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটক। 'প্রথম পর্যায়ের রচনায় প্রেম, রূপকথা ও প্রাচীন কাব্যেল ঐতিহ্য-সহযোগে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক স্বপ্নভুবন রচনা করেছেন। তাঁর অতিরোমান্টিক প্রগলভতা, অতি কথন ও অতি-তরল মনোভঙ্গি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যে সংযত হয়েছে মিথাশ্রয়ী হবার ফলেই।'[১৭] 'পুনরুজ্জীবন' কবিতায় বিষ্ণুর নাভিপদ্মের পুরাণ-প্রতীক ব্যবহার করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কবির উক্তি :

এই অন্ধকার দ্বিখণ্ডিত হলো আমার চোখের সামনে,
বেরিয়ে এলো তার জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম,
তার কেন্দ্রে আমি।
আমিই তো তাকে সৃষ্টি করেছিলুম, যখন আর-কিছু সৃষ্টি হয়নি
আমার অপরিমেয় অনির্বচনীয় প্রেম দিয়ে। ('পুনরুজ্জীবন'/ *নতুন পাতা*)

বিরহবোধের আতিশয্যজনিত আবেগ থেকে এই মিথ-ভাবনায় সমর্পিত হয়েছেন কবি। কারণ প্রলয়জলে শায়িত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে যেমন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তেমনই প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়পদ্মের মিলনে নতুন কিছুর সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এই নতুন সৃষ্টির প্রেরণাকে– 'অন্ধকার দ্বিখণ্ডিত হলো আমার চোখের সামনে' বলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, যার উৎসমূল থেকে সৃজিত হয়েছে 'জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম' এবং এর 'কেন্দ্রে' কবি নিজেকেই কল্পনা করছেন। আদি-অন্তহীন এই পৌরাণিক-চেতনায় অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত করতে চান কবি, কারণ বিরহের আতিশয্যে প্রেয়সীকে কাছে পাবার ব্যাকুলতায় তাঁর হৃদয় আকুল। তাই তো বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে নতুন সৃষ্টির বাসনায় উদ্বেল তিনি। প্রথম দিককার কবিতায় এভাবে রোমান্টিক প্রেম-সংবেদনায় ও গভীর আবেগে কবির পৌরাণিক-অভিজ্ঞান প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় যখন বর্ণনামূলক প্রকরণরীতি পরিহার করতে সচেষ্ট কবি, তখন সমসাময়িক জীবনচেতনার সাথে মিথ-চেতনা হয়েছে সমন্বিত, প্রশমিত হয়েছে রোমান্টিক আবেগ। এ-পর্যায়ে পৌরাণিক রূপক ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'দয়মন্তী' কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা :

স্বর্গ তোকে চায়, যজ্ঞ তোকে চায়, মৃত্যু তোকে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও। ('দয়মন্তী'/ *দয়মন্তী*)

এখানে পৌরাণিক নল-দয়মন্তীর পার্থিব-প্রেমকে কবি মিথ-প্রয়োগের দক্ষতায় অনন্য করে গড়েছেন। পৌরাণিক- রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে কবি জীবন ও জরা এবং যৌবন ও প্রেমের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় রচনা করেছেন। মিথকল্পের সহায়তায় দয়মন্তীর পার্থিব প্রেম[১৮] ও কামনা-বসনার সমান্তরালে কবি ব্যবহার করেছেন নিজের ও নিজ-কন্যার জীবনের প্রেমকাহিনী। আমরা জানি, মিথ-কাহিনী অনুযায়ী হংসদূতের মুখে 'প্রিয়তম' নাম শুনে, দয়মন্তী অগ্নি-যমকে প্রত্যাখ্যান করে বেছে নেয় মানুষ নলকে। কারণ যেহেতু ' কানে-কানে, শুনায়েছে প্রিয়তম নাম' এবং 'হংসদূত এসে' দয়মন্তীর নিকট 'সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে', সেহেতু আর ফিরে যাবার পথ নেই। এখানে মর্তকেন্দ্রিক রক্তমাংসের প্রেমের প্রতি কবির পক্ষপাত আমাদের সচকিত করে। এছাড়া কেবল *দয়মন্তী* নয়, *দ্রৌপদীর শাড়ি* কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও আমারা পুরাণ-প্রয়োগের উদাহরণ খুঁজে পাই। *দ্রৌপদীর শাড়ি* কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা 'দ্রৌপদীর শাড়ি' পাঠ করে আমরা এক অনন্ত রহস্যজালের সন্ধানলাভ করি :

প্রতিশ্রুতি হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃদপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি
আকাশ ভ'রে উঠলো সোর,
মেঘের ঘোর, জলেল তোড়;
মন্ত্র-পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি। ('দ্রৌপদীর শাড়ি'/*দ্রৌপদীর শাড়ি*)

'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতায় মিথ রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে গিয়ে দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হেরে গেলে দুঃশাসন রাজসভাতেই দ্রৌপদীর শাড়ি খুলে অপদস্থ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু দ্রৌপদীর শাড়ি অন্তহীন হয়ে তাঁকে রক্ষা করে। এই ঘটনার রূপক-অন্তরালে এক দিকে রয়েছে 'দ্রৌপদী', সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি এবং অন্যদিকে দুঃশাসন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী-বুদ্ধি। এই দুটি ভিন্ন রূপকের মাধ্যমে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তহীন রহস্যজাল উন্মোচন করার প্রচেষ্টার কথা কবি উল্লেখ করেছেন। আর বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যজাল দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই অন্তহীন[১৯]। তৃতীয় পর্যায়ে এসে বুদ্ধদেব বসু মিথ-ব্যবহারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অর্থাৎ প্রথম দুই পর্যায়ের চেয়ে তা হয়ে ওঠে পরিমাণে ও ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধিতে অনন্য। *যে-আঁধার আলোর অধিক* কাব্যগ্রন্থের 'অর্জুনের প্রতি– কোনো নামহীন' কবিতায় মধ্যবিত্তের রূপক চরিত্ররূপে আবির্ভাব ঘটেছে 'অর্জুন' চরিত্রের। কবি দেখেছেন, মানুষ জীবনব্যাপী কাম-প্রেম-লালসায় অবগাহন করেও আত্মতৃপ্তির স্বাদ লাভ করে না। কারণ দীর্ঘজীবন পাওয়ায় অর্জুন বহু নারীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের মাঝে নাম-পরিচয়হীন একজনের কথা

ভেবেছেন কবি। নিজেকে অর্জুনরূপে কল্পনা করে মহাভারতের সেই উপেক্ষিতা নারীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করেছেন। আবার 'রোদন-রূপসী' কবিতায় দ্রৌপদীর বিবাহ-প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বরপক্ষ পঞ্চ-স্বামীর প্রস্তাব উত্থাপন করে। দ্রৌপদীর পিতা তা ধর্মসম্মত নয় বলে প্রত্যাখ্যান করলেও দৈবপ্রভাবে তা সংঘঠিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এই পৌরাণিক ঘটনা দিয়ে এই কবিতাটি রচনা করেছেন। আবার এই অর্জুন চরিত্রকেন্দ্রিক মিথ ব্যবহৃত হয়েছে 'অসম্ভবের গান' কবিতাতেও :

> বৃথায় জপিয়াছি তোমারে মন,
> থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
> কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
> এক বসন্তেই শূন্য তূণ। ('অসম্ভবের গান'/*শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*)

এখানে মধ্যবিত্ত-চরিত্র 'অর্জুন' বাস্তব পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি জীবনব্যাপী নানা টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত, আশ্রয়হীন এবং প্রেমিকা ও এক-পঞ্চমাংশ স্ত্রী দ্রৌপদীর সান্নিধ্য বঞ্চিত। এই কবিতায় মিথের আবরণে এক মধ্যবিত্ত প্রেমিক পুরুষের বেদনা-হাহাকার-অতৃপ্তিকে কবি চিত্রিত করছেন। *স্বাগতবিদায়* কাব্যগ্রন্থের 'হনুমানের জীবন ও মৃত্যু' কবিতায় হনুমানকর্তৃক সীতার জন্য সমুদ্র-লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা চিত্রিত হয় সার্থকভাবে। কবিও হনুমানের মতো কল্পনা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেরণার তীব্রতায় দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রকে অতিক্রম করে সীতারূপী 'অকথিত বাণীকে' বাঙ্ময় রূপ দিতে সচেষ্ট হন। শুধু তা-ই নয়, হনুমানের মতো দীর্ঘজীবন, খ্যাতি, সম্মান প্রভৃতি লাভ করে মৃত্যুবরণ করতে চান কবি। হনুমানের জীবন-কর্ম-মৃত্যুকে নিজের জীবনের সাথে একই সরল রেখায় এঁকে এই মিথকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে চান কবি। বুদ্ধদেব বসুর মিথ-প্রয়োগের কৃতিত্ব তাঁর প্রায় সকল পর্যায়ের কবিতায় লক্ষ্যণীয়– তবে ভারতীয় পুরাণের ব্যবহারই অধিক। 'স্বভাবসূত্রে রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির শক্তিতে তিনি স্বস্থ, আবার ইতিহাসগতির ধারায় বৃহত্তর দেশকালের সঙ্গে অনন্বিত। ফলে ব্যক্তিতাকে নিরপেক্ষ রেখেও বুদ্ধদেব বসু প্রতিকারহীন বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাই পাশ্চাত্য শিল্পরীতিতে অভ্যস্ত হয়েও আদর্শ সন্ধানের জন্য পুনরায় ফিরে আসেন ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎসে।'[২০] সুতরাং যদিও কবি বিষ্ণু দের মতো পাশ্চাত্য পুরাণের প্রতি কবির আত্মপ্রকাশ কম, তথাপি এ-কথা অনস্বীকার্য যে মিথকল্পের আধুনিক রূপায়ণে তিনি সফল শিল্পী।

৩.

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার চিত্রকল্পের সুপ্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, কারণ আধুনিক কবিতার এটি প্রধান লক্ষণ। কবির মেধা-মনন-স্মৃতি ও কামনা-বসনা-প্রেরণা থেকে চিত্রকল্পের জন্ম হয়। ইমেজিস্ট কাব্যান্দোলনের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রচুর চিত্রকল্পের ব্যবহার হয়েছে। ত্রিশোত্তর কবিরা কবিতায় চিত্রকল্প রচনা করলেও পাশ্চাত্যে প্রচলিত চিত্রকল্পবাদী আন্দোলনে তেমন একটা সাড়া দেননি। কবি নিজে অবশ্য *বন্দীর বন্দনা* থেকে *কঙ্কাবতী* পর্যন্ত কাব্যে চিত্রকল্প রচনার ব্যাপারে ততটা সচেতন ছিলেন না। তিনিও ইমেজিস্ট কাব্যান্দোলনের প্রভাবে চিত্রকল্প সৃজনে আগ্রহী হলেও চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। '১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত স্থায়ী অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় 'ইমেজিস্ট' আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো বিষয়ের প্রত্যক্ষতা, নিরঙ্কুশ ও সংহত প্রকাশরীতি, চিত্রকল্পের অনিবার্য স্পষ্টতা, কথ্যরীতির ব্যবহার, মুক্তছন্দের প্রয়োগ ইত্যাদি।'[২১] *বন্দীর বন্দনা* কাব্যে যে সংক্ষিপ্ত পরিমাণে চিত্রকল্প তিনি রচনা করেছেন, তা অপূর্ণ ও রূপক-নির্ভর। কিছু চিত্রল বর্ণনায়, টুকরো ছবি বা দৃশ্য এবং ঘন বা গাঢ়বদ্ধ আবেগে গড়া রূপক ইমেজে তিনি কবিতা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ চিত্রের সাথে প্রায়ই যুক্ত হয়েছে ঘন বা গাঢ়বদ্ধ আবেগের স্ফূর্তি, যার ফলে গভীর কল্পনা পরিপূর্ণতা পায় নি। এতে প্রথম পর্যায়ের কবিতায় 'চুল', ' চোখ', 'চাঁদ', 'বিদ্যুৎ', 'অন্ধকার' প্রভৃতি রোমান্টিক উপাদান চিত্রকল্প রচনার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে– তবে তা চিত্রকল্প হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ বহু চিত্রল বর্ণনা থাকলেও তা আসলে চিত্রকল্প নয়। কারণ 'অনেকের কাছে উপমা ও

ইমেজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অনেকের কাছে গভীর আবেগসম্ভূত উপমাই ইমেজ। কিন্তু, এ কথা বলাই বাহুল্য যে গভীর আবেগ কোথায় সম্পৃক্ত হচ্ছে তার সিদ্ধান্ত পাঠকের অনুভবলব্ধ ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভরশীল। সেই পাঠকচিত্তও আবার যুগভেদে, শ্রেণীভেদে, শিক্ষা-অভ্যাস-রুচিভেদে ভিন্ন হতে তো পারেই– একই পাঠকের মন কালক্রমে বদলেও যেতে পারে।'[২২] নিম্নে প্রথম পর্যায়ের কিছু চিত্রকল্পের বর্ণনার উদাহরণ দেয়া হল:

১. সমস্ত রাত্রি বিশাল একটা রূপালি পাখি হয়ে উঠলো,
   তার ক্ষুধিত ঠোঁটের মধ্যে আমার সত্তা ('পুনরুজ্জীবন'/*নতুন পাতা*)
২. চুলে তার খেলা করে হেমন্তের বিকালের সোনালি আলোক,
   তরল নয়নে তার আলো-ভরা অন্ধকার করে টলমল, ('প্রেমিকের প্রার্থনা/ *একটি কথা*)
৩. রাত্রি লাফিয়ে উঠছে কেউটের কালো ফণার মতো ('বিচ্ছেদের দিন'/ *নতুন পাতা*)

প্রথম এবং তৃতীয় উদ্ধৃতিতে রাত্রি রূপান্তরিত হয়েছে যথাক্রমে 'রূপালি পাখি' ও 'কেউটের কালো ফণার' হিসেবে। প্রেমিকার অনুপস্থিতি ও বিরহভাবনা এই দুটি কবিতাংশে উপস্থিত প্রবলভাবে, যার ফলে কবির অমঙ্গলবোধ প্রকটিত হয়েছে 'রূপালি পাখি' ও 'কেউটের কালো ফণার' মাধ্যমে। যদিও রাত্রির রূপালি পাখি হয়ে ওঠার বর্ণনা চিত্রগুণে সমৃদ্ধ, সে-হিসেবে কেউটের ফণার মধ্যে চিত্র নেই। কেউটে-কেন্দ্রিক চিত্রটি বেশ সমৃদ্ধ হলেও তাতে কোনো রূপান্তর প্রক্রিয়া নেই, কেবল 'রাত্রি লাফিয়ে উঠছে' এবং কেউটের ফণার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থিরভাবে। আবার দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পাঠকের কল্পনা হয়ে পড়ে বহুদূর বিস্তৃত, কারণ প্রেয়সীর 'তরল নয়নে' তিনি দেখতে পান 'আলো-ভরা অন্ধকার' এর জলাধার। তবে এই উদ্ধৃতি সুস্পষ্ট চিত্র অংকনে সক্ষম হলেও চিত্রকল্প নয়। কিন্তু *নতুন পাতা* কাব্যগ্রন্থ হতে কবির চিত্রকল্প পরিণত হতে শুরু করেছে, পেয়েছে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি। কারণ এই পর্যায়ে এসে একদিকে লাভ করেছেন ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার সান্নিধ্য, অন্যদিকে সঞ্চিত ইমেজিস্ট কাব্যান্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব।

নতুন পাতা কাব্যগ্রন্থ হতে ক্রমে কাব্যরচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ঘাস' কবিতায় আমার খুঁজে পাই নাগরিক চিত্রকল্প। কবির ভাষায় :

চারিদিকে
ইস্পাত অ্যাশফেল্ট ইটে
টেরি শাড়ি ঢলে পড়ে এ ওর পিঠের পরে
দোলে যেন পাতাহারা কঙ্কাল-গাছেরা
পাতালের অলক্ষ্য হাওয়ায়। ('ঘাস'/ *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*)

'ঘাস' কবিতার নাগরিক চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু নিজের চৈতন্য-জারিত ইমেজিস্ট কবিদের সাধারণ লক্ষণকে প্রকাশ করেছেন। যার ফলে বোদলেয়ার-পাউন্ড-এলিয়টের কবিতায় স্থান পেয়েছে নগর ও নাগরিক জীবন। এক্ষেত্রে এলিয়টের 'The Love Song of J. Alfred Profrok' কবিতাটি স্মরণযোগ্য, যেখানে কবির উক্তি নিম্নরূপ :

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient entherised upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retrets
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:[২৩]

অতএব 'ঘাস' কবিতায় নাগরিক চিত্রকল্প রূপে 'ইস্পাত অ্যাশফেল্ট ইটে' গড়ে উঠেছে 'পাতাহারা কঙ্কাল-গাছেরা' ও তাঁদের স্মৃতি-অভিজ্ঞান। আবার একইভাবে উপর্যুক্ত এলিয়টের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে নাগরিক অনুষঙ্গ, একটি সন্ধ্যার বর্ণনা– যেখানে অপারেশন-টেবিলে শায়িত অজ্ঞান ব্যক্তির জীবন-বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে বিবর্ণ সন্ধ্যার চিত্রময়তায়। অন্যদিকে কবি-সৃজিত প্রকৃতি-নির্ভর চিত্রকল্পও আমাদের সহজে চমকিত করে। কবির উক্তি এ-ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> কখনো নীল মেঘের ভার,
> আলোর বাঘ কখনো ছায়া–
> হরিণে করে তাড়া, ('দ্রৌপদীর শাড়ি'/*দ্রৌপদীর শাড়ি*)

প্রকৃতির এই চিত্রকল্পে আমরা দেখতে পাই বহুবিধ প্রতীকী উদ্ভাসন, যার মধ্য দিয়ে আসলে কবি প্রকৃতির রহস্যময়তা উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। 'আলোর বাঘ কখনো ছায়া–হরিণে করে তাড়া' পঙ্‌ক্তিতে তিনি 'আলোর বাঘ' ও ' ছায়া–হরিণ' এর প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সূর্যের নীচে গতিশীল মেঘের ছুটে চলা এবং তাদের মধ্যে বাঘ ও হরিণের প্রতীকে তাড়া করার বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে কেবল প্রতীকী-চিত্রল্পই নয়, সমাসোক্তি অলঙ্কারের মাধ্যমেও চিত্রকল্প সৃজনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। কবি বলেছেন :

> রূপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
> নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
> সূর্যের চুম্বনে। –এখানে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
> তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
> কখনো কি ভেবেছিলে? ('চিল্কায় সকাল'/ *নতুন পাতা*)

এখানে 'রূপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে' কবিতাংশের উল্লেখমাত্র পাঠক অপরূপ কোনো নারীকে কল্পনা-মনীষায় স্থান দেয়। যে নারীর বুকের ওপর 'সমস্ত আকাশ /নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে', আরও রয়েছে 'সূর্যের চুম্বন'। এ- যেন কোনো নারী অপরূপ ভঙ্গিমায় সকালের মিঠে রৌদ্র দেহে মেখে নিচ্ছে, আর তাতে জ্বলে উঠছে 'অপরূপ ইন্দ্রধনু'– যার মাধ্যমে কবি নিজের সাথে প্রেয়সীর এক গোপন সংযোগরেখা অনুভব করছেন। এভাবে নিজের 'রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে' কল্পনায় 'অপরূপ ইন্দ্রধনু' কল্পনা করার মধ্য দিয়ে পাঠকচেতনায় দূরপ্রসারী ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। কাব্যচর্চার তৃতীয় পর্যায়ে প্রতীকের গূঢ় ব্যঞ্জনায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই পর্যায়ে এসে শব্দ ব্যঞ্জনায় তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন গাঢ়বদ্ধতা, নির্মেদ রূপ, প্রগাঢ়ত্বর প্রতি। এক কথায়, অন্তিম পর্যায়ে চিত্রকল্প সংখ্যায় কম হলেও অভিনব ও কল্পনাসমৃদ্ধ। উপর্যুক্ত 'চিল্কায় সকাল' কবিতায় যেভাবে প্রেয়সীর বিচিত্র প্রেমময় ভঙ্গিমাকে কবি যেমন চিত্ররূপময় করে উপস্থাপন করেছেন, ঠিক সেভাবে তৃতীয় পর্যায়ের 'মৌলিনাথের স্বপ্ন' কবিতায় আরও চমৎকার ও উপভোগ্য বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় :

> চোখে চোখ রেখে ছিলে তুমি অনিমেষ,
> ঠোঁটে প্রলোভন, কৌতুকে আঁকা ভুরু,
> মৃত হৃদয়ের লুপ্ত আদরে মাখা
> বতিচেলি– মুখ, পাণ্ডুর। ('মৌলিনাথের স্বপ্ন'/ *মরচে পড়া পেরেকের গান*)

এখানে উপমেয় নারীর আবির্ভাব ঘটেছে এক বিশেষ ভঙ্গিমায়– ঠোঁটে প্রলোভন', 'কৌতুকে আঁকা ভুরু' আর 'লুপ্ত আদরে মাখা/বতিচেলি– মুখ, পাণ্ডুর'। অর্থাৎ উপমেয় নারীর ভঙ্গিমাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে টেনে এনেছেন বতিচেলির চিত্রকর্মের প্রসঙ্গ। আলোচ্য উদ্ধৃতিতে শিল্পী বতিচেলি সৃজিত কোনো অনির্দেশ সুন্দর মুখশ্রী ও ভঙ্গিমাতে উজ্জ্বল নারীর সাথে বাস্তব নারীর তুলনার মাধ্যমে মুহূর্তেই এক অনন্য চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে, যার ফলে সেই নারী আরও রহস্যময় ও অপরূপ হয়ে উঠেছেন।

আসলে বুদ্ধদেব বসু রচিত চিত্রকল্প সহজেই কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রকল্পে প্রকাশিত রোমান্টিক অনুভূতি ও প্রেমচেতনার প্রায় সমস্ত উপমানচিত্র সংগৃহিত হয়েছে প্রকৃতি থেকে। ঘনিষ্ট-পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবির প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্রকল্পের সর্বত্র প্রকৃতি-প্রকৃতিভাবনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পাঠক যতো সামনে এগিয়ে যাবেন ততো অধিক পরিমাণে প্রেমিকসত্তা, প্রেমিকা, প্রেম ও প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাবেন গভীর সংলগ্নতা। তৃতীয় পর্যায়ে প্রকৃতির সান্নিধ্য কমে গিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে জীবনসিঞ্চিত অভিজ্ঞতার নির্জাস এবং ক্রমে সমস্ত কবিতায় চিত্রকল্পের সুগভীর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে অজস্রধারায়।

আমরা জানি, 'সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম ছন্দ। আমাদের নিত্যকথিত বা গঠিত গদ্য ভাষার ধ্বনিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত রূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়।'[২৪] কবিতায় ছন্দ ও অলঙ্কারের বুননে বুদ্ধদেব বসু সর্বদা স্বাধীনযাত্রা খুঁজেছেন, যার ফলে নিবিষ্ট মনে রচনা করেছেন গদ্য–পদ্যের এক প্রগাঢ় সেতুবন্ধ। প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ব্যবহারের নির্যাস নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,'প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।'[২৫] কাব্যচর্চায় স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর প্রকাশ হবার আগে রাবীন্দ্রিক ছন্দ ও উচ্চারণভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কৈশোরিক রচনা *মর্মবাণী*-তে। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের রচনায় প্রধানত মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দকে তিনি কবিতার বাহন করেছেন। এর উপযুক্ত উদাহরণ *বন্দীর বন্দনা* কাব্য, যেখানে রাবীন্দ্রিক-প্রয়োগের মাধুর্য ও অনাড়ষ্ট উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির অন্বয়জনিত আড়ষ্টতা ও অসচেতনতায় ব্যবহার করেছেন 'মম', 'তবে', 'সনে', 'যবে', 'মোরে' ইত্যাদি সমকালীন প্রচলিত শব্দমালা। তবে এই কাব্য থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করার প্রত্যয় পাঠকসম্মুখে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে রাবীন্দ্রিক মুক্তক অক্ষরবৃত্তে কাব্যচর্চার সূচনা ঘটলেও পরবর্তী পর্যায়ে কবিতায় নিজস্ব কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এমনকি সাধু ক্রিয়াপদ ও তৎসম শব্দের অবাধ ব্যবহার পরিত্যাগ করেন অবলীলায়।

কবি রবীন্দ্র-প্রভাবে মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে *বন্দীর বন্দনা* কাব্যের 'শাপভ্রষ্ট', 'অমিতার প্রেম', 'কালস্রোত', প্রেমিক', অপর্ণার শত্রু', 'বন্দীর বন্দনা' ইত্যাদি কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু আবেগ-স্পন্দনে ও অর্ন্তজগতে প্রবহমান চেতনস্রোতে নিজস্ব স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরে ভাস্বর। ক্রমে *একটি কথা* ও *পৃথিবীর পথে* কাব্যগ্রন্থে এসে তৎসম শব্দের ব্যবহার-বাহুল্য কমেছে, বেড়েছে কথ্যশব্দের ব্যবহার। প্রথম পর্যায়ে ছন্দের অনুশাসন মেনে চললেও ক্রমে স্বাধীনভাবে ছন্দবুননে ব্রতী হন, পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। *বন্দীর বন্দনা* কাব্যের 'প্রেমিক' কবিতায় মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার নিম্নরূপ:

> জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি–
> নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা। ('প্রেমিকা'/ *বন্দীর বন্দনা*)

মৌখিক ভাষাকে কাব্যদেহে সঞ্চারিত করতে গিয়ে *দয়মন্তী* কাব্যে সাধু ক্রিয়াপদ ও কাব্যিক শব্দবর্জিত পঙ্‌ক্তিমালায় অভ্যস্ত হলেন কবি। তবে মৌখিক ভাষার বাক্‌ভঙ্গি সর্বদা ব্যবহার সম্ভব নয়, কারণ কবিতার ভাষার নিজস্ব বুনন রয়েছে। এর ফলে সাধু ক্রিয়াপদ সর্বত্র বর্জন করা সম্ভব হয়নি:

> সামান্য সংকল্প তার নষ্ট হ'লে অদৃষ্টের দোষে
> বিশ্বে নিন্দে, আপনাকে অক্ষম ধিক্কারে
> ক্ষত করে : ('দয়মন্তী'/ *দয়মন্তী*)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কবিতায় কবি শব্দ-ব্যবহারের নিপুণ কৌশলে, জটিল বাক্যবন্ধনের ব্যবহারে ও কথ্য বাক্‌স্পন্দনের প্রবহমানতায় কবিতায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'ছন্দকে যথাসম্ভব কৃত্রিম উচ্চারণ

থেকে মুক্ত করে চলিত ভাষার বাক্‌ধর্মী স্বাভাবিকতায় তাকে উন্নীত করা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন ছন্দরীতির উচ্চারণে শৈথিল্য স্বীকার করে নিয়েছেন।'[২৬] আবার সনেট-নির্মাণেও যে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা *বন্দীর বন্দনা* কাব্য-পাঠে উপলব্ধি করা যায়। এই কাব্যে স্থান পেয়েছে মোট বারোটি সনেট, তবে প্রচলিত ১৪ মাত্রার পঙ্‌ক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ১৮ মাত্রার পঙ্‌ক্তি। দীর্ঘ মাত্রার পঙ্‌ক্তি ছাড়া প্রথম পর্যায়ের সনেটে তেমন বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে সনেট নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপাদান সংহত বাক্‌স্পন্দ, দৃঢ়বদ্ধ রূপরীতি, নির্মেদ কাঠিন্য ইত্যাদি নির্মাণে প্রত্যয় লক্ষ্য করা গেছে দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতা থেকে, কিন্তু এই পর্যায়ে এসে কবির সনেট রচনার পরিমাণ কমে গেছে। তিনি তাঁর সুপরিচিত 'ইলিশ' কবিতায় ব্যবহার করেছেন অক্ষরবৃত্ত সনেট-কাঠামো; মিল-বিন্যাস– কখখক : কখখক গঘঙ গঙঘ :

> আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশে বর্ষায় বিহ্বল।
> মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল সারি
> বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
> বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল। ('ইলিশ'/ *দময়ন্তী*)

'ইলিশ' কবিতায় অষ্টক চার পঙ্‌ক্তির দুই স্তবকে বিভক্ত হয়ে যেমন পেয়েছে সংহত-রূপ, ঠিক তেমনই সঞ্চারিত হয়েছে সংহত বাক্‌স্পন্দ। তৃতীয় পর্যায়ে এসে আমরা উপলব্ধি করি, সনেটকে কেন্দ্র করে কবিতার সংহত-রূপ দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে– পেয়েছে কাঠামোকেন্দ্রিক স্ফূর্তি। বিশেষভাবে *যে আঁধার আলোর অধিক* কাব্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ্য, কারণ এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সনেট। এমনকি বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরও এখানে দৃশ্যমান, 'এক তরুণ কবিকে' কবিতায় ব্যবহার করেছেন স্বরবৃত্ত ছন্দ। এমনকি সনেটের স্তবক বিন্যাস নিয়েও বিচিত্র পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন, যদিও অধিকাংশ সনেটের স্তবক-বিন্যাস ৪-৪ : ৩-৩ তথাপি প্রায়ই অষ্টক-ষটকের অবস্থান বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

অসহনীয়	৪-৪ : ৩-৩
কর্কটক্রান্তি	৪-৩ : ৩-৪
না- লেখা কবিতার প্রতি	৪-৩ : ৩-৪
ঋতুর উত্তরে	৩-৩ : ৩-৩ : ২
সর্বেশ্বরী	৪-৪ : ৪-৪
মুক্তির মুহূর্ত	৪-৪ : ৩-৩ : ২

আবার অসম-পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্তও রয়েছে :

> ঋজু পথে আমাদের চলা। পিঁপড়ের কর্মঠ মিছিল
> ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড পোকার শব, শৈশব, যৌবন পার হ'য়ে;
> এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নেয় নথিপত্র, স্বাক্ষর, দলিল;
> ('স্মৃতির প্রতি-২'/ *যে আঁধার আলোর অধিক*)

আসলে বুদ্ধদেব বসু সনেট-নির্মাণে ও ছন্দ-মিল-স্পন্দন সৃজনে দক্ষ কারিগর, যার ফলে তাঁর কাব্য-প্রত্যয় হয়ে উঠেছে সঙ্গত ও সঙ্গতিপূর্ণ। আর যে বাক্‌রীতি অনুসরণ করে তিনি কাব্যচর্চা করেছেন তা গদ্যধর্মী। এই গদ্যধর্মী কাব্য-বুননের প্রচেষ্টা থেকে প্রথম ও অন্তিম পর্বে কবি অধিক গদ্যছন্দ অবলম্বন করেছেন। একজন সমালোচক কবি বুদ্ধদেব বসুর ছন্দজ্ঞান-প্রসঙ্গে বলেছেন,'বুদ্ধদেব বসু ছন্দে বাক্‌রীতির প্রয়োগে সফল হয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত– তিন রীতির ছন্দেই প্রয়োজনমত শিথিল উচ্চারণ এনে স্বাভাবিক চলতি ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিদেশী ছন্দ-মিলের প্রয়োগ, ছড়াজাতীয় কবিতার লঘু যতিভাগ ও ধ্বনিস্পন্দে, গদ্য কবিতার ভাববাহী বাকপর্ব বিন্যাসে, প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস ব্যবহারে তিনি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।[২৭] সুতরাং, ত্রিশোত্তর কবিদের কবিতায় গদ্যছন্দের চর্চা প্রবল হয়ে উঠেছিলো এবং গদ্য-পদ্যের

মিথষ্ক্রিয়া ঘটানোর তৎপরতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যছন্দের উদাহরণও এই ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য, তবে তাঁর কবিতার অন্তস্পন্দের সাথে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার অন্তস্পন্দের মিল অতি সামান্য। বুদ্ধদেব বসু গদ্যকবিতায় কখেনো আবেগকে শাসন করেছেন, আবার কখনো আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে নির্মাণ করেছেন আবেগভার প্রশমিত পঙ্‌ক্তিমালা। তাঁর রচিত এমন একটি সংত গদ্যকবিতার উদাহরণ হলো ‘এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে’ :

> স্বর্গের স্বপ্নের মতো; তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত উৎসুক
> আমার হাতের স্পর্শ; কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক (‘এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে’/ *নতুন পাতা*)

The Waste Land কাব্যগ্রন্থে T.S.Eliot কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন ‘Reflect the speech of life, the pressure of life, its very essence’[২৮]-যুক্তি গ্রহণ করে। যার ফলে তাঁর এই কাব্যে কথ্যভাষার সাথে কাব্যভাষার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে দ্রুত এবং সৃজিত হয়েছে কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত কাব্যভাষা। তবে কবির গদ্যছন্দের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে *একদিন : চিরদিন* কাব্যগ্রন্থে, কারণ এখানে কথ্যভাষার স্বাভাবিক স্পন্দনকে আত্তীকরণের মাধ্যমে কবিতায় এক বিশেষ স্পন্দনকে স্থায়ী করা হয়েছে। তিনি এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে ছোটো-ছোটো বাক্য সঞ্চয় করে এবং দাড়ি-কমার অবিরল ব্যবহারে কথ্যভঙ্গির যতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এর ফলে কবিতায় যেমন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি-গড়ন পেয়েছে কাঠামো, আবার ঠিক তেমনই রাবীন্দ্রিক গদ্যভঙ্গি থেকে পেয়েছে এক স্বতন্ত্র রূপ। *একদিন : চিরদিন* কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা ‘একদিন : চিরদিন’ পাঠ করলে তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব :

> বেলা দুটো, ঝামরে নামে গ্রীষ্ম। তেমনি ডিমের মতো রোদ্দুর,
> আকাশ জুড়ে তা দেবার স্তব্ধতা। চিনতে পারি এই সেই বাড়ি,
> ট্রাম থেকে নেমে পড়ি পার্ক সার্কাসে।
> পাঁচিলে ঘেরা একতলা, সিঁড়ির গায়ে পুরোনো দিনের শ্যাওলা
> শুকনো পাতা খ'সে পড়ে উঠোনে। আস্তে : ছিঁড়ে ফেলা
> চিঠির মতো শব্দ করো। (‘একদিন : চিরদিন’/ *একদিন : চিরদিন*)

এভাবে গদ্যছন্দ নির্মাণেও কবি নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রতিনিয়ত রূপান্তরের মাধ্যমে এক ভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতি থেকে অন্য ভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতিতে নিজেকে চালিত করেছেন। মুক্তক অক্ষরবৃত্ত তাঁর কাব্যচর্চার প্রধান বাহন হলেও এর মধ্যে তিনি প্রবাহিত করেছে আবেগ ও নিরাবেগ চেতনার সংহত প্রস্রবন। রোমান্টিক কবিতার মূল বাহন অতলান্ত আবেগ-প্ররাক্রম থেকে ধীরে-ধীরে সরে এসে নির্মাণকলায় অবারিত করেছেন নিরাবেগ ও নির্মোহ কাব্যপ্রবাহ। ছন্দের ক্ষেত্রে সুর-স্বর-ভঙ্গি ও বুনন প্রকল্পে ঘটিয়েছেন অবিরল পরিবর্তন, যার ফলে সহজেই ছন্দপ্রবাহের এই ক্রম-অগ্রসরমাণতায় ও ক্রম-পরিবর্তনশীলতায় গঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র-স্বর। এছাড়া বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অলঙ্কার-রঞ্জকে সমৃদ্ধ এবং নিজস্ব শব্দমালার ব্যবহার-মাধুর্যে কবিতায় সঙ্গীতগুণ সঞ্চারিত করেছেন। এই সাংগীতিক ধ্বনি-বিন্যাস অনুপ্রাস আকারে পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। এই অনুপ্রাস ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), শব্দালংকারের ঝংকারে ও সাড়ম্বর-আতিশয্যে। কিন্তু ত্রিশোত্তর কবিরা শব্দের ধ্বনিগত বিন্যাসে কেবলমাত্র অনুপ্রাসে নির্ভরশীল হননি, বহু-বিচিত্র পথে যাত্রা করেছেন সচেতনভাবে। এর ফলে প্রথম পর্যায়ের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু যেভাবে প্রচুর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন, পরবর্তী পর্যায়ে তা পরিমাণে অনেক কম। প্রথম দিকে ধ্বনিগত চমক সৃষ্টিতে তাঁর আগ্রহ লক্ষ্যনীয় :

১. নতুন ননীর মতো তনু তব? (‘প্রেমিক’/ *বন্দীর বন্দনা*)
২. তোমার তনুর তরলিত সোনা (‘ওগো বিদ্যুল্লতা’/ *পৃথিবীর পথে*)
৩. ঘুম নেমে এলো মেদুর আকাশে, মধুর মেঘে, (‘সেরেনাদ’/ *কঙ্কাবতী*)
৪. পথিক, প্রার্থিত, ঘুম, প্রেমিকেরা, ভূমার আস্বাদ:– (‘কর্কটক্রান্ত’/ *যে-আঁধার আলোর অধিক*)

৫. সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত-দুধের ফোঁটায়। (‘স্বর’/ *যে-আঁধার আলোর অধিক*)
৬. পুকুরে প্রফুল্ল পানা, বাঁশবন বৃষ্টিতে ধূমল:– (‘স্বাগতবিদায়’/ *স্বাগতবিদায়*)
৭. যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায় (‘দয়মন্তী’/ *দয়মন্তী*)

আসলে ইন্দ্রিয়াতীত অরূপ রূপকে কবিতায় ধারণ করতে গিয়ে অনুপ্রাসের ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। ১-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ধ্বনিগত চমক আমাদের ভাবিত করে। ধ্বনিমাধুর্যের চমৎকারিত্বে অনুপ্রাসে ‘দেহতনু’ চিত্রিত হয়েছে ‘নতুন ননীর’ অবয়বে। কিংবা ২-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ‘তনু’ হয়েছে ‘তনু তরলিত সোনা’, যার ফলে ‘ত’ ধ্বনিটি ধ্বনিসাজুয্যে যেমন অতুলনীয় সুন্দর হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনই ‘তরলিত’ শব্দ-সহযোগে কাব্যিক-লাবণ্যে হয়েছে মোহনীয়। অন্যদিকে উদ্ধৃতি ৩-এ ‘ঘুম’ শব্দটির বিসঙ্গত ব্যবহার অনুপ্রাসবৃন্তে কাব্যিক অভিঘাত সৃজন করেছে। এর উদাহরণ উল্লিখিত ৪-সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও দৃশ্যমান, অর্থাৎ ‘পথিক, প্রার্থিত, ঘুম, প্রেমিকেরা’ কবিতাংশে ‘ঘুম’ শব্দের অনবদ্য উপস্থাপনায় ও ধ্বনিসংগঠনে কবির মননশীলতা চিত্রিত হয়েছে সহজাতভাবে। আবার ৫-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নারীর রূপ বর্ণনায় এক প্রগাঢ় স্মৃতিমগ্নতা সৃষ্টি হয়েছে, যা সহজেই ধ্বনিতরঙ্গ গড়ে তোলে। কিংবা উদ্ধৃতি ৬-এ ‘পুকুরে প্রফুল্ল পানা’ কবিতাংশ হতে আমারা জানি, ‘পানা’ তো কখনো প্রফুল্ল হয় না– তবে গুণবাচক শব্দ অন্যাসক্ত অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে। আবার আমরা ৫-সংখ্যক উদাহরণ হতে ধ্বনিমাধুর্যের চমৎকারিত্ব ও অনুপ্রাসের অনন্য রূপ-নির্মাণ দেখি ‘যৌবনের জাদু স্বর্গ’-এ ব্যবহৃত কবিতাংশের অনুপ্রাসে। এভাবে অনুপ্রাসের মতো উপমা নির্মাণেও বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কবি এবং নিজেই বলেছেন,‘ রোমান্টিকতার দাবি এই যে কবিতা হবে সন্ধানধর্মী, আবিষ্কারপ্রবণ, বিশ্বেও আপাতবিদৃশ্য বস্তুরাশি– আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিরকাল যারা পরস্পরের সুদূর ও অপরিচিত হয়ে থাকে– তাদের মধ্যে স্থাপন করবে একটি ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ।’[২৯] কবির এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা নিচে কিছু উপমা বিশ্লেষণ করছি :

১. ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তম,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা। (‘শেষের রাত্রি’/ *কঙ্কাবতী*)
২. ডালে আর পাতায় আর হাজার অদৃশ্য পাখির উপনিবেশে মর্মরিত
গাছের মতো রাত্রি; (‘সময় নেই’/ *নতুন পাতা*)
৩. কোনো ভাগ্যবান বাচ-খেলার লম্বা, শাদা নৌকোটাকে নিয়ে
সুন্দর একটি তীরের মতো মিলিয়ে যায়। (‘উদ্বাস্তু’/ *দ্রৌপদীর শাড়ি*)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহে উপমারাশি সৃজিত হয়েছে প্রকৃতিমালা এবং রোমান্টিক অনুভব-বিশ্বের প্রগাঢ় আবেগ-তাড়না ও তীব্রতায়। এখানে প্রথম দুটি উদ্ধৃতি গ্রন্থিত হয়েছে প্রথম পর্যায়ের কবিতাসমূহ থেকে, যার ফলে আবেগের তীব্রতা লক্ষ্যণীয়। কারণ ‘তাঁর প্রথম বয়সের কাব্যেও অনেক জায়গায় কল্পনার অবলম্বন গতানুগতিক বিশ্বাস ও মত, যার সঙ্গে কবির মনের নিগূঢ় যোগ নেই। সে বিশ্বাস অতি প্রাচীন হোক বা অত্যাধুনিক হোক, বুদ্ধদেবের কাব্য সেখানে দুর্বল্ মনকে আবিষ্ট করে না।’[৩০] কেবল সাদৃশ্যগুণকে উপজীব্য করে উপমা-নির্মাণে কবি প্রচেষ্ট হননি, পাশাপাশি সাদৃশ্যের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাও চিত্রিত করেছেন। উল্লিখিত ১-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ‘ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা’ কবিতাংশের ব্যবহারে শব্দমালা উপমেয়-উপমানের মাঝে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। প্রেয়সীর মাথার সাধারণ ‘চুল’কে আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা’ বাক্যাংশে চিত্রিত করতে গিয়ে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন ‘মরণ’ শব্দটি। যার ফলে কালো কেশের বর্ণনা সাদৃশ্যের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় রহস্যময় উঠেছে। আবার উদ্ধৃতি ২-এ এসে কবি ‘ডালে আর পাতায় আর হাজার অদৃশ্য পাখির উপনিবেশ’ চিত্রত করেছেন, যেখানে উপমেয় ‘রাত্রি’ এবং ‘মর্মরিত গাছ’ হচ্ছে উপমান। সাদৃশ্য চেতনা অদৃশ্য হলেও পত্র-পল্লব ও পাখির উপনিবেশ-এ ‘মর্মরিত রাত্রি’ বিশেষ চিত্রকল্পের সৌন্দর্যময় ব্যঞ্জনা পেয়েছে। আবার ৩-সংখ্যক উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে কবির পরিণত পর্যায়ের কবিতাসমূহ থেকে, যার ফলে এখানে নাগরিক জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে প্রবলভাবে। নাগরিক

উপাদান 'বাচ-খেলার লম্বা, শাদা নৌকোটা' এখানে কবির উপজীব্য এবং 'তীর'-এর সাথে 'শাদা নৌকো'র কোনো সাজুয্য নেই। দুটি উপমার গীতশীলতাই কবির প্রধান লক্ষ্য এবং 'দুধ-রঙের কুয়াশার' বর্ণনা এসেছে কেবল অনিবার্যতা থেকে। আমরা জানি,'প্রকৃত (উপমেয়কে) গভীরতর সাদৃশ্য হেতু যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট এককোটিক সংশয় (সম্ভাবনা) হয়, তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলা যায়।'[৩১] অর্থাৎ তা উৎকট জ্ঞান, কল্পনা বা মিথ্যা, তবে কাব্যশক্তিগুণে এই কল্পনা-জ্ঞানকে পাঠক সহজেই গ্রহণ করে। আবার উৎপ্রেক্ষা নির্মাণেও তিনি চমৎকারিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, যার কয়েটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১. আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর খরস্রোত; ('এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে'/*নতুন পাতা*)
২. কোন দূর থেকে অট্টহাসি ভেসে এলো। যেন
শৃগালের চিৎকার, পিশাচের উল্লাস, ডাকিনীর উলুধ্বনি– ('কালিদাসকে খোলা চিঠি'/ *একদিন : চিরদিন*)
৩. মনে পড়ে মৃত্যু ও জীবন
পরস্পর সম্পৃক্ত অনবরত, অথচ অনন্ত দূর,
যেন যুগলকক্ষ– ('সেতুবন্ধ'/ *স্বাগতবিদায়*)

আমরা জানি, ' যেখানে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয় তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়। এই অভেদারোপ প্রধান কিন্তু একমাত্র বা সর্বস্ব নয় এবং এখানে উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে না, তবে আচ্ছন্ন করে প্রবলভাবে।'[৩২] এ পর্যায়ে রূপক নির্মাণের কিছু উদাহরণও উপস্থাপন করছি :

১. দুঃখের কুটিল
অরণ্য পুষ্পিত হবে চৈত্ররথ-বনে
তোমার যৌবনেরে ঘিরে। ('দয়মন্তী'/ *দয়মন্তী*)
২. কিংবা কোনো জেট-প্লেনে দীর্ঘায়িত নিশীথের মাতৃগর্ভে ('সেতুবন্ধ'/ *স্বাগতবিদায়*)

অতএব উৎপ্রেক্ষার উল্লিখিত 'এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে' কবিতার ১-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'হাত' এবং 'নদী'র মধ্যে এক ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাদৃশ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এমন সাদৃশ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে উদ্ধৃতি ২-এ 'অট্টহাসি'র সাথে শৃগাল, পিশাচ, ডাকিনী ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক-সূত্র স্থাপিত হয়েছে। 'অট্টহাসি' ও 'উলুধ্বনি' শব্দ দুটি একই সরলরেখায় বৃত্তবদ্ধ করেছেন, যার ফলে তিনটি উপমানই বিভৎস চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। আবার উদ্ধৃতি ৩-এ মৃত্যুর অনুষঙ্গে জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি 'দর্পণের কাচে চিরকাল-বিভক্ত' দুটি ভিন্ন পথের বাস্তবতা চিত্রায়িত হয়েছে, আর পরিণতিও পাঠকের অজানা নয়। আবার রূপক-নির্মাণের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি ২-এ দুঃখের উপমানচিত্রে 'কুটিল অরণ্য' রূপক-এ শোভিত হয়েছে, যার ফলে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছে বেদনাঘন মর্মকথা। অন্যদিকে ৩-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'নিশীথ' মাতৃগর্ভের রূপক-উপমানে রূপায়িত। 'নিশীথ' ও মাতৃগর্ভ' দুটি শব্দই 'অন্ধকার' এবং অবোধ- চৈতন্যলোকের দিকে পাঠকের দৃষ্টি নিবন্ধ করে। কবির সৃষ্টি করা অধিকাংশ রূপক ইন্দ্রয়ঘন ও সৌন্দর্যসঞ্চারী, যা কাব্যদেহে সহজেই সঞ্চারিত করেছে আবেগের মূর্তশোভা।

৪.

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার প্রকরণ-কৌশলের মর্মমূলে একদিকে রয়েছে প্রতীচ্য কাব্যপ্রকরণ, শিল্পঐতিহ্য এবং মানস-সংবেদনা; অন্যদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য বোধ-লালিত দেহচেতনার দ্বন্দ্বমুখর পরিণতি। আবেগতাড়িত রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও বর্ণনার প্রাবল্য যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, ঠিক তেমনই গীতিদোলা ও মনো-সমীক্ষকণসূত্র অনুযায়ী অন্তঃস্বগতোক্তি কবিতার গঠনকৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রমে তাঁর কাব্যকলা পেয়েছে পরিণত-সংহত-সংযত রূপ এবং তা গড়ে উঠেছে জটিল-সংহত-সংযত বাক্য-বুনন, শব্দ-নির্বাচন ও প্রতীক-রূপক-চিত্রকল্পের গাঢ়বদ্ধ আশ্রয়ে। তিনি কেবল কাব্য-বিষয় নির্মাণের সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় অন্তর্লীন ছিলেন না, কাব্যের শিল্পরূপ-নির্মাণের বিষয়েও ছিলেন অখণ্ড মনোযোগী এবং ভারতীয় মানস-প্রবণতা ও পুরাণপ্রকরণের নিকট অধিক ঋণী। এই কাব্য-অন্তর্লীন ঋণ জীবনব্যাপী সুফলা প্রকৃতি-অন্বেষণে, রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের বৈচিত্র্য ও

সৌন্দর্যে, নাগরিক প্রতিবেশের সংকীর্ণ আবেষ্টনিতে, বিচ্ছিন্নতা-নৈঃসঙ্গে ও অতি-সংবেদনশীলতায় পেয়েছে শিল্পরূপ। এ কারণে কবি বুদ্ধদেব বসু পরিণত হয়েছেন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বে।

তথ্যনির্দেশ

[১] বেগম আকতার কামাল, 'শিল্পসাহিত্যে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত', *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাসাহিত্য* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ২৩

[২] জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং., ২০০৮), পৃ.৬৯

[৩] দীপ্তি ত্রিপাঠী,'বুদ্ধদেব বসু', *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সং., ১৯৯৭), পৃ. ৯৬

[৪] মঞ্জুভাষ মিত্র, *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয়* প্রভাব (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পুন.মু., ২০১৭), পৃ. ১৫৩

[৫] ড. গৈরিক ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসু', *স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎস ও বিবর্তন* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৫), পৃ. ৭৯

[৬] ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *স্বর ও বাক্ রীতি* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ২য় সং., ১৯৯৮), পৃ. ৮৪

[৭] বুদ্ধদেব বসু, *বুদ্ধদেব বসু রচনাসমগ্র*-৩ (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বিশেষ সং., ১৯৮২), পৃ. ৪৯১

[৮] অমলেন্দু বসু, *সাহিত্যচিন্তা* (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম. সং., ১৯৮১), পৃ. ১০০

[৯] বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতার অনুবাদ', *বিষয়* কবিতা (কলকাতা : বাণীশিল্প, ২০১১), পৃ. ৯১

[১০] বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা ও আমার জীবন', *বুদ্ধদেব বসু রচনাসমগ্র-৪* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বিশেষ সং., ২০১৫), পৃ. ৬৩৩

[১১] বুদ্ধদেব বসু, 'দে'জ সংস্করণের ভূমিকা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (নরেশ গুহ সম্পা.), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, চতুর্দশ সং., ২০১০), পৃ. ১১

[১২] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভাষার মুদ্রা–আধুনিক কাব্য', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (আলোকরঞ্জন দাশ ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.), (কলকাতা : ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৮৩), পৃ. ১৯৭

[১৩] হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য প্রকরণ* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পুন.মু., ১৪১৬), পৃ. ৩৪১

[১৪] বুদ্ধদেব বসু, 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিকতা', *কবিতীর্থ: শার্ল বোদলেয়ার* (উৎপল ভট্টাচার্য সম্পা.), (কলকাতা: কবিতীর্থ, ১৪২০), পৃ.২৪৯

[১৫] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ন* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১৯৯৭), পৃ. ৭০

[১৬] সুবীর রায় চৌধুরী, 'সাদৃশ্যের সন্ধানে : 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' এবং 'রাত ভ'রে বৃষ্টি', *বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ* (আনন্দ রায় সম্পা.), (কলকাতা : বর্ণালী, ১৯৭৮), পৃ. ১৪০

[১৭] মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পুন.মু., ২০১১), পৃ. ২৭১

[১৮] সুধীরচন্দ্র (সম্পা.), *পৌরাণিক অভিধান* (কলকাতা : এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি., দশম সং., ১৪১৫), পৃ. ২১২

[১৯] তদেব, পৃ. ১৯২-১৯৫

[২০] বেগম আকতার কামাল, 'কবির চেতনায় মিথ', *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৩১

[২১] কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (কলকাতা : রত্নাবলী, ৮ম মু,৩ ২০১১), পৃ. ৫৪

[২২] সুমিতা চক্রবর্তী, 'চিত্রকল্প: মূর্তিতে কি দিবে ধরা', *আধুনিক কবিতার চালচিত্র* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, পুন.মু., ২০০৮), পৃ. ২৭৪

[২৩] T.S. Eliot, 'The Love Song of J. Alfred Profrok', *The Norton Anthology of Poetry* (London: W.W. Norton & Company Inc., 3rd Edn., 1975), p. 994

[২৪] শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন, *নতুন ছন্দ-পরিক্রমা* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪র্থ মু., ১৯৯৫), পৃ. ৭

[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছন্দ* (সম্পা.), (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৩য় সং.,১৯৭৬), পৃ. ৩১

[২৬] রামবহাল তেওয়ারী, 'বুদ্ধদেব বসু', *বাংলা ছন্দ-সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০১৩), পৃ. ২৭৬

[২৭] নীলরতন সেন, 'রবীন্দ্র যুগ : অন্তপর্ব', *আধুনিক বাংলা ছন্দ* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং., ২০১৩), পৃ. ১৬৮

[২৮] Herbert Read, *Collected Essays in Literary Criticism* (Kolkata : Association Press, 1988), p. 50

[২৯] বুদ্ধদেব বসু (অনুবাদ-ভূমিকা-টীকা), *কালিদাসের মেঘদূত* (কলকাতা : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট, ৩য় সং., ১৯৬৩), পৃ. ৫৩

[৩০] বুদ্ধদেব বসু, *রচনা সমগ্র-১* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ৪র্থ সং., ২০১৬), পৃ.৩৬৪

[৩১] নরেন বিশ্বাস, *অলঙ্কার অন্বেষা* (ঢাকা : অনন্যা, ৩য় মু., ২০১০), পৃ. ৭৪

[৩২] বদিউর রহমান, *সাহিত্য–সংজ্ঞা অভিধান* (ঢাকা : অবসর, ২০১৬), পৃ. ৩৭৫

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

মুক্তিযুদ্ধের যুগল উপন্যাসঃ জীবনসংগ্রাম ও মুক্তির পরিলেখ

তানিয়া তহমিনা সরকার*

Abstract: The year 1971 is a glorious chapter of our national life. During the war of liberation, we the Bangladeshi people have proved that patriotism is the most powerful weapon in the world. The history of becoming an independent country makes Bangladeshi people very much concern about their own identity and self determination. Image of Liberation War (LW) has changed the total lifestyle of Banglaeshi people. After Release from West Pakistan, Bangla literature has been variegated with the incidents, events and emotions of LW and it has been flown in the way of Liberation War. Bangladeshi novelists took LW as their main theme of writings. In the history of Bangladeshi novel Selina Hossain and Sayed Shamsul Haque are two famous novelists. This article aims at how historic events, incidents, feelings of LW, savagery of Pakistan Military Army, sturggles of Bangladeshi people, movement of freedom fighters have been illustrated in their Novels and finally how our freedom fighters defeat Pakistan army in all sectors.

ভূমিকা

বাঙালি-জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়ের নাম মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালির হৃদয় ও মননে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সদা জাগ্রত। বাঙালির প্রতি মুহূর্তের প্রেরণা-বিন্দুর উৎস মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ সাড়ে ২৩ বছরের নিপীড়িত, বঞ্চিত ও অবহেলিত জাতির অধিকার আদায় ও আত্মোপলব্ধির নাম মুক্তিযুদ্ধ। তাই বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বারবার মুক্তিযুদ্ধ প্রধান অনুষঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের উপন্যাসের সমৃদ্ধ ধারারও বিশিষ্ট একটি উপজীব্য মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক সচেতন ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন। সাহিত্যের এ ধারার সমৃদ্ধিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অবিসংবাদিতভাবে চলমান একটি প্রভাবক। সাড়ে তেইশ বছরের শোষণ, এক যুগের সামরিক শাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অস্তিত্ববাদের সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাম মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাশাপাশি অন্যান্য অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন ও বর্বরতা, বাঙালির সংগ্রামের গৌরব ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং স্বজন হারানোর বেদনা।

মূলত এত ঘটনাবহুল সংক্ষুব্ধ অথচ প্রদীপ্ত স্বপ্নময় সময় বাঙালির জীবনে আর কখনও আসেনি। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ- জন্মের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে উপেক্ষা করার অর্থ বাংলাদেশকে উপেক্ষা করা। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের মধ্য থেকে এ প্রবন্ধে ২জন লেখকের ২টি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেলিনা হোসেনের (জ.১৯৪৭) *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) এবং সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১) এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু।

সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেডের* প্রেক্ষাপট গ্রাম। সাধারণ এক গ্রামীণ গৃহিণী নারীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ, দেশের জন্যে জনসাধারণের কিছু করার তাগিদ, দালালদের তৎপরতা, হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, লুণ্ঠন এবং যুদ্ধ না করার অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রতিবন্ধী ছেলেকে মুক্তিযোদ্ধা সাজিয়ে হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদ্বয়কে বাঁচানোর প্রয়াস এ উপন্যাসের অন্যতম ঘটনাপ্রবাহ। কথিত আছে যশোর

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জেলার কালীগঞ্জ গ্রামের এক মায়ের সত্য কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাস জুড়ে বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন এবং প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প।

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকগণ কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। যেমন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা, বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রাম ও তার গৌরব, হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, নিপীড়ন ও নির্মমতা। অনুষঙ্গ হিসেবে আলবদর-রাজাকার বাহিনীর কথাও এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস হলেও তাতে শুধু ৯ মাসের ঘটনাপ্রবাহ নেই, বরং তাতে অনুষঙ্গ হিসেবে রয়েছে সাড়ে তেইশ বছরের বঞ্চনা, শোষণ, এক যুগের সামরিক শাসন, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন, ১৯৭০ এর নির্বাচন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি সৃজনশীল সাহিত্যে স্বপ্ন এবং কল্পনার সাযুজ্য থাকলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তবতার বাইরে কোন কল্পনার দৌড় আমরা দেখিনা। বাঙালির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ চিরন্তন বাস্তবতা। কল্পনার খাতিরে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হলেও ঘটনা ও কাহিনি বিনির্মাণে তা সবসময়ই বাস্তবতার অনুকূল। সত্য ঘটনাকে হুবহু বর্ণনা করতেও কেউ কেউ দ্বিধা করেননি। উপন্যাস সাহিত্যের ধারার সমৃদ্ধির দিকে ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি না থেকে তা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে। এর অন্যতম কারণ মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত বাঙালির প্রাণের আবেগ উপন্যাস নির্মাণের প্রতিভা ও মৌলিকত্বের তাগিদে এ সত্যকে অস্বীকার করতে অপারগ ঔপন্যাসিক। এ কারণেই বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস মূলত মুক্তিযুদ্ধেরই প্রামাণ্য দলিল।

উল্লিখিত ২টি উপন্যাস ২টি ভিন্ন প্রেক্ষাপট, স্থান, ভিন্নধর্মী চরিত্র এবং সময়কে উল্লেখ করেছে। ঘটনাপ্রবাহরীতিতেও এদের বৈপরীত্য লক্ষণীয়। *হাঙর নদী গ্রেনেড* ও *নিষিদ্ধ লোবানের* কেন্দ্রিয় চরিত্র নারী। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য মা, অপরজন শিক্ষিত গৃহিণী। তাদের দুজনের সংগ্রাম দুরকম; পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রতিরোধের গল্পও আলাদা। এ দুটি চরিত্র যেন সমগ্র বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করেছে। দ্রোহে, প্রেমে, সংগ্রামে, স্বপ্নে তারা লালন করেছে স্বাধীনতার বীজ। মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক চিত্র তাদের খণ্ডিত গল্পের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

হাঙর নদী গ্রেনেড

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের একটি প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে ইতিহাস। ইতিহাস ও রাজনীতি সচেতন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক *হাঙর নদী গ্রেনেড* একটি নন্দিত উপন্যাস। এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত এক গাঁয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্ফূরণ, পাকিস্তানি শাসন-শোষণের প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের চালচিত্র *হাঙর নদী গ্রেনেড*। আর পাঁচটি গ্রামের মতো হলদী গাঁর অধিবাসীরাও নিস্তরঙ্গ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। একমাত্র বুড়িই ব্যতিক্রম তার কৌতূহল ও মানসিক ক্ষুৎ-পিপাসা নিয়ে। বয়সক্রমে বিয়ে হয় তার চাচাত ভাই গফুরের সাথে। এতে করে তার জীবনতরঙ্গে নতুন কোন ঢেউ ওঠে না। প্রাত্যহিকতার স্বাভাবিকত্বে কিছুটা ছেদ পড়ে যখন সলীম আর কলীম কোন এক আসন্ন যুদ্ধের কথা বলে। বুড়ি তখন প্রৌঢ়ের খাতায় নাম লিখিয়েছে। জীবনে সে অনেক কিছুই শুনেছে কিন্তু স্বাধীন দেশ কিভাবে যুদ্ধ করে আবার স্বাধীন করতে হয় তা শোনেনি।

সেলিনা হোসেন *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে এক ভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। এ উপন্যাসে পাকিস্তান জন্মের উল্লেখ রয়েছে। বুড়ির অভিজ্ঞতা বলে, বিয়ের কিছুদিন পরেই তারা দেশ স্বাধীনের খবর ও সে উপলক্ষে উল্লাস দেখেছে। দারুণ ফুর্তি নিয়ে সবাই উদ্‌যাপন করেছে পাকিস্তানরাষ্ট্রের জন্ম। কিন্তু সলীম কলীমের কথা থেকে বুড়ি বুঝতে পারে দেশের অবস্থা সংকটাপন্ন। কিন্তু স্বাধীনতার মানে কেন বদলে যায় সেটা তার মাথায় ঢোকে না:‘এখন কেন স্বাধীনতা মানে যুদ্ধ?... কি হল দেশটার? নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু। নইলে বিয়ে পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে কেন ওরা।’[১] অজ্ঞতা সত্ত্বেও বুড়ির মননে ধরা পড়ে এক বিশাল পরিবর্তন। চারপাশের ঘ্রাণ, রঙ ও ফিসফাস শব্দ

তাকে বলে দেয়, কিছু একটা হবে। এমনকী জলের বুকের স্রোতও এ রূপান্তর সম্পর্কে বুড়িকে সজাগ করে। বুড়ির এহেন উৎকণ্ঠায় অরাজনৈতিক মননে মুক্তির বার্তার তরঙ্গের অভিঘাত তুলে ধরেছেন লেখক। ভাল কি মন্দ বুড়ি জানে না, শুধু বুঝতে পারে এ বাঁক বদল অনিবার্য, অমোঘ:

> বদলে যাচ্ছে মাটির গতর। হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুক্‌ শব্দধ্বনি। কেমন যেন উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছে খালের শরীর।... যেন বাঁক বদলাতে চায়, যেন স্রোতে বিশাল কিছু বয়ে আনতে চায়... কেন হলদী গাঁয়ের প্রাণ বদলে যাচ্ছে। কোন অমোঘ শক্তির টানে হলদী গাঁ তার আপন স্বরূপের বাইরে পা বাড়াচ্ছে? কে তাকে এমন সাহসী, বেগবান এবং যৌবনবতী করে তুলল?[২]

প্রকৃতি শুধু নয় হলদী গাঁয়ের ছেলেগুলোও যেন এক লহমায় বদলে গেছে। বুড়ি লক্ষ করে ওদের অকারণ ছেলেমানুষী, দুষ্টুমী, চপলতা উধাও। উত্তেজিত হয়ে নতুন এক ঢঙে তারা কথা বলে। কি বলে তাও বুড়ির কাছে অস্পষ্ট। কলীম, সলীমের মতো তাদের কথাও বুড়ির কাছে ধোঁয়াশা মনে হয়। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র দেশ উন্মাতাল হয়ে উঠেছিল। এর আগে আর কোন বিষয়ে বাঙালি এভাবে একাত্মতা বোধ করেনি। ফলে তাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ বুড়ির মতো সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা লাগে। তার শুধু আফসোস জাগে যে, চারপাশের এত প্রাণস্পন্দন তার প্রতিবন্ধী ছেলে রইসকে ছুঁয়ে যেতে পারে না।

২৫শে মার্চ ১৯৭১, কালরাত্রিতে ঢাকা শহরের হত্যাযজ্ঞ আর ধ্বংসের খবর বয়ে আনে বুড়ির বাল্যবন্ধু জলিল। তার সংক্ষিপ্ত সংলাপেই সেলিনা হোসেন পাকিস্তানি বীভৎসতার পরিচয় দিয়েছেন:

> আগুন। গুলি। দাউদাউ করে জ্বলে চারদিকে। মানুষ চিল্লায়। মানুষ মানুষকে এমন করে মারে কি করে?... চোখ বন্ধ করলে আমি আগুন দেখি। গুলির শব্দ শুনি। মানুষের চিল্লানিতে কান ফেটে যেতে চায়।[৩]

জলিলের বক্তব্যে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে বুড়ির:

> - যারা আমাদের ওপর গুলি চালালো তারাতো আমাদের দেশেরই মানুষ জলিল ভাই?
> - হ্যাঁ আমরা তো একদেশেরই মানুষ।... অন্য নাম তো শুনিনি।
> - তাহলে ওরা আমাদের মারে কেন? ওরা কি আমাদের ভালবাসে না?[৪]

পাকিস্তানিদের মিথ্যাচার ও মিথ্যে সম্পর্কের ঘুণ বুড়ির চোখেও ধরা পড়ে। বুড়ির মতো গ্রামের নিতান্ত অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষও বুঝতে পারে একপেশে সম্পর্ক ভাঙার সময় হয়েছে। বাঙালির এই হৃদস্পন্দন টের পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি স্বাধীনতার সবুজ পতাকা ওড়ানোর পরোক্ষ ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। ২২শে ফাল্গুন রেডিও মারফত সেই ঘোষণা বুড়ি শুনেছে নিজের কানে। বঙ্গবন্ধুকে দেখার তীব্র ইচ্ছে বোধ করা বুড়ি তাঁকে আত্মার আত্মীয় মনে করে। ভীত বুড়ি সাহসী হয়ে উচ্চারণ করে–'আমাদের জন্যে যাদের মায়া নেই তাদের জন্যে আমাদের মায়া কি?... ঐ গুলিটা যখন আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে তখন ওদের শরীরে ঢুকবে না কেন?'[৫]

হলদী গাঁয়ের ছেলেরা সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরাসরি যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষ দৃশ্য না থাকলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সরব উপস্থিতি মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে উপন্যাসের শেষ দিকে। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম, তাদের প্রতিজ্ঞা, নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন প্রকাশিত সলীমের সংলাপে:

> শোন মা, ও যাতে একটা স্বাধীন দেশের মাটিতে বড় হতে পারে সেই প্রতিজ্ঞাই তো আমি নিয়েছি। বড় হয়ে ও গর্ব করতে পারবে যে ওর বাপ একটা নতুন দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছিল। আমার ছেলের বুকের মধ্যে এই অহংকারের বীজ আমি পুঁতে দিতে চাই মা। এটাই আমার সোহাগ।[৬]

বর্তমান ও নতুন প্রজন্মকে স্বাধীন দেশের পতাকা উপহার দেওয়ার জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা ব্যক্তিগত জীবনকে আমলে নেয়নি। কোমল হাতে মাটির গন্ধ মুছে বন্দুক চালানো লিখেছে তারা। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন রেখে যুদ্ধ করতে কখনও সীমান্ত পেরিয়েছে, কখনও ছেড়ে গেছে গ্রাম। বন্দি দেশের রাজপুত্র হয়ে তারা পঙ্খীরাজ

ঘোড়ায় চড়ে দানবরূপী পাকিস্তানিদের হত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। দেশপ্রেমের ভক্তি, আবেগ আর শপথ তাদের ব্যক্তিগত থেকে সার্বজনীন করেছে। এর পেছনে কোন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা চেতনা কাজ করে নি, কাজ করেছে সহজাত অধিকারবোধ ও দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও সীমানার প্রতি সুগভীর টানেই তারা অনমনীয় ও দুর্বার হয়ে ওঠে। দুর্বিনীত এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নাড়ির টান অনুভব করেছে সকল বাঙালি। তাই কাদের ও হাফিজকে বাঁচাতে বুড়ি নিজের সন্তান রইসকে অস্ত্রসহ পাকিস্তানিদের কাছে ধরিয়ে দেয়। তার কাছে মনে হয়:

> ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের উজ্জ্বলধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না।[৭]

মানতের ফলে যে সন্তান বুড়ির কোলে এসেছিল, যে ছিল তার যৌবনের স্বপ্ন, মা ডাক না শোনার যে অপূর্ণতার কাঁটা; তাকে বুড়ি বিসর্জন দেয় দেশের তাগিদে। ব্যক্তিগত অর্জন ছাপিয়ে হলদী গাঁ তথা দেশের মুক্তির প্রয়োজন প্রাধান্য পায় বুড়ির কাছে। এমন হাজারও বুড়ির আত্মত্যাগ ও সন্তান ত্যাগের বিনিময় স্বাধীনতা-সূর্য। বাংলার মাটি তাদের রক্তে উর্বর হয়েছে, নতুন চেতনার বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে বলে– এ প্রত্যাশা লেখক সেলিনা হোসেনের।

বুড়ির সন্তান শুধু নয়, সে নিজেও একজন অকুতোভয় যোদ্ধা। দেশের জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও তার দ্বিধা নেই। সেই কঠিন দুঃসময়ে প্রায় সকল বাঙালি যে যার ক্ষেত্র থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। বুড়ির শরীরে শক্তি বা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ছিল না। কিন্তু তাই বলে দেশের প্রয়োজনে সে পিছপাও হয়নি। বুড়ির বন্ধু নীতা তার মনের মানুষ ছেড়ে দেশের গান গ্রামের পথে পথে গেয়ে মানুষকে সচেতন করেছে। এও এক যুদ্ধ। 'মুক্তির গান' মুক্তিযুদ্ধের সময় গণমানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে। গানের কথা ও সুরে প্রাণিত হয়ে বীর বাঙালি স্বাধীন দেশের মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়েছে। অসংখ্য শিল্পী গানের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাদেরই প্রতিনিধি বৈরাগিণী নীতা, বৈষ্টম অখিল। গানের বিষয় হিসেবে দেশকে বেছে নিয়ে তারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের অন্যতম প্রসঙ্গ রাজাকার-আলবদর বাহিনী এবং পাকিস্তানি সেনা। *হাঙর নদী গ্রেনেডেও* তারা অনুপস্থিত নয়। সেলিনা হোসেন এ উপন্যাসে তাদের কুটুম নামে সম্বোধন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে শহরেই ছিল মিলিটারি বাহিনীর আনাগোনা। সারা দেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে তাদের শায়েস্তা করতে হানাদার বাহিনীও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত হানা দিতে শুরু করে। আগমনের আগেই তাদের আবির্ভাব অনুভব করে বুড়ি। এ অনুভূতি তার ভেতরে ভয় ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, কারণ এই কুটুম আনন্দ বয়ে আনে না, আনে ধ্বংস ও মৃত্যু:

> ১. কুটুম পাখি ডাকে একটানা। বুড়ির মনের মধ্যে... কুটুমের আগমনের উল্লাস নেই, কেমন একটা থিতানো ভাব। এই কুটুমের জন্যে পিঠে পুলির উৎসব নেই। বরং জল ঢেলে চুলো নিবিয়ে লুকিয়ে থাকা।[৮]
>
> ২. বটির গায়ে রক্তের ক্ষীণধারা বুড়ির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাজা ছটফটে মাছগুলোর লাফানি বন্ধ হয়ে যায় এক পোঁচে। বুড়ির মনে হয় কুটুম আসবে। বন্যা, মহামারী খরা যেমন ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায় এ কুটুমের আগমন তেমনি। মাঠঘাট প্রান্তর তোলপাড় করে দিয়ে ওর আঙ্গিনায় কুটুম আসছে।[৯]

মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে অব্যবহিতভাবে উঠে আসে রাজাকার-আলবদর-আল শাম্‌স প্রমুখ দেশীয় দোসর, যাদের বিভীষণরূপী আচরণে বাংলা ও বাংলার মানুষ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বেশি। *হাঙর নদী গ্রেনেডেও* এমন একজনের সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মনসুর মেম্বার গ্রাম ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ নিয়ে তা জানিয়ে দেয় পাকিস্তানি ক্যাম্পে। সলীমের খোঁজ না পেয়ে তারা কলিমকে বন্দি করে নিয়ে যায়।একসময়

তাকে হত্যা করে মা বুড়ির সামনে। এছাড়াও রমজান আলীর ছেলে কাদের ও হাফিজের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথাও সে জানায় মিলিটারিদের। বুড়ি তার ক্রোধ প্রকাশ করেছে মনসুরের প্রতি অভিশাপ দিয়ে। নীতা বুড়ির কাছে থাকতে এলে সেটা নিয়েও সতর্ক হতে বলেছে মনসুর। বুড়ি কৌশলে সলীমের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে মনসুরের কুদৃষ্টির সীমা থেকে নীতাকে সরিয়ে দেয়। মনসুরের মতো দালালদের প্রতি বাঙালির ভয় ও মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বুড়ির কথায়:

> জানিস নীতা এখন ঐ সৈনিকগুলোর চাইতে আমি মনুসরকে বেশি ভয় পাই যে। ও আমার ঘরের কাছের লোক। ও আমার হাঁড়ির খবর রাখে।[১০]

এমন হাঁড়ির খবর জানা লোকদের কর্মকাণ্ডের ফলে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতির সূর্যসন্তানদের হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল। নইলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতো এমন আগন্তুকদের পক্ষে বাংলার সূর্য সন্তান চেনা বা তাদের খবর রাখা ছিল প্রায় অসম্ভব। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনও যথারীতি এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। গরু চুরি থেকে গ্রামে আগুন লাগানোর কথাও বিবৃত। মেয়েদের প্রতি তাদের জান্তব আচরণও প্রকাশিত এ উপন্যাসে। নীতার আখড়া পুড়িয়ে দিয়ে ধর্মাশ্রয়ী মানুষগুলোকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দালাল। মিলিটারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্রামবাসীরা মাথায় কচুরিপানা চাপিয়ে পুকুরের মধ্যে আত্মগোপন করে। এক ভীত সন্ত্রস্ত মায়ের বেঁচে থাকার জন্যে সন্তানের নাক-মুখ টিপে মেরে ফেলার প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে মিলিটারি-ভীতি ও সেনাদের চারিত্র্যের সঠিক নির্দেশনা দান করতে সক্ষম হয়।

নিষিদ্ধ লোবান

সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। রংপুর অঞ্চলের একটি গ্রাম জলেশ্বরী এর প্রেক্ষাপট। মূল চরিত্র বিলকিস, শিক্ষিত; বৈবাহিকসূত্রে ঢাকায় অবস্থানরত। স্বামী আলতাফ পত্রিকায় চাকরি করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বেশকিছু পত্রিকা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। আলতাফ তেমনই একটি অফিসে চাকরি করত। তার লাশ পায়নি বিলকিস। অসংখ্য মানুষের মতো সেও স্বামীর জীবিতাবস্থা নিয়ে সংশয়ে দোদুল্যমান। অনিরাপদ ভেবে সে বাড়ি ফিরে আসে। ঢাকা শহরের মতো জলেশ্বরীতেও মিলিটারির উপস্থিতি গ্রামের অধিবাসীদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। ছোট ভাই খোকার মৃত্যু এবং পরিবারের অন্যান্যদের খোঁজ না পাওয়ায় বিলকিস শক্তি সঞ্চয় করে। সে সিদ্ধান্ত নেয় বাজারে নিহত লাশদের সে কবরস্থ করবে। একজন মিলিটারিকে জীবন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারার মধ্যে বিলকিস তার ভাই খোকা ও প্রদীপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। উপন্যাসের শেষে বিলকিস ও সিরাজ ওরফে প্রদীপ ধরা পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর পরে সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাসটি লিখেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিলকিস ও সিরাজের অন্তর্দহনকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের চমৎকার সুযোগ পেয়েছেন। লক্ষ করবার মতো বিষয় হচ্ছে মধ্যবিত্তসুলভ কোন টানাপড়েন বিলকিসের মধ্যে দেখা যায় না। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১এ তার সমস্ত টানাপড়েনের মৃত্যু ঘটেছে। এ রাতেই মূলত বাঙালি তার সংশয়ের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তারা বুঝেছিল লড়াই ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই। সমগ্র জাতি সেদিন থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার এ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বিলকিসের সাহসও ২৫শে মার্চের কল্যাণে প্রাপ্ত। ব্যক্তিগত শোক তার শক্তিতে পরিণত হয়েছিল:

> মার্চ মাসের চব্বিশ তারিখেও কেউ যদি আমাকে বলত,... মাঝরাতে নির্জন একটা রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যেতে পারবে? বিশ্বাস কর, আমি কল্পনাকরেও ভয়ে মরে যেতাম। পঁচিশ তারিখে এত লোক মারা গেছে শুনেছি, আলতাফ যদি বেঁচে থাকত, মৃত্যুকে আমার ভয় করত। আলতাফ নেই, আমার মৃত্যু ভয় নেই, মৃত্যুর জন্যে আমার শোকও নেই।[১১]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ইতিহাস যেমন উন্মুক্ত হয়েছে, তেমনি বাঙালির ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ও কারণও স্পষ্ট হয়েছে। শোকের তীব্রতা কেটে গিয়ে বাঙালির মননে প্রতিশোধের দৃপ্ত প্রত্যয় তাদের চালিত করেছে সম্মুখ যুদ্ধে। বিলকিসও এ পথে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছে সিরাজের কাছে। তার আগে বাঙালির আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিতে চেয়েছে সে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে।

মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ চিত্র *নিষিদ্ধ লোবান* নয়। ব্যক্তিগত প্রতিরোধের পরিসর পরিব্যাপ্ত হয়েছে উপন্যাসটিতে। বিলকিসের প্রতিজ্ঞা ছোট ভাইসহ সকল শহীদের দাফন এবং সিরাজের তার পরিবার হত্যার প্রতিশোধ, সেই সাথে মাতৃভূমির মুক্তির অন্বেষণ। জলেশ্বরীতে মিলিটারি আসে এপ্রিলের প্রথম দিকে। জলেশ্বরীর অধিবাসীরা প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরে ফিরে আসে। তাদের আড়ালে ফেরে মুক্তিযোদ্ধারাও। রেলের পুলে ডিনামাইট ফাটিয়ে তারা মিলিটারিদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আরও একদিন রাস্তায় পুঁতে রাখা মাইন দ্বারা নিহত হয় ৩জন মিলিটারি। এ দুটি ঘটনা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আর কোন সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না এ উপন্যাসে। সম্মুখ যুদ্ধ-চিত্রও অনুপস্থিত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে লিখিত হলেও সৈয়দ শামসুল হক এক অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এ উপন্যাসে। জলেশ্বরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ছায়া-উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে প্রথম থেকেই। বিলকিস ট্রেন থেকে নামলে মনসুর তাকে দেখে। মনসুর মুক্তিযোদ্ধা, অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায় সিরাজও তাই। নিজ গ্রামে ফেরার পথে বিলকিস ও সিরাজের কথপোকথনের মাধ্যমে ফুটে ওঠে ঢাকা শহরে মিলিটারি তাণ্ডবের চিত্র:

> ঢাকার কথা তুমি জান না। ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের বাড়িতে ঢুকে গুলি করে মেরেছে। হিন্দু প্রফেসরদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।... তোমার বয়সী ছেলেদেরই মিলিটারি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইনজেকশন দিয়ে সব রক্ত টেনে নেয় ওরা, হাত বাঁধা অনেক লাশ পাওয়া গেছে, নদীতে ভেসে আছে।[১২]

তাদের সংলাপের ধারাবাহিকতায় ইতিহাসের ছায়া প্রলম্বিত হতে থাকে। এর মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের খবর যেমন পাওয়া যায়, তেমনি রাজাকার ও মিলিটারি কর্তৃক গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতনেরও ইঙ্গিত মেলে:

> বাজারের খোলা চত্বরময় ছড়িয়ে আছে লাশ। বেড়াহীন উলঙ্গ দোকানে খুঁটি আঁকড়ে পড়ে আছে লাশ। আলোর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে গলিটা, তার উপরে উপুড় হয়ে আছে লাশ। লাশের পর লাশ।.... বাজারে হয়তো ফল বেচতে এসেছিল গাছের, দুটো বাচ্চা উল্টে থাকা গরুর গাড়ির ছাউনি জড়িয়ে ধরে- লাশ; সমস্ত চত্বর আর খালের ঢালু জুড়ে ইতস্তত বাঁশের গোল গোল ঝাঁকা, কলস, সব্জি আর সমস্ত কিছুর ওপরে স্তব্ধতা, স্থিরতা, প্রত্যাবর্তনের আশাহীন অক্ষমতা।[১৩]

বোঝাই যায় আতঙ্ক সৃষ্টি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মোহে এলোপাতারি গুলিবর্ষণের ফল এটি। মেরে ফেলেও তাদের আধিপত্য প্রদর্শনের মোহ কমেনি, খোকার মুখে প্রস্রাব করার প্রস্তাবে টের পাওয়া যায় বাঙালিকে মানুষ হিসেবে কতটা ব্রাত্য অচ্ছুত মনে করে পাকিস্তানি বাহিনী। শুধু তাই নয় লাশের ধর্মীয়ভাবে শেষকৃত্য করার অনুমতি তারা দেয় না, বরং শেয়ালের খাদ্য হিসেবে লাশগুলো ওভাবেই ফেলে রাখে। ধর্মীয় বন্ধন থেকে পাকিস্তানের জন্ম হলেও বাঙালিদের তারা ভাই ভাবেনি কখনই। বাঙালি পুরুষ কুকুরসম, বাঙালি নারী ভোগ্যপণ্য– এই ছিল তাদের মনোভাব। কিন্তু বিলকিস অন্যান্যদের মতো শুধু জীবিতদের নিয়ে ভাবেনি, ভেবেছে মৃতদের নিয়েও।

বাজারের লাশগুলো দাফন করে সে প্রমাণ করতে চায় যে, বাঙালিও মানুষ। শেষকৃত্যে তাদের অধিকার আছে। মানুষ মাত্রই সম্মানের অধিকারী। বাঙালি বলে তাদের অপমান করার অধিকার কারও নেই, মৃত হলেও নয়:

> যদি মনে করতে পারতে ওরা তোমারই অংশ, তাহলে দেখতে ওদের সৎকার করে তুমি জীবনকে শ্রদ্ধা করছ, সম্মান দিচ্ছ।... যদি পারতাম, আজ রাতে আমি সবাইকে মাটি দিতাম।... ওরা দেখত আমরা পশু নই, আমরা আমাদের মৃতদেহ ফেলে রাখতে দেই না, আমরা শকুনের খাদ্য হতে চাই না।[১৪]

দীর্ঘ সাড়ে ২৩ বছর ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালিকে ধ্বংস করার একটা হীন প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় পাকিস্তানিদের মধ্যে। ২৫শে মার্চের পরে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে করা হয় কুকুরের মতো আচরণ। কুকুর ও মানুষকে একই সাথে মেরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে; যেন বাঙালি তাদের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়। সৈয়দ শামসুল হক *নিষিদ্ধ লোবানে* এ ধারণাবাহী কিছু সংলাপ সৃষ্টি করেছেন:

> ১. আমরা জানি পশুর মতো বাঙালিরা সন্তান উৎপাদন করে। বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দেয়।[১৫]
>
> ২. আমার বীজ ভালো। আমার রক্ত শুদ্ধ।... আমি তোমায় সন্তান দিতে পারব।... তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানি হবে, চাও না সেই সন্তান? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব;[১৬]

মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য উপন্যাসের মতো শামসুল হকও মিলিটারির নারী নির্যাতনের পেছনে ধর্মের দায়হীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পুনরুক্তি করেছেন। পাকিদের নারী নির্যাতনের পেছনে যে ভীষণ দূরবর্তী ভাবনা লুকিয়ে ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় সংলাপটিতে। ধর্ষণের ফলে যে সন্তান বাঙালির গর্ভে জন্ম নেবে সে হবে খাঁটি পাকিস্তানি। যুদ্ধকালীন এমন বর্বরতা তাও ধর্মের নামে নিজ দেশে- অকল্পনীয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ নিষ্ঠুরতার প্রমাণ প্রায় প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসেই মেলে। বাঙালি মুসলমান হয়ত কিছুটা দয়ার যোগ্য কিন্তু হিন্দু বা কমিউনিস্ট সরাসরি দণ্ডযোগ্য। কারণ তারা বিশ্বাসঘাতক। ঐতিহাসিক এ বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে *নিষিদ্ধ লোবানেও*। সিরাজের প্রকৃত নাম প্রদীপ। জীবন বাঁচানোর তাগিদে মনুসর তার নাম পরিবর্তন করেছে। পাকিস্তানিদের কাছেও হিন্দুদের এই নাম পরিবর্তন কাহিনি অজানা নয়। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে তাই দেখা যায় পুরুষদের খতনা নির্ণয় করছে হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য। কলেমা জানতে চাওয়া ছিল তাদের আরেকটি কৌশল।

রাতারাতি ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে অনেক হিন্দু। যারা করেনি তারা প্রাণ দিয়ে ধর্মপ্রাণতার দায় চুকিয়েছে। সিরাজ স্বপ্ন দেখে সে আবার প্রদীপ হবে। নিজের অস্তিত্ব ফিরে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর সিরাজ ধর্মের কারণে মা-বাবা আর দিদিকে হারিয়েছে। নিজের দুঃখবোধ প্রকাশ করে সে বলেছে:

> দিদি, আপনি বুঝতে পারেন আমার দুঃখ? মা-বাবা-বোন, আমার নাম, আমার পরিচয় একটা মাত্র রাতে আমার সব কিছু হারিয়ে যাবার দুঃখ?[১৭]

যে দেশে ধর্ম বিভাজন সৃষ্টি করে, মানুষকে বাধ্য করে মনুষ্যত্ব ছাড়তে, নারীদের লিবিডো ক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, সে দেশ প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। এমন অত্যাচারী পশুসম মানুষের প্রতিরোধ সময়েরই দাবি। কিন্তু কিছু মানুষ জন্মায়ই মনুষত্বহীন অবস্থায়। অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সু এই মানুষরূপী হায়েনার পরিচয় মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি পেয়েছে। জ্ঞাতিশত্রুর চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। রাজাকার- আলবদরের পাশাপাশি বিহারিদের অত্যাচারের নমুনা প্রচুর। *নিষিদ্ধ লোবানেও* তা বিরল নয়। মনুষ্যবিহীন জলেশ্বরীতে আলেক মোক্তারকে পেয়ে বিহারিরা উল্লসিত হয়। অন্ধ এ মানুষটিকে গরুর মতো বেঁধে, বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে হাঁটায়, লাথি মারে। 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়ার অপরাধে খোকাকে হত্যা করেও ওরা ক্ষান্ত হয়নি, মোক্তারের তলপেটে খোঁচা মেরেছে যেন সে তার মুখে প্রস্রাব করে। সড়কপথে মাইন বিস্ফোরণে তিন সেনাসদস্য নিহত হলে আলেককে হত্যা করে তারা। রাতে-দিনে বিহারীরা গ্রামে গ্রামে পাহারা দিয়েছে, লুট করেছে প্রত্যেক বাড়ি ও দোকান। মিলিটারি বাহিনীর ডান হাত হিসেবে কাজ করেছে রাজাকার ও বিহারি- এ তথ্যও সুস্পষ্ট *নিষিদ্ধ লোবানের* ক্যানভাসে।

এ উপন্যাসের কাহিনির সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় সফোক্লেস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৬-৪০৬) রচিত *আন্তিগোনে*-র। পারস্পরিক যুদ্ধে নিহত এক ভাইয়ের রাজকীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হয়। অপরজন পশু-পাখির খাদ্য হিসেবে পড়ে থাকে। আন্তিগোনে ভাইয়ের এ অমর্যাদা সহ্য করতে পারে না। রাজদণ্ডের ভয় উপেক্ষা করে সে ভাইয়ের লাশকে যথার্থ মর্যাদা দেয়। বিলকিসও তার ভাই খোকাকে দাফন করার প্রতিজ্ঞায় বাজারে যায় কিন্তু নৃশংসতাদৃষ্টে সিদ্ধান্ত নেয় প্রত্যেকটি লাশ দাফন করার। এতে লাশের কোন যায় না এলেও বাঙালি হিসেবে, মানুষ হিসেবে জীবনকে, প্রাণকে সম্মান জানানোর বোধকে গুরুত্ব দিয়েছে বিলকিস। শেষ রক্ষা না হলেও ভ্রাতৃহত্যা অর্থাৎ খোকা ও প্রদীপের হত্যার প্রতিশোধ নেয় সে পাকি মেজরকে পুড়িয়ে মারার মাধ্যমে। বিলকিস প্রমাণ করে বাঙালি দুর্বল নয়। শোক বাঙালিকে স্তব্ধ করে দেয়নি বরং নিরন্তর শক্তির বহমান উৎস তা। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস সৃষ্টি ও তাতে প্রতিরোধের চূড়ান্ত পথনির্দেশ প্রমাণ করে লেখক হিসেবে শামসুল হক কতটা দায়বদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডাংশ বর্ণিত হলেও *নিষিদ্ধ লোবান* মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রামাণ্য দলিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধকালের ইতিহাস, বাস্তবতা এবং ঘটনাপ্রবাহ এই ২টি উপন্যাসে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপটকেই বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছে। এই ২টি উপন্যাসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালীন বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পাকিস্তানিদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। হিন্দুদের পাশাপাশি অবস্থান ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল এ প্রোপাগাণ্ডার সহায়ক প্রভাবক। যৌক্তিকতা বা যাচাইকরণ ছাড়া পাকিস্তানিরা তা মেনেও নিয়েছিল।

অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘ সাড়ে ২৩ বছরের শোষণে সমৃদ্ধি ঘটেছে পশ্চিম পাকিস্তানের। পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলাম রক্ষার তাগিদের বাহানায় পূর্ব বাংলাকে শক্তহাতে শায়েস্তা করার পরিকল্পনায় নির্যাতন ও হত্যার স্টিম রোলার চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। কিন্তু অস্ত্রের মুখে বাঙালিদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ ও লুঠ করার দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করে বিশ্বের সামনে ত্রাতা হিসেবে নিজেদের উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে তারা।

হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সাধারণ বাস্তবতা। নারী নির্যাতন ও বাঙালি নিধনের এই লক্ষ্য ২টি উপন্যাসেই যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায় একই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব রিরংসাবৃত্তির পেছনে কাজ করেছে বলে উপন্যাসে তার উপস্থাপনও এক। হিন্দু, কমিউনিস্ট, আওয়ামী লীগার ছিল তাদের প্রধান শত্রু। *হাঙর নদী গ্রেনেড* ও *নিষিদ্ধ লোবান*-এ সত্য উন্মুক্ত। শিশু হত্যায় তাদের নৃশংসতা বর্বরতার নামান্তর— এ বিষয়টিও প্রতিফলিত উপন্যাসে। যুবকদের হত্যা, তাদের রক্ত নিঃশেষ করে মেরে ফেলা এগুলোও আলোচনার সাধারণ প্রসঙ্গ।

২৫শে মার্চের পর থেকে সাধারণ জীবনযাত্রা সমগ্র দেশে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। অফিস-আদালত বন্ধ। বেতন নেই। এক অদ্ভূত বৈকল্যের দিনগুলো বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। সলীমের মতো সক্ষম ছেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় অভাব হা মেলে এসেছে বুড়ির সংসারে।

ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে বাঙালির নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চিত্র ২টি উপন্যাসেই প্রতিফলিত। কিন্তু গোটা দেশের কোন জায়গাতেই নিরাপত্তা মেলেনি। ঘর বা দেশ ত্যাগ করার সময় বাঙালি তার পার্থিব সব সম্পত্তি ফেলে সঙ্গে নিয়েছে একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু।

শঙ্কিত বাঙালির একমাত্র আনন্দ ও আশ্বাসের উৎস ছিল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধের ২টি উপন্যাসেই মুক্তিযুদ্ধের খবর, দেশের অবস্থা, বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরের উৎস ছিল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার, যুদ্ধকালীন নানান খবর পুরো দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল

বেতারের। কবিতা, গান, খবরের পাশাপাশি 'চরমপত্র'ও উদ্দীপ্ত করেছে বাঙালি জনতাকে। বাঙালির রক্তে অনুরণন তুলত এ অনুষ্ঠানটি:

> যুদ্ধের সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে জুগিয়েছিল অদম্য সাহস, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল অপরিসীম মনোবল আর দখলীকৃত এলাকার কোটি কোটি মানব সন্তানের জন্য এই অনুষ্ঠান ছিল আলোকবর্তিকা।[১৮]

বাঙালির এই মুক্তির যুদ্ধে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল বিহারীরা। ২৫শে মার্চের পর তাদের সুস্পষ্ট অবস্থান ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর দিকে। বাঙালি হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নির্যাতনে তারা পাকিস্তানের সক্রিয় সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। বিহারিদের দ্বারা নির্যাতন ও হত্যার বিবরণ রয়েছে *নিষিদ্ধ লোবানেও*।

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গও উত্থিত হয়েছে বারবার। ২টি উপন্যাসেই মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান, ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫শে মার্চ রাতে তাঁর গ্রেপ্তার প্রসঙ্গ ইত্যাদি অনুষঙ্গ আলোচিত হয়েছে বাস্তবসম্মতভাবেই। জাতির মুক্তি-উৎসের কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গবন্ধু। বাঙালির ভালোবাসায় তিনি ধারণ করেছেন বটবৃক্ষের বিশালতা। সারা বাংলায় ছড়িয়ে ছিল তাঁরই প্রণোদনার অদৃশ্য অথচ সরব উপস্থিতি। বঙ্গবন্ধু নিজেও জানতেন তাঁকে ঘিরে চলতে থাকা জাতির ভালোবাসা ও ভরসার প্রবহমানতা:

> আমি এখান থেকে চলে গেলে ইয়াহিয়া ও তার সঙ্গীরা নানা রকমের কুৎসা রটাবে ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। না, না আমাকে এখানে থাকতেই হবে। আমাকে হত্যা করলে জাতির মনোবল নষ্ট হবে না এবং এর ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য আরো শক্তিশালীভাবে গড়ে উঠবে।[১৯]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে কতটা বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। আলোচিত ২জন ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী, ফলে তাদের অভিজ্ঞতা-পরিশ্রুত হয়ে উপন্যাস ২টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্বরচিত্র। প্রথমদিকের অতর্কিত হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যা-ধর্ষণের শিকার বাঙালির দেশচেতনায় আত্মোপলব্ধি ঘটেছে এবং পরবর্তী সময়ে সর্বশক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধে। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত উপন্যাসদ্বয়ে স্বাধীনতার আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে তীব্রভাবে। দুজন লেখকই উপন্যাস শেষে স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীনতার। তারা প্রত্যেকেই এই অভীপ্সা মনে রেখেছেন, স্বাধীনতা-সূর্যের আগমন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অনাগত উত্তরপ্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের এ উপন্যাসগুলো এক একটি প্রামাণ্য দলিল। জাতির আবেগ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাঙালির জনযুদ্ধ, মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম, রাজাকার-আল বদরদের বিশ্বাসঘাতকতা, পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা-নির্যাতন-ধর্ষণ-লুণ্ঠনতা অবশেষে স্বাধীনতার আগমনের দীপ্ত প্রত্যয় ধারণকারী এই মহৎ উপন্যাসগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নির্ভরযোগ্য কথামালা।

তথ্যনির্দেশ

১ সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড* (৫ম মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭), পৃ. ৫৩

২ *তদেব*, পৃ. ৫৪

৩ *তদেব*, পৃ. ৬২

৪ *তদেব*, পৃ. ৬৩

৫ *তদেব*, পৃ. ৬৩

[৬] *তদেব*, পৃ. ৬৪

[৭] *তদেব*, পৃ. ১০৯

[৮] *তদেব*, পৃ. ৬৯

[৯] *তদেব*, পৃ. ৭৩

[১০] তদেব, পৃ. ১০৪

[১১] সৈয়দ শামসুল হক, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (২য় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৩০৬

[১২] *তদেব*, পৃ.২৮৯

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৩১১

[১৪] *তদেব*, পৃ.৩১৯-৩২০

[১৫] *তদেব*, পৃ. ৩২৮

[১৬] *তদেব*, পৃ. ৩৩৩

[১৭] *তদেব*, পৃ. ৩২২

[১৮] এম আর আখতার মুকুল, "আমার কথা", *চরমপত্র* (৪র্থ মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ২৮

[১৯] আসাদ চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (৪র্থ পুনমুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১), পৃ. ২৯

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম *সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402*

ঠাকুরমা'র ঝুলিতে নারীর প্রতিকৃতি

মাহমুদা আকতার*

Abstract: *Thakurmar Jhuli* is the Bengali folktales of Bengali folk literature which is highly popular, well established and most often read by the readers. In nineteenth century, Dakshinaranjan Mitra-Majumder first collected those folk-stories by his personal initiation. The story-tellers were women. Therefore, most of the stories reflect the thinking, belief, struggle, revolution, displeasure-disappointment, pain-sorrows, desire-recognition and experiences of women. Both appreciation and condemnation of women have been noticed in those tales. The theme of the most stories is, women should be mentally candid and elegant along with their physical beauty. Otherwise they would be treated as beast. Again, it has been frequently noticed in the stories that women have to bear punishment throughout their life or accept death sentence due to their devil incidence. On the other hand, trustworthy females are rescued by the princes subsequent to sorrows or a miserable life but afterwards, they lead a cheerful life being a Queen. Finally, *Thakurmar Jhuli,* reveals the two contradictory personality of women. Considering the above fact, this study has been conducted to explore the dimensions of the female characters on the basis of *Thakurmar Jhuli*.

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ঐতিহ্যবাহী লোকসাহিত্যের প্রাচীন ধারা লোককথা। লোককথায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে। লোককথার ঘটনা-চরিত্র-স্থান-কাল পরিবেষ্টিত থাকে অলৌকিক, কাল্পনিক, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, রাক্ষস-খোক্কস, জিন-পরী, পশু-পাখি, কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা আর নিপীড়নের চিত্র দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি। যদিও লোককথায় মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, শক্তি দিয়ে পরাজিত করে দেও-দৈত্য, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কসকে। এখানে পশুপাখি কথা বলে ওঠে, কল্পনার জগৎ প্রসারিত করে অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে পাঠকও অনাবিল আনন্দে ভেসে ওঠে। একটি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতিফলন লোককথা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'লোককথার গভীর তলে একেকটি জাতি পেয়ে যায় তাদের আত্ম-আবিষ্কারের ভূমিতল।'[১] দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৬) *ঠাকুরমা'র ঝুলি* (১৯০৭) এর ব্যতিক্রম নয়। ইউরোপে যেমন গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের 'Fairy tales', বাংলায় তেমনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের *ঠাকুরমা'র ঝুলি*। বাঙালির শাশ্বত, চিরায়ত জীবনের গল্প-সমাহার *ঠাকুরমা'র ঝুলি*।

ক. সংজ্ঞা ও পরিধি

ইংরেজি 'Folktale' শব্দটির প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'লোককথা', 'লোককাহিনি', 'কথকতা' ইত্যাদিতে অভিহিত করেছেন ফোকলোরবিদগণ। লোককথা মৌখিক সাহিত্য। সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে তা প্রচলিত হয়ে আসছে। কৃষিজীবী মানুষ অবসরে এক অন্যের সঙ্গে যখন গল্পে মেতে ওঠে; তখন কথাচ্ছলে নিজেদের সুখ-দুঃখ, নিপীড়ন-বঞ্চনা, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নানা রঙে-বর্ণে, লৌকিক-অলৌকিতার আবরণে বর্ণনা করে থাকে। এসব গল্পে কাহিনি হয়ত বাস্তব; তবে চরিত্রের নামকরণে থাকে কল্পনার ছাপ। অনাদিকাল থেকেই মুখে মুখে প্রচলিত এসব কাহিনি বা কথা বংশপরম্পরায় লোক সমাজে স্থান করে নেয় স্থায়ীভাবে। সময়ের বিবর্তনে এসব লোককথার অবয়বে ঘটনায় কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন হয়ে যুগোপযোগী হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন The critic Donald

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Haase, 'For some, the term denotes a speceific narrative form easily identified characteristics but for others it suggests not a singular genre but an umbrella category under which a variety of other forms may be grouped.'[২] লোককথার স্বাতন্ত্র্য এর ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও রসের অপূর্ব সমাহারে।

লোককথাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন লোকবিজ্ঞানীগণ। তার মধ্যে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডক্টর মযহারুল ইসলাম এর সংজ্ঞা থেকে লোককথার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় :

১. গদ্য ও পদ্য উভয়বিদ রচনার ভিতর দিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পদ্যের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ করা হয়, তাহা 'গীতিকা' ও 'এপিক' নামে পরিচিত; গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয়, ইংরেজীতে তাহাকেই সাধারণভাবে folktale বলা হয়।[৩] (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)

আবার

২. যে-লোক সাহিত্যের মধ্যে কাহিনী আছে, যা মুখ্যত বর্ণনাত্মক যার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি বিদ্যমান, আকাশ, মাটি, চন্দ্রসূর্য, স্বর্গনরক, জলস্থল, মহাশূন্য, পাতাল এক সহজ নৈকট্যে আবদ্ধ, দুস্তর ও সুদূরের ব্যবধান যেখানে সহজেই অতিক্রমনীয়, যে-কাহিনীতে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ভাষার বোধগম্যতা যেখানে কোন সমস্যা নয়, যাদু শক্তির প্রভাব, দৈত্য দানবের কার্যকলাপ, খলচরিত্রের প্রয়াস, নায়কচরিত্রের উত্থান পতন, নায়কের সাহায্যকারী শক্তির ভূমিকা ইত্যাদি উপস্থিত থাকে, সেগুলোই লোককাহিনী।[৪] (ড. মাযহারুল ইসলাম)

এ দুটো সংজ্ঞার আলোকে লোককথার বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায়:

ক. লোককথা কাহিনি নির্ভর;

খ. লোককথা বর্ণনাধর্মী;

গ. লোককথা লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনির সমাহার;

ঘ. লোককথায় মানুষ ও জীব-জন্তু ও পশু-পাখির মধ্যে প্রভেদ নেই বললেই চলে;

ঙ. লোককথার ভাষা সাবলীল ও সহজবোধ্য;

চ. যাদুটোনা, দৈত্য-দানব ও অলৌকিক শক্তির ব্যবহার অনিবার্য;

ছ. লোককথায় খল চরিত্রের উপস্থিতি ও কাহিনি শেষে পতন অনিবার্য;

জ. নায়ক চরিত্রের উত্থান ও পতন দুটোই থাকে;

ঝ. নায়ককে সাহায্যকারী বন্ধু কিংবা পশু-পাখির উপস্থিতি;

ঞ. লোককথা বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত;

ট. গদ্য নির্ভর; জনশ্রুতিমূলক ঐতিহ্যবাহী কাহিনি বর্ণিত লোককথায়;

ঠ. লোককথার শেষ পরিণতি মিলনাত্মক ইত্যাদি।

বিষয় ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী লোককথাকে উপকথা, রূপকথা, ব্রতকথা, পুরাণকথা, নীতিকথা, ব্যঙ্গকথা ইত্যাদিতে বিন্যস্ত করেছেন লোকবিজ্ঞানীগণ। *ঠাকুরমা'র ঝুলির* গল্পগুলো বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণের দিক থেকে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণির অন্তর্গত।

ঠাকুরমা'র ঝুলি বাংলা লোকসাহিত্য তথা শিশুসাহিত্যের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, পঠিত, স্বীকৃত লোককথা বা লোককাহিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাহিনিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে সে সময়ের মানুষের জীবনধারা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, নিত্যদিনের জীবনযাপন, দুঃখকষ্টসহ নানা বিষয়। তৎকালীন মানুষের সরল জীবনযাপন, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার ছাপ; বিশেষ করে বাঙালি জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য এতে পরিস্ফুট। তাইতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন :

> *ঠাকুরমা'র ঝুলি*টির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে'। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মাটিনে'র এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল- রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায়- সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক![৫]

ঠাকুরমা'র ঝুলি'র গল্পগুলো 'দুধের সাগর', 'রূপ-তরাসী', 'চ্যাং-ব্যাং' ও 'আম-সন্দেশ' এই চারটি পর্বে সজ্জিত। বিষয় অনুযায়ী গল্পগুলো আমরা নিম্নোক্তভাবে সাজাতে পারি:

- দুঃসাহসিক গল্প- কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্তপরী, কাঞ্চনমালা, সাত ভাই চম্পা, শীতবসন্ত, কিরণমালা।
- ভূত-প্রেত সম্পর্কীয় গল্প- নীলকমল আর লালকমল, ডালিমকুমার, পাতালকন্যা মণিমালা
- পশু-পাখি সম্পর্কীয় গল্প- শিয়ালপণ্ডিত
- হাস্যরসাত্মক গল্প- সুখু আর দুখু, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, দেড় আঙ্গুলে

গল্পগুলোতে বাঙলির ঐতিহ্যগত 'সমাজ জীবন, মানব চরিত্র, সুক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির সমাবেশ'[৬] লক্ষ্যণীয়।

খ. সমকালীন সমাজবাস্তবতা

ঠাকুরমা'র ঝুলির কথক নারী। তাই অনিবার্যভাবেই গল্পগুলোতে নারীর ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, ক্ষোভ-হতাশা-সংগ্রাম, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, 'কোনো গল্প বা উপন্যাস কেবল একটি কাহিনীই বলে না, কোনো না কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা যুগের চিত্র তথা মানসিকতাও প্রতিফলিত করে।'[৭]

এ বিষয়টি আরো বোধগম্য হয় আশরাফ সিদ্দিকীর উদ্ধৃত একটি উক্তিতে :

> The arrangement of the texts of the stories, in collection of tales, according to story-tellers, has given exceptionally valuable sources for the formulation and solution of the question of the reflection of the creative personality of the story-teller in his tales.[৮]

*ঠাকুরমা'র ঝুলি*ও নারীর সেই সব ভাবনারই প্রতিচ্ছবি। গল্পগুলোতে সমকালীন সমাজমানস প্রতিফলিত; বিশেষ করে নারীর অভিজ্ঞতায় নারীর অবস্থান। *ঠাকুরমা'র ঝুলির* গল্পগুলো কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে আবদ্ধ নয়। এগুলো যুগে যুগে কালে কালে বংশপরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসা গল্পকথা। তবে রূপকথার-উপকথার উপকরণ-উপাদান, গল্পের চরিত্রদের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে গবেষকগণের ধারণা যে, এগুলো অতি প্রাচীন। রাক্ষসীদের মানবশিশু ভক্ষণ, শিকারযাত্রা আদিম সমাজের নরখাদক মানুষদেরই অস্তিত্ব জানান দেয়। আবার রূপকথা-উপকথার রাজা-রানিদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড দেখে লোকগবেষক

আতোয়ার রহমান *ঠাকুরমার ঝুলি*কে নিতান্তই আদি যুগের, যখন রাজতন্ত্রের শৈশবকাল চলছিল বলে মন্তব্য করেন। তার মতে:

> রূপে ঘর-আলো করা, গুণে অতুলনীয়া রাজকন্যা রাণী হয়ে এসে রাজপুরী জুড়ে বসেন, সোনার ঘাটে মাথা, রূপোর খাটে পা রেখে সুখে নিদ্রা দেন। কিন্তু আপন হাতে পঞ্চ ব্যাঞ্জন রাঁধতেও তাঁর বাধে না। তা হোক না সেই পঞ্চ ব্যাঞ্জন প্রজার ঘরের ব্যাঞ্জনের তুলনায় দামী। এমন রাজা-রাণী সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের কর্তা-গিন্নীর থেকে এমন কিছু দূরের মানুষ নন। যদি বলি, তাঁরা ছিলেন সেই যুগের মানুষ, যা সভ্যতার নিতান্তই আদি যুগ, যখন রাজতন্ত্রের শৈশবকাল চলছে, রাজা-প্রজোয় প্রভেদটা সাত সমুদ্র তেরো নদীর মতো দুস্তর হয়ে ওঠেনি, তাঁরা নিশ্চয়ই রূপকথালোকের দেয়াল ভেঙ্গে এসে আমার শূলদন্ডের বিধান দেবেন না।[৯]

ড. দীনেশচন্দ্র সেন *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে বাংলাদেশের রূপকথা-উপকথার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে এগুলোর জন্ম বাংলার বণিক যুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ-চতুদর্শ শতকের দিকে বলে দাবি করেছেন। বাংলার লোককথাগুলোর সময়কাল নিয়ে ড. আশরাফ সিদ্দিকী *লোকসাহিত্য* গ্রন্থে একে প্রাচীন আদিম সমাজের বলে উল্লেখ করেছেন। *ঠাকুমা'র ঝুলি*র নির্দিষ্ট সময়কাল জানা না গেলেও এটা ঠিক যে এগুলো অতি প্রাচীন। এবং এর কথক বাংলার প্রাচীন সমাজের মা-দিদি-দিদিমা; যাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র এতে উদ্ভাসিত। তৎকালীন সমাজ বিশ্লেষণে স্বীকৃত, নারী ছিল পরাধীন। চিরকালই অবহেলিত। প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে বাধ্য করা হয়েছে পুরুষের বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকারে। অথচ ভারতীয় সমাজে বৈদিককালে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল সম্মানজনক। তখন নারী ছিল পবিত্র, স্বামীর দ্বারা সম্মানিত এবং স্বাধীনতাভোগকারিণী। যে নিজের জীবনসঙ্গি বেছে নেওয়ার অধিকারও লাভ করত। কিন্তু সময়ান্তরে তৎকালীন সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার জালে বন্দি হতে থাকে নারী। কন্যা রূপে পিতার, জায়া রূপে স্বামীর এবং মাতারূপে পুত্রের অধীনতা স্বীকার করতে হত নারীকে। এর মূল কারণ, নারী ছিল পরনির্ভরশীল ও পরান্নজীবী। ফলে কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না তাদের। বাবা-মার সম্পত্তিতেও ছিল না তাদের অধিকার। জীবন নির্বাহের জন্য ছিল না কোন উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও সুযোগ। কেননা নারীর বিদ্যার্জনের চেয়ে গৃহকর্মে দক্ষতাকে মূল্যায়ন করা হত তৎকালীন সমাজে। ফলে স্বামীর হুকুমপালন, পদে পদে স্বামী ও তার পরিবার দ্বারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ ছিল নিয়মিত ব্যাপার। যার কারণে নারী হয়ে ওঠে নিষ্ক্রিয়, আজ্ঞাবাহী ও পতিব্রতা। মূল্যায়িত হতে থাকে সৌন্দর্যগুণে, জন্মদানে সক্ষমতা ও গৃহকর্মে দক্ষতা গুণে। এর মধ্যে জন্মদানে সক্ষমতা নারীর অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করত। তা না হলে স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে পথের ফকিরে পরিণত হতে হত। এছাড়া সতিনবিদ্বেষ, ঈর্ষা, কলহ, ষড়যন্ত্রের শিকারও হত নারী। বেশিরভাগক্ষেত্রে নারীর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াত নারী; পুরুষমাত্রই শাস্তিবিধানকর্তা। ফলে নারীর মননে মগজে তার এই দুরবস্থার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় আরেক নারী। নারীর এই দুর্ভোগ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সাথে সাথে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে কখনো নমনীয় কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে; কখনো নগ্নভাবে। প্রাচীনযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরুষের প্রতি নারীর অধীনতা, বশ্যতা যেন বিধির বিধান। বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন মনুসংহিতায়, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতেও নারীকে পুরুষের অধীন করার প্রয়াস দেখা যায়। যেমন মনুসংহিতায় নারীর পরাধীনতার চিত্র এসেছে এভাবে:

> বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
> ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষবপি।[১০]

অর্থাৎ নারী যুবতি, বালিকা কিংবা বৃদ্ধাই হোক, গৃহমধ্যে থেকে কোনো কাজ স্বামীর বিনা অনুমতিতে করতে পারবে না। এছাড়াও মনসংহিতায় নারী যে শুধু কামজসত্তা, সন্তান জন্মাদানের ক্ষেত্র এবং রূপে বিচার্য; এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন শ্লোক রচিত হয়েছে। এমন কি নারীর শরীরে কোথায় প্রহার করতে হবে

তারও নির্দেশ রয়েছে মনুসংহিতায়। আমাদের আলোচ্য *ঠাকুরমা'র ঝুলিতে* নারীর এই অবয়ব এসেছে প্রতিরূপকীয় তাৎপর্যে।

গ. নারীসত্তার শুভ-অশুভ রূপ

ঠাকুরমা'র ঝুলি-র অধিকাংশ গল্পই নারীপ্রধান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী যেমন– রানি, রাজকন্যা, ব্রাহ্মণী, মন্ত্রীর স্ত্রী, কৃষানি, দাসী, রাক্ষসী'র বিচরণ *ঠাকুরমা'র ঝুলিতে*। ক্ষমতার অপব্যবহার, যাদুর অপশক্তি প্রয়োগ, নিষ্ঠুরতা, কূট-কৌশল প্রয়োগ, বিভিন্ন অপকর্মকারী বড়রানি, সুয়োরানি, সৎমা, রাক্ষসীসহ সকল অশুভ/মন্দ চরিত্র যেমন নারী; তেমনি সরলা, পরমা সুন্দরী, গুণবতী, গৃহকর্মে নিপুণ, ধৈর্যশীল, দয়াবতী, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত আর নির্যাতন-নিগ্রহ সহ্যকারী ভাল/সৎ/শুভ চরিত্রও নারী। প্রায় সবগল্পেই মন্দ নারীচরিত্র ডাইনি, বা সৎমা তাদের কৃত অপকর্মের ফল হিসেবে শাস্তিভোগ করে অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়; আর শুভ/ভাল/সৎ চরিত্রের নারী অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সয়ে কোন রাজপুত্র কর্তৃক উদ্ধার লাভ করে রানি হয়ে রাজার সাথে সুখে বসবাস করতে থাকে। অর্থাৎ *ঠাকুরমা'র ঝুলিতে* পরস্পর বিরোধী মনোভঙ্গির নারীচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনঃ

অশুভ সত্তা/মন্দ/অসৎ নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ

ক. রূপসি কিন্তু সন্তানধারণে অক্ষম;

খ. প্রতিহিংসা ও কলহপরায়ণতা;

গ. কর্মবিমুখ ও অমনোযোগিতা;

ঘ. অশুভ শক্তির প্রয়োগকারী;

ঙ. অলৌকিক যাদুশক্তির অপপ্রয়োগ;

চ. কুটনি, ডাইনি অথবা রাক্ষসী এবং

ছ. উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

শুভ সত্তা/ভাল/সৎ নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ

ক. রূপসি তা সন্তান ধারণে সক্ষম;

খ. পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল;

গ. অশেষ নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার;

ঘ. সরল, সৎ ও দয়াবতী;

ঙ. গৃহকর্ম ও গৃহধর্ম পালনে কর্তব্যনিষ্ঠ;

চ. নির্ভরশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়;

ছ. গল্পের শুরুতে স্বামী দ্বারা বিতাড়িত;

জ. গল্পের শেষে পুত্র কিংবা পুত্রবধূ কর্তৃক উদ্ধার লাভ, নির্দোষ প্রমাণিত ও শেষে সুখে-শান্তিতে স্বামী-সন্তানসহ সংসার করতে পারা।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর নারীচরিত্র *ঠাকুরমা'র ঝুলিতে* লক্ষ্যণীয়। তবে ব্যতিক্রমধর্মী দু'একজন চরিত্র যেমন- "কিরণমালা" উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের বাইরে সাহসীকন্যা; যে শত বাধাবিপত্তি এড়িয়ে অরুণ-বরুণ দুভাইসহ শত শত রাজপুত্রের উদ্ধারকর্তা হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। যেমনঃ

> কিরণমালা সোনার ঝারি ঢালিয়া জল ছিটাইলেন, চারিদিকে পাহাড় মড়মড় করিয়া উঠিল, সকল পাথর টকটক করিয়া উঠিল,—যেখানে জলের ছিটা-ফোঁটা পড়ে, যত যুগের যত রাজপুত্র আসিয়া পাথর হইয়া ছিলেন, চক্ষের পলকে গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া বসেন।
>
> দেখিতে দেখিতে সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হইয়া গেল। রাজপুত্রেরা জোড়হাতে করিয়া কিরণমালাকে প্রণাম করিল,
>
> "সাত যুগের ধন্য বীর!"[১১]

আবার, "কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা" গল্পেও স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কাঞ্চনমালা স্বামীর অসুস্থতায় রাজ্য চালাতে সক্ষম হয়; যেটি পুরো *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পে বিরল। দৃষ্টান্ত:

> সুচরাজার রাজসংসার অচল হইল,—সুচরাজা মনের দুঃখে মাথা নামাইয়া বসিয়া থাকেন; রাণী কাঞ্চনমালা দুঃখে কষ্টে কোনোরকমে রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।[১২]

*ঠাকুরমা'র ঝুলি*তে দু'ধরনের নারীচরিত্র স্পষ্ট– নিষ্ক্রিয় (Passive) ও সক্রিয় (Active)। আমরা শুভসত্তা ও অশুভসত্তা হিসেবেও একে চিহ্নিত করতে পারি। নিষ্ক্রিয় বা শুভসত্তার নারী অপরূপ রূপের অধিকারিণী ও রাজকন্যা। রূপহীন, কুৎসিত রমণীরা সক্রিয় অশুভ গোত্রের অন্তর্গত। এরা হয় সৎমা, রাক্ষসী নয়তো ডাইনি। প্রসঙ্গত, সাধারণ কোনো নারীর বর্ণনা এসব গল্পে অনুপস্থিত। কেননা সাধারণ মেয়ের পক্ষে রাজপুত্রের ঘরণি হওয়া কার্যত অসম্ভব।

ঘ. নারীর শৈল্পিক রূপ

ঠাকুরমা'র ঝুলি গল্পে রসঘন পরিস্থিতি তৈরিতে মূল আধার নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা। এটি লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। প্রায় গল্পেই দেখা যায়, নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য রাজপুত্রদের মুগ্ধ করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এজন্য যোগ্যতা হিসেবে তাদের প্রধান অবলম্বন সৌন্দর্য; এরপরে দেখা হয় অন্তর্জীবনের মাধুর্য বা সৌন্দর্য। চিরায়ত বাঙালি রমণীর যা বৈশিষ্ট্য। *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পে শুভসত্তা/নিষ্ক্রিয় (Passive) নারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছাপ পরিলক্ষিত। শুভসত্তা/নিষ্ক্রিয় (Passive) নারীরা সুন্দরী সেই সাথে দয়াবতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সরলা, ধৈর্যশীল, পাশবিক নির্যাতন সহ্যকারিণী ও মানবিক গুণাবলির অধিকারিণী। এর ব্যতিক্রম হলেই নারীরা মানবী নয় রাক্ষসী কিংবা ডাইনিস্বভাবা; যা সক্রিয় নারীর বৈশিষ্ট্য। নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রাজপুত্র কিংবা তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছায় কখনও রাজকন্যার নিজের তাগিদে; কখনও শুক পাখির মুখ দিয়ে; কখনও বা ভ্রমণে গিয়ে রাজপুত্রের রাজকন্যাকে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হয়ে। "কলাবতী রাজকন্যা" গল্পে 'কুচ-বরণ' রাজকন্যাকে দেখা যায় নৌকায় করে রাজপুত্রদের রাজত্বে এসে নিজের রূপের বর্ণনা করতে এভাবে :

> কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ
> তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
> আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল-ডগর,
> সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।[১৩]

লক্ষ্যণীয় রাজকন্যারা সবসময় 'কুচবরণ' কেউই শ্যামলা বা কালো বর্ণের নয়। "ঘুমন্তপরী" গল্পে রাজকন্যার সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় রাজপুত্রের রাজকন্যাকে প্রথম দর্শনে:

> ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলানো রহিয়াছে; সেই মালার নিচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন। ঘুমন্ত রাজকন্যার হাত দেখা যায় না, পা দেখা যায় না, কেবল চাঁদের-কিরণ মুখখানি সোনার পদ্মের সোনার পাপড়ির মধ্যে টুলটুল করিতেছে।[১৪]

কিছু গল্পে মেয়ের রূপ দেখে বাবা-মা নাম রাখেন 'রূপবতী'। যেমন:

> রাজকন্যা রূপবতী নাম থুয়েছে মায়।
> গজমোতি হত শোভা ষোল-কলায়।[১৫]

কখনও বাবা নিজেই মেয়ের রূপের সাথে পরীর তুলনা করে বলেন, 'জোড়া পরীর মতো জোড়া রাজকন্যা।'[১৬] এহেন রূপের বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে রাজপুত্ররা রাজ্য ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন অপরূপা রাজকন্যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। জীবনবাজী রেখে মোকাবেলা করেন নানা প্রতিকূলতার। নারী হয়েও একজন মা বিবাহের অন্যতম শর্ত হিসেবে খোঁজেন সুন্দরী রাজকন্যা। এজন্য পুত্রদের বিপদসংকুল জায়গায় পাঠাতেও দ্বিধাবোধ করেন না। রাজকন্যারাও বিজিত রাজপুত্রদের হাতে সঁপে দেন নিজেদের। সুখে ঘরকন্নার মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ নারীর সৌন্দর্য গল্পের ক্লাইমেক্স (Climax) ও পরিণতির মূল চাবিকাঠি। দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও নিষ্ক্রিয় (Passive)/শুভসত্তার নারীদের অন্তর্জীবনের সৌন্দর্য (অহিংসা, দয়া, ধৈর্য, পরোপকার, সৎ, সরল, কর্মী) পরিলক্ষিত। এই গুণাবলী না থাকলে নারীকে মন্দ নারীর পরিণতি ভোগ করতে হয়। "সুখু আর দুখু" এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুখুর দৈহিক ও মানসিক উভয় গুণাবলীর কারণে সে ধন ও বর দুটোই লাভ করেছে। যেমন, 'ক্ষার খৈলটুকু মাখিয়া জলে নামিয়া দুখু ডুব দিল। ডুব দিতেই এক ডুবে দুখুর সৌন্দর্য উথলে পড়ে! –সে কী রূপ! -অত রূপ দেবকন্যারও নাই'![১৭]

অপরদিকে সুখু হিংসুক, নিষ্ঠুর অমানবিক, ঝগড়াটে, লোভী। তার ফলস্বরূপ:

> এক ডুবে সৌন্দর্য! এক ডুবে গহনা!- আঃ !!! –আর সুখুকে পায় কে? সুখু এদিকে চায়, সুখু ওদিকে চায়,
>
> "যত যত ডুব দিব, না জানি আরো কী পাব"!
>
> আঁই-আঁই-আঁই !!! '-তিন ডুব দিয়া উঠিয়া সুখু দেখে, -গা-ভরা আঁচিল, ঘা পাঁচড়া– এই নখ, শোণের গোছা চুল-কত কদর্য সুখুর কপালে!'[১৮]

অতএব, *ঠাকুরমা'র ঝুলি*তে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও মানসিক সৌকমার্য দুটোকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চিরায়ত বাঙালি সমাজ নারীকে এভাবেই দেখতে চায়। অন্যথায় নারী কুটিলা, মন্দস্বভাবা বলে আখ্যায়িত হয়। শুধু বাংলায় নয়; গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের *ফেয়ারি টেলের* "The pink flower", "Cinderella", "The Goose Girl at the Spring" গল্পগুলোতে নারীদের দৈহিক ও মানসিক সৌকমার্য গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "The pink flower" গল্পে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা এসেছে এভাবে, 'So beautiful that no painter could ever have made her look more beautiful.'[১৯]

ঙ. সন্তান জন্মদানের যান্ত্রিক রূপ

সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিবাহের পর সন্তান উৎপাদনই নারীর মুখ্য ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পে। ঘর-স্বামী-সন্তান এর মধ্যেই বিচরণ নারীর। এর ব্যত্যয় ঘটলে দুঃখ-দুর্দশা আর নিপীড়নের সীমা থাকে না একজন নারীর। সেই নিপীড়ন আসে স্বামীর কাছ থেকে, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে 'ন-রানী', 'ছোট রানী', 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে 'ছোটরানী', 'কিরণমালা' গল্পের 'রানী' তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সন্তান জন্ম না দিতে পারার দায় বর্তায় শুধু নারীর উপর। পুরুষের তাতে কোন দায় নেই। নারীও তা মেনে নেয় অবলীলায়, কেননা এমন সামাজিক চর্চায় তার বেড়ে ওঠা। আর নারীর এই হীনমন্যতার প্রতিফল একজন রাজার ছয় সাতটা রানি। এজন্যই প্রায় অধিকাংশ গল্পই শুরু হয়– 'এক যে,

রাজা। রাজার সাত রানী।-বড়রানী, মেজরানী, সেজরানী, ন-রানী, কনেরানী, দুয়োরানী, আর ছোটরানী।'[২০] কিংবা, দুই রাজার দুই রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী।[২১] ফলে সন্তান উৎপাদনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নিজেদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও প্রতিহিংসা। এই প্রতিহিংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সন্তানহীন নারী নিষ্পাপ শিশুকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করে না। উদাহরণস্বরূপ, 'নিষ্ঠুর বড় রানীরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপিচুপি হাঁড়ি-সরা আনিয়া, ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশ গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল।'[২২]

কখনও 'বড়রানীদের' চক্রান্তে সাতপুত্র-এক কন্যা জন্মদানকারী 'ছোটরানী' 'ব্যাঙের ছানা ইঁদুরের ছানা' কিংবা বোনেদের চক্রান্তে দুই ছেলে আর এক মেয়ে জন্মদানকারী ছোটবোন 'কুকুর ছানা, বিড়াল-ছানা আর কাঠের পুতুল' জন্মদানের অপরাধে হতে হয় দাসী কিংবা নির্বাসিত। আর নির্বাসিত রানিরা কোন প্রকার অভিযোগ না করে সরল মনে নিয়তিকে মেনে পাশবিক কষ্ট সহ্য করে যান। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*র "কলাবতী রাজকন্যা" গল্পে বড় পাঁচ রানির 'ন-রানী' ও 'ছোটরানী'কে বঞ্চিত করে শিকড় খেয়ে ফেলা ও "শীত বসন্ত" গল্পের প্রথমদিকে সুয়োরানীর দুয়োরানীকে মাথায় বড়ি টিপে টিয়ে বানিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত তা প্রমাণ করে। নারীদের এসব চক্রান্তের মূল কারণ সন্তান বিশেষ করে পুত্র জন্মদানে অক্ষমতা। কেননা পুত্রসন্তান প্রসবের উপর তাদের মর্যাদা নির্ণীত হয়। এইরকম চক্রান্তের দৃষ্টান্ত *ঠাকুরমা'র ঝুলি*র অন্যান্য গল্পেও দৃশ্যমান।

চ. নারীর সহিষ্ণুরূপ

ঠাকুরমা'র ঝুলি গল্পে সৎমা ও রাক্ষসী চরিত্রের নারী ব্যতিত অন্যান্য নারীরা সরল, নিষ্ক্রিয় (Passive) বা শুভ সত্তা। অধিকাংশ গল্পেই নারী বিনয়ী, আত্মনিবেদিত ও আজ্ঞাবহ মেয়ে, স্ত্রী ও মা চরিত্রে আভাসিত। নিষ্ক্রিয় (Passive) চরিত্রের নারী মানেই শান্ত-শিষ্ট, সুন্দরী, অমানবিক কষ্টসহ্যকারিণী, গৃহকর্মে নিপুণা, বিবাহে আগ্রহী; তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিদ্যাজর্নের আগ্রহের কথাও জানা যায় না। "কলাবতী রাজকন্যা" গল্পে 'ন-রানী', 'ছোটরানী' একদিকে যেমন গৃহকর্মে সিদ্ধহস্ত তেমনি বানর ও পেঁচা জন্মদানের অপরাধে রাজবাড়ীর জৌলুস আর অঢেল সম্পদ হারিয়ে পথের ফকিরে পরিণত হয়েছে। "কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা" গল্পে চতুর দাসী কাঁকনমালার প্রতারণায় সরলা কাঞ্চনমালাকে দাসীতে পরিণত হয়ে গৃহের সকল কাজ করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ:

> কাঞ্চনমালা আঁস্তাকুড়ে বসিয়া মাছ কোটেন আর কাঁদেন,–
> হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসী,
> সেহ হইল রানী, আমি হইলাম বাঁদী।
> কী বা পাপে সোনার রাজার রাজ্য গেল ছার
> কী বা পাপে ভাঙ্গিল কপাল কাঞ্চনমালার?[২৩]

কাঞ্চনমালা রানি হলেও *ঠাকুরমা'র ঝুলি গল্পে* শুভসত্তার প্রতীক; তাই সে সরল। এবং নিয়তিকে দোষারোপ করে দাসী জীবনযাপনে নিষ্ক্রিয় (Passive) থাকছে। "কিরণমালা" গল্পে 'চাঁদের মতন বাড়ে, ফুলের মতন ফোটে'[২৪] পরমা সুন্দরি কিরণমালাও 'বাড়িতে কুটাটুকু পড়িতে দেয় না, কাজললতা গাইয়ের গায়ে মাছিটি বসিতে দেয় না।'[২৫] অর্থাৎ কিরণমালা সুন্দরী সেই সাথে গৃহকর্মে নিপুণা। নারীর গৃহকর্মে নিপুণতার বিষয়টি গল্পগুলোতে পুরুষের বিদ্যার্জনের সমতুল্য হিসেবে পাওয়া যায়। উদাহরণে বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য:

> অরুণ-বরুণ, ব্রাহ্মণের সকল বিদ্যা পড়িলেন; কিরণমালা ব্রাহ্মণের ঘরসংসার হাতে নিলেন।[২৬]

"সুখু আর দুখু" গল্পের দুখু ও তার মা নিষ্ক্রিয় (Passive)/শুভসত্তা। দুখু সকলগুণে গুণান্বিত। গৃহের সকল কাজে নিপুণা; সৎমায়ের নির্যাতন সহ্যকারিণী; পরোপকারী ও নির্লোভ। দুখুর প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে সে চাঁদের বুড়িমা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ শুভসত্তার প্রতিভূ না হলে তার সুখুর পরিণতি ভোগ করতে হত। উল্লেখ্য, গ্রীমস্ *ফেয়ারি টেলের* "In Snow White", ও "Cinderella" গল্পেও 'Snow white' ও 'Cinderella' শান্তশিষ্ট, সরলা, আত্মনিবেদিত ও আজ্ঞাবাহী। তাদের দেখা যায়, ঘরের সমস্ত কাজের সাথে সাথে সৎমা ও সৎবোনেদের নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যেতে। তাদের আজ্ঞাপালনে আত্মনিবেদিত থাকতে।

ছ. সন্তানবাৎসল্যে নারীসত্তা

শুভসত্তা সৎ/ভাল চরিত্রের নারী নিষ্ক্রিয় (Passive) হলেও এদের সন্তানবাৎসল্য লক্ষ্যণীয়। "কলাবতী রাজকন্যা" গল্পে 'বুদ্ধ' ও 'ভুতুমের' কলাবতী দেশের যাত্রার খবরে 'ন-রানী' ও 'ছোটরানী' সন্তানের মঙ্গল কামনায়, 'দুই জনে দুইখানা সুপারির ডোঙ্গায়, দুইকড়া কড়ি, ধান, দূর্বা আর আগা-গলুইয়ে পাছা-গলুইয়ে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া ভাসাইয়া দিলেন।'[২৭] আবার, বড় পাঁচ রাজপুত্র ফিরে এলেও যখন বুদ্ধু ও ভুতুম নিরুদ্দেশ তখন ও 'ভুতুমের মা', 'বুদ্ধুর মা', এতদিন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া মর-মর। শেষে দুইজনে নদীর জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন।'[২৮] সন্তানের জন্য তাদের এ আত্মত্যাগ চিরন্তন বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্য। 'সোনার কাটি রুপার কাটি' গল্পে স্বামীর হুকুম সত্ত্বেও রানি পুত্রবাৎসল্যে পুত্রের প্লেটে ভাতের বদলে ছাই না দিয়ে পরমান্ন সাজিয়ে থালার এককোণে ছাইয়ের গুড়া রেখেছিলেন। "ঘুমন্ত পুরী" গল্পেও পুত্র শোকে রানিকে আহার নিদ্রা ছেড়ে শয্যাশায়ী হতে দেখা যায়। "পাতাল কন্যা মণিমালা"তেও পেঁচোর মা নঞর্থক ব্যঞ্জনার নারীমূর্তি হলেও তাকে দেখি পুত্রকে রাজকন্যার সাথে বিয়ে করানোর উদ্দেশ্যে কূট-কৌশলে মণিমালাকে বন্দি করতে। নিষ্ক্রিয়/সৎ নারীর সন্তানবাৎসল্য শুধু নিজের সন্তান নয়, সতীনপুত্রদের প্রতি সমানাভাব। তাইতো "শীত বসন্ত", "ডালিমকুমার" গল্পে সতীনের চক্রান্তে নির্বাসিত নারীদের দেখা যায় গল্পের শেষে সতীনপুত্রকন্যাদের সাদরে গ্রহণ করে সুখি জীবনযাপন করতে। "সুখু আর দুখু" গল্পে দুখুর প্রাপ্ত ধন সুখুকেও ভাগ দিতে চায় দুখুর মা। নারীর এ সন্তানবাৎসল্য চিরায়ত বাঙালি নারীরই ধর্ম; আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ।

জ. নির্ভরশীল নারীসত্তা

ঠাকুরমা'র ঝুলি গল্পে নারীর নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি সম্মান ও গ্রহণযোগ্য আচরণ হিসেবে রেখায়িত। এখানে নিষ্ক্রিয় বলতে যেকোন অনুকূল পরিস্থিতিতে নারী নিজে মুক্তির উপায় না খুঁজে নিয়তিকে মেনে নিয়ে অপেক্ষারত কোন মুক্তিদাতা রাজপুত্রের জন্য। অর্থাৎ কোন পুরুষ বা রাজপুত্রই নারীর অনুকূল পরিস্থিতি উত্তরণের সিঁড়ি। "ঘুমন্ত পরী" গল্পে রাজকন্যা বছরের পর বছর ঘুমিয়ে কাটাত যদি না রাজপুত্র এসে তাকে উদ্ধার করত। "কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা" গল্পে কাঞ্চনমালাকে সুচ রাজার রাখাল বন্ধু কর্তৃক দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি লাভ ও সুখি জীবনযাপনে প্রবেশ করতে দেখা যায়। "শীত বসন্ত" গল্পে পুত্র কর্তৃক দুয়োরানীর উদ্ধার সম্ভব হয়েছে; 'সোনার কাটি রূপার কাটি' গল্পে রাজকন্যার বন্দিজীবন থেকে মুক্তি সম্ভব হয়েছে রাজপুত্রের সহায়তায়। গ্রীমস্ এর "The Sleeping beauty" ও "Cinderella", গল্পেও এ প্রবণতা প্রকটিত। 'Sleeping beauty' কে প্রিন্স চুমু না খেলে সে বছরের পর বছর ঘুমিয়েই থাকতো; অন্যদিকে 'Cinderella' কে দেখি প্রিন্স এর দ্বারা মানবেতর জীবন থেকে মুক্তি পেতে। সৎমা, সতিন ও রাক্ষসী চরিত্রের নারী ছাড়া অন্যদের সক্রিয়তা নেই বললেই চলে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম "সাত ভাই চম্পা" গল্পের পারুল ও "কিরণমালা" গল্পের কিরণমালা। যদিও মাকে উদ্ধারে পারুলের ভূমিকা সামান্যই। তবে

একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী কিরণমালা নিয়তিকে দোষারোপ না করে ভাইদের উদ্ধারে রাজপুত্রের পোশাকে বেরিয়ে পড়ে। যেমনঃ

> কিরণমালা কাঁদিল না, কাটিল না, চক্ষের জল মুছিল না; উঠিয়া কাজললতাকে খড় খৈল দিল, গাছগাছালির গোড়ায় জল দিল, দিয়া, রাজপুত্রের পোশাক পরিয়া, মাথে মুকুট তরোয়াল,– কাজললতার বাছুরকে, হরিণের ছানাকে চুমু খাইয়া চক্ষের পলক ফেলিয়া কিরণমালা মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইল।[২৯]

কিরণমালা একদিকে সুনিপুণ গৃহিণী, অন্যদিকে বীর যোদ্ধা। গোটা *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পে পুরুষ যেখানে নারীর উদ্ধারকর্তা সেখানে লক্ষ লক্ষ রাজপুত্রের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত, 'সাত যুগের ধন্য বীর'[৩০] কিরণমালা। এক্ষেত্রে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের "Hansel ও Gratel" গল্পের Gratel এর সাথে তুলনীয় কিরণমালা। Gratelও সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে হত্যা করেছিল ডাইনিদের।

শুভসত্তা/ভাল/সৎ বৈশিষ্ট্যের নারীচরিত্রের মধ্যে কিরণমালাই সক্রিয় নারী। এছাড়া আমরা এমন নারী চরিত্রের সন্ধান পাই যে তারা এতটাই নিষ্ক্রিয় ও আজ্ঞাবহ যে বিবাহ করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও রাখে না। যেমন "ঘুমন্ত পরী" গল্পে উদ্ধারকর্তা রাজপুত্রকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা উপহার পেতে দেখি, 'রাজা বললেন- আমার কি আছে, কি দিব?- এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম এই রাজত্ব তোমাকে দিলাম।'[৩১] কিংবা, 'রাজপুত্রকে যে ভালো করিতে পারিবে, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাকে দিব।'[৩২] অথবা 'রাজা নিয়ম করিয়াছেন, যে কোনো জোড়া রাজপুত্র খোক্কস মারিতে পারিবে, জোড়া পরীর মতো জোড়া রাজকন্যা আর তাঁহার রাজত্ব তাহারাই পাইবে।'[৩৩] রাজা রাজকন্যার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা না জানতে চেয়ে উপঢৌকন হিসেবে তাকে সঁপে দিচ্ছেন অচেনা-অজানা উদ্ধারকর্তা রাজপুত্রকে। এরকম উদাহরণ *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পে বিস্তর। তবে "শীত বসন্ত" গল্পে রাজকন্যাকে অল্প সময়ের জন্য হলেও স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতে দেখা যায়।

ঝ. নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষীসত্তা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎমা, সতীন ও রাক্ষসী চরিত্রে মন্দ নারী/অশুভসত্তার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উচ্চাকাঙ্ক্ষীরাও মন্দ নারী/অশুভসত্তা হিসেবে চিত্রিত ঠাকুরমার ঝুলিতে। এরা হয় কুৎসিত লোভী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির, হিংসুক এবং অন্য মানুষের জীবনে হুমকিস্বরূপ। অপরের ক্ষতিসাধনই এদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যেমন 'সৎমা' প্রায় সব গল্পেই নিষ্ঠুর, হিংসুক প্রকৃতির। নিচের কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট:

> ক) পাটকাটি তিন ছেলে নিয়া সুয়োরানী গুমরে গুমরে আগুনে পুড়িয়া ঘর করে। মন-ভরা জ্বালা, পেট-ভরা হিংসা,– আপনার ছেলেদের থালে পাঁচ পরমান্ন অষ্টরন্ধন, ঘিয়ে চপচপ পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া দেন; শীত-বসন্তের পাতে আলুন আতেল কড়কড়া ভাত সড়সড়া চাল শাকের উপর ছাইয়ের তাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান।[৩৪]
>
> খ) রাক্ষসী-রানীর মনে কাল, রাক্ষসী-রানীর জিভে লাল। রাক্ষসী কি তাহা দেখিতে পারে?– কবে সতিনের ছেলের কচি কচি হাড়-মাংসের ঝোল অম্বল রাঁধিয়া খাইবে;– তা পেটের দুষ্টু ছেলে সতিন-পুতের সাথ ছাড়ে না। রাগে রাক্ষসীর দাঁতে-দাঁতে কড়ুকড়ু পাঁচ পরাণ সর্‌সর্‌।[৩৫]
>
> (গ) রাক্ষসী বলিল,
>
> "যাও ওরে সুতাশঙ্খ, বাতাসে করি ভর,—
> যম-যমুনার রাজ্য-শেষে পাশাবতীর ঘর!

এই লিখন দিও নিয়া পাশাবতীর ঠাঁই,
সাত ছেলের তরে আমার সাত কন্যা চাই।
রিপু অরি যায়, সুতা, চিবিয়ে খাবে তারে,
সতিনের পুত যেন পাশা আনতে নারে।"[৩৬]

মূলত গল্পগুলোতে সতিন বিদ্বেষ থেকে সতিন পুত্রকন্যাদের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। বিদ্বেষে অন্ধ সৎমার মূল সক্রিয়তা সৎ ছেলে মেয়েদের অনিষ্ট সাধন করা। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের *ফেয়ারি টেলের* 'Snow white', 'Cinderlla', 'Gretel' কে দেখি সৎমাদের চক্ষুশূল হতে। *ঠাকুমা'র ঝুলির* সাথে *ফেয়ারি টেলের* এ প্রবণতা অভিন্ন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারীকেও দেখা যায় মন্দ বৈশিষ্ট্যের নারীচরিত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে। "কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা" গল্পে কাঁকনমালা প্রতারণা করে দাসী থেকে রানি হয়েছে। "পাতাল-কন্যা মণিমালা" গল্পে মণিমালার সরলতার সুযোগে তাকে বন্দি করেছে পেঁচোর মা। "কিরণমালা" গল্পে ছোটবোনের সুখে বড় দুইবোন 'হিংসায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে।'[৩৭] লোভ আর হিংসায় অন্ধ "নীলকমল আর লালকমল" গল্পের রাক্ষসী রানীকে দেখি আপন ছেলেকে খেয়ে ফেলতে। যেমন 'রানী দেখিল, পৃথিবী উল্টিয়াছে– পেটের ছেলে শত্রু হইয়াছে। রানী মনের আগুনে জ্ঞান-দিশা হারাইয়া আপনার ছেলেকে মুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খাইল!'[৩৮] প্রায় সব গল্পেই মন্দ বৈশিষ্ট্যের নারীচরিত্রের শিকার সরলস্বভাবা নারীরা। তাদের চক্রান্তেই কাহিনিতে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে ঘটনা এগোতে থাকে এবং কাহিনির সমাপ্তি ঘটে তাদের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা মৃত্যুতে।

ঞ. অন্যান্য

ঠাকুরমা'র ঝুলি গল্পে বেশ কিছু বৃদ্ধ নারী যেমন– তিন বুড়ি, ছোট কাঁথা সেলাইকারী বুড়ি, একশ বচ্ছুরে বুড়ি, রাক্ষস-খোক্কস রাজত্বের আয়ী-রাক্ষসী, পেঁচোর মা ইত্যাদি চরিত্রের সন্ধান পাই। দেখতে কুৎসিত হলেও এরা ক্ষমতাধর। এরা রাক্ষসী-প্রধান কিংবা ডাইনিস্বভাবের। তবে নাতি-নাতনির প্রতি তাদের স্নেহপ্রবণতা লক্ষণীয়। চাঁদের বুড়িমা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সে ক্ষমতাধর ও স্নেহপ্রবণ দুটোই। গ্রীমস্ এর ফেয়ারি টেলের তরুণীদেরও তুলনায় বৃদ্ধাদের কুৎসিত, কঠোর হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

ট. চরিত্র নির্মাণে দুর্বলতা

ঠাকুরমা'র ঝুলিতে শুভ/অশুভ সত্তা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে বোঝা যায় তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট। তবে পরস্পর বিরোধী জীবনদর্শনে অভ্যস্ত হলেও *ঠাকুরমা'র ঝুলিতে* নিম্নের কয়েকটি বিষয় উভয় নারীচরিত্রে লক্ষ্যণীয়:

ক) প্রতিবাদী চরিত্র নেই।

খ) রাজকার্যে নারী অংশগ্রহণ দেখা যায় না।

গ) দুঃসাহসিক কোন কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায় না।

ঘ) কন্যা সন্তানের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখা যায় না।

ঙ) দুজনই পুরুষের অধীন, বশ্যতা গ্রহণকারী ও নিয়ন্ত্রিত।

চ) নারীচরিত্রগুলোকে পরস্পরের প্রতি প্রশংসা, সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশের চিত্র অনুপস্থিত।

ছ) পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে এমন প্রতিচ্ছবি শুভ/অশুভ উভয় চরিত্রে অনুপস্থিত।

জ) ভাগ্য পরিবর্তনে নিজস্ব প্রচেষ্টার অভাব; সক্রিয়/অশুভসত্তার চরিত্রগুলোকে দেখা যায় নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেয়ে অন্যের ধ্বংস সাধনে বিভিন্ন অলৌকিক শক্তিমত্তা প্রকাশ করতে ইত্যাদি।

উপসংহার

মূলত *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পে 'প্রশংসনীয় ও নিন্দিত' দুই ধরণের নারীচরিত্র চিত্রিত হয়েছে। প্রায় গল্পেরই অন্তর্নিহিত ভাব-তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, দৈহিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে নারীকে মানসিক (দয়া, বিনয়, ধৈর্য, সরল, সৎ, পরোপকারী ইত্যাদি) সৌন্দর্যের অধিকারী হতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে নারী রাক্ষসী-ডাইনি। প্রায় গল্পেই নারীর দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, দুর্বিষহ জীবনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক নারী। অর্থাৎ নারীর প্রতিপক্ষ নারী। *ঠাকুরমা'র ঝুলি* বাংলা শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এর অন্য বয়সি পাঠক থাকলেও মূলত শিশুরাই এর মূল পাঠক। তাইতো আশা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৫-১৯৮৭) মন্তব্য করেন, 'মা-দিদিমা-দিদির মুখ হইতে শোনা এইসব কাহিনীই শৈশব হইতে চরিত্র-গঠনের ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিতেছে।[৩৯] তবে এ গল্পগুলো পাঠে শিশুর কল্পনার জগত বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে ন্যায়-অন্যায়বোধ, নীতিবোধের শিক্ষা পেলেও অবচেতন মনে নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে তারা বড় হতে থাকে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে গল্পগুলোর অবস্থান নিয়ে অনেকেই যৌক্তিক প্রশ্ন তোলেন। তাদের যুক্তি, নারী এখন শিক্ষিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, নারী যোদ্ধা-ব্যবসায়ী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর রয়েছে পদচারণা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে *ঠাকুরমা'র ঝুলি* গল্পগুলো নারী অবয়ব সম্পর্কে ভুল বার্তা দিচ্ছে কি? অনেকে নারী-পুরুষ বৈষম্যের দিকটিতে আলোকপাতও করেছেন। আসলে শিশুসাহিত্য হিসেবে মূল্যায়ন করতে গেলে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*র কল্পলোক অংশটুকু বাদ দিয়ে এর অন্তর্নিহিত বিষয়-ভাবনা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে নারীর চিরায়ত স্বভাবের পাশাপাশি বর্তমানে শিক্ষা, কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীর উত্তরণের, স্বনির্ভরশীলতার মতো ইতিবাচক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা। পশ্চিমাদেশের ফেয়ারি টেলসগুলোতে যা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সেখানে বড় বড় প্রডাকশন হাউজগুলো নারীর ইতিবাচক দিকগুলোতে আলো ফেলে *ফেয়ারি টেলের* গল্পগুলোর বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে প্রচার শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ ডিজনি *ফেয়ারি টেলস* ফিল্মের "The little Mermaid", "Beauty and the Beast" ও "Mulan" এর কথা বলা যায়। যেখানে নতুনভাবে নারীর ইতিবাচক দিক অন্তর্ভুক্ত করে চিত্রিত হয়েছে। তাই শিশুসাহিত্যের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*তে নারীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনের বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নারীচরিত্রের ঐতিহ্যগত, চিরায়ত মূল আবেদন বজায় রেখে বর্তমানে নারীর অবস্থান ও সমাজে তার স্থান, মর্যাদা ও অবদান সংযোজন হতে পারে। বাংলাদেশে এই ধরনের ধারা এখনো শুরু না হলেও শিশুসাহিত্যিক, মনোবিজ্ঞানী কিংবা মানবাধিকারকর্মীদের চেতনায় বিষয়টি নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে।

তথ্যনির্দেশঃ

১ রফিকউল্লাহ খান, *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ* (ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ৭৮

২ Donald Haase, *The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales,* Volume 3, 'Fairy Tale', (Westport, CT: Greenwood Press, 2008), p. 322-323

---

[৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: ৫ম সং., ২০০৪), পৃ. ৪০১

[৪] মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম পুর্নমুদ্রণ, ১৯৯৩), পৃ. ৩৩

[৫] বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পা., *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, শত বার্ষিক সং. (ঢাকা: অবসর প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮), পৃ. একুশ (এরপর থেকে শুধু গল্পের নাম ব্যবহৃত হবে)

[৬] বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোকসংস্কৃতির সাতকাহন* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্যভবন, ২০০৯), পৃ. ৯২

[৭] আতোয়ার রহমান, "রূপকথার দেশ পরিচয়", *লোকসাহিত্যের কথা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১

[৮] J.M. Sokolov, *Russian Folklore*, p. 403, উদ্ধৃত, আশরাফ সিদ্দিকী, "ভূমিকা", *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫), পৃ. ২১

[৯] আতোয়ার রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

[১০] চৈতালি দত্ত (সম্পা. ও ভাষান্তর), *মনুসংহিতা* (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ৪১৭।

[১১] কিরণমালা, পৃ. ৭১

[১২] কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা, পৃ. ৩০

[১৩] কলাবতী রাজকন্যা, পৃ. ৯

[১৪] ঘুমন্ত পরী, পৃ. ২৪

[১৫] শীত বসন্ত, পৃ. ৪৮

[১৬] নীলকমল আর লালকমল, পৃ. ৮১

[১৭] সুখু আর দুখু, পৃ. ১৩৫

[১৮] সুখু আর দুখু, পৃ. ১৩৭

[১৯] Jack Zipes (Translation and Introduction), *The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm* (New York : Bantam, 1992), p. 286

[২০] কলাবতী রাজকন্যা, পৃ. ৫

[২১] শীত বসন্ত, পৃ. ৪০

[২২] সাতভাই চম্পা, পৃ. ৩৭

[২৩] কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা, পৃ. ৩১

[২৪] কিরণমালা, পৃ. ৬১

[২৫] তদেব

[২৬] তদেব

[২৭] কলাবতী রাজকন্যা, পৃ. ১২

[২৮] কলাবতী রাজকন্যা, পৃ. ২০

[২৯] কিরণমালা, পৃ. ৬৯

[৩০] কিরণমালা, পৃ. ৭১

[৩১] ঘুমন্ত পরী, পৃ. ২৭

[৩২] পাতালকন্যা মণিমালা, পৃ. ১০৪

[৩৩] নীলকমল আর লালকমল, পৃ. ৮১

[৩৪] শীত বসন্ত, পৃ. ৪১

---

[৩৫] নীলকমল আর লালকমল, পৃ. ৭৭

[৩৬] ডালিমকুমার, পৃ. ৯৪

[৩৭] কিরণমালা, পৃ. ৫৯

[৩৮] নীলকমল আর লালকমল, পৃ. ৮০

[৩৯] আশা গঙ্গোবাধ্যায়, *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (কলকাতাঃ ডি, এম, লাইব্রেরী, ১৩৬৮), পৃ. ১৫

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

শহীদ কাদরীর কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা

ড. মো. সুজা উদ-দৌলা*

Abstract: Shahid Quadri (1942-2016) is one of those who have enriched poetry of Bangladesh in the ege of fifty. Though born in West Bengal, he starts living in Bangladesh after the partition in 1947. When he was only fourteen, one of his poems was published in Buddhadeb Bassues magazine 'Kabita'. Though he continued writing poems, he left his native land for London in 1978. Later he started living in America parmanently various experience in his life have influenced his decision to leave his country and his life in a foreign country. A total of five volumes of poetry has been published before and after his death. Though love, romance, and city life are some of his main themes, the representation of trials and tribulatoins of daily life in his poetry has got a dissonent dimention. Also his sense of alienation, loneliness and his consciousness of death have often become the subject matter in his poetry. Indeed the awarness of death and loneliness is one of his main concerns. How and how much this consciousness has been reflected in his poetry is discussed in this essay.

১.

বাংলাদেশের কবিতায় যাঁদের অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় শহীদ কাদরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'শহীদ কাদরী জন্মেছেন ১৯৪২ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতায়।'[১] ফলে তাঁর জীবনের শৈশবকাল কেটেছে কলকাতাতেই। '১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় আসেন।'[২] তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী ও প্রথিতযশা কবিদের একজন। বাংলাদেশের কবিতায় তিনি স্বতন্ত্র এক কাব্যবোধ নিয়ে আবির্ভূত হন। শহীদ কাদরী যে কোন বিষয় থেকে বিষয়ের গভীরে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারতেন— যা তাঁর কবিতার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'তাঁর কবিতা পাঠককে অভিনব এক ভিন্ন জগতের সন্ধান দেয়।'[৩] বাংলাদেশের কবিতায় নিরীক্ষাপ্রবণ কবি হিসেবে তিনি একটি মাইলফলক দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। শহীদ কাদরী পঞ্চাশের দশকের কবি। তবে বিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় পঞ্চাশের দশকে কবিতাচর্চা শুরু করলেও তাঁর প্রথম কবিতার বই পাঠকের হাতে পৌঁছে ষাটের দশকেরও শেষ দিকে। মূলত 'পঞ্চাশ-উত্তর কবিতায় আধুনিকতা ও নাগরিক জীবনবোধের সংযোগ ঘটিয়ে শহীদ কাদরীর আত্মপ্রকাশ।'[৪] দীর্ঘ সময় ধরে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, কিন্তু লিখেছেন মাত্র পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতার সংখ্যা দু'শোর মতো। জীবদ্দশায় কবির চারটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম কাব্য। তবে প্রকাশিত প্রতিটি কাব্যের মধ্যেই একটা দীর্ঘ বিরতি পরিলক্ষিত হয়। শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্য 'উত্তরাধিকার' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এরপর ১৯৭৪ সালে 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা', ১৯৭৮ সালে 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই' এবং দীর্ঘদিন পর ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'। কবির মৃত্যুর পর তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে 'গোধূলির গান' নামে সর্বশেষ কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ সালে। মাত্র পনের বছর বয়সে শহীদ কাদরী কবিতা লিখতে শুরু করলেও চুয়াত্তর বছরের জীবনে এত কম লেখা প্রকাশের পেছনে যে কারণটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে সেটি হলো পড়ার চেয়ে লেখাকে তিনি কখনোই বড় করে দেখেননি। একজন খাঁটি ও জাত কবির জায়গা থেকে যা কিছু কবিতার বিষয়ে পরিণত করেছেন তার সবটুকুই পাঠকের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। কবির লেখালেখির স্বল্পতা প্রসঙ্গে কবিপত্নীর সাক্ষ্য :

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ মানুষ তিনি। কবি শহীদ কাদরী, আমি যেটা বারবার দেখেছি, অনেক বেশি পড়াশুনার মধ্যে থাকতেন। লেখার চাইতেও পড়াটাকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। সব সময় নতুন কিছু আনার চেষ্টা করতেন। বলতেন, সবই তো লেখা হয়ে গেছে, নতুন কিছু করা বেশ কঠিন। এখন যদি নতুন কোন ফর্ম আনা যায়, তাহলে সেটা চেষ্টা করতে হবে। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন ; বলতেন, বিজ্ঞানে যদি নতুন কিছু আবিষ্কার করা হয়, তাহলে হয়তো আমরা তার সাথে নতুন কিছু পাব। এছাড়া নতুন বিষয়বস্তু আনা খুব কঠিন। চর্বিতচর্বণ করে লাভ নেই।[৫]

পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের কবিতার যারা কৃতী নির্মাতা তাঁদের মধ্যে শহীদ কাদরী ছিলেন অন্যতম। কোন কোন সমালোচক তাঁকে ষাটের দশকের কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন— ‘ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে শহীদ কাদরীই একমাত্র ব্যতিক্রম যাঁর কবিতা প্রথম স্বাতন্ত্র্যসূচক হয়ে উঠেছিল। ষাটের কবিতার নিঃসঙ্গ ও স্বাতন্ত্র্যসূচক ধারাটির তকমাও তাঁকে দিয়ে দেয়া যায়।’[৬] শহীদ কাদরী বাংলাদেশের কবিতার ধারায় এমন এক বিরলপ্রজ কবি যিনি জীবনের সুদীর্ঘ সময় ধরে ইচ্ছাকৃত বিদেশভূমিতে অবস্থান করেছেন। তিনি নিজেকে সব কিছু থেকে আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কাব্য-কবিতা তিনি পাঠকের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন তা তাঁকে কখনোই পাঠকের থেকে আড়াল হতে দেয়নি। বরং তাঁর এসব কাব্য-কবিতা বারবার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ; মনে করে দিয়েছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের কবিতার ভুবনে কবির কতো বেশি প্রয়োজন। নিজেকে তিনি যতই সবকিছু থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেছেন ততই কবি-প্রতিভাগুণে তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। ‘শহীদ কাদরী সর্বতোভাবে একজন খাঁটি কবি। শহীদ কাদরী এমন কবিদের দলে যারা অত্যন্ত কম লিখেন কিন্তু তাঁদের প্রতিটি রচনাই সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।’[৭] অল্প সংখ্যক কবিতা লিখেও শহীদ কাদরী দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের কবিতার ভুবনে রাজত্ব করেছেন। স্বেচ্ছায় পরবাস গ্রহণ এবং সীমিত লেখার পরও বাংলাদেশের কবিতায় এ কাজটি তাঁর একার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

শহীদ কাদরী আধুনিক জীবন চেতনায় সজাগ ছিলেন এবং একজন প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে জীবনকে খোলা চোখে দেখেছেন। আজীবন শহরে বসবাস করার ফলে শহর তথা নগরের মানুষ তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। তবে এই মানুষকে ঘিরে থাকা প্রেম, নিসর্গ, স্বাদেশিকতা, সমাজ-রাজনীতি, অর্থনীতি কোন কিছুই তাঁর চোখকে এড়িয়ে যায়নি। জীবনের বহুবিধ বিষয় যেমন কবিকে আনন্দিত-আন্দোলিত করেছে, তেমনি এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা শহীদ কাদরীর যাতনারও কারণ হয়ে উঠেছিল। কবির চেতনা জগতে এক ধরনের নৈঃসঙ্গ্যবোধের উদ্রেক করেছে, আবার কখনো কখনো তাঁকে মৃত্যুচেতনায় ভাবিত হতে দেখা যায়। মৃত্যুচেতনা ও নৈঃসঙ্গ্যবোধ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঐতিহ্যের অংশ। আধুনিক বাংলা কবিতায় এর প্রকাশ ও প্রসার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতার মধ্যে অসংখ্য জায়গায় মৃত্যুচেতনার প্রকাশ করেছেন। দ্বিধাহীন-নিঃসঙ্কোচে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে— ‘মরণরে, তুহু মম শ্যাম সমান।’[৮] শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে ঘিরে আরো বলেছেন– ‘মৃত্যু অজ্ঞাত মোর আজি তার তরে/ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।/ ... এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়/ মৃত্যুরে আমি ভালোবাসিব নিশ্চয়।’[৯] এরপর নজরুলের কবিতাতে নানাভাবে নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর ত্রিশের বাংলা কবিতায় এ লক্ষণ সবচেয়ে বেশি গাঢ়তা লাভ করেছে। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে ত্রিশের প্রায় প্রত্যেক কবিই তাঁদের কবিতার মধ্যে এ প্রসঙ্গকে বারবার নিয়ে এসেছেন। এমনকি কারো কারো কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা প্রসঙ্গ এত বেশি যে তাঁদেরকে নৈঃসঙ্গ্য চেতনার কবি হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কবিতায় শামসুর রাহমান, আবুল হাসানসহ অনেকের কবিতাতেই এই চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্যের খাতনামা লেখক ওমর খৈয়াম, জন মিল্টন, উইলিয়াম শেক্সপীয়র, এলিয়ট থেকে শুরু করে অনেকের লেখায় নৈরাশ্য-নৈঃসঙ্গ্য ও মৃত্যুচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। শহীদ কাদরী একই পথ অনুসরণ করে কবি হিসেবে সে ভাব-চেতনা আত্মস্থ করেছেন। ফলে তাঁর কবিতার বড় একটি অংশ জুড়ে নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

২.

শহীদ কাদরী লিখেছেন কম, কিন্তু কবিতার জন্য তাঁর আত্মনিবেদন প্রশংসাযোগ্য। কবির সংবেদনশীল অভিব্যক্তি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সামাজিক জীবনের ক্লেদ ও অবক্ষয় এবং একাকীত্বের যন্ত্রণা তাঁর কবিতার মধ্যে নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনার বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। 'তাঁর অধিকাংশ কবিতার উপজীব্য বিষয়সমূহে স্বদেশ-সংলগ্ন থেকেও যেন তিনি নিজেকে ভেবেছেন–'নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু, অনাত্মীয় এক/ আঁধার টানেলে যেন ভূতলবাসীর মতো।'[১০] পাশাপাশি দাঁনা বেঁধেছিল মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা। দীর্ঘ সময় বিদেশে অবস্থান করলে সেখানকার মানুষদের প্রতিও তাঁর আস্থার সংকট তৈরি হয়। ফলে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ নিয়ে তিনি বলেন—'কাউকে বিশ্বাস নেই আর বিরূপ বিদেশে।'[১১] কবিজীবনের একেবারে সূচনালগ্নেই শহীদ কাদরীর নৈঃসঙ্গ্য জীবনবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম কাব্যের প্রথম কবিতা "বৃষ্টি বৃষ্টি"র একেবারে শেষের স্তবকটি হতে পারে তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি এখানে নিঃসঙ্গ সদ্য নতুন নৌকার মতো নিজেকে কল্পনা করে একাকী পরিভ্রমণ করেন আপন পরিবৃত্তে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা :

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায় বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,
আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো?[১২]

শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যের প্রথম কবিতার মতো এ কাব্যের নাম কবিতা "উত্তরাধিকার"-এ তাঁর হতাশা, নৈঃসঙ্গ্য ও অসহায়ত্ব ধরা পড়ে। প্রতিদিনের জীবন ধারণের গ্লানি ও প্রতিকূল পরিবেশের কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিমনের পরিচর্যা অপেক্ষা জীবনযাপনের সংকটই বড় হয়ে উঠেছে। এখানে কবির কোন দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। সরল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন :

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরা থেকে নেমে–
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগ্‌রে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউটে আঁধারে।
... ...
–এইমতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
এবং আমাকে নিস্কপর্দক, নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
ক'রে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা!
আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো
বিপদ-সংকেত জ্বেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো।[১৩]

শহীদ কাদরী শহরের আলো হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ। কলকাতা ও ঢাকা দুটি শহরে তাঁর শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর চিন্তা ও কবিতার ভাষায় মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সুস্পষ্ট

ছাপ রয়েছে। জীবনভর তিনি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনির্মাণে তিনি ছিলেন অনেক বেশি উদার ও আন্তরিক। কিন্তু মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠা অনেক সম্পর্কই কখনো কখনো কবির আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। কবি যাদেরকে বিশ্বাস করেছেন সে সব মানুষের কেউ কেউ তাঁর বিশ্বাসের জায়গায় ফাটল ধরিয়েছেন। ফলে এক ধরনের অবিশ্বাস কবির মধ্যে দাঁনা বেঁধে ওঠে। প্রথম কাব্য প্রকাশের এক দশকের মধ্যে কবি স্বদেশ থেকে পাড়ি জমান বিদেশভূমিতে। দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করার ফলে বিদেশই একসময় কবির কাছে স্বদেশের মতো হয়ে ওঠে। এখানেও কবি অনেকের সঙ্গে মিশেছেন কিন্তু কেউই কবির আস্থার জায়গাটি সমুন্নত রাখতে পারেনি। ২০০৯ সালে প্রকাশিত 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' কাব্যে কবির এ আস্থাহীনতার কথা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় শহীদ কাদরীর হতাশাবোধ ও নৈঃসঙ্গ্যচেতনা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। বিদেশের মাটিতে অবস্থানরত কাতর কবির কণ্ঠধ্বনিতে ভেসে ওঠে:

হে মেঘ, হে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তুমিও ঠকাবে নাকি
হে নিরুদ্দেশগামী ?
কাউকে বিশ্বাস নেই আর এই বিরূপ বিদেশে।
তবু বলি : যদি পারো,
হে নন্দিত মেঘ তুমি নেমে এসো
ঘন ও নিবিড় হয়ে করুণা ধারায় নেমে এসো
শ্রাবণে শ্রাবণে তুমি, হে বন্ধু স্পন্দিত করে দাও
এই অফুরান পরবাস।[১৪]

অপরিমেয় ইচ্ছাশক্তি ও আকাঙ্ক্ষা শহীদ কাদরীকে জীবনের বিচিত্র পথে পরিচালিত করেছে। ফলে প্রতিনিয়ত তিনি নতুন মানুষের সংস্পর্শ পেয়েছেন—যা কবিকে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। কবি যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনিই তাঁর কষ্টের কারণ হয়েছেন। ঘুনেধরা সমাজব্যবস্থা কবির বিশ্বাসস্থলে সৃষ্টি করেছে ফাটল। ফলে নির্ভরতার শক্তি ও সাহস হারিয়ে অনেকটা নিরবলম্ব মানুষে পরিণত হয়েছিলেন কবি। নিরুদ্দেশগামী নিঃসঙ্গ মেঘের মতো সুদূর পরবাসেও কবিকে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এক ধরনের মানস-পীড়া নিয়ে মেঘকেও কবি বন্ধু হিসেবে কল্পনা করতে থাকেন। এ যেন কবির হতাশার স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ। কিন্তু কবি এই হতাশাকে লালন না করে বিছিয়ে দিতে চান বকুলতলায়। সেখানে 'সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে'[১৫]–এই আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে "নশ্বর জ্যোৎস্না" নামক কবিতায় শহীদ কাদরীর উক্তি :

জ্যোৎস্নায় বিব্রত বাগানের ফুলগুলি, অফুরন্ত
হাওয়ায় আশ্চর্য আবিষ্কার করে নিয়ে
চোখের বিষাদ আমি বদলে নি' আর হতাশারে
নিঃশব্দে বিছিয়ে রাখি বকুলতলায়
সেখানে একাকী রাত্রে, বারান্দার পাশে
সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে,
টলটল করবে কেবল এই নক্ষত্রের আলো-জ্বলা জল
অপ্সরার ওষ্ঠ থেকে খসে-পড়া চুম্বনের মতো
তৃষ্ণা নেভানোর প্রতিশ্রুতিতে সজল
এই আটপৌরে পুকুরেই
শামুক সাজাবে তার আজীবন প্রতীক্ষিত পাড়।[১৬]

নির্লিপ্ততা ও নিঃসঙ্গতা শহীদ কাদরীর জীবনের ও সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১৭] চারিদিকের মুক্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করেও শহীদ কাদরীকে এক ধরনের দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে। দীর্ঘদিনের পরবাসী জীবনে তিনি বারবার দেশের কথা স্মরণ করেছেন। দেশের সঙ্গে তাঁর আপাত দূরত্ব ঘটলেও স্বদেশ ও হৃদয়-ভূগোলের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, তা মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করেছেন। জনাকীর্ণ আমেরিকার অসংখ্য মানুষের ভিড়ে থেকেও নিজেকে কবি অন্ধকার এক ভূতলবাসী হিসেবে কল্পনা করেছেন :

সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় কেন তবে কষ্টশ্বাস ?
কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন
সদ্য উঠে -আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ ![১৮]

শহীদ কাদরী আড্ডাবাজ কবি হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি আড্ডার খোঁজে ঘুরেছেন– পথ থেকে পথে। কিন্তু মানুষের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা তাঁর আড্ডার পথকে সংকুচিত করে তুলেছে। ফলে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা বোধ করেছেন কবি। উত্থান-পতনে ভরা 'এক অন্তহীন নক্ষত্রবিহীন যাত্রা'[১৯]— কবির জীবনপথের যাত্রা। কবির একাকী নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর কাছে এক সময় ভারী হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের স্বেচ্ছা পরবাস শহীদ কাদরীকে করে তুলে ভারাক্রান্ত। জীবনের প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, ধর্ম-মতাদর্শ সবকিছু তাঁর কাছে স্বাভাবিকতা হারানোর মতো মনে হয়। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' নামক কাব্যে তাই তিনি লিখেছেন :

প্রেম থেকে অপ্রেমে
ধর্ম থেকে ধর্মান্ধতায়
প্রগতি থেকে প্রতিক্রিয়ার মধ্যযুগীয় আবর্তে
চুম্বন থেকে চুম্বনহীনতায়
জীবনের ওপারে কোন অন্তহীন কফিনে
এই যে নির্বাসন
আমার কাম্য নয় আর,
কোন নির্বাসনই কাম্য নয় আর।[২০]

নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত মানুষ কখনো জাগ্রত হয় মানবিক সম্ভাবনা ও দায়িত্বচেতনায়। নিঃসঙ্গতার সর্বগ্রাসী অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানুষ সংলগ্ন হতে চায় বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে।'[২১] শহীদ কাদরী এই বৃত্তের বাইরে নন। মানুষের কাছে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির টানাপোড়েন শহীদ কাদরীর চেতনালোকে বারবার ঘুরপাক খেয়েছে। ফলে হৃদয়ের বেদনাবোধ প্রতিবিম্বিত হয়েছে কবিতার মধ্যে দিয়ে। উন্নত দেশের উন্নত পরিবেশে বসবাস শুরু করেও তিনি জীবনের হতাশাবোধ ও নৈঃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি। ফলে স্বেচ্ছায় পরবাস কবির কাছে এক সময় হয়ে ওঠে নির্বাসনের মতো। তবে তিনি কেন দীর্ঘদিন যাবৎ নিঃসঙ্গ সময় অতিবাহিত করলেন; আর কেনইবা বিদেশে অবস্থান করলেন তারও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন "তাই এই দীর্ঘ পরবাস" নামক কবিতায় :

দু টুকরো রুটি কিংবা লাল মানবিক ভরা
এবং নক্ষত্রকুচির মতন কিছু লবনের কণা
দিগন্তের শান্ত দাওয়ায় আমাকে চাওনি তুমি দিতে–
তাই এই দীর্ঘ পরবাস।

জীবনকে শ্বাপদসংকুল করে তুলেছো
এবং আমার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর
তোমাদের তাক-করা বন্দুকের নল।
ঝোপে ঝাড়ে সরীসৃপের মতন বুকে
নিরাপদ নিভৃত কুঠির খুঁজতে হয়েছে আমাকে–
তাই এই দীর্ঘ পরবাস।[২২]

তবে দীর্ঘদিন পরবাসে থাকার পর শহীদ কাদরীর ঘরে ফেরা ও নিজ দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' কাব্যের শেষ কবিতা "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য়। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন থেকে কবির ঘরে ফেরার প্রবল আগ্রহ এখানে ভিন্ন একটি মাত্রা পেয়েছে :

আমার মতো ভ্রাম্যমান এক বিহ্বল মানুষ
ঘরের দিকেই
ফিরতে চাইবে
হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে সুস্থ
সহজ এবং স্বাভাবিক।
আমার নিজস্ব ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবো বলেই
আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছিলাম একদা
আমার আজন্ম-চেনা গৃহচ্ছায়া থেকে–
আমার প্রথম কৈশোরের রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভোরে।[২৩]

কবির সেই নিঃসঙ্গচেতনা সবচেয়ে যাতনামিশ্রিত হয়ে ওঠে তখনই যখন তিনি বলেন, 'আমার গাঁ কিংবা শহর কিংবা বাড়ি কিছুই এখনো খুঁজে পেলাম না।'[২৪] শহীদ কাদরী এই হতাশা ও অপ্রাপ্তির মূলে ছিল যুগযন্ত্রণা। জীবনকে আবেষ্টন করে থাকা প্রতিকূল ও বিমুখ পরিবেশ কবিকে প্রবলভাবে আক্রান্ত করেছে। সমসাময়িক জীবনের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে কবিতায় তিনি বারবার দেখিয়েছেন অস্তিত্ব সংকটের সুস্পষ্ট ছাপ। ব্যক্তিগত জীবনে শহীদ কাদরী যে বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধকে ধারণ করে কবিতা লিখতে চেয়েছেন, হৃদয়ের অতৃপ্ত আর্তস্বর তার সবকিছু ছাপিয়ে বারবার নৈরাশ্য-নিঃসঙ্গতা ও বেদনার কথা প্রকাশে বাধ্য করেছে। ফলে নৈঃসঙ্গ্যবোধ হয়েছে শহীদ কাদরীর কবিতার অন্যতম বিষয়।

৩.

অন্য সব প্রাণির মতো মানুষের জীবনেও মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য ও নির্মম এক সত্য ঘটনা। এই নিষ্ঠুর সত্য কখনো কারো জীবনে আকস্মিকভাবে আসে, আবার কখনোবা রোগ-জরা-বার্ধক্য মানুষকে ইঙ্গিত দেয় মৃত্যু আসন্ন। আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি জীবনানন্দ দাশ তাই বলেছেন— 'কখন মরণ আসে কে বা জানে/কালীদহে কখন যে ঝড় কমলের নাল ভাঙে।'[২৫] শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্য "উত্তরাধিকার" থেকেই তাঁর নৈঃসঙ্গ্যপীড়ার মতো মৃত্যুচেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের জীবনের এই চরম সত্যকে কবি এড়িয়ে যাননি। মৃত্যুচেতনা প্রসঙ্গ শহীদ কাদরী নানাভাবে তাঁর কবিতায় নিয়ে এসেছেন। জীবন-মৃত্যুর অনেক বাণী প্রকটিত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার শব্দমালায়। মূলত মৃত্যু, বিতৃষ্ণা, শূন্যতা ছড়িয়ে আছে শহীদ কাদরীর কবিতার বিস্তৃত পরিসর জুড়ে। মৃত্যুচিন্তা তাঁর মধ্যে অনেক আগেই দাঁনা বাঁধে এবং এক ধরনের বিষণ্ণতার সঞ্চার করে। তবে শহীদ কাদরীর অসুস্থ হওয়ার পর এ প্রসঙ্গটি তাঁর কাছে ভিন্নরকম গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর জীবনসূর্যও অস্তমিত হয়েছে

হাসপাতালের বেডে। মৃত্যুর পরের পরিণতি সম্পর্কে নিজের ভাবনাগুলোর কাব্যরূপ দিয়ে "মৃত্যুর পরে" নামক কবিতায় তিনি লেখেন :

রয়ে যায় ঐ গুল্মলতায়,
পরিত্যক্ত হাওয়ায়-ওড়ানো কোন হলুদ পাতায়,
পুকুর পাড়ের গুলগুলে,
একফোঁটা হন্তারক বিষে, যদি কেউ তাকে পান করে ভুলে,
অথবা সুগন্ধি কোন তেলের শিশিতে,
মহিলার চুলে,
গোপনে লুকিয়ে থাকি যেন তার ঘুমের নিশীথে
অন্তত নিদেন পক্ষে একলাফে পেরিয়ে দেয়াল
পৌঁছে যেতে পারি যেন আমার কবরে আমি জলন্ত শেয়াল
সন্তর্পণে নাকে শুঁকে রাত্রির নিঃশব্দ মখমলে
আমার টাটকা শব ফেরে যেন আমারই দখলে
বিঘ্নহীন, রক্তমাংস হাড়গোড় চেটেপুটে সবই খাওয়া হয়
নিজেই বাঁচাতে যেন পারি ওহে, নিজেই নেহাৎ
ব্যক্তিগত পরিচয়।।[২৬]

শহীদ কাদরীর মৃত্যুচেতনা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' কাব্যের "স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে একদিন" নামক কবিতায়। কবির নিজের মৃত্যু নিয়ে ভাবনা যেমন এ কবিতায় ধরা পড়ে, তেমনি এখানে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিমান-অভিজ্ঞতামিশ্রিত বোধ ও উপলব্ধি। মৃত্যুচিন্তার প্রকাশ করতে গিয়ে শহীদ কাদরী কখনো কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছেন; লিখেছেন ব্যঙ্গ কবিতা। নিজের মৃত্যুর পর সতীর্থ, প্রিয়জনদের ভূমিকা কেমন হবে তা কল্পনা করে কবি লিখেছেন :

আমার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমার শুভানুধ্যায়ীরা পৌঁছে গেছেন
শহরের প্রখ্যাত কবরখানায়,
পুরানা পল্টন থেকে পায়ে হেটে রওয়ানা দিয়েছেন
তিনজন তরুণ কবি
মোহাম্মদপুর থেকে এসেছেন চশমা-চোখে
বিরলকেশ দু'জন সাহিত্য সমালোচক,
প্রায় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা পাঠিয়েছেন
অসামান্য চিত্রকল্প শিকারি
বেশ কয়েকজন ক্যামেরাম্যান,
মাইক্রোফোন হাতে তরুণ ও প্রৌঢ় সাংবাদিকরা
সংগ্রহ করছেন
আমার অকালমৃত্যু ও বিরল সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে
আমার সতীর্থদের
না-ছুঁই পানি না-ছুঁই মাছ ধরনের
মন্তব্য।[২৭]

শহীদ কাদরীর জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছে স্বদেশ, সমাজ ও মানুষের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এসব কিছু থেকে যে বিচ্ছেদ— তা তাঁকে অনেক বেশি একা ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। মানুষের জীবনে যে কোন বিচ্ছেদ-ব্যবধানের মধ্যেই বেদনা আছে। এই বেদনাবোধ কারো কারো জীবনকে করে তোলে আবেগাক্রান্ত। আপাতদৃষ্টিতে শহীদ কাদরীকে কঠোর মনে হলেও তিনি ছিলেন কোমল প্রকৃতির মানুষ। ফলে জীবনের প্রতিটি বিচ্ছেদ তাঁকে আপ্লুত করেছে। এমনকি এক একটি বিচ্ছেদ তাঁর চেতনার জগতে সৃষ্টি করেছে মৃত্যুর মতোই শূন্যতা। জীবনের দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে শারীরিক সমস্যা-জরা তাঁকে বিষণ্ন করেছে। তাই সব বিচ্ছেদের মধ্যেই কবি মৃত্যুর পূর্বাভাস পান :

> দ্যাখো, ভয় আমি পাই
> কেননা ইতিহাসের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে
> আজ আমি জরাগ্রস্ত—
> বন্দী এক বিদেশি বারান্দায়।
> হ্যাঁ, বিচ্ছেদ তা যত ক্ষণকালীনই হোক
> তাকে আমি ভয় পাই।
> সব বিচ্ছেদের মধ্যেই রয়েছে মৃত্যুর স্বাদ।[২৮]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শহীদ কাদরী ছিলেন অভিজ্ঞতাপ্রবণ। ব্যক্তি শহীদ কাদরীর বাংলাদেশের কবিতার শহীদ কাদরী হয়ে ওঠার পেছনে জীবনের মিঠে-কড়া অভিজ্ঞতা রেখেছে দীর্ঘ ভূমিকা। আর এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ছিল আড্ডা। মানুষের সঙ্গে আড্ডায় কবি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম কাব্যেই কবির জীবনী অভিজ্ঞতা পরিণত-পর্যায় অর্জনে সক্ষম হয়। এরপর তিনি যত কবিতা লিখেছেন, সেখানে শুধু নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চরণ ঘটেছে। শহীদ কাদরীর প্রসারিত কাব্যদৃষ্টি জীবনের বহুবিধ পথসমূহ সন্ধান করেছে। কিন্তু বহুবিস্তৃত পথ-অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত গভীর সারল্যে তাঁর ভাবনা সমর্পিত হয় জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুর কাছে। তবে শহীদ কাদরীর মৃত্যুচেতনা সব সময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়নি। সমসাময়িক জীবনের আশা-হতাশার সংমিশ্রণে কবির মৃত্যুচেতনা বিকশিত হয় বিচিত্র অভিধায়। যার কারণে অন্তঃসারশূন্য পৃথিবীর বিব্রত পরাস্ত এক মানুষের মতো তিনি কবিতায় ধ্বনিত করেন :

> বজ্র-বিদ্যুৎ-ব্লিজার্ডের তাড়া খাওয়া
> পরাস্ত মানুষের মতো
> ফিকে আমি
> নিজস্ব বিবরে
> আর মৃতের উল্টে যাওয়া চোখের সাদার মতো
> এই বিব্রত বিশ্বের দিকে তাকিয়ে থাকি
> কোথাও দেখি না আর
> লতাতন্তুময় প্রাণের উত্থান।[২৯]

মানুষের নিজস্ব প্রতিভা ও গুণাবলী তাকে অপরাপর মানুষের কাছে করে তোলে আপন; জড়িয়ে ফেলে মায়াবী সম্পর্কে। ক্ষণিকের জন্য এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান-সময় ফুরিয়ে গেলে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে তাকে চলে যেতে হয়। কবির কাছে মানুষের এই আসা-যাওয়া মনে হয়েছে পাখির বৃক্ষস্থান পরিবর্তনের মতো। তিনি মনে করেন পাখি যেমন এক ডাল থেকে অন্য ডালে তার স্থান পরিবর্তন করে, মানুষও তেমনি তার অবস্থান বদলায় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তাই কবির উচ্চারণ :

আমাদের প্রত্যেকের মাংসের গভীরে
বসবাস করেন
একজন গায়ক পক্ষী।
একদিন হঠাৎ বাতাসে
উড্ডীন হয়ে
কোথায় চলে যান
সম্ভবত অন্য কোন
সতেজ বৃক্ষের ডালে। আমাদের মৃত্যু হয়।[৩০]

জীবনের পড়ন্ত পর্বে শহীদ কাদরী শারীরিকভাবে অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় দশ বছর ধরে হাসপাতালে নিয়মিত তাঁর ডায়ালাইসিস চলে। শারীরিক এই অসুস্থতার ফলে মৃত্যু তাঁকে চরমভাবে ভাবিত করে। কবির কাছে মনে হয়েছে মানুষ খুবই স্বল্পায়ু প্রাণী এবং অতি দ্রুতই মানুষের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কাছে জীবনের এত দ্রুত পরাজয়কে কবি কোনভাবেই মানতে পারেননি। তাঁর কাছে মনে হয়েছে জীবনের গতিময়তা জীবনকে অতি দ্রুত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে জীবন-সায়াহ্নে এসে মৃত্যু ভয়ের চেয়ে কবির জীবনপিপাসা অধিকতর গাঢ় হয়ে ওঠে। তাই জীবনকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরার বাসনা নিয়ে শহীদ কাদরী প্রশ্ন:

হে স্বল্পায়ু মানুষ
মৃত্যু কি এ্যাতোই মোহনীয় ?
এমন দারুণ ব্যস্ততার সঙ্গে
তুমি কেন এ্যাতো দ্রুত ধাবমান।[৩১]

জীবন-অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণতায় শহীদ কাদরী তাঁর কবিতার মধ্যে নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবির এই দ্বিবিধ চেতনা অধিকাংশ সময়ই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে।

৪.

পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বিশ্বের কোন বরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গ শহীদ কাদরীর কবিতায় তেমন একটা দেখা মেলে না। স্বীয় জীবনের বিষাদ ও একাকীত্বই কবির চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। জীবদ্দশায় শহীদ কাদরী সামান্য কিছু কবিতা লিখে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে জায়গা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। মাত্র দুই শতাধিক কবিতা লিখে সহস্র পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নেয়া যতটা বিরল ততটাই বিস্ময়ের। অভিনব কাব্যকৌশলের কারণেই শহীদ কাদরী বাংলাদেশের কবিতায় এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁর কাব্য-কবিতার বিচার-বিশ্লেষণে সচরাচর তাঁকে আধুনিক বাংলা কবিতায় নাগরিক কবি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একথা হয়তো সত্য নগরজীবন তাঁর কবিতায় ব্যাপকতা লাভ করেছে। তবে এটিও সত্য যে নাগরিকবোধের পাশাপাশি অন্য অনেক বিষয়ই তাঁর কবিতার অবলম্বন হয়ে উঠেছে। শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রতিফলিত নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মৃত্যুচেতনা তারই অংশভাগ।

তথ্যনির্দেশ:

১. জুনান নাশিত, "অন্তরঙ্গ ও মাধুর্যময় কবিব্যক্তিত্ব", শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, 'অভিবাদন শহীদ কাদরী', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬ পৃ. ৭৭

২. ড. আরজুমন্দ আরা বানু, "শহীদ কাদরীর কবিতা : স্বনির্মিত স্বতন্ত্র স্বর", 'সাহিত্যিকী', ৪৮তম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০২

৩. রতনতনু ঘোষ, 'বাংলাদেশের সাহিত্য', অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৫১
৪. শহীদ ইকবাল, "শহীদ কাদরীর কবিতায় নাগরিক চেতনা", সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক যুগান্তর', ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৪
৫. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, 'অভিবাদন শহীদ কাদরী', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১১৩
৬. বায়তুল্লাহ কাদেরী, 'বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.৪৩
৭. বেলাল চৌধুরী, "শহীদবিহীন ঢাকা", নঈম নিজাম সম্পাদিত. 'দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন', ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃ. ৫
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মরণ", 'ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী', অজিতকুমার গুহ ও আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত 'সঞ্চয়িতা', সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১
৯. ঐ, "মৃত্যু", 'নৈবেদ্য',পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮
১০. দিলারা হাফিজ, 'বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২১২
১১. শহীদ কাদরী, "প্রবাসের পঙ্‌ক্তিমালা", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৪৬
১২. ঐ, "বৃষ্টি বৃষ্টি", 'উত্তরাধিকার', শহীদ কাদরীর কবিতা, সাহিত্য প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ. ১১
১৩. ঐ, "উত্তরাধিকার", 'উত্তরাধিকার', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
১৪. ঐ, "প্রবাসের পঙ্‌ক্তিমালা", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
১৫. ঐ, "নশ্বর জ্যোৎস্নায়", 'উত্তরাধিকার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
১৬. তদেব
১৭. দিলারা হাফিজ, 'বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
১৮. শহীদ কাদরী, "নপুংসক সন্তের উক্তি", 'উত্তরাধিকার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
১৯. ঐ, "নিরুদ্দেশ যাত্রা", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
২০. ঐ, "কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
২১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫১
২২. শহীদ কাদরী, "তাই এই দীর্ঘ পরবাস", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
২৩. ঐ, "নিরুদ্দেশ যাত্রা", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
২৪. তদেব
২৫. জীবনানন্দ দাশ, "তোমার বুকের থেকে একদিন", 'রূপসী বাংলা', ছালাম হোসেন খান সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৩৪
২৬. শহীদ কাদরী, "মৃত্যুর পরে", 'উত্তরাধিকার', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
২৭. ঐ, "স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে একদিন", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
২৮. ঐ, "অপেক্ষা করছি", 'গোধূলির গান', প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৭
২৯. ঐ, "হন্তারকের প্রতি", 'গোধূলির গান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৩০. ঐ, "মৃত্যু", 'গোধূলির গান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৩১. ঐ, "গাছ, পাথর, সমুদ্র", 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের বিস্তারে স্থানীয় শাসকবর্গের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ*

Abstract: In the seventh and eighth centuries, the spread of Islam began in Southeast Asia during the early stages of the arrival and spread of Islam in the Arab World. But Islam did not come in this rigion through any political influence or any military expedition from Arabia, Persia, North Africa, Middle East, Crentral Asia or India. The preaching and spread of Islam in South-East Asia was started by the Muslim Merchants. They were mainly Arab, Gujarati, Tamil and Bengali. Through their efforts, Islam spread to Sumatra, Java and other places in South-East Asia. In the thirteenth century, a small number of Muslim Settlements and Port-States were established there. However, local Muslim rulers played an important role in the spreading of Islam in this region. In this case, the name of Malacca State can be specifically mentioned. In addition, Moreover, the environment created after the fall of Malacca in the hands of the Portuguese in the sixteenth century played an important role in the rapid spread and strengthening of Islam in Southeast Asia.

ভূমিকা

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তারের প্রারম্ভিক যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রচার শুরু হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বীপাঞ্চলের বিভিন্ন বন্দরে মুসলিম বসতি গড়ে উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এ অঞ্চলে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব শুরু হয়। অতঃপর কালের বিবর্তনে এক সময় এই অঞ্চল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। তবে মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা অথবা ভারত থেকে সামরিক অভিযান প্রেরণ বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে হয়নি। এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ও বিস্তার ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। মুসলিম বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তবে এই অঞ্চলে ইসলামীকরণ তথা ইসলামের ব্যাপক বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় মুসলিম শাসকবর্গ। এক্ষেত্রে মালাক্কা রাষ্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মালাক্কার সুলতানগণ কর্তৃক বিজয়াভিযান প্রেরণ, বিজিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, বাণিজ্যিক লেনদেন, সুলতানদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অংশে মুসলিম আধিপত্য সম্প্রসারিত হয় এবং ইসলামের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের মালাক্কা দখল পরবর্তী ঘটনাবলী এ অঞ্চলে ইসলামের দ্রুত বিস্তার ও সুসংহতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মালাক্কার পতনের পর দ্বীপাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠে। এসব রাজ্যের শাসক, বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণ দ্বীপাঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আশংকায় পর্তুগিজদের এ অঞ্চলীয় দ্বীপ ও বন্দর-রাজ্যগুলোতে আগমনের পূর্বেই দ্রুততার সঙ্গে ইসলাম প্রচার ও সুদৃঢ়করণে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে।

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচিতি : দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বে, চীনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলটি সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পরিচিত। নামটি হালজামানার। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাওয়ার্ড ম্যালকম নামক জনৈক মার্কিন ধর্মপ্রচারকের বিবরণে। আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে নানা অজানা তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ম্যালকম এ অঞ্চলে আগমন করেন এবং ১৮৩৯ সালে স্বদেশে ফিরে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। বিবরণীটির শিরোনাম ছিল Travels in South Eastern Asia Embracing Hindustan, Malay, Sam and China and the Burma Empire।[১] তাঁর বিবরণেই প্রথম সাউথ ইস্টার্ণ এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটির সচেতন উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী একশত বছর নামটির ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত থাকে। এ সময় এ অঞ্চলকে বোঝাতে অন্যান্য নাম ব্যবহৃত হতো। যথা- বৃহত্তর ভারত, বহির্ভারত, ইন্দোচীন, ইস্ট ইন্ডিজ ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নামটির পুনঃপ্রচলন ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে জাপান ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন মালয় অঞ্চল, সিঙ্গাপুর এবং ওলন্দাজ নিয়ন্ত্রিত ইন্দোনেশিয়া দখল করে নেয়। বিশ্ব পরিমণ্ডলে এ দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের এবং ইংল্যান্ডের সমরায়োজনে টিন ও রাবারের সরবরাহ কেন্দ্র ছিল মালয়। সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশদের মূলধন বিনিয়োগের অন্যতম ক্ষেত্র এবং বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ওলন্দাজ নিয়ন্ত্রিত ইন্দোনেশিয়া ছিল প্রাচ্যের মসলার প্রধান আকর। ফলে এসব স্থানের পতনে বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তিবর্গ তাদের প্রাচ্যীয় ঔপনিবেশগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। জাপানি দখল থেকে এসব দেশকে মুক্ত করার জন্য এ অঞ্চলকে একটি সামরিক কমাণ্ডের অধীনে আনার প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৩ সালের মে মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলনে South East Asia Command গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত তখন থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শব্দটির বহুল প্রচলন শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ASEAN (Association of South East Asian Nations) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা গঠন করলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নামটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বার্মা (মিয়ানমার), থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও পূর্ব তিমুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রচার ও বিস্তার : সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরব ভূখণ্ডে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচার শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিম বসতি স্থাপন ও বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর ব্যাপক বিস্তার তথা ইসলামীকরণ ঘটে। তবে আরব ভূখণ্ড, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া বা ভারত থেকে কোনো সামরিক অভিযান প্রেরণ বা রাজনৈতিক প্রভাবে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন হয়নি, এখানে ইসলামের আগমন ঘটে মুসলিম বণিক, ধর্ম প্রচারক এবং স্থানীয় শাসকবর্গের মাধ্যমে। মুসলিম বণিকদের হাত ধরে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামের আদিভূমি আরব হওয়ায় স্বভাবতই আরবগণ এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। তবে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুজরাটি, তামিল, বাঙালি, চীনা প্রমুখ বণিকগণও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর, নগর ও রাজ্যগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাদের ব্যাপক যাতায়াত ও পরিচিতি ছিল। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর উত্তম রুজি ও জীবিকার সন্ধানে মুসলিম বণিকগণ ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষত বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হয় এবং বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতে থাকে। উল্লেখ্য, কোরআনে ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[২] নিজ হাতের কাজ এবং হালাল ব্যবসার উপার্জনকে হাদিসে উত্তম উপার্জন বলা হয়েছে।[৩] মুসলিম বণিকদের ব্যাপক যাতায়াত এ

অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ পটভূমি তৈরি করে। ভারতের অবস্থানগত সুবিধা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সঙ্গে কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত ব্যাপক মিল থাকায় ভারতীয় বণিকগণ এক্ষেত্রে অধিকতর ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচার ও বিস্তারে বেশ কিছু বিষয় উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে এ অঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে মুসলিম বণিকদের দীর্ঘদিন অবস্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পণ্য ক্রয়বিক্রয়, মৌসুমী বায়ুর জন্য অপেক্ষা, জাহাজ মেরামত প্রভৃতি কারণে দ্বীপাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে মুসলিম বণিকদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। এ অবস্থায় তাদের বাড়িঘর নির্মাণ করতে হতো। পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপদ অবস্থানের জন্যও তাদের ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে হতো। এভাবে সেখানে বিভিন্ন বন্দরে মুসলিম বসতি গড়ে উঠতো। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের উন্নত জীবন-যাপন দ্বীপাঞ্চলবাসীদের ইসলাম গ্রহণে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইসলামী আদর্শে স্নাত মুসলিম বণিকদের পাক-পবিত্র জীবনযাপন, সাদা-কালো, ধনী-গরীব, মনিব-চাকর, বংশ, পদমর্যাদা নির্বিশেষে শ্রেণী-বর্ণহীন সমাজ ব্যবস্থা এবং তাদের নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা, সততা, সহমর্মিতা, ভাতৃত্ববোধ, পরপোকারিতা প্রভৃতি প্রকৃতিপূজারী, জড়বাদী, কুসংস্কারছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়বাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তৃতীয়ত, স্থানীয় বন্দর-প্রধান, রাজা ও অভিজাতদের অনেকে তৎকালীন প্রাচ্য বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক মুসলিম বণিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যেও ইসলাম গ্রহণ করেন। চতুর্থত, মুসলিম বণিকদের অন্তর্বিবাহ এ অঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ অঞ্চলে আগত মুসলিম বণিকদের অনেকে স্থানীয় রমণী বিবাহ করতো। কোন কোন বণিকের একাধিক স্ত্রী থাকতো। এ অঞ্চলের লোকদের সহনশীলতা ও উদার সংস্কৃতি মুসলিম বণিকদের স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাদের সন্তান-সন্তানাদি স্বভাবত ইসলামের অনুসারী হতো। তাছাড়া অর্থ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে মুসলিম বণিকরা এ অঞ্চলের বিভিন্ন শাসক পরিবারেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়। শাসকগণ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পরিবারের সদস্যগণ, অভিজাতবর্গ, কর্মচারীবৃন্দ, দাস-দাসী ও প্রজাসাধারণও ইসলামের অনুসারী হতো। পঞ্চমত মুসলিম বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও ঘরবাড়িতে স্থানীয় লোকেরা কর্মচারী ও গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতো। তারা মনিবদের সংস্পর্শে এসে এবং কখনো কখনো আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের আশায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতো। তাছাড়া মুসলিম বণিকগণ কর্তৃক স্থানীয়দের মধ্যে দান, সাদাকা, যাকাত প্রভৃতি বিতরণের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শ্রীবিজয়া ও মাজাপাহিতদের কুশাসনে অত্যাচারিত, নির্যাতিত এবং বিভিন্ন সামাজিক, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতদরিদ্র ও হতাশাগ্রস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়বাসীদের মধ্যে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারে ধর্ম প্রচারকগণও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশে বিশেষত বিদায় হজ্জে তাঁর ইসলামের বানী চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বানের পর মুসলমানগণ ইসলামের প্রচারের কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ এবং পরবর্তীতে সাহাবী, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন এবং শেখ, শাহ, মখদুম, রাদেন, সুফি, পীর, আউলিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইসলামের সুমহান বানী বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে অংশগ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগত ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ মধ্যপ্রাচ্যের আরব, ইয়ামেন, পারস্য (ইরান), ইরাক ছাড়াও ভারতের মালাবার ও করমন্ডল উপকূল থেকে আগমন করেছিলেন। এ অঞ্চলে আগত মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের সাধামাটা ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, পরিপূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসন পরিপালন, ভদ্র ও মার্জিত আচার-ব্যবহার, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, পরোপোকারিতা, ধনী-গরীব, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আন্তরিক

মেলামেশা, দুঃস্থ-দরীদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতা দান, তাদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি নোংরা ও অসভ্য প্রকৃতির দ্বীপাঞ্চলবাসীদের ইসলামের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। উল্লেখ্য, তখন দ্বীপাঞ্চলের অধিকাংশ লোক নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ জীবনযাপন করতো যার প্রমাণ মেলে সমকালীন পর্যটকদের বিবরণীতে। ভেনেসীয় পর্যটক মার্কো পোলো সুমাত্রার পারলাক পরিভ্রমণকালে লক্ষ্য করেন যে, এখানকার পাহাড়ের অধিবাসীরা পশুর ন্যায় জীবনযাপন করে। এরা বাছ-বিচারহীনভাবে মানুষসহ পরিষ্কার বা অপরিষ্কার সব ধরনের জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করে। বিভিন্ন জিনিসকে ঘিরে এরা পূজা-অর্চনা করে। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে যে জিনিসটাকে প্রথমে দেখে সারাদিন তারই অর্চনা করে।[৪] জড়বাদী ও প্রকৃতি পূজারী নোংরা ও নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত দ্বীপাঞ্চলবাসী সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে মুসলমানদের উন্নত জীবনাদর্শ ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে।

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা এবং জাভা দ্বীপে প্রথম ইসলামের প্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য এলাকায় তা বিস্তার লাভ করে। পশ্চিম থেকে ইসলামের আগমন হওয়ায় স্বভাবতই পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বীপ সুমাত্রায় ইসলামের প্রথম পদার্পণ ঘটে। চীনা বর্ষলিপিতে ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে একজন আরব প্রধানের পশ্চিম সুমাত্রায় স্থাপিত একটি মুসলিম বসতির নেতা থাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৫] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুমাত্রায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার হয় এবং ছোট ছোট মুসলিম বসতি গড়ে উঠে। সমুদ্র নগরীর প্রচলিত লোক কাহিনী অনুযায়ী সুমাত্রার লোকদের ইসলামে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে শেখ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি ধর্মপ্রচারক দল আসেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সুমাত্রার পাসুরাই (সম্ভবত পাসাই), লাম্বারী, আরু, সমুদ্র, পারলাক প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচারিত হয়।[৬] সুমাত্রায় ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় ভেনেসীয় পর্যটক মার্কোপোলোর বিবরণে। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তিনি সুমাত্রা দ্বীপে ৫ মাস অপেক্ষা করেছিলেন। এ সময় তিনি সমগ্র সুমাত্রা পরিভ্রমণ করেন। তিনি উত্তর সুমাত্রার পারলাকে (ফারলাক) মুসলিম বণিকদের অবাধ যাতায়াত লক্ষ্য করেন। তারা স্থানীয় অনেককেই মুহাম্মদের ধর্মে দীক্ষিত করেন বলে মার্কোপোলো তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেন।[৭] অবশ্য সুমাত্রার অন্য কোনো বন্দরে ইসলাম বিস্তারের কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালয় উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ত্রেঙ্গানুতে সম্ভবত ইসলামের প্রচার হয়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ত্রেঙ্গানুতে আবিষ্কৃত আরবী অক্ষরে লিখিত মালয়ের প্রাচীন পাঠ্য গ্রন্থসমূহের অংশ সম্বলিত শিলালিপি থেকে এই ধারণা করা হয়। শিলালিপিতে হিজরি ৭৮৮ অর্থাৎ ১৩৮৬ খোদিত আছে।[৮] মালয় ভূখণ্ডের উত্তরে থাইল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে শ্যাম বৌদ্ধদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এখানকার ধর্মান্তরীত মুসলিমদের ‘সামসামস’ বলা হয়।[৯] মালয় উপদ্বীপের বন্য ও বর্বর গোত্রগুলোর মধ্যেও ইসলাম প্রবেশ করে। ইন্দোচীনে ইসলাম বিস্তারের ইতিহাস স্পষ্ট নয়। দশম শতাব্দী হতে আরব ও পারসিক বণিকদের মাধ্যমে সম্ভবত এখানকার সমুদ্র-বন্দর শহরগুলোতে ইসলামের প্রচার হয়। তবে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রান্তলগ্নে মালয়ীদের অভিবাসনের মাধ্যমে এখানে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিস্তার ঘটে।

ইসলাম প্রচারের ফলে ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যের উত্থান শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সমুদ্র নামক একটি মুসলিম বন্দররাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটি ছিল এ অঞ্চলের প্রথম মুসলিম রাজ্য। চীনা লোকসূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে *Cambridge History of Islam* গ্রন্থে বলা হয়েছে, ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে এ রাজ্য থেকে হুসাইন ও সুলাইমান নামক দু’জন মুসলিম দূত চীনে প্রেরণ করা হয়।[১০] এই রাজ্যের প্রথম মুসলিম শাসক ছিলেন সুলতান মালিক আস সালেহ। তিনি ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে মৃতুবরণ করেন। মালিক আস সালেহের প্রকৃত নাম মেরাহ সিলু। তিনি সুমাত্রায় আগত প্রখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক শেখ ইসমাইলের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উক্ত নাম ধারণ করেন। মালয় লোক ইতিহাসে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে সুমাত্রার উত্তর উপকূলে অবস্থিত আচেহতে জাহান শাহের ক্ষমতা

আরোহণের কথা বলা হয়েছে। তাঁকে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। প্রদত্ত তথ্য থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে একটি মুসলিম রাজ্য হিসেবে আচেহ রাজ্যের যে উত্থান হয় তা অনুমিত হয়। এভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই সুমাত্রার অধিকাংশ স্থানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে সুমাত্রায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা চীন যাতায়াতের পথে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে (সেপ্টেমবর-অক্টোবর) সুমাত্রা পরিভ্রমণ করেন। তিনি সুমাত্রার সুলতানের নাম আল-মালিক আজ-জাহির উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁকে একজন ন্যায়পরায়ণ এবং যোগ্য শাসক বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকালে সুমাত্রায় কোনো অমুসলিম রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেননি, তবে সেখানে খ্রিস্টান বা অমুসলিমদের থাকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জনৈক চীনা পর্যটক ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে সুমাত্রা পরিভ্রমণ করেন। তিনি লাম্বারি সম্পর্কে বলেন যে সেখানে প্রায় ১,০০০ পরিবার বসবাস করতো যারা সকলে মুসলিম ছিল।[১১] ফলে লাম্বারিও যে চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়।

জাভাতে ইসলামের বিস্তার কার্যক্রম শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। জাভার উত্তর উপকূলে অবস্থিত গ্রেসিকে মালিক ইবরাহিম নামক একজন মুসলিম বণিকদের নেতৃত্বে সেখানে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁর কবর ফলকে মৃত্যুর তারিখ ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত আছে। মালিক ইবরাহিমকে স্থানীয়ভাবে ইসলামের একজন সুফি ধর্মপ্রচারক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পারস্যের একজন অধিবাসী ও প্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন। দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে মসলার ব্যবসা করে তিনি বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন।[১২] গ্রেসিক তখন মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের অধিনস্থ বন্দর হিসেবে খ্যাত ছিল। গ্রেসিকের বণিকরা মলুক্কাস, বান্দা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় মসলার দ্বীপসমূহ হতে মসলা সংগ্রহ করে গুজরাটি বণিকদের কাছে সরবরাহ করতো এবং বিনিময়ে ভারতীয় বস্ত্রাদি সংগ্রহ করতো। গ্রেসিকের লোকজন মালিক ইবরাহীমের মাধ্যমে গুজরাটিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপন করার ইচ্ছা করেছিল এবং এ কারণে গ্রেসিকের জনগণের উপর মালিক ইবরাহীমের বিশেষ প্রভাবও তৈরি হয়েছিল যা গ্রেসিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৩]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারে শাসকবর্গের ভূমিকা : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন স্থানীয় মুসলিম শাসকবর্গ বিশেষত ধর্মান্তরিত মুসলিম শাসকবর্গ। নব্য প্রতিষ্ঠিত বন্দর রাজ্যগুলোর সুলতানগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের বিস্তার, মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে অমুসলিম বন্দর রাজ্যগুলোকে মুসলিম রাজ্যে পরিণত করা, নতুন নতুন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং অভিযান প্রেরণের মাধ্যমে মুসলিম রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করার প্রয়াস পান। এক্ষেত্রে প্রথমে সমুদ্র রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। সমুদ্রের শাসক ছিলেন সুলতান মালিক আস সালেহ। তিনি পারলাকের রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দুই পুত্র সন্তানকে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে পাসাই নামক একটি মুসলিম বন্দর-রাজ্যের পত্তন ঘটে। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা যখন সমুদ্র বন্দর পরিভ্রমণ করেন তখন সেখানকার সুলতান ছিলেন মালিক আজ জাহির। তিনি সুলতান মালিক আস সালেহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইবনে বতুতার বিবরণ মতে, সমগ্র রাজ্যব্যাপী তিনি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির জন্য গোটা বছর বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার এবং সুলতানকে কর প্রদান না করতো। সুমাত্রার প্রজারাও ইসলামের স্বার্থে সুলতানের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে যেতো এবং প্রতিটি অভিযানে অংশ নিতো।[১৪] তাঁর কর্তৃত্ব ক্রমান্বয়ে সুমাত্রার উপকূল বরাবর সম্প্রসারিত হয়েছিল। সুলতান মালিক আজ জাহির একজন গোঁড়া মুসলিম ছিলেন। আইনবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা পছন্দ করতেন। তাঁর

দরবারে মুসলিম কবি-সাহিত্যিক এবং শিক্ষিত লোকের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তাদের মাধ্যমে ইসলামের রীতিনীতি ও আদর্শ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকদের ইসলামে ধর্মান্তরীত হতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ইসলামের বিস্তার তথা ইসলামীকরণ ঘটে মালাক্কা রাজ্যের মাধ্যমে। মালাক্কার উত্থান ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় পলাতক যুবরাজ পরমেশ্বরের নেতৃত্বে মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মালাক্কা রাজ্যের পত্তন ঘটে। ১৪০২ খ্রিস্টাব্দে দলবল নিয়ে পরমেশরের আগমনকালে মালাক্কা একটি অখ্যাত গ্রাম ছিল মাত্র। তখন এটি জেলে এবং জলদস্যুদের আশ্রয়স্থল হিসেবে মূলত পরিচিত ছিল। পরমেশ্বরের প্রচেষ্টায় মালাক্কা স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম থেকে একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। মালাক্কার দ্রুত উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত শ্যাম (থাইল্যান্ড) এবং জাভার মাজাপাহিত রাজা মালাক্কার উপর স্বার্বভৌমত্ব দাবী করে বসে।[১৫] এ অবস্থায় পরমেশ্বর চীনের সাহায্য কামনা করলে চীন সম্রাট মালাক্কাকে ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে একটি স্বাধীন রাজ্য এবং পরমেশ্বরকে স্বাধীন রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। কিন্তু চীনের দূরত্বের কারণে বিপদের আশংকা দূরীভূত না হওয়ায় পরমেশ্বর মালাক্কা প্রণালীর অপর প্রান্তে অবস্থিত সুমাত্রার উত্তর উপকূলীয় পাসাই রাজ্যের সুলতানের সাহায্য ও সমর্থন কামনা করেন।

পাসাই এর সুলতান দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই মালাক্কাকে একটি মুসলিম রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করছিলেন। এ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বরকে সমর্থন দানের বিনিময়ে তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রস্তাব দেন। মালাক্কায় অবস্থানরত গুজরাটি ও আরব বণিকরা রাজা পরমেশ্বরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে চাপ দিতে থাকে। এ অবস্থায় পরমেশ্বর ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে স্বপরিবারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সুলতান ইসকান্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পাসাই এর রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। রাজা পরমেশ্বরের ইসলামে ধর্মান্তর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে যেভাবেই হোক না কেন রাজা পরমেশ্বরের ইসলাম গ্রহণের ফলে মালাক্কা একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের হাতে পতনের পূর্ব পর্যন্ত কখনো সেখানে মুসলিম শাসনের ছন্দপতন ঘটেনি। যাহোক, পরমেশ্বরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে রাজপরিবারের সকল সদস্য, অনুচরবর্গ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, দাস-দাসী এবং প্রজাবৃন্দ সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হয়। মালাক্কা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মালাক্কাকে কেন্দ্র করে মালয়ের মূল ভূখণ্ডে এবং দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত এলাকায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও সম্প্রসারণ ঘটে।

ইসলাম প্রচারে মালাক্কার সুলতানদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, বিজয়াভিযান পরিচালনা, বিজিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে বৈবাহিক সমন্ধ স্থাপন এবং ব্যাপক বাণিজ্যিক লেনদেন প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে সুলতান মোজাফ্ফর শাহ এবং সুলতান মনশুর শাহ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মোজাফ্ফর শাহ (১৪৪৬-১৪৫৯ খ্রি.) প্রথম সুলতান উপাধি গ্রহণ করে মালাক্কাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি যুগপৎভাবে ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি ধর্ম প্রচারকদের ব্যাপকভাবে সমর্থন ও সার্বিক সহায়তা দান করেন। ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় তিনি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ব্যক্তিগতভাবে রক্ষণশীল মনোভাবের হলেও ধর্মের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হতো না, প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন করতে পারতো। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় মালাক্কা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক জহর সেন সুলতান মোজাফ্ফর শাহের রাজত্বকাল মূল্যায়ন

করতে গিয়ে বলেন, রাজার ধর্ম প্রজাকুঞ্জ গ্রহণ করেছিল। ইসলাম প্রচারে কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি। সনাতন সমাজের রীতিনীতিকেও আক্রমণ করা হয়নি। এসব কারণে স্বাভাবিক কারণে তাঁর সময়ে এ অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার সহজ ও স্বাভাবিক হয়।[১৬]

মোজাফ্‌ফর শাহের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ মালাক্কা রাষ্ট্রের সংহতি ও স্থায়িত্বকে সুদৃঢ় করে। তিনি তামিল গোষ্ঠীর নেতা তুন আলীকে অপসারণ করে মালাই সম্প্রদায়ের নেতা তুন পেরাককে (সুলতান মোজাফ্‌ফর শাহের স্ত্রীর ভাই) বেন্দাহারা বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে তামিল ও মালাই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পথ প্রশস্ত করেন যা মালাক্কার সমৃদ্ধি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তুন পেরাক ১৪৫৯-১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় চার দশক অত্যন্ত দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং মালাক্কার সুখ,শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মালাক্কার বিস্তৃতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যাহোক, মোজাফ্‌ফর শাহের শাসনকালে শ্যামের বাহিনী ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্থলপথে এবং ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে নৌপথে মালাক্কার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করলে তুন পেরাকের নেতৃত্বে মালাক্কার বাহিনী কেবল এ দু'টি আক্রমণই ব্যর্থ করে দেয়নি, শ্যাম বাহিনীকে মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত করে। থাইল্যান্ড বাহিনীর পরাজয়ের ফলে মালাক্কার শক্তি ও মর্যাদা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। সুদক্ষ রাজনীতিবিদ মোজাফ্‌ফর শাহ শ্যামের সঙ্গে দীর্ঘদিন শত্রুতা বজায় না রেখে শীঘ্র দূত ও উপহার প্রেরণের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মোজাফ্‌ফর শাহ চীনে দূত পাঠিয়ে চীন-মালাক্কা সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান। চীন সম্রাট মোজাফ্‌ফর শাহকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং একটি চামড়ার টুপি, কারুকার্যখচিত পোশাক ও লাল সিল্কের তৈরি একটি পোশাক এবং গন্ডারের শিং যুক্ত কোমরবন্ধ ও রেশমের তৈরি একটি টুপি প্রদান করেন।[১৭] তাছাড়া শ্যামের পরাজয়ের পর চীন মালাক্কার সঙ্গে অধিকতর বাণিজ্যিক ও কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে। মালাক্কার নিকট তৎকালীন মালয় অঞ্চলের বৃহৎ শক্তি শ্যামের পরাজয় এবং চীন সম্রাট প্রদত্ত উপহার ও সুলতান উপাধি লাভ মালাক্কা রাজ্যের মর্যাদা আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে সুলতান মোজাফ্‌ফর শাহের পুত্র মনসুর শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৭ খ্রি.)। মালয় ভূখণ্ড এবং দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত অংশে মালাক্কার আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়। তিনি সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মনসুর শাহ মনে প্রাণে একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খা পূরণের পটভূমি তৈরি করে। পিতা সুলতান মোজাফ্‌ফর শাহের সময় মালাক্কা বাহিনীর কাছে দু'বার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তিশালী রাজ্য শ্যাম বাহিনীর পরাজয় ঘটলে এবং মালাক্কার সঙ্গে শ্যামের শান্তি স্থাপিত হলে এ অঞ্চলে মালাক্কাকে বাধা দেওয়ার মত আর কোন দেশ ছিল না। তাছাড়া শক্তিশালী চীনও এ সময় শ্যামের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে ও ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নিয়ে উদীয়মান শক্তিশালী মালাক্কার দিকে মনোনিবেশ করে। সুলতানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব সুমাত্রা এবং পার্শ্বস্থ দ্বীপসমূহ মালাক্কা অধিভুক্ত হয় এবং মালাক্কা একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

মালাক্কার এই সম্প্রসারণের মূলে ছিলেন বেন্দাহারা তুন পেরাক। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে তুন পেরাক শ্যামের করদরাজ্য স্বর্ণ সমৃদ্ধ পাহাঙ এর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধাভিযান প্রেরণের মাধ্যমে সুলতানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বাস্তবায়ন শুরু করেন। তিনি সেখানকার রাজা মহারাজা দেব সুরকে সিংহাসনচ্যুত করে মালাক্কার একজন যুবরাজকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে সেখানে সরাসরি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তুন পেরাকের নেতৃত্বে সুলতান মনসুর শাহের রাজত্বকাল সমাপ্তির পূর্বে মূল ভূখণ্ডের পাহাঙ, ত্রেঙ্গানু, পাতানি, কেদাহ, পেরাক, কেলানতান, সেলাংগার ও জোহর; পূর্ব সুমাত্রার জাম্বি, কাম্পার; বেঙ্কালিস, ক্যারিমন দ্বীপপুঞ্জ ও বিনটাং মালাক্কা কর্তৃক বিজিত হয়। তাছাড়া এ সময় মালাক্কার নৌবাহিনী সুমাত্রার উত্তর-পূর্ব উপকূলে

অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহ বিশেষত রোকান, সিয়াক ও দক্ষিণ সুমাত্রার মিনাঙ্কাবাউ, ইন্দ্রোগিরি এবং দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত তুমাসিক (বর্তমান সিঙ্গাপুর), রাইয়ু, বান্দা ও লীংগা দ্বীপপুঞ্জ জয় করে মালাক্কার অধীনে নিয়ে আনে।[১৮] সুমাত্রার সিয়াক, কামপার, ইন্দ্রোগিরি, জাম্বি এবং মূলভূখণ্ডের পাহাঙ এর রাজপরিবারের সঙ্গে মালাক্কার শাসকগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বিজয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে এসব রাজ্যে ইসলামের বিস্তার ঘটে। মালাক্কা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও ইসলামের প্রধান প্রসরণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

মালাক্কার মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলাম প্রচারের সর্বশেষ অধ্যায় রচিত হয় বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে। বিশেষত এই প্রক্রিয়ায় জাভা এবং দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত অংশে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। মালাক্কার সুলতানগণের প্রচেষ্টায় মালাক্কা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মাজাপাহিত এর স্থান দখল করে এবং তৎকালীন বিশ্বখ্যাত তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্রের একটিতে উন্নতি লাভ করে।[১৯] মালাক্কার সুলতানগণ বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করা এবং মালাক্কাকে একটি উন্নত বন্দরে পরিণত করার জন্য বণিকদের থাকা-খাওয়ার সুবিধাসহ পর্যাপ্ত আবাসস্থল নির্মাণ, বিপুল পরিমাণ পণ্য সংরক্ষণযোগ্য গুদামঘর তৈরি, স্বল্পমাত্রায় বাণিজ্যশুল্ক ধার্য, উন্নতমানের জেটি নির্মাণ, মালাক্কা প্রণালীতে জলদস্যুদের দমন ও সার্বক্ষণিক নৌপ্রহার ব্যবস্থাকরণ, মানসম্মত রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রবর্তন, বিদেশী বণিকদের দেখাশুনার জন্য শাহবন্দর (বন্দর কর্মকর্তা) নিয়োগ, পণ্যের ওজন ও মান যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতানগণ কর্তৃক এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মালাক্কা বিদেশী বণিকদের সেখানে বাণিজ্যিক লেনদেন করতে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। একদিকে পশ্চিমে পূর্ব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ, বাংলা, পূর্বে চীন, জাপান ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বণিকরা মালাক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বন্দর রাজ্যের বণিকদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মালাক্কায় যাতায়াত এবং লেনদেনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও বিস্তার ঘটতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে জাভার নাম উল্লেখ করা যায়। মালাক্কার সঙ্গে উত্তর জাভার বিভিন্ন বন্দর বিশেষত তুবান ও গ্রেসিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মালাক্কা এ বন্দরগুলোর মাধ্যমে জাভা থেকে তার বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য চাউল সংগ্রহ করতো। তাছাড়া পূর্ব জাভার বণিক এবং নাবিকদের মাধ্যমে মলুক্কাস থেকে মসলা সংগ্রহ করতো। এভাবে জাভার বণিকরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ব্যাপকভাবে মালাক্কায় যাতায়াত করতো। মালাক্কা-জাভা বাণিজ্য তখন জাভানিদের হাতে ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তারা মালাক্কার জনসংখ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। মালাক্কার সৈন্যবাহিনীতে জাভার অনেক সৈন্য ছিল। মালাক্কার জাহাজ নির্মাতাদের অধিকাংশই ছিল জাভাবাসী। জাভার বিখ্যাত অভিজাতগণ পূর্ব ইন্দোনেশিয়া ও মালাক্কার মধ্যে স্থাপিত বাণিজ্যে প্রতিনিধিত্ব করতো। বলা হয়ে থাকে যে একজন জাভানি বণিক-রাজপুত্রের ৬,০০০ ক্রীতদাস নিয়ে গঠিত নিজস্ব সৈন্য ছিল।[২০] এভাবে বাণিজ্যিক এবং চাকরিগত কারণে মালাক্কায় ব্যাপক পরিমাণে জাভার লোকদের যাতায়াত হতো। মালাক্কায় আগত জাভানিদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তাদের মাধ্যমে জাভার বিভিন্ন বন্দরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে মালাক্কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে জাভায় ইসলামিকরণ শুরু হয় এবং উত্তর জাভার তুবান, গ্রেসিক, জাপরা, দেমাক প্রভৃতি বন্দররাজ্যের শাসকগণ মাজাপাহিত আধিপত্যের বন্ধন ছিন্ন করে মুসলিম শাসক হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করেন। এভাবে জাভার বন্দর-রাজ্যগুলো পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু বা বৌদ্ধ শাসকদের বন্ধন ছিন্ন করে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মালাক্কা-জাভা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতেও ইসলামের বিস্তার হয় এবং বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে। জাভার বণিকরা মালাক্কার জন্য প্রয়োজনীয় মসলা সংগ্রহ করতো পূর্বদিকস্থ মলুক্কাস, বান্দা, টিডোর, টারনেট, অ্যামবয়না প্রভৃতি বিভিন্ন মসলার দ্বীপ থেকে। জাভার মুসলিম বণিকদের

সংস্পর্শে এ সব দ্বীপের অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়। ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে টিডোরের শাসক আনুষ্ঠানিকভাবে বিপুল সংখ্যক প্রজা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শেখ মুনসুর উপাধি গ্রহণ করেন। মসলার অন্যতম দ্বীপ টারনেটে টিডোরের সমসাময়িককালে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। দাতু মালা নামক একজন স্থানীয় বণিকদের মাধ্যমে টারনেটে ইসলাম প্রচারিত হয়। টিডোর ও টারনেটে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বল্প সময়ের মধ্যে অ্যামবয়নাতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে মলুক্কাস মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মালাক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সূত্র ধরে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সুলু দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শতাব্দীর শেষদিকে নাবাকান ও মিন্দানাওয়ে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটে। সুলু ও মিন্দানাও থেকে ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোতে ইসলামের বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন স্থানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিপাইনে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন ধর্মপ্রচারকগণ। ফিলিপাইনে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন বাধাবিপত্তির সম্মুখিনও হতে হয়। তবে এতে তারা না দমে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখে। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয়দের হাতে পতনের পূর্বে ম্যানিলা সুলতান সুলাইমানের নেতৃত্বে একটি মুসলিম রাজ্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারের সর্বশেষ অধ্যায় রচিত হয় ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের হাতে মালাক্কার মুসলিম সালতানাতের পতন এবং পতন পরবর্তী এ অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনকে কেন্দ্র । মালাক্কার পতন ঘটলেও মুসলিম বণিক, স্থানীয় মুসলিম শাসকবর্গ ও ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত দ্বীপাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত থাকে। মালাক্কায় আগত পর্তুগিজদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার যাতে না ঘটে সেজন্য দ্বীপাঞ্চলে তাদের আগমনের পূর্বেই স্থানীয় রাজ্যের সুলতান, বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দ্রুত ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পান। এরই ফলস্বরূপ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বোর্ণিওতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণিওর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ব্রুনাই এর শাসক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি উত্তর-পূর্ব বোর্ণিওর অধিকাংশ স্থান দখল করে বোর্ণিওর অধিভুক্ত করেন। এ সময় দক্ষিণ বোর্ণিওর বানজারমাশিনের শাসকও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বোর্ণিওর অন্যান্য অংশে সুমাত্রা থেকে বিশেষত পালেমবাঙ থেমে ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও বিস্তার ঘটে। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণিওর পশ্চিমাংশে সুন্দাকল্পায় প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাকাস্সারের শাসক আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে এটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমুদ্র তীরবর্তী ও মালয় ভূখণ্ড বিশেষত মালাক্কা এবং মলুক্কাসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান হওয়ার কারণে বন্দর রাজ্য হিসেবে মাকাস্সার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে মালয় বণিকরা সেখানে বসতি স্থাপন আরম্ভ করে। মুসলিম বণিকদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে মাকাস্সর রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক মাকাস্সরের শাসকের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে রাজনৈতিক বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম বণিক ও সুলতানদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।[২১] তবে উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন মাকাস্সার ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার : উপল্লিখিত আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রবেশ শুরু হয়। তাদের প্রচেষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সুমাত্রা, জাভা এবং মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বসতি স্থাপন এমনকি ছোট ছোট রাজ্যও (বন্দররাজ্য) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে এ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলিম শাসকবর্গ সর্বাধিক

ভূমিকা পালন করেন। এ ব্যাপারে মালাক্কা রাষ্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মালাক্কার মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মালাক্কার সুলতান, মুসলিম বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় মালাক্কা এশিয়া তথা প্রাচ্যের ইসলামি কৃষ্টি-সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। আর এ জন্যই দেখা যায় **১৫১১** খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজগণ কর্তৃক মালাক্কা দখন ও মুসলিম সালতানাত পতনের পর হতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীন মালোশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই প্রভৃতি রাষ্ট্রের উত্থান না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলে ডাচ, ইংরেজ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম থাকলেও মুসলিম কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং মুসলিম অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে পারেনি, বরং বিভিন্নভাবে তারা স্থানীয় মুসলিম রাজ্য এবং শাসকবর্গ কর্তৃক বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ জহর সেন, *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃ. ১-২।

২ *সুরা বাকারা*, আয়াত ২৭৫।

৩ *মেশকাত শরীফ* (১-১১ খণ্ড একত্রে), সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, হাদিস নং ২৬৫৪।

৪ *দ্যা ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো*, অনুবাদ সোহরাব সুমন, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ২২২-২২৩ (পরবর্তীতে *দ্যা ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো* রূপে উল্লিখিত); P.M. Holt, Ann K.S. Lambtion, Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2, Cambridge : Cambridge University Press, 1970, p.125 (পরবর্তীতে *The Cambridge History of Islam* রূপে উল্লিখিত)।

৫ T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, 2nd ed. (London : Constable & Company Ltd., 1913, p. 271.

৬ *Ibid*, p. 274.

৭ *দ্যা ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো*, পৃ. ২২২।

৮ D. G. E. Hall, *A History of South-East Asia*, New York : Macmillan & Co Ltd, 1964, p. 191.

৯ T. W. Arnold, *op. cit*., p. 280.

১০ *The Cambridge History of Islam*, p. 125.

১১ T. W. Arnold, *op. cit*., p. 274.

১২ Brian Harrison, *South-East Asia, A short History*, New York : ST Martin's Press, 1967, p. 52.

১৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলার বিস্তারে বণিকদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন , ইমতিয়াজ আহমেদ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তার : বণিকদের ভূমিকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-এ, ভলিয়্যুম ২৩-২৪, পৃ. ২৩-৩৬।

১৪ *ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা*, পৃ. ২২৪।

১৫ পরমেশ্বরের আগমনের বহু পূর্ব থেকে থাইল্যান্ডের মানচিত্রে মালাক্কাকে একটি গ্রাম হিসেবে দেখানো ছিল। এই সূত্র ধরে থাইল্যান্ডের রাজা মালাক্কার উপর স্বার্বভৌমত্ব দাবী করে বসেন। অন্যদিকে পরমেশ্বর জাভার মাজাপাহিত বংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করায় মাজাপাহিত রাজাও আত্মীয়তার সূত্রে মালাক্কার উপর উত্তরাধিকার দাবী করেন।

১৬ জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪, ৮৫।

১৭ D. G. E. Hall, *op. cit* p. 196.

১৮ *Ibid*, Jon F Cady, *South East Asia- Its Historical Development*, 2nd Indian Reprint, Delhi : Surjeet Publications, 2006, p.158-159; জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

১৯ ঐ সময়ে তিনটি বন্দর বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিল : মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া, চীনের ক্যান্টন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা।

২০ D. G. E. Hall, *op. cit.*, pp. 198-199.

২১ *Ibid*, p. 201.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

আদর্শ নগর রূপান্তরের সমস্যা ও সম্ভাবনা: প্রসঙ্গ রাজশাহী মহানগর

ড. মু. খলিলুর রহমান*

Abstract: The city of Rajshahi occupies a unique place in the history of the socio-economic and educational development of Bangladesh. This city has undergone transition for years together since the early modern period especially from the days of the British rule in the Indian sub- continent. But the city has to face a number of problems and challenges from the very inception in the trend of its transition. The present paper is a humble attempt to find out those problems and challenges it had to face in the past and is still facing today towards making the city life useful and comfortable in all aspects of urban social life. At the same time, some suggestions have also been put forward for overcoming the problems and challenges towards making it a modern peaceful city in the history of Bangladesh in general and Northern Bangladesh in particular.

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনই মানুষের অভ্যাস। সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। সমাজ বলতে মূলত সমাজের সহযোগিতামূলক কার্যাবলীকে বুঝায়। পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা হলো সমাজের মূল ভিত্তি। সুতরাং একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি পারস্পারিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বসবাস করে এবং সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে সুসংগঠিত রূপ লাভ করে, তখনই সেটা পূর্ণাঙ্গ সমাজে রূপান্তরিত হয়। যে সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠী সমাজ উন্নয়ন, সমাজের সকল লোকজনের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাস্তবায়ন, হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় সেটাই হচ্ছে আদর্শ সমাজ। মানুষের ইতিহাস যেমন পুরনো তেমনি নগর বসতির ইতিহাসও পুরনো। মানব সভ্যতার সাথে নগর বসতির সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং একে অপরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তবে নগর বসতি কখন কীভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। কয়েকটি বিশেষ সৃষ্টির উপর নগরের উৎপত্তি নির্ভরশীল। যেমন যখনই কোন সভ্যতা অধিক খাদ্যফলন, সংরক্ষণ ও বন্টন ব্যবস্থার কৌশল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে, তখনই সে সভ্যতার অন্তর্ভূক্ত সুবিধাজনক স্থানে শহর গড়ে উঠেছে। সমসাময়িক সভ্যতা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় একই সাথে শুরু হলেও প্রতিটি সভ্যতায় গড়ে উঠা নগরগুলোর বৈশিষ্ট্য, ধরন, স্থাপত্য ও স্থাপনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। বর্তমান যুগের মত প্রাচীনকালের এ সকল নগর বসতির একটি জীবন্তরূপ ছিল অর্থাৎ শহরের সৃষ্টি বা জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়প্রাপ্ত, অবলুপ্তি বা মৃত্যু। প্রাচীনকালের অধিকাংশ শহরগুলোই কালের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়েছে। শুধু পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষ, যা বর্তমানে গবেষকদের গবেষণার একটি অন্যতম বিষয়বস্তু।

নগর

নগর বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় যেখানে শহর অপেক্ষা বেশি বসতি গড়ে উঠে। ভৌগোলিকভাবে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী স্থানের চেয়ে মানুষের বসবাসের জন্য সুাবধাজনক ব্যবস্থাদি রয়েছে, যেখানে মানুষ বিশেষত অকৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা যোগাযোগ ব্যবস্থা এলাকাটিকে পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করে এবং যে স্থানের জনসংখ্যার ঘনত্ব পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে একটি নগর বা পৌর এলাকাতে কমপক্ষে ১০০০০০ (একলক্ষ)

---

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে ৪,৯৯,৯৯৯ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরাব্বই) জন লোকের বসবাস হতে হবে।[১] শহরের চেয়ে নগরের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নততর। সভ্যতার পরিচয়বাহী ক্রীয়াকলাপের সমাবেশ নগরেই বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সুযোগ, স্থাপত্য শৈলী প্রভৃতি নগরের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গ্রিফিথ টেইলারের মতে, "নগর বা শহর হল এর অবস্থান, বিকাশ, প্যাটার্ন এবং শ্রেণী বিভাজন।"[২] ডাডলী স্ট্যাম্পের মতে, "নগরসমূহ তাদের বিকাশের যাবতীয় ভৌগোলিক বিষয়ের নীবিড় অনুশীলন।"[৩] মারফি মনে করেন, "নগর বা শহর বলতে এর অবস্থান, বৈশিষ্ট্য, বিকাশ এবং প্রান্তদেশীয় গ্রামীণ এলাকার সাথে সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকে।" ইয়েটস ও গার্নার-এর মতে, "নগরের অন্তস্থিত কৃত্যের আন্তঃসম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনাকে নগর বলে।"[৪] নরদ্যাম-এর মত অনুযায়ী, "যে শাস্ত্র নগর কেন্দ্র বা বসত অঞ্চল সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়ে আলোকপাত করে তাকে নগর বলে।" ক্লার্কের অভিমত হল, "নগর হল ভূগোল শাস্ত্রের এমন একটি শাখা যা নগর ও শহরের অবস্থান এবং স্থানিক বিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করে।"[৫] ঘোষালের মতে, "নগর বা শহর হল নগর জনপদের ভৌগোলিক চর্চা, যা পরিচালিত ও বিকশিত এবং বিরাজ করে পরিপার্শ্বিক এলাকার সেবা কেন্দ্র হিসেবে।"[৬]

রাজশাহী ও রাজশাহী শহরের নামকরণ

রাজশাহী শহরের নাম ছিল রামপুরা বোয়ালিয়া। রামপুরা-বোয়ালিয়া শহরের নামকরণ রাজশাহী কীভাবে হলো তা নিয়ে বহু মতামত রয়েছে। রাজশাহী শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি ভিন্ন ভাষার একই অর্থবোধক দুটি শব্দের সংযোজন পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত '*রাজ*' ও ফারসি '*শাহ*' এর বিশেষণ '*শাহী*' শব্দযোগে 'রাজশাহী' শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ একই অর্থাৎ রাজা বা রাজা-রাজকীয় বা বাদশাহ বা বাদশাহী।[৭] তবে বাংলা ভাষায় আমরা একই অর্থের অনেক শব্দ দু-বার উচ্চারণ করে থাকি। যেমন- শাক-সবজি, চালাক-চতুর, ভুল-ভ্রান্তি, ভুল-ত্রুটি, চাষ-আবাদ, জমি-জিরাত, ধার-দেনা, শিক্ষা-দীক্ষা, দীন-দুঃখী, ঘষা-মাজা, মান-সম্মান, দান-খয়রাত, পাহাড়-পর্বত, পাকা-পোক্ত, বিপদ-আপদ ইত্যাদি। ঠিক তেমনি করে অদ্ভুত ধরনের এ রাজশাহী শব্দের উদ্ভবও যে এভাবে ঘটে থাকতে পারে তা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।[৮]এ নামকরণ নিয়ে অনেক কল্পকাহিনীরও অবতারণা রয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয় এ জেলায় বহু রাজা-জমিদারের বসবাস ছিল এজন্য এ জেলার নাম হয়েছে রাজশাহী। কেউ বলেন রাজা গণেশের সময় (১৪১৪-১৪১৮) এ নামের উদ্ভব।[৯] পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ের ইলিয়াসশাহী সুলতান সাইফুদ্দীন হামযা শাহকে উৎখাত করে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশ (কংস) এ অঞ্চলের অধিপতি হন এবং তিনি 'রাজাশাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত সেজন্যই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে রাজশাহী।[১০] কারো মতে বীরভূমের রাজা উপাধিধারী মুসলমান রাজাগণের নাম হতে রাজশাহী নামের উৎপত্তি।[১১] আবার কেউ বলেন শাহী রাজা মানসিংহের নামানুসারে রাজশাহী নামের উদ্ভব হয়েছে।[১২] এসবই অনুমান ভিত্তিক। ঐতিহাসিক সত্যতা এসব মতের পক্ষে ততটা যুক্তিনির্ভরতা নেই। আবার কেউ কেউ ঐতিহাসিক সূত্র টেনে বলেন যে, সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে (১৭১৭-১৭২৭) ১৭২২ সনে সম্পাদিত রাজস্ব বন্দোবস্তে সমগ্র বাংলাকে যে তেরটি চাকলায়[১৩] বিভক্ত করা হয় রাজশাহী চাকলা ছিল সেগুলোর একটি।[১৪] সে সময় উদয়নারায়ণ (উদিত নারায়ণ) নামক একজন হিন্দু জমিদার কর্তৃক রাজশাহী চাকলার শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো।[১৫] পদ্মা নদীর উভয় তীরে (উত্তর ও দক্ষিণ) তাঁর জমিদারি বিস্তৃত ছিল। উত্তরে বর্তমান রাজশাহী ও দক্ষিণে মুর্শিদাবাদের সাথে অপর অংশ ছিল 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নামে অভিহিত। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, মালদহ এবং দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কিছু অংশের অধিবাসী তাঁর সরাসরি প্রজা ছিল এবং তারা তাঁকে ভূমি রাজস্ব প্রদান করতো।[১৬] উদয়নারায়ণের সমগ্র জমিদারিই রাজশাহী নামে পরিচিত ছিল।[১৭] এক সময় জমিদার উদয়নারায়ণ সুবাদার মুর্শিদকুলী খানকে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকার করে স্বীয় বন্ধু গোলাম মুহম্মদ জামাদারের সহযোগিতায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে মুর্শিদকুলী খান মুহম্মদ জানকে সেনাপতি করে একটি সৈন্যবাহিনী উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বৃহত্তর ফরিদপুর

জেলার রাজবাড়ির নিকট উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গোলাম মুহাম্মদ নিহত ও উদয়নারায়ণ পরাজিত হলে মুর্শিদকুলী খানের কোপের ভয়ে তিনি (জমিদার উদয়নারায়ণ) আত্মহত্যা করেন।[১৮] ফলে ১৭১৪ সনে উদয়নারায়ণের জমিদারির পদ্মা নদীর উত্তর অংশের ভূ-সম্পত্তি রাজশাহী চাকলা ভ্রাতা রঘুনন্দনের সহায়তায় নাটোর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয় এবং রামজীবনের জমিদারিও 'রাজশাহী জমিদারি' নামে পরিচিতি পায়।[১৯] পরবর্তীতে উদয়নারায়ণের সমগ্র জমিদারিই নাটোর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তদানীন্তন বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারি হিসেবে মহারানী ভবানীর জমিদারি সাধারণত 'রাজশাহী' নামেই অভিহিত হয়। রামজীবন জমিদারি লাভের পর নাটোরে রাজবাড়ি নির্মাণ করে তথায় জমিদারি কার্যালয় স্থাপন করেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা রাজশাহী জমিদারি পরিচালনা করেন।

রাজশাহী ইতিবৃত্ত গ্রন্থের লেখক এবনে গোলাম সামাদ তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুনসি গোলাম হোসেন সালীম রচিত ফারসি গ্রন্থ *রিয়াজ-উস-সালাতীন* এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- 'উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় বলা আছে, 'রাজশাহী' বলে একটি চাকলা ছিল যার জমিদার ছিলেন উদিত নারায়ণ'।[২০] তিনি তাঁর গ্রন্থে উদিত নারায়ণের কাছ থেকে জমিদারি হস্তান্তরিত হয়ে নাটোরের জমিদার রামজীবনের নামে বন্দোবস্তকরণ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত এ বর্ণনা প্রদান করেন। সম্ভবত তিনি গোলাম হুসাইন সলীম (নামটি এভাবেই লিখিত) রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের আকবরউদ্দীন কর্তৃক বাংলায় অনুদিত এবং বাংলা একাডেমি কর্তৃক ১৯৭৪ সনে *বাংলার ইতিহাস* শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে তথ্যটি গ্রহণ করেছেন (লেখক তাঁর গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের উৎস উল্লেখ করেননি)। আকবরউদ্দীন অনুদিত এ গ্রন্থে রাজশাহী চাকলার জমিদার ছিলেন আদি নারায়ণ (উদিত নারায়ণ) বলা হয়েছে।[২১] নবাব মুর্শিদকুলী খানের সৃষ্ট তেরটি চাকলার একটি চাকলা ছিল 'রাজশাহী' সম্পর্কিত তথ্যটি খুবসম্ভব এ গ্রন্থ থেকেই এ মতের অধিকারীগণ গ্রহণ করে থাকবেন বলে অনুমিত হয়। কিন্তু শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত গোলাম হুসাইন সলীম এর *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে (বঙ্গানুবাদ) রাজশাহী চাকলার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে রাজা উদয় নারায়ণ রাজশাহী (বানান রাজশাহী) জমিদার ছিলেন।[২২] সুতরাং গ্রন্থটির দুটি বঙ্গানুবাদে রাজশাহী সম্পর্কিত দু-ধরনের তথ্য পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু শেষোক্ত অনুবাদ গ্রন্থের ৬৫ নং পাদটীকায় উল্লেখ রয়েছে রাজশাহীর (বানান রয়েছে রাজশাহী) একটি পরগনার নাম যা গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাজমহলের অনতিদূরে অবস্থিত।[২৩] এটি রামজীবনের প্রধান জমিদারি ছিল এবং এ জমিদারির নামানুসারেই রামজীবনের সমগ্র জমিদারি রাজশাহী নামে আখ্যায়িত হয়। ঠিক একই তথ্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল)* গ্রন্থেও পরিলক্ষিত হয়। এখানে তিনি বলেছেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে সাঁওতাল পরগনার পাকুড় উপবিভাগে প্রাচীন রাজশাহী পরগনা অবস্থিত এবং দেবীনগর (লুপ লাইনে মুরারই রেল স্টেশনের পশ্চিমাংশে অদ্যাপি বর্তমান) ছিল প্রাচীন রাজশাহীর রাজধানী।[২৪] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভূ-ম্যধিকারীগণ এ রাজশাহী জমিদারী ভোগ করে আসছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে পূর্বতন ভূস্বামী-বংশীয় উদয়নারায়ণ ছিলেন এ পরগনার অধিপতি।[২৫] একই সুরে তাল মিলিয়ে *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস* গ্রন্থের লেখক নিখিলনাথ রায় বলেছেন, 'অদ্যাপি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে রাজশাহী নামে একটি পরগণা দৃষ্ট হয়'।[২৬] তিনি (নিখিলনাথ রায়) তাঁর *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* গ্রন্থে আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, এক্ষণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজশাহী নামে এক-একটি পরগনা দৃষ্ট হয় এবং তাও উদয়নারায়ণের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৭] কিন্তু মোগল শাসন ব্যবস্থার তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত *আইন-ই-আকবরীতে* ১৯টি সরকারের ৬৮৮টি পরগনার নাম উল্লেখ থাকলেও রাজশাহী নামে কোন পরগনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পরগনাটি প্রাচীন হলে অবশ্যই *আইন-ই-আকবরীতে* উল্লেখ থাকার কথা। অন্যদিকে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব বন্দোবস্তে পূর্বের বৃহৎ পরগনাগুলোকে ভেঙে যে ১৬৬০টি পরগনা করা হয়েছিল তার সবগুলোর নামও একত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং *রিয়াজ-উস-সালাতিন* এর ৬৫ নং টিকায় উল্লিখিত এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরবর্তীতে নিখিলনাথ রায়ের পরিবেশিত একটি পরগনার নাম

ছিল 'রাজশাহী' তথ্যটি কতটা সঠিক ও যুক্তিনির্ভর তা প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে বলা দুস্কর। কেননা তাঁরা কেউই তাঁদের এ মতের সপক্ষে উপযুক্ত তথ্যাদি বা প্রাপ্ত উৎস প্রদান করেননি। আবার *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* গ্রন্থের লেখক কালীনাথ চৌধুরী ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের দেয়া পদ্মা নদীর দক্ষিণে 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নামে একটি ভূ-ভাগ রাজশাহী প্রদেশের অন্তর্গত ছিল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঐ চাকলার নামে ইংরেজ আমলে রাজশাহী জেলার নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করেন এবং বলেন 'এক্ষণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজশাহী নামে পরগণা দৃষ্ট হয়'।[২৮] তবে কালীনাথ চৌধুরীও রাজশাহী পরগনা নামের তথ্যভিত্তিক কোন উৎসের উল্লেখ করেননি। এখানে হান্টার প্রদত্ত 'নিজ চাকলা রাজশাহী'[২৯] তথ্যটিও খুবসম্ভবত রাজশাহী চাকলা নামকরণের ধারণা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে অনুমিত হয়। অর্থাৎ তথ্য দৃষ্টে মনে হয়, রাজশাহী একটি বড় চাকলা যার পদ্মা নদীর দক্ষিণ ভাগ (রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ) 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নামে অভিহিত।

রাজশাহী শহরের প্রথম বাজার ছিল বোয়ালিয়া বাজার যা সাহেবগঞ্জ বাজার নামে পরিচিত। এটির অবস্থান ছিল বর্তমান আলুপট্টির দক্ষিণে। তবে বর্তমানে বাজারটি আজ পদ্মা নদী গর্ভে বিলুপ্ত।[৩০] সাহেবগঞ্জ বাজার পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী বর্তমান বড় কুঠির উত্তর অঞ্চলে দোকান-পাট বসিয়ে এক নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমান সাহেব বাজার নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এম. জেড. কোম্পানির (মেদনীপুর জমিদারি কোম্পানি) ম্যানেজার মি. অস্টিন স্থায়ী বাজার নির্মাণে এগিয়ে আসেন এবং পাকা দালান ও তৎসংলগ্ন টিনের ছাউনিযুক্ত কিছু দোকান বসার ব্যবস্থা করে এর নামকরণ করেন 'কোম্পানির সাহেব বাজার'। কিন্তু শহরবাসী অস্টিন সাহেবের এ নামকরণ সম্পূর্ণরূপে সাদরে গ্রহণ না করে 'কোম্পানি' শব্দটি তুলে দিয়ে কেবল 'সাহেব বাজার' নামকরণ করেন যা বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।[৩১] অন্যদিকে ইংরেজ সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সাহেব বাজারের বিপরীতে ইংরেজ কোম্পানি বিরোধী রাজশাহী জেলার জমিদাররা বিশেষত নাটোর, পুঠিয়া ও দিঘাপাতিয়ার রানীরা স্থানীয় রেশমপট্টিতে সাহেব বাজারের অনুরূপ আরেকটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন যা 'রানী বাজার' নামে পরিচিত।[৩২]এ বাজার প্রতিষ্ঠায় পুঠিয়ার রানী শরৎ সুন্দরী ও হেমন্তকুমারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। শুধু বাজার প্রতিষ্ঠাই নয় বরং রাজশাহী শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে পুঠিয়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া, দুবলহাটি, বলিহার ও কাশিমপুরের জমিদারদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মূলত তাঁরাই তদানীন্তন ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সাথে থেকে রাজশাহী শহরের দ্রুত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আর্দশ নগর রূপান্তরের প্রতিবন্ধকতা

একটি দেশ, একটি অঞ্চল, একটি সমাজ বা পরিবার এমনকি কোন ব্যক্তি তার সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছাতে চাইলে প্রতি পদক্ষেপে তার প্রতিবন্ধতা আসবে এটাই স্বাভাবিক। সে সকল বাধা-বিপত্তি দুরিভূত করেই তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আদর্শ নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজশাহীর সামাজিক, রাজনৈতিক, বরেণ্য ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম চলছে যেমনঃ রাস্তাঘাট, শিক্ষা-ব্যবস্থা, বর্জ্য ও পয়নিষ্কাশন, খাল বা নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যানজট নিরসন প্রভৃতি। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যতটুকু রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা রাখার প্রয়োজন ছিল, তা রাখতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু কেন সক্ষম হয়নি বা হচ্ছে না অথবা উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি সে সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে গবেষণা অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের জনগনের মতামতের ভিত্তিতে এর প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নত করে তা সারণী ও চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

সারণি-১

বাধার কারণসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অর্থনৈতিক	১০ জন	১০%
জনগণের অসর্তকতা/ সামাজিক অসর্তকতা	২০ জন	২০%
রাজনৈতিক	৬০ জন	৬০%
সরাসরি নিয়ন্ত্রণ/ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব	১০ জন	১০%
মোট	১০০ জন	১০০%

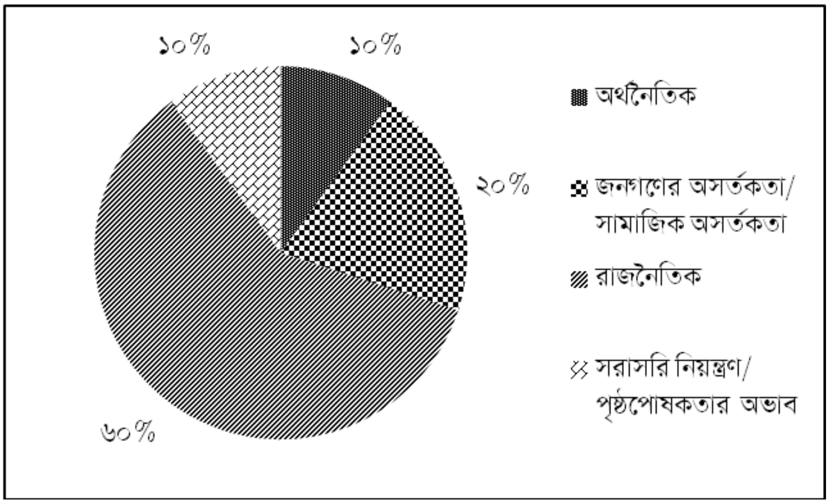

চিত্র: ১

উপর্যুক্ত সারণি- ১ ও চিত্র -১ এর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে রাজশাহীকে আদর্শ নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো অত্র গবেষণা অঞ্চলের ১০০ জন বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামতের উপর জরিপ করে ১০জন ব্যক্তি বলেছেন অর্থনৈতিক সমস্যার কথা, ২০ জন মন্তব্য করেছেন জনগনের সচেতনতার অভাব, ৬০ জন বলেছেন রাজনৈতিক সমস্যার কথা এবং ১০ জন বলেছেন প্রশাসনিক পদক্ষেপের কারণ। তবে উল্লেখ্য যে, নগরের অধিকাংশ নাগরিক মনে করেণ রাজনৈতিক দিক থেকেই নগর উন্নয়নে বেশী বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

রাজশাহীকে আদর্শ নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি এমনকি সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর চেষ্টা বা আন্তরিকতার কোন ত্রুটি নাই। এর পরও যে সকল সমস্যার কারণে এ মহানগরীর নাগরিক সমাজ প্রতিনিয়তই বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন তা মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সারণি ও চিত্রের আলোকে দেখানো হলো:

সারণি- ২

প্রধান সমস্যাসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অটো চালিত যান্ত্রিক সমস্যা	৫০ জন	৫০%
পানি নিষ্কাশন সমস্যা	০৫ জন	০৫%
আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সমস্যা	১০ জন	১০%
জোর পূর্বক ফুটপাত দখল	২০ জন	২০%
মশা-মাছির সমস্যা	১০ জন	১০%
পরিবেশগত সমস্যা	০৫ জন	০৫%
মোট	১০০ জন	১০০%

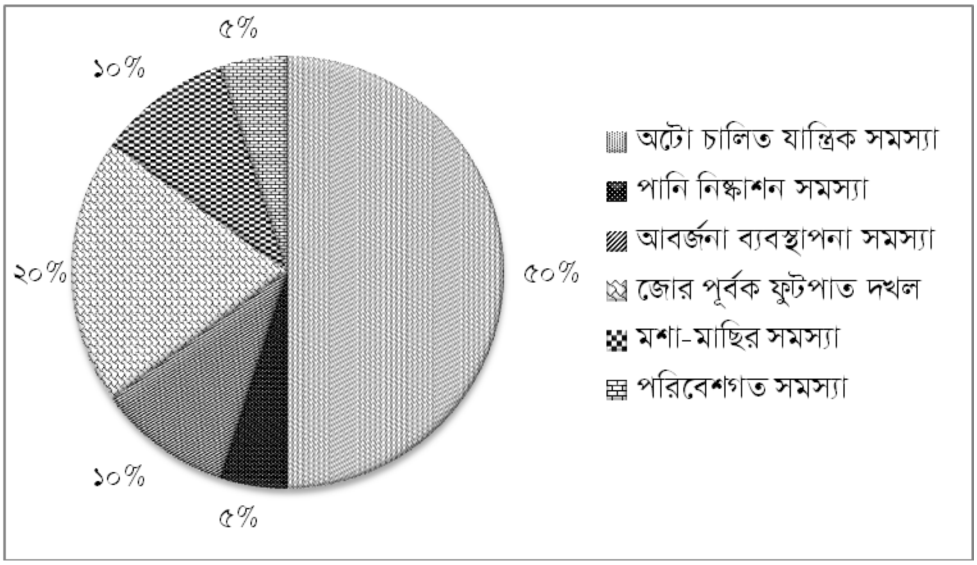

চিত্রঃ ২

উপর্যুক্ত সারণি- ২ ও চিত্র - ২ এর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে রাজশাহীকে আদর্শ নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো অত্র গবেষণা অঞ্চলের ১০০ জন সকল স্তরের জনগনের মতামতের উপর জরিপ করেঅটো চালিত যান্ত্রিক সমস্যার কথা ৫০ জন, পানি নিষ্কাশন সমস্যা ০৫ জন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সমস্যা ১০ জন, জোর পূর্বক ফুটপাত দখলের অভিযোগ এনেঝেন ২০ জন. মশা-মাছির সমস্যা ১০ জন এবং পরিবেশগত সমস্যর কথা ০৫ জন বলেছেন।

অটো চালিত যান্ত্রিক সমস্যাঃ প্রাচীনকালে বিশ্ব জুড়ে সভ্যতা গড়ে উঠে নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক। কালের বিবর্তনে সড়ক পথ ও রেলপথের উন্নয়ণে সড়কের পাশেও রেলের ধারেও গড়ে উঠেছে সভ্যতার নিদর্শন। যে রাষ্ট্র ও তার জনগণ যত বেশী সচেতন ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে রাষ্ট্র ও সচেতন সমাজ পরিবেষ্টিত

অঞ্চলটি তত বেশী সমৃদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট এলাকার প্রশাসক, প্রশাসন যন্ত্র, আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও আইন সম্পর্কে জনগণের যথার্থ জ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে অত্র এলাকার সৌন্দর্য্য। যা কোন একক বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সার্বিক বিষয়ের উপর এবং তা একদিনেনয় দীর্ঘ দিনে বিকশিত হয়।

রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজারে অটো চালিত যানবহনের সৃষ্ট যানজোটের চিত্র।

রাজশাহী মহানগরী পৃথিবীর অন্যতম একটি ছোট্ট মহানগরী। যে মহানগরীতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাবার জন্য কোন বাসের ব্যবস্থা নেই। একমাত্র অটোরিক্সার মাধ্যমে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে জনগণকে যেতে হয়। কিন্তু কি পরিমাণ অটো এই শহরের জন্য যথেষ্ট তার সঠিক পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য। তবে বাস্তব চিত্র যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশী অটো রাজশাহীর রাজপথে চলছে। এর চালকরা প্রশিক্ষণ বিহীন। প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে তাদের অধিকাংশের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ধারণা নেই। পাশাপাশি অটোরিক্সার আকার আকৃতি ত্রুটিযুক্ত হবার কারণে প্রায়শই নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এজন্য যাত্রী-সাধারণকেও পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ। যা জরিপে ৫০% লোকই এর বিপক্ষে অভিমত প্রদান করেছেন। কারণ শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে এ যানবহনটি।

ভাড়া কম হবার ফলে শহরের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সুবিধা সৃষ্টি করেছে অপরদিকে সংখ্যাধিক্যতার কারণে শহরে যানজটেরও কারণ হয়েছে। তবে শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে

অটোরিক্সা যেমন একদিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অপরদিকে অটোরিক্সা আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান বিদ্যুৎও শোষণ করছে অবিরত। তাই অটোরিক্সার সংখ্যা কমানো এখন সময়ের অনিবার্য দাবী।

পানি নিষ্কাশন সমস্যা: রাজশাহী মহানগরীতে নানা প্রকার সমস্যাকে সামনে রেখে ১০০ জন বিভিন্ন পেশার জনশক্তির মতামত নিয়ে শতকরা ০৫ জন ব্যক্তি পানি নিষ্কাশন সমস্যার কথা বলেছেন। যা এই সমস্যাকে মহানগরীর জন্য অধিকাংশই ব্যক্তি এটা মৌলিক কোন সমস্যা নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সমস্যা: রাজশাহী সিটিকর্পোরেশন এই শহরকে আবর্জনা ও দূষণমুক্ত করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা দৃশ্যমান। এর পরও শতকরা ১০ ভাগ জনগন মনে করেন এই ব্যবস্থাপনা আরও আধুনিক হলে এই মহানগরী একটি আদর্শ নগরের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যেত। এমনকি এসকল আবর্জনাগুলো দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সার তৈরী করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

রাজশাহী শহরের প্রধান সড়কে অসাধু ব্যবসায়ীদের রক্ষিত ইট-খোয়া-বালি

জোরপূর্বক ফুটপাত দখল: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এই অঞ্চলটি একটি আধুনিক নগরে রুপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে প্রধান রাস্তার দু'ধারে সাধারণ জনগণের চলাচলের জন্য ফুটপাত বা সরু রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সে রাস্তার ধারের ব্যবসায়ীগণ তাদের নিজস্ব মালামাল সেই ফুটপাত বা সরু রাস্তার উপর রেখে পরিবেশ দূষিত করছে যা সাধারণ জনগণের চলাচল এবং রাস্তা পারাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। প্রধান রাস্তার কোন ফাঁকা জায়গা থাকলে প্রশাসনের নাকের ডগায় অসাধু ব্যবসায়ীগণ পেশি শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সেখানে ইট-বালু-খোয়া রেখে ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছে। ফলে নানা ধরনের দুর্ঘটনা, পরিবেশ দুষণ এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে। জরিপে শতকরা ২০ ভাগ জনসাধারণ এর তীব্র বিরোধীতা করে প্রশাসনকে আরও যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন।

রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার অবৈধভাবে দখলকৃতফুটপাত

মশা-মাছির ও পরিবেশগত সমস্যা: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মশা নিধন কর্মসূচি অত্র অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে এই প্রশাসন মশা নিধন কর্মসূচিতেও সফলতা বয়ে আনতে পারছেনা। এক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ সিটিবাসিই মনে করেন রাজশাহী একটি আদর্শ নগরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মশা-মাছি এবং ০৫ ভাগ মনে করেন পরিবেশগত কারনেই এটি সম্ভব হচ্ছে না।

উত্তরণের উপায়

একটি নগর বা অঞ্চলকে আধুনিক বা আদর্শ এলাকায় রূপান্তর করতে হলে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এর মধ্যে জনগনের মতামতের ভিত্তিতে মৌলিক বিষয়গুলো সারণী - ৫.৩ ও চিত্রের- ৫.৩ মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হলো:

সারণী: ৩

সমাধানের বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার %
অটো চালিত যানবাহন পরিমিত রাখা	৪০ জন	৪০%
রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা	৩০ জন	৩০%
জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ	২০ জন	২০%
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ	১০ জন	১০%
মোট	১০০ জন	১০০%

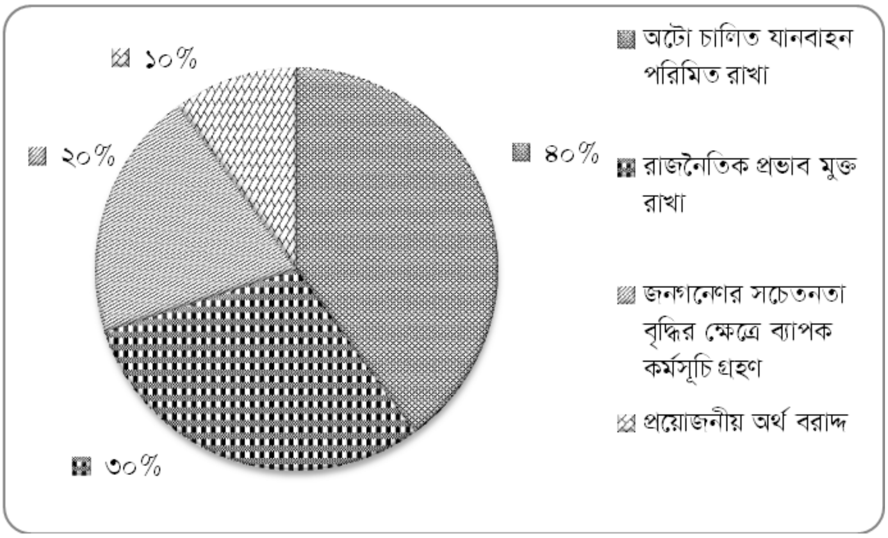

চিত্র: ৩

রাজশাহী মহানগরীকে আদর্শ নগর রূপান্তরের ক্ষেত্রে অত্র অঞ্চলের ১০০ জনের মতামতের উপর জরিপ করে মৌলিক ৪টি দিক তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ৪০ ভাগই জনগণ মনে করেন অটো চালিত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। ৩০ ভাগ জনগণ মনে করেন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছাড়া কোন অঞ্চলই উন্নয়নের দারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারবে না। কাজেই দলমত নির্বিশেষ সকলকেই এক্ষেত্রে একমত হতে হবে। ২০ ভাগ জনগোষ্ঠী মনে করেন জনগণকে সচেতন হতে হবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এমনকি সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। ১০ ভাগ জনগণ চায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। একটি অঞ্চলকে আদর্শ নগরে রূপান্তর করতে চাইলে সে এলাকায় সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং সদিচ্ছা ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

উপরোক্ত মৌলিক বিষয়গুলোছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে নজর রাখলে দ্রুত রাজশাহী মহানগরীকে একটি আদর্শ নগরীতে উন্নিত করা সম্ভব হবে।

১। অটো চালিত যানবাহন পরিমিত রাখা।

২। রাজশাহী মহানগরীকে একটি আদর্শ নগরীতে পরিণত করার স্বার্থে সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা।

৩। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লিফলেট, পোস্টারিং, প্রয়োজনে মাইকিংসহ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ।

৪। রাজশাহী মহানগরীকে একটি আদর্শ নগরীতে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ।

৫। অবৈধভাবে দখলকৃত ফুটপাত বা সরু রাস্তাগুলি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান টিম বা আদালতের মাধ্যমে সেগুলোর মিমাংসা করা।

৬। পুরাতন অটো চালিত যানবাহনের লাইসেন্স বাতিল করে নতুনভাবে রাজশাহী নগরের চাহিদানুযায়ী অটো যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান।

৭। অটো ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান।

৮। রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজারের প্রধান সড়কগুলোতে অটো চালিত যানবাহন প্রবেশের অনুমতি না দেয়া।

৯। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় যেমনঃ রেলস্টেশন মোড়, রেলগেট, বর্ণালী, লক্ষ্মীপুর, সাহেব বাজার প্রভৃতি স্থানে কার-মাইক্রো চালিত ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা গেলে শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধিসহ যানজট কমানো সম্ভব হবে।

১০। ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী বা হকারসদের জন্য একটি হকার মার্কেট নির্মাণ করে সাহেব বাজারসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে হকারস মুক্ত করে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যাবে।

১১। রাজশাহী শহরের দখলকৃত সরকারি সম্পত্তি জবর দখলমুক্ত করে তা জনসাধারণের জন্য বিনোদন কেন্দ্র বা শপিংমল নির্মাণ করে সেগুলো স্বল্প মূল্যে বেকার যুবকদের কাছে হস্তান্তর করলে সে সকল সম্পত্তি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ রাজশাহী একটি আদর্শ ও পরিচ্ছন্ন নগরীতে রুপান্তরিত হতে সহযোগিতা লাভ করবে।

১২। রাজশাহীকে একটি আদর্শ নগরে উন্নতি করতে হলে অত্র অঞ্চলের সকল স্তরের নাগরিক সমাজকে মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে দল-মত নির্বিশেষে একাযোগে সহযোগিতা করতে হবে।

১৩। ঘর-বাড়ি বা দোকান পাট নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধান মেনেই যথাযোথ প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে আধুনিক রাজশাহীর নগরায়নের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে।

১৪। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (রাসিক)-এর নিয়ম ভঙ্গকারী জনগণের বিরুদ্ধেও শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাসিক-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তৎপরতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতিরোধে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫। রাসিক-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে করে তারা তাদের দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় এবং রাজশাহী মহানগরীকে একটি আদর্শ নগরীতে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

১৬। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজের প্রচারণা এমনভাবে করতে হবে যাতে শহরের যুব সম্প্রদায় লেখা-পড়ার পাশা-পাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে নগরীর বেকারত্ব ও মাদকাসক্তির হার অনেকটা কমে আসবে এবং রাজশাহী মহানগরী আদর্শ নগরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

উপসংহার

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং জনবহুল দেশসমূহের বাংলাদেশ অন্যতম। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্রের পাশাপাশি সীমিত জমিতে বিপুল জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট ২৩.৩৯% জনসংখ্যা হলো নগরীয় জনসংখ্যা। যেহেতু বাংলাদেশে দ্রুত হারে জনগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে অতি দ্রুত নগরায়ন সংঘঠিত হচ্ছে, সেহেতু বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধার উপর। যেহারে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০২০ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ৩৮.২% জনগোষ্ঠি শহরে বসবাস করবে। নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ ভৌত অবকাঠামোর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে না পারলে বাংলাদেশে আদর্শ নগর উন্নয়নতো দূরের কথা আধুনিক নগরায়ন বা নগর উন্নয়নে এক অস্বাভাবিক, ছন্দহীন ও অসহনীয় রূপ পরিগ্রহ করবে। বাংলাদেশে অতি দ্রুত নগরায়ন ঘটছে। অভাব অনটনের কারণে এবং কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ছাড়াও এদেশের গ্রামের মানুষ বহুবিধ কারণে ব্যাপকহারে গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরাঞ্চলে ব্যাপক জনসমাগম হচ্ছে ঠিকই কিন্তু একটি শহরকে আধুনিক বা আদর্শ নগরীতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কোন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না। যে হারে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক সে হারে শহরের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কাজেই আদর্শ নগর বা আধুনিক নগরায়নের মাত্রার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের নিম্ন নগরায়িত দেশসমূহের একটি। আদর্শ নগর বিনির্মাণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। এ দিকে গভীর মনোযোগ দিলে বাংলাদেশের নগরায়ন ভিন্ন মাত্রা পাবে এবং তা টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] মোঃ আনসার আলী খান, *পৌরসভা ম্যানুয়েল* (ঢাকা: বাংলাদেশ ল বুক কোম্পানি, ২০০০), পৃ. ৪০৪-৪০৫।

[২] কুন্তলা লাহেড়ী দত্ত, *ভূগোল চিন্তার বিকাশ* (কলিকাতা: দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট. লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ৩৯-৪০।

[৩] *তদেব*, পৃ. ৪৫।

[৪] কে. মউদুদ ইলাহী ও সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী, *নগর ভূগোল : সাম্প্রতিক ধারা* (ঢাকা : ডেল্টা বুক্স, ২০০৫), পৃ. ২৭; আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ২১০।

[৫] কাজী মারুফা, *নগর ভূগোল ও নগর পরিকল্পনা* (ঢাকা: সুজনেসু প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ১০-১১।

৬ Fazal Karim, "The Role of Municipal Administration", M.A. Husain Khan (ed.), *Problems of Municipal Administration* (Dacca: National Institute of public Administration, 1967), pp. 48-50; quoted M.K.U. Molla, "Growth and Development of Rajshahi Municipal Town", S.A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1983), pp. 135-138; Abdul Latif, "Growth and Development of Kotchandpur as a Municipal Town, 1883-1947", Unpublished M. Phil Thesis (Rajshahi: The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1985), p. 5-15; আবু তাহা, *জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল* (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশক, ২০০২), পৃ. ৭-১০।

৭ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (বগুড়া: কাজী প্রকাশনী, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১০৩-১০৫।

৮ এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী: প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৯।

৯ ব্লকম্যান এ ধরনের মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, 'শাহী রাজা' অর্থাৎ হিন্দু রাজার মুসলমান সিংহাসনে অধিরোহন যা কেবল রাজা কংসের (রাজা গণেশ) রাজত্বকালকেই নির্দেশ করে। রাজা গণেশ গৌড়ের মুসলিম শাসনকর্তাকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজশাহী নামের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। দ্রষ্টব্য: কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)*, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা: ১৩১৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৫, (পাদটীকা-১)।

১০ খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬), পৃ. ২৪৯।

১১ মি. বেভারিজ এ ধরনের মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, রাজশাহী নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। *আইন-ই-আকবরী*-তে রাজশাহী পরগনার নাম নেই। প্রাচীন রাজশাহী পরগনা ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বে রাজা কংসের (রাজা গণেশের) রাজ্য হতে বহুদূরে। সুতরাং রাজা গণেশ নয় বরং বীরভূমের 'রাজা' উপাধিধারী মুসলিম রাজগণের নাম হতে রাজশাহী নামের উদ্ভব ঘটতে পারে। দ্রষ্টব্য: বিমলাচরণ মৈত্রেয়,*পুঠিয়া রাজবংশ* (কলিকাতা: প্যারিস আর্ট প্রেস, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৯৭।

১২ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্লকম্যান ও বেভারিজের মতামত খণ্ডন করে বলেন, মহারাজ মানসিংহ আগমহনের নাম রাজমহল দিয়ে এখানে রাজধানী ও দুর্গাদি স্থাপন করেন। প্রাচীন রাজশাহী পরগনা রাজমহলের অনতিদূরে অবস্থিত হওয়ায় 'শাহী রাজা' মানসিংহের নামেই রাজশাহী নামের উৎপত্তি হতে পারে। দ্রষ্টব্য: বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৬-২৯৭। কালী প্রসন্ন বাবু বলেছেন যে, রাজশাহীর নাম রাজা মানসিংহ কর্তৃক প্রদত্ত। কিন্তু বাংলার কোন ইতিহাসে তার কোন সমর্থন বা উল্লেখ নেই। দ্রষ্টব্য: কাজী মোহাম্মদ মিছের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭।

১৩ কয়েকটি পরগনার সমষ্টি বা একীভূত জেলা হলো চাকলা। এটি একটি রাজস্ব ইউনিট।

১৪ কাজী মোহাম্মদ মিছের, পূর্বোক্ত, পৃ. 5; Md. Moksudur Rahman, 'General Administration of Rajshahi District in Historical Perspective', *The District of Rajshahi Its Past And Present,* (ed.) S.A., Akanda, p. 113.

১৫ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; Md. Moksudur Rahman, *op.cit.*, p. 113.

১৬ Md. Moksudur Rahman, *op.cit.*, p. 114.

১৭ কালীনাথ চৌধুরী, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলিকাতা: স্কুল বুক প্রেস, ১৯০১), পৃ. ১০৭।

১৮ আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, (বঙ্গানুবাদ) মোকাদ্দেসুর রহমান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ৮৫; Md. Moksudur Rahman, *op.cit.*, p. 114; এবনে গোলাম সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২।

১৯ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬।

২০ এবনে গোলাম সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২।

২১ বিস্তারিত, গোলাম হুসাইন সলীম, *বাংলার ইতিহাস*, আকবরউদ্দীন অনুদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ২০০।

২২ গোলাম হুসাইন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (বঙ্গানুবাদ), শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৬৭।

২৩ *ঐ*, পাদটীকা- ৬৫, পৃ. ২৪৬।

২৪ বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৭।

[২৫] মোঃ মাহবুবুর রহমান সম্পাদিত, ড. কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "রাজশাহী শহর ও তার নামকরণ: একটি পর্যালোচনা", *রাজশাহী মহানগর : অতীত ও বর্তমান* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

[২৬] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* (কলিকাতা: ১৩১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৮৯।

[২৭] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* (কলিকাতা: ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, ১৯৭৮), পৃ. ১২।

[২৮] কালীনাথ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২-৩; কালীনাথ চৌধুরীর গ্রন্থটি ১৯০১, নিখিলনাথ রায় রচিত *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস* গ্রন্থটি ১৯০২ এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি ১৯০৮ সনে প্রকাশিত বিধায় পরগনার নাম রাজশাহী তথ্যটি সম্ভবত কালীনাথ চৌধুরীর গ্রন্থেই প্রথম সংযোজিত হয়, কিন্তু সেখানে তথ্যের উৎস দেয়া হয়নি।

[২৯] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, Districts of Rajshahi and Bogra,* Vol.- VIII (ondon: Trubner and Co. 1876), p. 20.

[৩০] মুহম্মদ আব্দুস সামাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬।

[৩১] *ঐ*, পৃ. ৯৭।

[৩২] *ঐ*, পৃ. ৯৭-৯৮।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন ও আলজেরিয়দের প্রতিরোধ আন্দোলন

মো: রবিউল ইসলাম*

Abstract: Algeria was colonized by the French from 1830 and had been an integral part of France since the end of the 19th Century. From the beginning the continuing colonization led to fierce resistance by local rulers and the population. The most important resistance leader was emir (Commander) Abdelkader (Add al-Qadir), who managed for some time to maintain control over much of Algeria. Abdelkader forces were, however, defeated by overwhelming French military force. Even before Abd-al-Qadir entered the scene, Ahmad Bey had extended his authority over much of the Beylik of Constantine and blocked French expansion there until 1837. Rebellions occurred regularly in Kabylia, including the uprising led by Sheikh Mokrani in 1871. In the Southern Shara, Tuareg forces, too, resisted the French army, which was unable to control the desert regions until the Tuareg were defeated in 1902. Nationalism began to spread in Algeria during the first decades of 20th century. The colonial policies led to the growth of nationalism in Algeria. But the aim of this paper is to analysis the primary resistance movement how influenced after the establishment of Nationalist movement of the Algeria.

ভূমিকা

উনিশ শতকের শুরুতে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন এবং বিশ শতকের মধ্য পর্যন্ত এর স্থায়ীত্ব আলজেরিয়ার সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ও বৈচিত্র্যময় ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে আলজেরিয় জনগোষ্ঠীর যেমন কোন জাতীয় পরিচয় ছিল না, ঠিক তেমনি আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনুরূপ চেতনাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠেনি। এটি না হবার পেছনে কারণ হচ্ছে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ বিশ্বাস অর্জন করেছিল যে, নতুন শাসক যিনিই হোন এবং তার জাতীয়তা ও ধর্ম যাই হোক না কেন, তাদেরকে স্থানীয় জীবন বিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করতে দেয়া হবে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন শাসকদের সময়কালে তারা এ অভিজ্ঞতাটি অর্জন করে। কিন্তু ফরাসিরা আসার পর এর ব্যত্যয় ঘটে। ঔপনিবেশিক শক্তি আলজেরিয় জনগণের মাতৃভাষার প্রতি আঘাত হানে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও তারা পরিবর্তন করার চেষ্টা চালায়। যা স্থানীয় জনগণ নীরবে মেনে নেয়নি, বরং প্রয়োজনবোধে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে নতুন শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লক্ষ্য করা যায় এবং ফরাসিদের পতন পর্যন্ত ঐ প্রবণতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ এবং তাদের সংগঠনের ক্রিয়াপদ্ধতি এবং নেতৃত্ব কখনো একই স্বার্থে এবং একইভাবে পরিচালিত ও সংগঠিত হয়নি। প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন স্বার্থ ও নতুন নতুন বিষয় সামনে আসে। তবে প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্রিয়াপদ্ধতি বা স্বার্থ যাই হোক না কেন এ আন্দোলনগুলো আলজেরিয়া জনগণের মধ্যে একটি নতুন চেতনার জন্ম দেয়। সেটি হলো জাতীয়তাবাদী চেতনা। আর এটি বিশ্লেষণ করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পটভূমি

ভূমধ্যসাগরের উপকূলের মাগরিবের দেশ আলজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। আয়তনের দিক থেকে আলজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম দেশ। আলজেরিয়া শব্দটি ফরাসি Algeric, (উচ্চারণ আলঝেরি), আরবি আলজাজির (the Islands) থেকে এসেছে, যার বাংলা অর্থ 'দ্বীপ'। উল্লেখ্য যে, আলজেরিয়ার রাজধানীটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বন্দর দ্বারা বেষ্টিত।[১]

আরব- বারবার অধ্যুষিত দেশ আলজেরিয়া। ১৯৬৩ সালে সংবিধানিকভাবে আরবিকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে আরবি ভাষাভাষীদেরকে বলা হয় 'আরব' আর বারবার ভাষাভাষীদের বলা হয় 'বারবার'। আরজিরিয়া রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পেছনে বারবার উপজাতির পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের লোকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত ছিল-কাবিলী (Kabyle), শাবিয়্যা (Shawiyya), মজাবীরা (Mzabits) এবং সাহারা মরুভূমি থেকে আগত লোকজন, যারা তুয়ারেগ (Tuareg)[২] নামে পরিচিত।

দীর্ঘসময় ধরে আলজেরিয়ায় ইউরোপীয়দের আগমন ও অবস্থান ঘটে। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপীয়দের অধিকাংশই যার যার দেশ চলে গেলেও এখনও কিছু সংখ্যক ফরাসি, স্পেনীয় ও ইতালীয়ান অবস্থান করছে এবং তারা এখানকার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনও করছে। আলজেরিয়ায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অবস্থান করলেও ইসলাম হচ্ছে প্রধান ধর্ম। সংক্ষিপ্ত আকারে বারবারদের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো ৮১৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ফিনিশীয়রা যখন এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে, তারও পূর্বে বারবাররা এ অঞ্চলে তাদের আবাস ভূমি গড়ে তুলেছিল। ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় উপনিবেশ ছিল উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ (বর্তমান আলজেরিয়া)। আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত কার্থেজ ছিল সমুদ্রতীরাঞ্চলীয় এক সমৃদ্ধ নগরী। সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ফিনিশীয় শাসনের রাজধানী ছিল কার্থেজ। কার্থেজ সম্পূর্ণরূপে ফিনিশীয়দের দখলে আসার পর বারবাররা কার্থেজীয়ানদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।[৩]

ইতিহাসে তিনটি পিউনিক যুদ্ধ সংগঠিত হয়, যার প্রথমটি সংগঠিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪-২৪০ অব্দে, দ্বিতীয়টি সংগঠিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২১৮-২০২ অব্দে এবং তৃতীয়টি সংগঠিত হয় ১৪৯-১৪৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ সম্পূর্ণরূপে রোমানদের নিকট পরাজিত হয়ে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তবে কার্থেজে রোমানরা একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল পূর্ব আলজেরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত নুমিদিয়া রাজ্য (Numidia)। কার্থেজের দূর্বলতার সুযোগে লুমিয়ানরা সেখানে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। এ সময় লুমিয়ানদের মোকাবিলা করার জন্য তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের একটি রোমান সামরিক বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় পাঠানো হয়, যা ২৮,০০০ সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাহায্যকারী সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় (১৪৯-১৪৬ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে) রোমানরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং নিষ্ঠুরভাবে কার্থেজকে ধ্বংস করে। কার্থেজকে ধ্বংস করার সাথে সাথে রোমানরা বারবারদেরও দমন করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় ইউরোপের বর্বর ভ্যান্ডালরা স্পেন হয়ে উত্তর-আফ্রিকা আক্রমণ করে এবং অন্যান্য বারবারদের সাথে মিশে উত্তর-আফ্রিকায় বসতি গড়ে তোলে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমানরা উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিচ্যুত হলেও, উত্তর তিউনিসিয়ায় অবস্থিত কার্থেজীয়দের আবাসভূমিতে একটি রোমান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর রোমানদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফলে মাসিনিসার[৪] মৃত্যুর পর তার রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং পরবর্তী ১৫০ বছরে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় ভূ-খন্ডে রোমান শাসন বিস্তার লাভ করে।[৫] খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুরুতে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এটি নামমাত্র রোমান শাসনের যুগ

হিসেবে পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী আরবরা উত্তর-আফ্রিকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র অঞ্চল থেকে রোমান শাসনের অবসান ঘটে।

ফরাসি অনুপ্রবেশ এবং আলজেরিয়দের প্রতিরোধ

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবরা উত্তর-আফ্রিকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলে রোমান শাসনের অবসান ঘটে। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনমলে ওকাবা বিন নাফির নেতৃত্বে ৬৭০ সালে আলজেরিয়ায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন উমাইয়া, আববাসীয়, আগলাবি, ফাতেমি ও মুয়াহিদিনদের দ্বারা শাসিত হবার পর আলজেরিয়া ১৫৫৩ সালে তুর্কি শাসনের অধীনে আসে। আধুনিক যুগের শুরু থেকে আলজেরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স ১৮৩০ সালে উত্তর-আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়া দখল করে। উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসিদের তিনটি ঔপনিবেশের মধ্যে আলজেরিয়া ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ববৃহৎ উপনিবেশ। এখানে প্রায় ১৩২ বছর তাদের শাসন চালু রাখতে সক্ষম হয়। এ দীর্ঘ সময়ে আলজেরিয়া ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনার পাশাপাশির নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করলেও ১৯১৯ সালে এসে আলজিয়ার্স, ওরান এবং কনস্ট্যান্টাইন নামক তিনটি বিভাগে ভাগ করে একে কেন্দ্রীয় ফরাসি শাসনের আওতাভুক্ত করে।[৬] বস্তুত এদেশে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় পর্যায়ক্রমে এবং ধাপে ধাপে।

১৮৩০-১৯৬২ সময়কালে আলজেরিয়ায় ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনকে ৪টি পর্যায়ে বা স্তরে ভাগ করা যায়। পর্যায়গুলো হলো:

১। ফরাসিদের অনুপ্রবেশ এবং আলজেরিয়দের প্রতিরোধ যুগ: ১৮৩০-১৮৭০

২। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে আলজেরিয়া: ১৮৭০-১৯৩০

৩। আলজেরিয় জাতীয়তাবাদের উত্থান: ১৯৩০-১৯৫৪

৪। যুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন: ১৯৫৪-১৯৬২

বর্তমান প্রবন্ধে উর্পযুক্ত চারটি পর্যায়ের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

ফরাসিদের অনুপ্রবেশ

খ্রিষ্টীয় তের শতকের শেষার্ধে বাইজান্টাইন সাম্রাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ জয় করে পুরাতন সেলজুক রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর আনাতোলিয়া অঞ্চলে উসমানীয় তুর্কিগন নিজেদের জন্য একটি রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। ক্রমান্বয়ে এশিয়া ও ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের পর তুর্কি শাসকগণ উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করে।

আফ্রিকার রাজ্যগুলোর মধ্যে আলজেরিয়া সর্বপ্রথম উসমানীয় সৈন্যদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ১৫১৭ সালে উসমানীয় সেনাপতি খায়ের-আল-দিন বারবারোসা এবং তার ভাই আরুজ (Aruj) মিশর জয় করে আফ্রিকা মহাদেশে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করেন।[৭] ১৫১৮ সালে খায়ের-আল-দিনের নেতৃত্বে উসমানীয় বাহিনী আলজেরিয়া অধিকার করে।[৮] তার এ সাফল্যে কনস্টান্টিনোপলের সরকার সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজকীয় 'বেলারবে' উপাধিতে ভূষিত করে এবং আলজেরিয়ার শাসনব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। কিন্তু, দক্ষিণ ইউরোপের কাছাকাছি এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের রাজধানী ও ইসলাম ধর্মের মূলকেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত হবার ফলে এখানে ইসলামের ঐতিহ্য চিরকালই দূর্বল ছিল। তাছাড়া বারবার ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রথম থেকেই এসব রাজ্যকে তুর্কি সাম্রাজ্যের মূলনীতির পরিবর্তে

একটি স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। যার ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তুর্কি সুলতানের দ্বারা মনোনীত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রায় স্বাধীন শাসকের মতোই এসব অঞ্চল শাসন করতেন। প্রতি বছর কনস্টান্টিনোপলে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদান ছাড়া সুলতানের সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। সতের শতকে উসমানীয় সুলতানদের শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করলে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রদেশগুলো স্থানীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নেতৃত্বে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে। পাশা, দে, বে, প্রভৃতি অভিধাযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ধীরে ধীরে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। উসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যর্থতা বা দূর্বলতার সুযোগে দূরবর্তী অঞ্চলের শাসকেরা যেমন বিদ্রোহ করে ঠিক তেমনি এসব আঞ্চলিক শাসকদের অর্থনৈতিক ও সামরিক দূর্বলতার কারণে ইউরোপীয় শক্তিধর দেশগুলো এখানে প্রভূত্ব করার সুযোগ পায়।

আরব ভূ-খন্ডের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিই প্রথম উসমানীয়দের হাতছাড়া হয়ে যায়। আলজেরিয়াই প্রথম আরব রাষ্ট্র, যারা উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৮৩০ সালে। ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্স এ সময় আলজেরিয়াকে দখল করে নেয়। তবে ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখল করার পশ্চাতে বেশ কিছু কারণ ছিল। অবস্থানগত কারণে প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর আফ্রিকার বারবার রাজ্যগুলোর আয়ের প্রধান উৎস ছিল জলদস্যুতা। জলদস্যুতার এ প্রশ্ন নিয়েই ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলজেরিয়ার বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। জলদস্যুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো প্রথমদিকে নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ইউরোপীয়রা এ সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার শর্তে জলদস্যুদের হাত থেকে বাণিজ্যিক এবং যাত্রীবাহী জাহাজগুলো নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমাগতভাবে জলদস্যুদল চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে লুণ্ঠনকাজে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করেনি। কালক্রমে ইউরোপীয় দেশসমূহ জলদস্যুদের হাতে এতটাই নাজেহাল হতে থাকে যে, ভিয়েনা কংগ্রেসের পর তারা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি লর্ড এক্সমাউথের (Lord Exmouth) নেতৃত্বে ১৮১৬ সালে উত্তর আফ্রিকা উপকূল অবরোধ করে। এর ফলে ত্রিপোলী ও তিউনিসিয়া জলদস্যুতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৯] কিন্তু আলজেরিয়া তা মানতে অস্বীকার করায় ইংরেজ নৌবাহিনী আলজেরিয়ার উপকূলে কোন বিরতি ছাড়াই নয় ঘন্টা বোমাবর্ষণ করে।[১০] ফলে আলজেরিয়া ৩০০০ ইউরোপীয় বন্দি এবং দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করে। ঐতিহাসিকভাবে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর তুলনায় সতের শতক হতে ফ্রান্সের সাথে আলজেরিয়ার ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ফলে ১৮১৬ সালে ফরাসিরা ব্রিটিশদের নেতৃত্বে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যে অভিযান তাতে অংশ গ্রহণ করেনি।[১১]

১৮২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আলজেরিয়ার জলদস্যুদের তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্পৃহাও বৃদ্ধি পায়। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের পর দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লুই ফিলিপ। ফ্রান্সের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ফিলিপও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। উত্তর আফ্রিকার বারবার রাজ্যগুলোর উৎপাতে ফ্রান্স দীর্ঘকাল পর্যন্ত অত্যন্ত বিব্রত ছিল। সুতরাং এ রাজ্যগুলোকে দমন করার জন্য ফ্রান্স গোপনে প্রস্তুতি শুরু করে। আলজেরিয়াই ছিল তাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। তবে আলজেরিয়ার অভ্যন্তরী ঘটনাবলি তাঁকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে সুযোগ দেয়। আলজেরিয় জলদস্যুদের উপদ্রব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা নির্বিচারে যে কোন দেশের বাণিজ্যিক ও যাত্রিবাহী জাহাজ লুণ্ঠন শুরু করে। ফরাসি সরকার জলদস্যুদের দমন করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী উত্তর আফ্রিকায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জলদস্যু দমন করার নামে আলজেরিয়া দখল করাই ছিল তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের আলজেরিয়ায় অনুপ্রবেশের পশ্চাতে এটি ছিল একটি কারণ।

ফ্রান্স তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের কারণেও আলজেরিয়া দখল করতে চায়। ১৮২৬ সালে ফ্রান্সে খরার কারণে কৃষির উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। যার ফলে ১৮২৭ সালে ফ্রান্সে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ঠিক সে বছরের ডিসেম্বর মাসে দশম চার্লস চেম্বার অফ ডেপুটিস ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্ত একেবারেই সঠিক ছিল না। এ ঘটনায় রক্ষণশীল দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এর পরিবর্তে সংসদে উদারপন্থী রাজতন্ত্রীরা বিপুল সংখ্যক আসন লাভ করে। রাজতন্ত্রীদের চাপে রাজা দশম চার্লস তার রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ভিলেলেকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন উদারপন্থী ভিকোমেট ডি মার্টিগনাক (Vicomate de Martignac)।[১২]

মার্টিগনাক দায়িত্ব নেয়ার পর বেশ কিছু কুখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ থেকে অপসারণ করেন। কিন্তু মার্টিগনাক খুব বেশী কিছু করতে ব্যর্থ হলেন। একদিকে উগ্র রাজতন্ত্রীদের চাপ, অন্যদিকে চরম উদারপন্থীদের চাপ তাঁর কাজ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দশম চার্লস মার্টিগনাককে পদচ্যুত করে উগ্র রাজতন্ত্রী প্রিন্স জুলেস ডি পলিগনাককে (Prince Julel de polignac) তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।[১৩] পলিগনাকের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। ১৮৩০ সালের বসন্তকালে চেম্বার অফ ডেপুটিস এর অধিকাংশ সদস্য পলিগনাকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। নতুন প্রজন্মের রোম্যান্টিক লেখকরাও দশম চার্লস ও পলিগনাকের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম ।

প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য দশম চার্লস ফ্রান্সের বাইরের অঞ্চল অধিকারের মাধ্যমে জনগণের মনোযোগ অন্যদিক নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গকে দিয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস এবং ইউরোপের মানচিত্রকে পুনর্বিন্যাস করার এক পরিকল্পনা রাশিয়ার নিকট পেশ করেন। রাশিয়া এ সময় গ্রীক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এ পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যদিকে পলিগনাক (Polignace) আলজেরিয়া দখল করে বিরোধীদলকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৩০ সালের ১৩ জুন ৩৬০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী আলজেরিয়ার অবতরণ করে এবং প্রাথমিক যুদ্ধে হুসাইন পাশার সৈন্যদল পরাজিত হলে ৫ জুলাই আলজিয়ার্স শহরের পতন ঘটে।

তবে নিম্নোক্ত কারণটি ছিল খুবই আশ্বর্যজনক। জানা যায় যে, দু'জন আলজেরিয় ব্যবসায়ী জ্যাকব বাকরী (Jacob Bakri) এবং বুসনর্ক (Bushnaq) ১৭৯৩ এবং ১৭৯৮ সালে ফরাসি সেনাবাহিনীর কাছে গম সরবরাহ করতেন, যার মূল্য ছিল আশি লক্ষ ফ্রাঙ্কের বেশি।[১৪] কিন্তু ক্রমাগতভাবে গম সরবারহ অব্যাহত রাখলেও বিশ বছরেরও অধিক সময়কাল পর্যন্ত এর মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। ১৮১৯ সালে আলজেরিয়া ও ফ্রান্স সরকারের মধ্যে এ মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, সেই অপরিশোধিত মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী ১৮২০-২১ সাল হতে কিস্তি প্রদান শুরু হয়। কিছু দিনের মধ্যে ফ্রান্স এ চুক্তি অমান্য করে। এরই ধারাবাহিকতায় আলজেরিয়ার শাসক 'দে' হুসাইন পাশা, ফরাসি সম্রাট দশম চার্লসের সময়ে উক্ত মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে একটি পত্র লিখেন কিন্তু এর কোন সদুত্তর ফ্রান্সের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি।[১৫] পত্রের কোন উত্তর না দিলেও ১৮২৭ সালের ২৯ এপ্রিলে আলজেরিয়ার শাসক 'দে' হুসাইন এবং ফরাসি 'কনসাল' Pierre Deval এর মধ্যে এ ব্যাপারে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ফরাসি ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধি দলও উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়।[১৬] এর পরেও ফ্রান্স উভয় দেশের মধ্যে সংঘটিত এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, বরং নির্লিপ্ত থাকে। ফ্রান্সের এরকম ভূমিকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই 'দে' রাগান্বিত হন এবং মিটিং চলাকালীন সময়ে তার হাতে থাকা পাখা কনসালের মুখের উপর ছুড়ে

মারেন। ফলশ্রুতিতে, ১৮২৭ সালে আলজেরিয়ার 'দে' কর্তৃক ফরাসি কনসালের অপমানের প্রতিশোধ বা অপমানের সমাধানকল্পে ফরাসি সম্রাট দশম চার্লস ১৮৩০ সালের ১৪ জুন একটি নৌবহর আলজেরিয়ায় পাঠান। এর পাশাপাশি আলজেরিয়ায় নিয়োজিত তুর্কি শাসককে একটি চরমপত্র প্রেরণ করেন, যা ছিল নিম্নরূপ: "যেহেতু ফরাসি কনসালকে পাখা দিয়ে আঘাত করার মাধ্যমে তার মর্যাদাহানী করা হয়েছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে অপমান করা হয়েছে, যার ফলে তাঁর ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যথাবিহিত পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তা হলো; "দে'র উপস্থিতিতে আলজেরিয়ার কসবা নামক বন্দরে ফরাসি পতাকা উত্তোলন করত: 'দে' ফরাসি জনগণের কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং একশত বার সশস্ত্র সালাম প্রদান করতে হবে।[১৭] কিন্তু, ব্রিটিশ কনসালের উৎসাহে 'দে' তা করতে অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফরাসি সরকার ১৮২৮ সালের ১৬ জুন আলজেরিয়ার সমুদ্র বন্দর ঘেরাও করার জন্য ফরাসি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করে।[১৮] শুধু তাই নয়, ১৮৩০ সাল হতে নিয়মিত আলজেরিয়ায় আক্রমণ শুরু করা হয়। ১৮৩০ সালের ১৪ জুন, আলজিয়ার্স শহর থেকে ২১ কি.মি দূরে সমুদ্রতীরবর্তী শহর সি'দি ফিরুয (Sidi Ferruch) এ ৩৭,৬০৭ জন ফরাসি সৈন্য অবতরণ করে।[১৯] সমগ্র আলজেরিয়ায় ফরাসি সৈন্যবাহিনী অবতরণ করার পর ১৮৩০ সালের ৫ জুলাই বেশ কিছু শহর দখল করে এবং বৃহত্তম শহর তুলূন (Toulon) দখল করার জন্য ৩৫,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ৬০০ জাহাজ প্রস্তুত রাখা হয়।[২০] এরূপ পরিস্থিতিতে 'দে' ফরাসি বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য ৭,০০০ জেনিসারি সৈন্য, উপসাগরীয় অঞ্চল কনস্ট্যান্টাইন (Constantine) এবং ওরান (Oran) হতে ১৯,০০০ সৈন্যবাহিনী এবং উপজাতীয় কাবিলা গোত্রের ১৭,০০০ লোককে সেখানে পাঠান।[২১]

কিন্তু ফরাসিরা সেখানে শক্তিশালী অবস্থান লাভ করায় আলজির্য়াস দখল করার হুমকি দেয় এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজধানী দখল করে নেয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩০ সালের ৫ জুলাই, 'দে' আত্মসমর্পনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। ফ্রান্স শত্রুর শক্তি নির্ণয় করার জন্য বুলিদা (Blida) নামক জায়গার ৫০ কি:মি: দক্ষিণে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। এখান থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় অতর্কিত হামলা পরিচালনা করে। ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে কিছু সংখ্যক রিয়াসাত বা পরগানা স্থাপিত হয় এবং এগুলোকে পরাস্ত করা ফরাসি বাহিনীর জন্য কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এ সুযোগে সাইয়্যোদ মুহয়িদ্দীন আল হাসানী *(Sayed Muhyi Al-Din Hasani)* ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন।[২২]

তাপরপরেও ফ্রান্স দু'বছরের মধ্যে আলজিয়ার্স এর পার্শ্ববর্তী তিনটি শহর ওরান (Oran) এর পশ্চিমাংশ এবং বন (Bone) এর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশকে ফরাসি ঔপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়।

আলজেরিয়দের প্রতিরোধ

ফরাসি আক্রমণ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে আলজেরিয় শাসক 'বে' হুসাইন ফরাসিদের সাথে 'ক্যাপিচুলেশন'[২৩] চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন এবং আলজেরিয়ায় ফরাসি শাসন মেনে নেন। কিন্তু স্থানীয় জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনকে মেনে নেয়নি।

ফরাসিরা সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাগুলো সহজে দখল করতে সক্ষম হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে তারা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এ প্রতিরোধগুলোকে প্রায় দুইযুগেরও বেশী সময় ধরে ফরাসি বাহিনীকে মোকাবিলা করতে হয়।

ফরাসি দখলদারিত্বের শুরুতেই আলজেরিয় জনগণ নিজেদের আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে। ১৮৩০ সালের ২৩ জুলাই কেপ ম্যাটিফো (Cape Matifou) এর নিকটবর্তী তেমেনটফৌস

(Tementfous) এ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং মুরাবিত গোষ্ঠী এক পরামর্শসভায় মিলিত হন। সেখানে তারা আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।[২৪]

অন্যদিকে আরব বারবার জনগণ আদিম অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দেশকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। ফরাসিদের প্রাথমিক ভাবে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আরব বারবারদের পাশাপাশি উপজাতীয় গোত্রগুলোও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ১৮৩০ সালে আলজেরিয়ায় ফরাসি যে দখলদারিত্ব ১৮৭১ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু, এ দখলদারিত্বের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফরাসি বাহিনীকে স্থানীয়দের প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়।[২৫]

আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে দু'টি প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে আন্দোলনগুলো স্থানীয় জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়, যার একটি পরিচালিত হয় আমীর আব্দুল কাদিরের নেতৃত্বে। আর অন্যটি আব্দুল কাদির দৃশ্যপটে আসারও পূর্বে কনস্ট্যান্টাইনে উসমানীয়দের সর্বশেষ 'বে' আহমদ এর নেতৃত্বে। আলজেরিয়ায় ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উসমানীয়দের সর্বশেষ 'বে' আহমদ এর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। অনুপ্রবেশের শুরু থেকেই ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রসারণ নীতির বশবর্তী হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এ সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করার জন্য আহমদ তিজান্নী (Ahmed Tijanni) একটি সংগঠন তৈরী করেন। যে সংগঠনের নাম ছিল "Tijanniya Brotherhood"। এ সংগঠনটির মাধ্যমে আলজেরিয়ার মাটিতে ফরাসি সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা করে।[২৬] আহমদ 'বে' এর প্রতিরোধ মোকাবিলা করেই ফরাসিরা আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে।

ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে কনস্ট্যান্টাইনে আহমদ বে যে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন, তা ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সাব-সাহারার শক্তিশালী উপজাতির গোষ্ঠী বেন ঘানা (Ben Ghana) এবং তুর্কি বাবা-মায়ের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন আহমদ 'বে' বিন মুহাম্মদ শরিফ (Ahmed Bey Ben Mohamed Sherif)। ইতিহাসে হাজী আহমদ নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৭৮৪ সালে কনস্ট্যান্টাইন এ জন্মগ্রহণ করেন। যুবক অবস্থায় তিনি হজব্রত পালন করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে মিশরে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ফরাসি দখলদারিত্বের শুরুতে তিনি আলজেরিয়ায় ফিরে আসেন এবং কনস্ট্যান্টাইন এ অনুষ্ঠিত Saoueli[২৭] এর যুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৮]

একসময় ফরাসি বাহিনী বন (Bone) দখল এবং সমুদ্র বন্দরগুলোর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এখানেও তারা প্রতিরোধের সম্মুখিন হন। এ উদ্দেশ্যে ফরাসি কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় পৌছানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। এতে উত্তেজিত হয়ে ফরাসি সেনাপ্রধান কাউন্ট ক্লজেল (Count Clauzel) ১৮৩৬ সালে দ্বিতীয়বারের মত উত্তর আফ্রিকায় একটি বাহিনী পাঠান। এ বাহিনী ৮৭০০ জন সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিরোধ দমন এবং আহমদ 'বে' এর রাজধানী দখল করাই ছিল এ বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু অপ্রতুল রসদ, শারীরিক অসুস্থতা, নভেম্বরের অতিবর্ষণ এবং যাত্রাপথে উপজাতিদের প্রতিরোধ প্রভৃতি কারণে ফরাসি বাহিনী কনস্ট্যান্টইন দখল করার যে প্রক্রিয়া তা ব্যর্থ হয়ে যায়। আহমদ 'বে' এর বাহিনী ফরাসি বাহিনীকে তার সদর দফতরের সামনে থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এ আক্রমণে ফরাসি বাহিনীর প্রায় ১০০ জন সদস্য নিহত হয়। এ বিজয় আহমেদ 'বে' এর জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।[২৯] কিন্তু তিনিও বেশী দিন ফরাসি বাহিনিকে মোকাবিলা করতে পারেননি।

পরবর্তীতে আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন পশ্চিম আলজেরিয়ার আমীর আব্দুল কাদির। আলজেরিয়দের নিকট তিনি ছিলেন জাতীয় 'বীর'। ১৮৩২ সালে মাহিদিন (Mahieddin) উপজাতিরা তাকে নিজেদের সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে। ফরাসি আক্রমণকে বাঁধা দেয়ার জন্য তিনি আলজেরিয়ান সরকারকে সংগঠিত করেন। পশ্চিম আলজেরিয়া থেকে তার প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনকে সফল করার জন্য তিনি উপজাতিদের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাসী অর্থাৎ সুফী সাধক ও গোড়া ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী লোকজনকে ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৩০]

ফরাসিদের মোকাবিলা করার জন্য আব্দুল কাদির উপজাতীয় সদস্যদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনীও গঠন করেন। আব্দুল কাদির আলজেরিয়াকে একটি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিনত করার পরিকল্পনাও করেন এবং এর রাজধানী হবে টেলেমসেন (Tlemcen) তাও নির্ধারণ করেন।[৩১]

আমীর আব্দুল কাদির মুহয়িদ্দীন হুসাইনির দেখানো আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ সংগ্রাম মোকাবিলা করতে গিয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় ফরাসি বাহিনী। এতে বাধ্য হয়ে ফরাসি কর্তৃপক্ষ দু'দু'বার আমীর আব্দুল কাদিরের সাথে সন্ধি করে। যার প্রথমটি স্বাক্ষরিত হয় ১৮৩৭ সালের ২০ মে টাফনাতে (Tafna)। তবে প্রত্যেকবারই ফরাসিরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে এবং নতুন করে যুদ্ধ বাঁধায়। কিন্তু সম্প্রসারণবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি আব্দুল কাদিরের শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে সমগ্র আলজেরিয়ায় আব্দুল কাদিরের বাহিনীর সাথে ফরাসি বাহিনী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।[৩২]

১৮৪০ সালের মধ্যে আমীর আব্দুল কাদির পশ্চিমাঞ্চলে এবং কেন্দ্রীয় আলজেরিয়ার সমগ্র উপজাতীয় গোষ্ঠীকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। দেশের সঙ্কটকালীন সময়ে আব্দুল কাদির তার যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার মাধ্যমে নিজেকে এক শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ সময় তিনি ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেন। কাদিরের অবস্থান বিবেচনা করে ফরাসি কর্তৃপক্ষ আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য দলত্যাগী বহুসংখ্যক উপজাতীয় লোকজনকে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে থাকে। এতে ঔপনিবেশিকদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় আমীর আব্দুল কাদিরের বাহিনী কিছুটা আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। কাদিরের বিরুদ্ধে ফরাসি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন জেনারেল থমাস রবার্ট বুজিয়্ (General Thomas Rebort Bugeaud)। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আলজেরিয়ায় ফরাসি শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন বুজিয়্। আব্দুল কাদিরের বিরুদ্ধে তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেন। বিভিন্ন গ্রাম ধ্বংস, বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়ে মাকড়সার জালের মত সৈন্যদল বিন্যস্ত করণ, পশুরপাল হত্যা করে আলজেরিয়ায় এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। যে সমস্ত উপজাতিয় নেতা আমিরকে নিয়মিত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে লোভ দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩৩] উত্তর আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের তুলনায় আলজেরিয়া সমৃদ্ধশালী হওয়ায় এখানেই সবচেয়ে বেশী ইউরোপীয়করণ হয়েছে।

১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ফরাসিরা এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধনী বিনিয়োগকারীরা এ অঞ্চলের উর্বর জায়গাগুলো ক্রয় করে নেয়। আলজেরিয়াতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ফরাসি, ইতালিয়, স্পেনিশ, মল্টেজ ও ক্রোয়েশিয়ানরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে স্পেনিশ চাষীদের আলজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে, ইতালিয়ান, মল্টেজ এবং ক্রোয়েশিয় চাষী ও জেলেদের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঔপনিবেশিকরা স্বায়ত্তশাসনের বেশিরভাগ সুবিধা অর্জন করে। চাষযোগ্য ভূমির দুই তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মালিকানায় চলে যায়। আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্রাট লুইস

ফিলিপ খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ১৮৪০ সালে এসে তিনি তার মত পরিবর্তন এবং সমগ্র অঞ্চল দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩৪]

ফরাসিরা তাদের মিশন সফল করতে গিয়ে খুব নির্দয় প্রকৃতির অভিযান চালায় এবং আলজেরিয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরন করে। ফরাসিদের এরকম নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে আব্দুল কাদির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি ফরাসি দখলদার ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ১৮৩২ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী এবং আধুনিক ফরাসি বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফরাসি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। জীবনের ৫০ বছরই আব্দুল কাদির যুদ্ধসংগ্রামে ব্যয় করেন এবং এর মধ্যে ৩৬ বছর তিনি কারাগার বা নির্বাসনে ছিলেন।

আমীর আব্দুল কাদির এবং আহমদ 'বে' এর মত ফরাসি বিরোধী আন্দোলনে এসময় আবু জায়য়ান, আবু মাজী, লালাফাতিমাহ ও মোকরানি বুয়ামামা নামে কয়েকজন আঞ্চলিক শাসক ও গোত্রপতি এগিয়ে আসেন। তবে সাংগঠনিক দূর্বলতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে এ পর্যায়ের যে প্রতিরোধ আন্দোলন তা খুব বেশী সফলতা বয়ে আনেনি। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এ আন্দোলনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন যেমন- ফকির- সন্নাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহ, ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল, ঠিক ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত আলজেরিয়দের পরিচালিত বিদ্রোহগুলো ফরাসি বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল। আলজেরিয় জনগণ বিভিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণে জাতীয়তাবাদের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন বিবর্তন, উন্নয়ন, স্বৈরতন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, পশ্চাদপদতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে তেমন সচেতন ছিল না।[৩৫] কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা তারা যে, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও হয়রানির শিকার হচ্ছে, এটা তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় এবং এ থেকেই তাদের মধ্যে দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারনের মানসিকতা তৈরি হয়।

১৮৪৭ সালে আমির আব্দুল কাদিরের পরাজয় এবং পরের বছর আহমদ বে এর আত্মসমর্পন আলজেরিয়দের প্রতিরোধ আন্দোলনকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেয়। ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্স এ পর্যায়ে এসে সমগ্র আলজেরিয়া দখল করার জন্য তিনটি কৌশল গ্রহণ করে।[৩৬] প্রথম পর্যায়ে ফরাসিরা আলজেরিয়ার প্রধান শহরগুলো দখল ও প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের দমন করার কৌশল গ্রহণ করেন। বিশেষ করে 'বে' এর সমর্থক গোষ্ঠী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর নির্যাতন চালায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফরাসি ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী সমতল ভূমি, অভ্যন্তরীণ ছোট শহর এবং আরব উপজাতির লোকজন যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাদেরকে প্রতিহত করার কৌশল নেয়। সর্বশেষ পাহাড়ী অঞ্চল, মরুভূমি অঞ্চল ও মরুদ্যানসমূহ এবং যারা মাহাদীর নেতৃত্বে সংগঠিতদের দমন করার কৌশল গ্রহণ করে।[৩৭]

ফরাসি কর্তৃপক্ষ এসব কূটকৌশল গ্রহণ করার ফলে ১৮৪৫ সালে এ প্রথমবারের মতো আলজেরিয় জনগণের মধ্যে এক আবেগময় বিষ্ফোরণ ঘটে। জনগণের এ ক্ষোভ চিলিফ উপত্যকার (Chelif Valley) উত্তরে অবস্থিত দারনা পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে তা দক্ষিণ ওয়ারেসিস (Ouarsensis), টিটারি (Titteri), কাবিলাহ (Kabylia) এবং সাহারাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বুজিয়ু দুই বছর ধরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর এ অঞ্চলগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।[৩৮]

এ সময় আলজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুতই আর একটি আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। আবু জায়য়ান এর নেতৃত্বে এ আন্দোলন সুরক্ষিত ওয়েসিস (Oasis), বিসরা (Biskra) এর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীবান

(Ziban) এ ছড়িয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক বাহিনী জায়য়ান এর কার্যক্রমে আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য অভিযান চালায়। কিন্তু এতে তাঁরা সফল হতে পারেনি। ফলে জায়য়ান এর খ্যাতি সমগ্র আলজেরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাঁকে মোকাবিলা করার জন্য ১৮৪৯ সালের জুলাই মাসে ছোট আকারের একটি বাহিনী পাঠায়। এ বাহিনীও চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ সময় সমগ্র জীবান (Ziban), হোডনা (Hodna) এবং আউরস (Aures) এর জনগণ জায়য়ান এর সমর্থনে তার পাশে এসে দাড়ায়। এ পর্যায়ে এসে ফরাসিরা কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিল না। ১৮৪৯ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কনস্ট্যান্টাইন এর কমান্ডার জেনারেল এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ওয়েসিসএ উপস্থিত হন। ৫২ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ওয়েসিস এর পতন ঘটে। আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আবু জায়য়ান সহ প্রায় ৮০০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। শহরের সমস্ত স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং ১০ হাজারেরও অধিক পাম গাছ কেটে ফেলা হয়। আবু জায়য়ান আলজেরিয়দের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের বীজ বপন করেন, তা পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে। আবু জায়যান এর প্রতিরোধ প্রয়াস দমন করা হলেও এ পর্যায়ে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয় ওয়ায়ারগলাতে (Ouargla)। এ আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন শরীফ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। তাঁর নেতৃত্বে এ আন্দোলন প্রায় ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।[৩৯]

বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৮৫০ সাল নাগাদ শুধুমাত্র সাহারার উত্তর এবং কাবিলাহর পূর্বাঞ্চল ছাড়া সমস্ত আলজেরিয়ায় ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি বাহিনী ঐ অঞ্চলগুলো দখল করার চেষ্টা করলে এখানেও তারা প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এ প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন রহমানিয়া ব্রাদারহুড *(Rahmaniyya Brothrhood)* ও আবু বাগলা (Bagla)। ১৮৫৪ সালের যুদ্ধে আবু বাগলা মৃত্যুবরণ করলে প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে আসেন মুরাবিত নেত্রী লালা ফাতিমা (Lalla Fatima)।[৪০]

বিচ্ছিন্নভাবে এসব প্রতিরাধ চলাকালে রবার্ট বুজিয়ূর *(Bugeaud)* পরিকল্পনায় জেনারেল আরমান্ড লিরয় *(General Armand Leroy)* এবং মার্শাল জ্যাকুস লুইস রনডন *(Marshal Jacques Louis Randon)* প্রতিরোধকারীদের দমনে নৃশংস আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফরাসি বাহিনী এ অঞ্চলগুলোর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি জলপাই ও ডুমুর গাছগুলোর মূলোৎপাটন করে। একই সাথে গ্রামবাসীদের উপর তীব্র নির্যাতন চালায়। এসব কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ১৮৫৭ সালে এখানে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্বত্যঞ্চলে প্রশাসনিক ও সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পর ফরাসি কর্তৃপক্ষ টেল, সাব-সাহারা এবং উত্তরাঞ্চলীয় মরুভূমি এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।[৪১]

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনামলে আলজেরিয় প্রতিরোধ

আমীর আব্দুল কাদির আত্মসমর্পণ করার পর ফরাসি কতৃপক্ষ আলজেরিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিপ্লব সংঘঠিত হবার পর দ্বিতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করে এবং তারা আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আলজিয়ার্স,ওরান এবং কনস্ট্যান্ট্যাটাইনে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে তথায় কেন্দ্রীয় ফরাসি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে।[৪২]

১৮৫২ সালের ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এ ভোটের মাধ্যমে নেপোলিয়ন ফরাসি প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতায় আসার পরেও ফরাসিদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী নীতি অব্যাহত রাখেন। নেপোলিয়ন শুরুতেই বিলাদ ই-কাবাইল এর নাখলিস্তান জয় করেন। এ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ সংগঠিত হয়। এ প্রতিরোধ আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে ১৮৫০ সালে ওরান প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কাবিলা

পাহাড়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিরোধ আন্দোলনে ফরাসিদের কঠিনভাবে প্রতিহত করা হয়। তবে স্বাধীন উপজাতিয় শ্রেণির লোকজন প্রতিরোধ অব্যাহত রাখলেও তা আব্দুল কাদিরের প্রতিরোধ আন্দোলনের মত শক্তিশালী ছিল না। ১৮৬০ এবং ১৮৬৩ সালে নেপোলিয়ন আলজেরিয়া সফর করেন এবং এখানকার ভূমির উপর উপজাতিদের যে ন্যায় সঙ্গত অধিকার তা ফিরিয়ে দেয়ার এবং স্থায়ীভাবে অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৮৬৩ সালে মুসলমানদের ভূমিসমূহকে ইউরোপীয় নীতি অনুযায়ী প্রাইভেট প্রোপারটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলে ভূমি নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। তুর্কি আমলের সৈন্য, সামন্ত, জায়গিরদার ও অন্যান্য ভূমি মালিকদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি মালিকানাভূক্ত করা হয়। ফরাসি কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ৪৫,৩০০ হেক্টর জমি ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে। অথচ জনসংখ্যার হার বিচার করলে দেখা যায় ১২ জন আলজেরিয় অনুপাতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক ছিল মাত্র ১ জন। কিন্তু জমি ভোগ দখল করার ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ তারাই ভোগ দখল করে এবং উর্বর দ্রাক্ষা অঞ্চলগুলোও তাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল।[৪৩] ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত আলজেরিয়ায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা স্বায়ত্তশাসিত কোলন বা অঞ্চলে বসবাস করত। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০ জন ভূস্বামী কোলনে বসবাস করত এবং তারা প্রায় ৫০,০০০০ একর জমির মলিক ছিল। এ সমস্ত ভূমি পূর্বে তুর্কি ও আগাদের অধিকারে ছিল। ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর এগুলো ফরাসি সৈন্য ও কর্মকর্তাদের দখলে চলে যায়। কোন রকম রাজস্ব না দিয়েই তারা তা ভোগ করত। এরকম ভূমিনীতি গ্রহণ করার ফলে ফরাসি কর্তৃপক্ষের সাথে উপজতিদের যে সদ্ভাব তা নষ্ট হয়ে যায়। জন গিলেসপি (John Gillespie) বলেন- "ঔপনিবেশিকদের যে ভূমি নীতি আলজেরিয়ার গরিব কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের উপর তা গভীর প্রভাব ফেলে এবং উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়।" এত কিছুর পরেও ফরাসিরা দ্রুতগতিত তাদের সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং অভিবাসীদের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ফরাসি ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ১,৩১,০০০ জন থেকে বেড়ে ১,৮১,০০০ জন দাঁড়ায়। আর মোট অভিবাসী বা কোলনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২,৫০,০০০ জনে।[৪৪]

উচ্চহারে করারোপ এবং মুসলমানদের জমি বেদখল হয়ে যাবার পর স্থানীয় জনগণ ক্ষুব্ধ হলেও তাদের যে রকমের প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা ছিল ১৮৪৮ সালের পূর্বে সে ধরনের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে ফরাসি ঔপনিবেশিক ও আলজেরিয়দের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থানীয়দের বঞ্চিত করার ফলে তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ বা বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয় তা মোকাবিলা করা ফরাসি বাহিনীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

ফরাসি বৈষম্যমূলক নীতির ফলে আলজেরিয়ায় জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং ১৮৫০ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত কাবিলিয়ায় *(Kabylia)* এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯০১ সালে দক্ষিণ ওরানে (Oran) এ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলতে থাকে। আলজেরিয়াকে উপনিবেশিক শাসনমুক্ত করার জন্য ১৮৭১ সালে এরকম এক সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ মোকরানী বোয়ামামা। মোকরানীর নেতৃত্বে এ সংগ্রাম কাবিলিয়ার উভয় অংশ, আলজিয়ার্স জেলার কিছু অংশে এবং কনস্ট্যান্টাইন এর দক্ষিণাংশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহগুলোকে উপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্স ভাল চোখে দেখেনি। যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন খামার বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিভিন্ন গ্রাম লুটপাটের শিকার হয়। ১৮৭১ সালের ৫ মে মোকরানীর পরাজয়ও মৃত্যুর ফলে এ সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে।[৪৫]

এডমিরাল ডি গুইডন (Admiral Gueydon) আলজেরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত হবার পর এখানে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে

বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তাদের উপর বড় অঙ্কের জরিমানা ধার্য করেন এবং দশ লক্ষ একরেরও বেশী জমি বাজেয়াপ্ত করে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

মোকরানীর যে বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে সেটাই ছিল সর্বশেষ বিদ্রোহ এবং এরপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী এখানে শান্তির পরিবেশ বিরাজমান ছিল। ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তি এ সময় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে রাখে।[৪৬] জন গিলেসপি (Joan Gillespie) আরো বলেন, ১৮৩০ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত পল্লী অঞ্চলগুলোতে ফরাসি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে উপজাতীয় লোকজন তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু ফরাসিরা তাদের শান্তি মিশন সফল করতে গিয়ে খুব নির্দয় প্রকৃতির অভিযান চালায়।[৪৭]

উপনিবেশিক যুগে প্রতিরোধ আন্দোলন

প্রথম পর্যায়ে দখলদারিত্বের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে ফরাসিরা আলজেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিরোধ সমাপ্ত হবার পর আলজিয়ার্স শহরের ৫০০ কি:মি: পূর্বে কনসন্ট্যান্টাইন প্রদেশে শহরকেন্দ্রিক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। ফরাসিরা এ আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণভাবে দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু কনসন্ট্যান্টাইন এর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। এসময় ফরাসি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালায়।[৪৮]

ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে আলজেরিয় জনগণ রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে তাদেরকে বিভিন্ন শর্ত দিয়ে বলা হয় তারা যদি তাদের ধর্ম ইসলাম এবং আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাদেরকে মূল ভূ-খন্ডের নাগরিকদের ন্যায় সমঅধিকার দেয়া হবে। ফ্রান্সের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আলজেরিয়াকে উপনিবেশ হিসেবে না রেখে একে ফ্রান্সের সাথে একীভূত করা।[৪৯]

উনিশ শতকের শেষে আলজেরিয় সংসদের মাধ্যমে গঠিত অর্থনৈতিক কমিটির মাধ্যমে আলজেরিয়া তার আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে এ কমিটি দুই তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় এবং এক তৃতীয়াংশ মুসলমানদের নিয়ে গঠিত ছিল।[৫০]

অন্যদিকে মুসলিম কৃষকদের তুলনায় অভিবাসীরা বেশী সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে। আলজেরিয়দের উপর অধিকহারে করারোপ করা হয় এবং তা আদায় করার দায়িত্ব দেয়া হয় ইউরোপীয়দের হাতে। ১৮৮১ সালে স্থানীয় মুসলিম সমাজকে শাসন করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার *Code d'indigenat* বা *Indigenat Code* বা আদিবাসীদের আইন নামে একটি আইন চালু করে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এটি ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে আলজেরিয় কোলন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। এর ফলে আলজেরিয়ার প্রশাসনিক রীতিনীতি ও এর বাসিন্দাগণ বুজিয়ু (Bugeaud)-এর সময় হতে বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে এবং প্রতিটি পর্যায়ে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শাসন পদ্ধতির সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের (১৮৪৮-৫২ খ্রি.) সময়কালে আলজেরিয়দের ক্রমবিলুপ্তি ও আরও অধিক সংখ্যক ফরাসির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনটি বিভাগের বেসামরিক এলাকাগুলো সামরিক তত্ত্বাবধায়কদের (Prefects) অধীনে রাখা হয়; যারা বহিরাগত বাসিন্দাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। ১৮৭০ সালে ফরাসি অভিবাসীরা রাজকর্মচারীদের দেশ হতে বিতাড়িত করে দেয় এবং আলজিয়ার্স শহরের পঞ্চায়েত (Commune) একটি বিপ্লবী সালতানাত স্থাপন করে। Thiers এর নেতৃত্বে সরকার একটি বেসামরিক প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেওয়ানী পদ্ধতির সীমারেখা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 'আরব ব্যুরো' এর স্থলে সংমিশ্রিত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অবশিষ্ট এলাকাগুলো সামরিক প্রশাসনের শাসনাধীন ও গর্ভণর জেনারেলের অধীনে ছিল। যে সকল এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সামরিক প্রশাসকদের উপর ন্যস্ত ছিল, সে সকল এলাকার প্রশাসন মুসলিম সর্দারদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এ পদ্ধতি দ্বিতীয় রাজতন্ত্রের (৩য় নেপোলিয়ানের রাজতন্ত্র-১৮৫২-৭০) সময়কাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ সময় ঔপনিবেশিকদের বিরোধীতা সত্ত্বেও সম্রাট আলজেরিয়াকে একটি 'আরব রাজ্য' (আরব মামলাকত) বানানোর চেষ্টা করেন। তিনি গোত্রসমূহের শরিকানা ভূ-সম্পত্তি ১৮৬৩ সালের সংসদীয় সিদ্ধান্তের বলে সংরক্ষণ করে দেন এবং ১৮৬৫ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানগণ ফরাসি নাগরিকত্ব গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে।

ফলাফল

দখলদারিত্বের শুরু থেকে ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তি আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং অবাধ শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র সরকারি কাজের জন্য বিদেশি ভাষা হিসেবে ফরাসি শাসকগোষ্ঠী আরবি ভাষার প্রচলন অব্যাহত রাখে। যে সমস্ত স্কুলে ফরাসি ও আলজেরিয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাত ছিল ১:১০ অথবা ১:১২ কেবলমাত্র সেখানেই আরবি ভাষার চর্চা হতো। ফরাসি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আলজেরিয়দের ব্যক্তিসত্তার বিলোপ ঘটিয়ে তাদেরকে মানসিকভাবে এ ধারণা দেয়া যে, প্রাচীন ফরাসিরাই ছিলেন আলজেরিয়দের পূর্ব পুরুষ।[৫১]

১৮৯০ সালের শেষে, ফরাসি সরকার কিছু সংখ্যক আলজেরিয় মুসলমানদেরকে ফ্রেঞ্চ স্কুলে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ দেয়। যদিও সেই শিক্ষাকার্যক্রম ছিল নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ফরাসি সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস এবং সমাজ থেকে আলজেরিয়গন কি উপকার বা সুবিধা পাচ্ছে এবং এখানকার সমাজে কি প্রভাব রাখছে এ বিষয়গুলোর উপরই শুধু তাদের শিক্ষা দেয়া হতো। মূলত ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা সম্বলিত পাঠ্যসূচি ঔপনিবেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণ করতো। এরপরেও ফরাসি স্কুলগুলোতে শিক্ষালাভ করার ফলে, আলজেরিয়ায় এক যুক্তিবাদী শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়। যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে ইউরোপের ইতিহাস, পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে সেখানে এক রাজনৈতিক ও 'জাতীয়তাবাদী ভাবধারার' বা নবজাগরণের সূচনা করে। এরাই ছিলেন আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক। এ সময় যুব আলজেরিয় দল (Young Algerian party) নামে একটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। এ দলটি আলজেরিয়ায় ফরাসি শাসন মেনে নিলেও,আলজেরিয় সংসদে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা সংস্কার, আরবদের উপর অতিরিক্ত কর প্রত্যাহার এবং স্থানীয় আইন চালু করার দাবি জানায়।

আলজেরিয়ায় ফরাসি ঔপনিবেশিক প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে দূর্গম অঞ্চলের জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনও বাড়তে থাকে।[৫২] বিশেষ করে কাবিলি ও দক্ষিণ ওরান এলাকায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের সংস্কার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, মিশর ও ইরাকে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, তা আলজেরিয় মুসলমানদেরকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

আলজেরিয় জনগণ এ সময়ে ফরাসিদের দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হয়। ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করা আলজেরিয়গন ফরাসিদের জীবন ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দেশে ফিরে তারা ফ্রান্সে বিরাজমান আধুনিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করে। এ বিষয়গুলো থেকে অনুধাবন করা যায় যে, আলজেরিয়ার জনগণ দখলদার ফরাসিদের কাছ থেকে আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা লাভ করেছে। ফরাসি ভাষা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান চর্চাও তাদের জীবনে বড় রকমের প্রভাব ফেলে। আলজিয়ার জনগণ ফরাসিদের কাছ থেকেই যে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে, তুর্কি বুদ্ধিজীবী হুসাইন জাইদ এর মন্তব্য থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। জাইদ এর মন্তব্যটি ছিল এ রকম, "কোন শক্তি ও প্রভাব আমার দৃষ্টিকে প্রসারিত

করেছে, আত্মাকে করেছে বন্ধনমুক্ত এবং একে করেছে মধ্যযুগীয় শিক্ষার নিগড়মুক্ত? মনে হয় ফরাসি ভাষা এবং সভ্যতাই আমার এ নবজন্মের মূল কারণ।"[৫৩]

ফরাসি সরকার আলজেরিয়া দখলের পর এক পর্যায়ে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অংশ বলে ঘোষণা দেয় এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে আরবি ভাষাভাষি আলজেরিয়দের ওপর ফরাসি ভাষা চাপিয়ে দেয়। শিক্ষিত আলজেরিয়গণ এ বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং শহর এলাকায় ফরাসি বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপসংহার

আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রতিরোধ আন্দোলন। এ প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে আলজেরিয় জনগণ দুটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। একটি হলো ঐক্য এবং দ্বিতীয় ধারণাটি ছিল বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ একত্র হয়েছে একটি স্বার্থকে কেন্দ্র করে। আর সেই স্বার্থটি হলো নিজ দেশকে দ্বিখন্ডিত হতে না দেয়। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্য স্থাপিত হয়েছে স্বার্থের। এখানে উপেক্ষিত হয়েছে ব্যক্তি ও শ্রেণি স্বার্থ। জয়লাভ করেছে জাতীয়তাবাদী স্বার্থ। নতুন শাসকগোষ্ঠী ভিনদেশী ছিল বলেই জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এটি ভাবার কোন কারণ নেই, বরং তাদের প্রতিবাদের কারণ ছিল এ যে নতুন শাসক এ দেশে শাসনকালে চিরাচরিত রীতিকে উপেক্ষা করে তাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি। এ শাসক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, ভূমি নিয়ন্ত্রণ, আইন ও বিচারকে নগ্নভাবে উপক্ষো করেছে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকল স্তর ও পরিস্থিতির জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং জনগণের এ উদ্বেগ নিষ্ক্রিয় বিরোধিতা থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে "আলজেরিয় ও ফরাসি পৃথক দুটি সত্তা ও মানসিকতা" এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এরপর থেকেই আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ফরাসিবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। আর এ প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে রোপিত জাতীয়তাবাদী বৃক্ষজাত ফল হলো স্বাধীন সার্বভৌম আলজেরিয়া।

তথ্যসূত্র

১. *The Encyclopedia Americana* VoL.1 (USA: Americana Corporation, 1958), P.565.

২. 'বারবার' নৃগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতম শাখার নাম 'তুয়ারেগ'। সাহারার বিশাল এলাকা জুড়ে এদের বিস্তৃতি। তবে লিবিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, আলজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, নাইজার, মালি এবং বারকিনা ফাসোতে এদের বসবাস সবচেয়ে বেশী। ঐতিহ্যগতভাবে তুয়ারেগরা যাযাবর এবং মেষ পালন তাদের প্রধান পেশা। ধর্মীয়ভাবে তুয়ারেগরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস। বিস্তারিত দেখুন, https://en.m.wikipedia. org/wiki/Tuareg-people.

৩. *The Encyclopedia Americana*, Vol.1. *Op. Cit.*, P. 568.

৪. নুমিদিয়া রাজ্যের রাজা ছিলেন মাসিনিসা। তিনি অসাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন শাসক ও যোদ্ধা ছিলেন। মাসিনিসা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একজন রাজা ছিলেন। লিভির বিবরণ অনুযায়ী মাসিনিসা রোমান এবং ফিনিশিয় নির্বিশেষে সকল বিদেশিকে বলতেন যে, আফ্রিকা আফ্রিকীয়দের জন্য। এ থেকে বোঝা যায় যে, মাসিনিসার স্বপ্ন ছিল একটি বৃহৎ নুমিদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

৫. এ.এফ.এম. শামসুর রহমান, *প্রাচীন পৃথিবী, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সভ্যতা* (জয়পুরহাট: যুগবানী ক্ষুদ্রায়ন অফসেট প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটারস, ২০০২), পৃ. ৫৪৯।

৬. এ.বি.এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১), পৃ. ২৮৯।

৭. Jamil M. Abun-Nasr, *A History of the Maghrib in the Islamic Period* (London: Combridge Univesity Press, 1987), P. 150

৮. John Ruedy, *Modern Algeria, The Origins and Development of a Nation* (Bloomingtion: Indiana University Press, 1st edition 1992, Second edition, 2005), P. 17.

৯. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, (১৭৮৯-১৯১৯) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৮৮।

১০. John Ruedy, *Op.cit.,* P.45.

১১. *Ibid,* P.45.

১২. *Ibid,* P.47.

১৩. *Ibid,* P.47.

১৪. Jamil M. Abun-Nasr, *Op. Cit.,* P. 249.

১৫. *ইসলামী বিশ্ব কোষ*, ৩য় খন্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭), পৃ. ১২৪।

১৬. John P. Entelis, *Algeria: The Revolution Institutionalized,* Part-2 (Coloroda: West-view Press, 1986), P.23.

১৭. William Spencer, *Algiers in the Age of the corsairs* (Norman: University of Oklahoma Press, 1976), PP. 149-150.

১৮. Jamil M. Abun Nasr, *Op. Cit.,* P. 250.

১৯. John P. Entelis, *Op. Cit.,* P.23.

২০. Edward Behr, *The Algerian Problem* (London: W.W.Norton, 1962), P.17.

২১. Helen Chapin Metz, *Algeria a Country Study* (USA: Library of Congress, 1994), P. 23.

২২. Jamil M. Abun Nasr, *Op. Cit.,* P. 253.

২৩. ক্যাপিচুলেন শব্দটি ল্যাটিন Capitula (অর্থ অধ্যায়) থেকে এসেছে, যার অর্থ দফাকৃত বিষয়বস্তু, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়া বা শর্তাধীনচুক্তি বা আত্মসমর্পনের চুক্তিপত্র। ইউরোপীয়দের সাথে উসমানীয়দের সম্পর্কের একটি দিক 'দফাকৃত বিষয়বস্তু' হওয়ায় তা এ নামে অভিহিত। এ দফা মূলতঃ প্রারম্ভিক পর্যায়ে ইতালীয়দের ন্যায় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার জন্যই এজেন্ডাভুক্ত করা হয়েছিল। তবে ক্যাপিচুলেশন প্রথা সর্বপ্রথম চৌদ্দ এবং পনের শতকে ইতালীয় বণিকদের (বিশেষ করে ভেনিস এবং জেনোয়ার ব্যবসায়ী) জন্য চালু হলেও তা ষোল শতকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের বেলায়ও প্রযোজ্য হয়।

২৪. John Ruedy, *Op. Cit.,* P. 55.

২৫. *Ibid,* P.55.

২৬. S.M. Imamuddin, *A Modern History of the Middle East and North Africa*, Vol. II (Dhaka: Najmah Sons, 1970), p. 305.

২৭. আলজিয়ার্স শহরে অবস্থিত একটি পৌরসভার নাম Saoueli. ফরাসি বাহিনী আলজেরিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ১৮৩০ সালের ১৮ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত ১ দিনের জন্য এখানে ফরাসি বাহিনী এবং স্থানীয় বাহিনীর মধ্যে একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। Saoueli-তে এ প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত হয় বলে ইতিহাসে এটি Saoueli যুদ্ধ নামে পরিচিত। ফরাসি বাহিনী এ অঞ্চলটি দখল করার পর সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। সেই আশ্রমে ১০০ জনের মতো সন্ন্যাসী অবস্থান করতো।

২৮. John Ruedy, *Op. Cit.,* P. 55.

২৯. *Ibid,* P.57.

৩০. John P. Entelis. *Op. Cit.,* P. 25.

৩১. *Ibid,* P.25.

৩২. *Ibid,* P.26

৩৩. *Ibid,* P. 26.

৩৪. Joan Gillespie, *Algeria, Rebellion and Revolution* (New York: Frederick A. Praeger Publisher, 1960), P.6.

৩৫. মোঃ ফায়েক উজ্জমান, "উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারঃ পত্র-পত্রিকার ভূমিকা" *Rajshahi University Journal of Arts and Law,* Vol-35, 2007, পৃ. ১১১।

৩৬. John Ruedy, *Op. Cit.,* P. 66.

৩৭. *Ibid,* P.67.

৩৮. *Ibid,* P.67.

৩৯. *Ibid,* P.67.

৪০. *Ibid,* P.68.

৪১. *Ibid,* P.68.

৪২. John P. Entelis, *Op. Cit.,* P.24.

৪৩. S.M. Imamuddin, *Op. Cit.,* P.306.

৪৪. John P. Entelis, *Op. Cit.,* P.29.

৪৫. John Ruedy, *Op. Cit.,* p. 78

৪৬. *Ibid,* P.31.

৪৭. Joan Gillespie, *Op. Cit.,* p.19

৪৮. *Ibid,* P.32

৪৯. এ. বি. এম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৯

৫০. John P. Entelis, *Op. Cit.,* P. 32.

৫১. S.M. Imamuddin, Vol. II. *Op. Cit.,* P. 307.

৫২. John Ruedy, *Op. Cit.,* P. 68.

৫৩. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য,* ১ম খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১১৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

Democratization in The Middle East: The case of Iraq

Dr. Md. Fazlul Haque*

Abstract : Democratization can not be expected to take place smoothly and calmly in a country like Iraq. Democracy in Iraq must be built primarily by Iraqis in response to specific Iraqi conditions and needs and after that to a standard frame. This paper will discuss various factors relating to democratization, a details explanation of their deficiency in Iraq, the present condition these factors and some broad suggestions on how to overcome the existing challenges. However, this would be a great challenge and is expected that every party will put the oil question as a priority in their economic programme.

Introduction

The term Middle East denotes the following 20 countries: Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, the Palestinian Authority, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkey, the United Arab Emirates and Yemen. The second definition I need to make is democratization which is not possible in a sentence. However, following Teorell, "democratization implies the process through which countries become democratic. But this of course begs the question what is meant by democracy."[1] Building upon concepts developed by Robert A. Dahl and Joseph Schumpeter, I will adopt the following definition: a political system is considered to be democratic when "its most powerful collective decision makers are selected through free, fair and interim elections in which candidates freely compete for votes and in which virtually all the adult population is eligible to vote. [...] It also implies the existence of those civil and political freedoms to speak, publish, assemble, and organize that are necessary to political debate and the conduct of electoral campaigns".[2]

Democracy has been on the agenda in the Arab world for several decades, most particularly in the 1960s and 1970s when it was propagated by progressive and secular national opposition movements and parties – only to find no support in the West which, during the cold war, could only conceive of one enemy, the Communists or Socialists.[3] When the Islamists turned against their former sponsors and masters, democracy suddenly became the buzzword in the Western corridors of power, from whence it aimed more at foes than at friends in the Middle East. However, the creation of a Western style democracy, i.e. one man – and woman! – one vote in the Middle East, might lead to political structures different from the malleable and compliant ones favoured by the West. The long decades of despotism, corruption, and nepotism made it very likely that such a democracy would produce what the West now despised and feared most of all, an Islamist anti-Western nationalist regime.

* Professor, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi.

Nevertheless the majority of Arabs (61 percent according to World Values Survey in five Arab countries, Algeria, Jordan, Saudi Arabia, Egypt and Morocco) favour democracy over other political systems, which is a higher percentage than that found in 16 European countries and by far exceeds the figures in the US, Canada, Australia, and New Zealand. Yet it is the West that wants to export democracy to the Arab world in general and to the Middle East in particular, be it the American "Broader Middle East and North Africa Initiative" or the Danish "Wider Middle East Initiative". Both initiatives were inspired by the attacks on New York and Washington on September 11, 2001 but are not designed in such a way as to fulfill the democratic aspirations of the Arab peoples.[4]

One of the mistakes of the West has been a tendency to consider the Arab world a static entity that should be pushed– by military or economic means – towards democracy. And one of the mistakes of the Arab world has been to blame everything on others, be it the US, the West in general, or Israel in particular. The essays in this book transcend both of these erroneous views and deal instead with both the external and the internal forces that are impeding or promoting democracy in the Arab world. The new Western mantra demanding democracy has often been met with multiple accusations of double standards: "Why in Iraq and not in Saudi Arabia?"; "Why should Syria comply with the UN resolutions and not Israel?" and "Why is the latter allowed to have weapons of mass destruction and not the Arab countries?" Often raised yet never answered, these questions are on every Arab citizen's mind, and no plan for democracy and no amount of money can do away with them; at the end of the day they will have to be answered adequately and justly.

Neither the process of democratization nor that of modernization can be expected to be carried out unproblematically in a country like Iraq, as it is in the politically hot area and oil-rich region of the Middle East. Add to that the inhospitable, unnatural and unfavourable external environment that has existed since World War 1. The importance of establishing democracy in the Middle East has exceeded the internal evolutionary process that pushes the society to express its needs for freedom and human rights. Today, that process emerges largely as a globalization spill-over and is associated with international efforts to achieve peace and fight terrorism, rather than responding to local expectations and inspirations. However, one cannot deny that favourable changes in the external environment provide a great opportunity and a dynamic ignition to the process of democratization. But one could ask, if this process could take place smoothly and calmly. There are many reasons unfortunately that point towards a negative answer. This paper discuss the factors relating democratization, their existence and violence in Iraq.

Factors relating to Democratization

The definition of democratization that has been given in introduction section can be recalled. However, democracy in general is the mechanism and method of governance, organisation and management, the right to partake in it, the right to disagree, and the acceptance of other people's views. This entails the accumulative

effects of adopting pluralism, diversity and transfer of power. Therefore, various internal and external factors are strongly related to democratization which may vary from region to region. Some most important factors are - Democracy and security, state's internal demographical determinants, internal and external political factors, social factors, economical factors and so on.

Democratization is more likely to emerge in affluent and especially educated societies. Economic development and education are also key factors determining the intensity of democratic reforms.[5] Also developed economy should be evenly distributed. The country should be caring about its internal resources. Democratization could be meaningful indeed, if a country has a civilized society. Young generation should have enough job opportunities. There should not be any gender difference at any stage of social and economical section. Political stability is another requirement for democratization. The country should have good relation with neighbor countries. All these factors are interrelated and can ensure the democratization.

This paper will next try to explain the factors behind the democratization deficiency in Iraq and to provide some broad suggestions on how to overcome existing challenges.

The existence of these factors in Iraq

Democracy is to take root in Iraq. It must be built primarily by Iraqis in response to specific Iraqi conditions and needs. Regarding the democracy and security, however, this should not offset the strong will of the Iraqis to go forward with the process. Shortly before the elections a survey about the willingness of the Iraqi people to build democracy in spite of the occupation was conducted by the Iraqi ministry of planning, the UNDP and FAFO (the Norwegian labor union's research institute) with around 3,300 Iraqi people. They were asked a few important questions about their standard of living and about their future aspirations. The survey showed that 75 percent of the sample is very interested in elections, considering it their key to building a new future. Despite the fact that they were 80 percent Arabs, 15 percent Kurds, and 5 percent from other communities– and despite their being Muslims, Christians or from other religions, religion proved not to have any impact or effect on the percentage of responses to the survey. People also linked the fulfillment of the election result with the security situation, revealing that the priority of the Iraqis is to regain a steady and secure life, which is the most important events in building democracy, and not the other way round where people see democracy as an approach to achieving security. The war on Iraq followed by the occupation has in fact exposed the deep and multi-dimensional economic, social, political and cultural crisis of this country which has been inherited from the past and to which many people, including historians and sociologists, attribute the country's deficiency in modernization and democratization.[6]

One of the key mistakes committed by the West is its inability to distinguish between the state and the power system. The same mistake was committed in Iraq when the US dismantled the state institutions. Iraq is today one of the poorest countries in the

region in spite of the fact that, because of its natural resources, it used to be one of the richest and most industrialised countries in the Middle East. The oil sector totally dominates Iraq's economy constituting 74 percent of its GDP, and the country depends entirely on oil export for financing investment and consumption expenditures. Oil exports provide more than 93 percent of government revenues and 98 percent of foreign currency earnings. Another main challenge is the necessity of changing the role of the state in Iraq, making way for a pluralisation of the political system and a transition from a centralised planned economy towards market economy. In the past the distinctive characteristic of the Iraqi economy was the excessive role of the state and the weakness of the private sector.

Recent times, in spite of the occupation and whatever was related to that, we witnessed the establishment of 4,000 Iraqi NGOs, ten percent of whom are women NGOs, which is an encouraging step towards building a civil society.

The Violence [Violation]

Furthermore, external actors– particularly the United States and to some degree Europe– are seeking influence on the political landscape of the Middle East, based on the notion that promoting democracy is the key to stability and prosperity in the region. However, these efforts are mistrusted by large sections of the Arab public, particularly in the wake of the US-led invasion of Iraq. Therefore the question is whether the approach represented by the West is appropriate and, if not, what alternatives are available. Islamists– that have also been preoccupied with identity, unity and authenticity rather than democratization. Where these movements have seized state power, state-building has often taken an authoritarian form. Hinnebusch argues that the international context is of utmost importance and– because of the pro-American policy of several Arab states– this has mainly been an impediment to democratization, because it deprives the rulers of the national legitimacy which would allow them to risk democratization.[7]

Strong dependence on oil

After more than five decades of efforts to modernise Iraq, the country still lags not only behind the advanced Western countries but almost every country in the region and the developing countries, except the least developed poor countries. This is so in spite of the fact that Iraq used to be one of the richest middle-income countries in the region in the 1970s because of its natural resources. Iraq is also distinguished by a great balance between its area, its population and its natural resources, and in addition Iraq owns the world's second largest oil reserves. Consequently, the total budget of the government is completely dependent on oil revenues. Although Americans after the occupation are handling this sector, it finances the budget which was about $18 billion for the year 2004, and is estimated to rise to $23, $31 and $32 billion for the following years until 2007.[8] Also the rationing system of food is totally dependent on oil revenues. The dependence on oil is a major weak point in the Iraqi economy.

The exclusive role of the state

Another main lack is the necessity of changing the role of the state in Iraq, because the building of a democracy needs two major changes in the structure of the Iraqi political and economic system. The political one is the transition from national unification to pluralisation of the political system. The economic one is the transition from a centralized planned economy towards market economy. These two challenges are difficult and it will be a long process. As regards the economic transformation, one should point out the distinctive characteristic of the Iraqi economy, or the Iraqi system, which is the excessive role of the state and the weakness of the private sector. This situation is a consequence of a state-managed economic development during the last half century. Due to the former governments' adaptation of a socialist model for development, and the militarization of the economy and the society, it is difficult to reform this structure and to privatise and liberalise the economy. The dominance of the state in the economic life of the Iraqi society has pushed the balance of power in favour of the state and against society. The public sector is over-represented in the economy– a fact that has caused inefficiency. Many small- and medium-sized enterprises have weakened over the last thirty years and due to its extensive weakness the private sector has limited its role in the economic development, increasing the lack of diversification in the economy. It is impossible to start a privatisation process now since Iraq does not have a private sector of small- and medium-sized enterprises that are strong enough to withstand the competition from other foreign investors. Most of the industrial sector, i.e. around 84 percent, is dependent on the public sector administration, despite the fact that privatisation was a priority for the economic reform programme when it started in 2003. Because the Iraqi private sector is extremely weak and – being under socialism for 35 years – a capitalist class is lacking and it will take some time to establish a healthy ground for a national private sector to grow.

Lack of modernization

1) Socio-economic indicators explain important lack of democratization. Disparities and social inequalities are widespread in a broad range of fields covering health, education, as well as public and social services for the low income groups, i.e. internally displaced persons, refugees, single parent-households (11 percent) and vulnerable groups across the country. More than 50 percent of the population of Iraq being under 24 years of age, Iraqi youth is nevertheless alienated due to violence and limited access to education, training and career prospects. Iraq suffers from extensive unemployment– 33 percent ranging from 40 to 50 percent– and deep poverty among more than 28 percent of the population in some areas of Iraq, despite the fact that the oil-for-food-programme includes the ration-food-basket providing basic needs for the people.[9]

2) The illiteracy rate is high and it is higher among women (41 percent) and schoolchildren expressing gender inequalities, and there is a high level of unemployment among women.

3) There are highly skewed patterns of income distribution with a small rich minority while the rest of the population is trapped in various degrees of poverty; all of it as a result of a biased allocation of resources and waste of resources because of the militarisation of the economy.

4) Shia and Sunni extremists will retain the capacity to attack the government and Iraqi civilians. If these groups begin receiving significant new foreign support—from Iran on the Shia side or from Saudi Arabia and other Gulf states on the Sunni side—the likelihood of ethno-sectarian violence increases. There is a belief that "Kurds and Sunnis are unlikely to accept Shi‘ite control, no matter how democratically achieved."

5) There are regional disparities too, some governorates are poor and others are in fact richer but cannot depend on their resources because of the centralised system and centralised resource-allocation in Iraq. As it happens, the richest governorates Basra, Kirkuk and Amara have almost all the oil of Iraq and at the same time they are the poorest governorates in the country.

6) Distorted patterns of urbanisation. The major outcome of such a situation is the absence of citizenship, the phenomena that establishes the rights and duties of each individual in the society and the relation between the citizen and the state. Such an understanding is crucial to Democracy**.** Like most Arab Countries the rural population in Iraq remains quite high (30 percent). However, rapid urbanisation was the result not of large-scale industrialisation but rather of migration of an impoverished rural population to the cities. As urban centres resemble rural areas in terms of cultural values, attitudes, and educational levels, they cannot be seen as a phenomenon of modernization; rather they represent the displacement of traditional societies (tribal relations) into urban conglomerates. Moreover, the pattern of state intervention and political rule has created a vertical environment where the upper and lower circuits become disintegrated on the basis of segregation in income and access to resources, social capital and public services.

7) Deteriorating infrastructure. Although the whole economy is depending on oil, this sector is in need of a major rehabilitation of its infrastructure to regain its pre-1991 capacity when it produced around 3.5 million barrels a day. Some estimates assume that it will need around $18 billion to increase from 2.5 million barrels a day– the current capacity– to 3.5 or 3.6. All other areas of the infrastructure are also suffering, including electricity, water, telecommunication, transportation, and so on. In the light of this dangerous and worsening reality reconstruction programmes and the implementation of economic reforms face major challenges and there is little progress in executing these programmes; indeed the whole reconstruction process is facing real delays and is moving more slowly than expected. Slow economic progress and increased insecurity have contributed to a state of frustration among the population which, if continued, could threaten the chances of success not only for those programmes but also for building democracy in the country.

Political and social challenges

The first challenge is of course the occupation itself. Although the occupation has the stated aim of building democracy in Iraq it is in itself a challenge to democracy. This is due to the Bush administration's adoption of a very ambitious agenda for the political transformation of Iraq and the region as a whole. According to their declarations they wanted **"**Iraq free of weapons of mass destruction and ties to terrorism and moreover led by a broadly based representative government hereby taking the first steps towards democracy".[10] This means that we are facing a long term mission for the Americans in the region. It is therefore unrealistic to think of ending the occupation in this transitional or provisional period as a precondition to building democracy, bearing in mind the Palestinian experience and other lessons from history. The main challenge to the Iraqis now is how to deal with the dilemma of democracy-building within the current occupation of Iraq!! It is therefore not surprising that people in Iraq still recall memories and lessons drawn from the British occupation of Iraq 1917-1932, and believe that there are many contextual similarities between Iraq now and then. During the British era in Iraq which lasted for more than four decades, Iraqis became familiar with their first exercise of democracy building when, due to the absence of strong governmental institutions, politics were highly personalised during the monarchy era (with the Iraqi kings, Faysal I and II, installed by the British). Both the Crown and the British sought to influence the outcome of parliamentary elections in order to secure positions for their preferred candidates. Moreover, many of those who served in parliament did so out of a desire for personal gain, not out of a commitment to public service. Thus democracy eventually became discredited in the eyes of many Iraqis because of political corruption, British meddling, and the government's failure to respond to their needs. It is worthwhile remembering that although external and internal forces are pushing towards building democracy, Iraqis in post-Saddam Iraq are likely to view US actions as an external factor pushing for democracy seen through the lens of their country's experience during the British era, ending with frustration and the whole process being discredited. Hence the occupation will create a tension which simultaneously will pose obstacles for the achievement of democracy. There might be cases that are easier to handle than the Iraqi one but the result of a strong state was always a weak society. And that is what we mean by the priority of the Iraqis to have their civil-society institutions built as soon as possible and as strong as possible to get on the track of democratization of the country.[11] Of course the social and economic factors which we have already mentioned– the existence of large scale poverty, poor electricity supply, poor health conditions and large income disparity– are in, and of, themselves impeding the building of a civil society and democratization of the country. Another challenge is gender-inequality inherited from the last twenty years. Since Iraq went through wars with its neighbours, women have been the victims of the economic and social policies that the regime undertook during the wars, and the following 13 years of economic sanctions. This situation is pushing women's interests away from political life and therefore discouraging half the population from participating actively and not only through elections. Some social indicators show yet another

discouraging picture. During the Saddam Hussein period there were no parties, no NGOs, no civil society institutions. A precondition for building democracy is of course the existence of such institutions. The excessive tendency to establish parties and social or political institutions is a healthy phenomenon in itself and it is needed within this transitional period.

Suggestions

In order to find a way out of these challenges we can suggest a few ideas.[12] Firstly, major support should be given on all levels inside and outside Iraq to the building of a human capital through education and training, including technical and scientific education, and through the encouragement of a spirit of enquiry inside the educational institutions in order to form a new way of thinking and a free mind. Secondly, the income disparities should be reduced through a process of development geared to job creation. This requires seriously building a new private sector in Iraq encouraging the establishment of private organisations. Thirdly, closing gender gaps will be necessary in trying to solve the development problems and to increase political participation. These goals are best achieved through a culturally sensitive strategy including progressive reading of Iraqi resources themselves. Encouraging a culture of dialogue, tolerance and accommodation is essential both for democracy and for development, of which the country is desperately in need. This can be achieved through supporting the educational and cultural institutions in the country, and encouraging the development of civil society is particularly important for the consolidation of democracy once it has been established. Fourthly, after being isolated for the last 25 years, the Iraqi economy needs to be reintegrated into the global economy and it should again be a productive part of the international economy insofar as it is the second largest oil country in the region after Saudi Arabia.

Those are the steps to be taken or suggestions to be discussed on the internal level. On the international level, Iraq is part of the Middle East which is the hottest region in the world now, so it is possible that the success of the democratization of Iraq is related to resolving the regional conflict as well as the encouragement of regional economic cooperation which is another very important factor, just as important as the political factor. The processes of creating larger markets and reducing regional conflicts are all related to a regional economic cooperation built on the historical, geographical, and cultural aspects of the Arab region.

Conclusion

The best description of the evolving Iraqi democracy is that it descended like a parachute. It was clear that democracy could not be acquired simply through words or slogans. There are several objective conditions that need to be satisfied, whether relating to the system, the conduct or the programme. They all complement each other, culminating in processes like identifying the options, taking the decisions and assisting the regular transfer of power. History offers a number of lessons for the first steps toward establishing a functioning democracy:

1) If democracy is to take root, it must be built primarily by Iraqis in response to specific Iraqi conditions and needs.

2) The establishment of democratic structures alone is insufficient to produce democratic processes or outcomes. The Iraqis must also create civil society institutions and strengthen basic freedoms, which are essential preconditions for building democracy. Furthermore, significant efforts must be devoted to preventing corruption by fostering transparency, accountability, and the rule of law.
Every Iraqi, woman or man, old or young, wish that the occupation would end and wish that the American forces– and they say American forces not multinational forces– would leave. But the problem is that without democracy it will be a very long and difficult mission to end the occupation. Through building democracy through elections better politicians to the national assembly could be brought, because on the 9th of April 2003 it was started in a vacuum as they did not have any political party. So building political parties, or having a political life, or working to establish this political culture within the people is a new experience in itself and a long term process. The question of how Iraq will get control of its major wealth, oil, is a political question. If they are going to accept American control of oil fields, oil extraction and oil export, we will be unable to control their oil. This problem, like the one of privatisation, has been deferred to be dealt with by the new government which will emerge, after the creation of the constitution. It is not possible for a provisional or a transitional government to deal with this for it is the right of the people to decide how to deal with this problem. This would be a great challenge and is expected that every party will put the oil question as a priority in their economic programme, oil and privatisation.

Notes & References

1. Teorell, Jan (2008), *Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World 1972-2002,* Department of Political Science, Lund University, p 27.

2. Elisabeth Larsson (2009), *Democratization in the Middle East- A Comparative Case Study*, p 4.

3. Birgitte Rahbek, (ed.), *Democratization in the Middle East: Dilemmas and Perspectives*, Aarhus University Press, 2005.

4. *Ibid.*

5. Elias Papaioannou and Gregorios Siourounis, “Economic and social factors driving the third wave of democratization”, *Journal of Comparative Economics*, Volume 36, Issue 3, September 2008, pp 365–387.

---

[6] Amal Shlash, “Democratisation in future Iraq”, *Democratisation in the Middle East: Dilemmas and perspectives, Aarhus University Press.*

[7] Birgitte Rahbek, *op.cit,* p9.

[8] Amal Shlash, *op.cit.*

[9] For details see”Iraq’s National Development Strategy (2005-2007)” ISRB, Ministry of Planning and Development Cooperation, Iraq September 2004.

[10] Micheal Eisenstadt and Eric Mathewson (ed.), *US policy in post-Saddam Iraq, lessons from the British Experience*,The Washington Institute for Near East Policy, 2003, p. 68.

[11] “Inherent Socio-economic problems precluded the development of a strong middle class”. And “Under the Ba’ath regime the structural problems of the past have been magnified, and new problems have been introduced. The middle class has all but disappeared”. Ibit. P.24.

[12] Birgitte Rahbek, *op.cit.*

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

শিক্ষানগরী রাজশাহী : ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ*

Abstract: Rajshahi is renowned as an education city among the divisional towns of Bangladesh. Here there is an extension of primary education or elementary lesson including the various enriched branches of secondary, higher secondary and higher learning. All the branches relating to general education, commercial education, technical and science education, medical science, engineering and even madrasha education are very prosperous here is this city. Though all these branches of learning are available in other towns, but those of Rajshahi do have some different features. Special mention may be made in connection with learners' accommodation facility, minimum livelihood cost, jam-free conveyance facility, hospitality and over all the pleasant learning environs and all these have made it an attractive education city. Carrying all the qualities, Rajshahi did have its high glorious past. Its continuous trend relating to the spread of education over the years is also appreciable. In the distant past, under the administration of the Pala-Sena dynasties or Sultanate - Mughal and Nawab periods, the reports of this tradition are available in Rajshahi region. It also bears the testimony of its glorious history of education during the British and post-British modern period. The architects who secretly played their role towards the development of education here in Rajshahi are connected with different sections like the ruling class, local educated patrons, teachers- intellectuals, writers - journalists - litterateurs and common peoples. Rajshahi has earned its reputation as an education city as a result of the earnest efforts of all sections of people cited above. The present paper is a humble attempt to highlight the suitability and features of Rajshahi town as an education city over the years under study.

বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য এবং খেতাব আছে। ফলের রাজা আম, আর আমের দেশ রাজশাহী। পোষাকের রাজা রেশমী, আর রেশমের শহর রাজশাহী। মানবিক গুণের আধার শিক্ষা, আর শিক্ষানগরী হচ্ছে রাজশাহী। সেইসাথে রাজশাহীর নামের মধ্যেই রাজা এবং শাহী'র আভিজাত্যও লুকিয়ে আছে। এসব খ্যাতি এবং ঐতিহ্যের মধ্যে বর্তমানে যে নামটি বেশি পরিচিত সেটি হচ্ছে 'শিক্ষানগরী রাজশাহী'। বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদেই শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহীর আলাদা মূল্যায়ন লক্ষ্য করা যায়। এর নেপথ্য কারিগর হিসেবে কাজ করেছেন শাসকশ্রেণি, স্থানীয় শিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিমহল, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি, লেখক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক এবং সাধারণ মানুষ। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজশাহী আজ শিক্ষানগরীতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয় দেশের শিক্ষা পদ্ধতি। সে প্রক্রিয়ায় বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, লোকসংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়।

রাজশাহী অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকাশ: শাসক ও শিক্ষানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতা

বৌদ্ধ শাসনামলে বিহারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা জনগণের অনেকটা সহজলভ্য ছিল। বিশেষ করে বাংলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীলা, বৃহত্তর রাজশাহীর পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ময়নামতি, লালমাই বিহার এবং বগুড়া মহাস্থানের ভাসু বিহার প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।[১] রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এখানকার প্রাচীন সংস্কৃতির পরম্পরা সহস্রাধিক বছরের শিক্ষাকে কেন্দ্র

---

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

করেই। বরেন্দ্রভূমি প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। এই জনপদের কোলঘেঁসে পদ্মা নদী। আরও কিছুটা পশ্চিমে বিহারের নালন্দা ও বিক্রমশীলা। এ দুটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বরেন্দ্র তথা বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। উল্লিখিত দুটি উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র সমগ্র উত্তরবঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষালয়গুলো সাফল্যের শিখরে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল। পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে (৭৮১-৮২১ খ্রিস্টাব্দ) বৃহত্তর রাজশাহীর বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলাধীন পাহাড়পুরে নির্মিত হয়েছিল সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার। মোট ২৭ একর স্থান জুড়ে গড়ে উঠেছিল সে যুগের বাংলার একক বৃহত্তম মহাবিহার। মহাবিহারটি মূলত ছিল একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও নওগাঁর হলুদ বিহার ও জগদ্দল বিহার দুটিও ছিল পাল আমলের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। জগৎবিখ্যাত শিক্ষাবিদ অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান সোমপুর মহাবিহারে এসেছিলেন একাধিকবার। এখানে এসে তিনি শিক্ষাদান করে গেছেন।

পাল আমলে বরেন্দ্র অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে স্বীয় কীর্তিতে কালের সীমা অতিক্রম করেছেন- এমন মানুষের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এদের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ চন্দ্রগোমী, রসায়ন শাস্ত্রের প্রথিতযশা পণ্ডিত নাগার্জুন ও বৌদ্ধ আচার্য জেতারী অন্যতম। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপালের নেতৃত্বে বরেন্দ্র অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সুষমামণ্ডিত উচ্চমানের ভাস্কর্যশিল্প ও ভাস্কর্য বিদ্যালয়। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'গৌড় লেখমালা'য় নবম ও দশম শতাব্দীর প্রখ্যাত কয়েকজন ভাস্কর্যশিল্পীর নাম উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে মংকদাস, তাতোই, বিমল দাস, বিষ্ণুভদ্র, মহীধর শশীদেব, কর্ণভদ্র, তথাগতসারের নাম উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 'সুভাষিত রত্নকোষ' নামক একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বৃহত্তর রাজশাহীর ধামইরহাট উপজেলার ইতিহাসখ্যাত স্থান জগদ্দল মহাবিহারে। সে আমলের প্রখ্যাত কবিগণের দ্বারা রচিত কবিতার এই গ্রন্থটির সংকলক ছিলেন জগদ্দল মহাবিহারের আচার্য বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত 'বিদ্যাকর'। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সংকলন গ্রন্থটির খণ্ডিত পুরাতন পুঁথি নেপালে সংরক্ষিত ছিল এবং ডাব্লিউ টমাস এটির সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি প্রথমে এর নামকরণ করেন 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ পুঁথিতে আসল নাম পাওয়া গেছে 'সুভাষিত রত্নকোষ'। এ কাব্যগ্রন্থে যেসকল প্রাচীন কবিদের কবিতা ও শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারী নন্দী, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীধর নন্দী, শ্রীপাশ বর্মা, সাক্ষশ্রী ভদ্র প্রমুখ। এদের অধিকাংশই বরেন্দ্র এলাকার অধিবাসী। চর্যাপদ রচনাকারী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যেও অনেকেই ছিলেন বৃহত্তর রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষ। এদের মধ্যে কাহ্নপা বা কানুপা, শবরীপা, লুইপা, সরহপা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত চর্যাকারগণ সংস্কৃত ভাষাতে কাব্য রচনা করতেন। পালি ও অপভ্রংশ ভাষায় এদের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। এরা বরেন্দ্রভূমির সোমপুর মহাবিহার ও জগদ্দল মহাবিহারে জীবনের অধিকাংশ সময়ে অবস্থান করেছেন এবং সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের শাসনামলে শিক্ষার পরিধি সংকুচিত হয়ে আসে এবং সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার চর্চা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণগণ ও রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন।[২] এমনকি এমন বক্তব্যও চোখে পড়ে যে, সংস্কৃতরূপ ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্মশাস্ত্র পাঠ করলে তার জন্য রৌরব নরক অবধারিত। 'অষ্টদশ পুরাণানী রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বারৌরব ব্রজেত।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত দেব ভাষা (সংস্কৃত) ছাড়া মানুষের (বাংলা) ভাষায় অধ্যয়ন করবে তার জন্য রৌরব নরক।[৩] সেন আমলে বাংলাভাষা চর্চার উপর অবরোধ আরোপিত হলেও সংস্কৃত সাহিত্য স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছিল। সেন রাজাদের সময়ে রচিত সাহিত্য গৌড়-বরেন্দ্র তথা বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের গৌড়ীয় রীতি নামে কাব্যরীতির

নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট গড়ে উঠেছিল। রাজশাহীর প্রখ্যাত সাধক বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তম ঠাকুর বাংলা ভাষায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কীর্ত্তনের প্রবর্তন করেন।

সেন শাসনের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১২০৪ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কি মুসলমানদের লাখনৌতি বিজয় বাংলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। তাদের উদারনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আহার্য ও বাসস্থানের ন্যায় শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। রাজশাহীর প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে এ সকল শিক্ষাকেন্দ্র নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বিশাল বরেন্দ্র অঞ্চলসহ নদ-নদী পরিবেষ্টিত রাজশাহীতে বিখ্যাত সুফী-সাধক, উলামা-মাশায়েখের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথমাবস্থায় ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়েই তাঁরা কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন। এরপর এ অঞ্চলের অক্ষরজ্ঞানহীন অধিকাংশ মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষাদানসহ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ অনুভব করলেন সুফী সাধকগণ। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে একে একে গড়ে উঠতে থাকে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইসলামের মৌলিক অনুশাসনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর জ্ঞান প্রদান করা হতো। মাহীসন্তোষ মাদরাসা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এ মাদরাসার পাঠ্যসূচীতে কুরআন হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের পাশাপাশি আরবি, ফারসি ও বাংলা শেখানো হতো। সে সময়কার শাসকবৃন্দ, অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা ফারসি ও বাংলায় সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। এটি ছিল সে আমলের অন্যতম প্রধান উচ্চশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মাদরাসার পাঠ্যসূচীতে ছিল তর্কবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আলকেমী, জ্যামিতি, জোতিষশাস্ত্র, ইতিহাস, গার্হস্থ্য বিদ্যা, প্রশাসন, পরিমাপ কৌশল, মনস্তত্ত্ব এসকল বিষয়। মাদরাসার শিক্ষার্থীগণ এসকল বিষয়ে পর্যায়ক্রমে জ্ঞানলাভ করতেন।[৪] এরা পছন্দ মতো এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করে দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ পেতেন। সুলতানি শাসনপর্বের পর মোগল শাসনপর্বেও অনুরূপ শিক্ষাধারা অব্যাহত ছিল। মুসলিম শাসনপর্বে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি এবং তার সাথে ধর্মের ভাষা আরবি এবং জনসাধারণের ভাষা বাংলার উৎকর্ষ সাধনে যথাযথ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি হওয়ার কারণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ফারসি শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

বাংলার অন্যান্য স্থানের মত রাজশাহীতেও শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মূলত পরিবারকেন্দ্রিক। শিক্ষার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল খানকা, মক্তব, মাদরাসা, মসজিদ, টোল প্রভৃতি।[৫] এছাড়া স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্থানে গুরুগৃহে শিক্ষা দেওয়া হতো। মুসলমান শিক্ষককে ওস্তাদজী নামে সম্বোধন করা হতো। অন্য ধর্মাবলম্বীগণ শিক্ষককে গুরুজী বলতেন। অনেক স্থানে শিক্ষকগণ শিক্ষার কাজে জায়গীর থাকতেন। অনেক সময় শাসকদের আনুকূল্যে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ঐ সময়ের কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় ছিল না। রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে যখন মসজিদ বা মাদরাসার অস্তিত্ব ছিল না তখন ইসলাম প্রচার ও প্রশিক্ষণের একমাত্র মাধ্যম ছিল খানকা। খানকা মূলত ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার অনুশীলন কেন্দ্র। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারকগণ এখানে আল্লাহর একত্ববাদ, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও ইসলামের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতিসহ সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দান করতেন। এমনকি খানকায় শরিয়াহর বিভিন্ন বিষয়সহ আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দান করা হতো। মুসলমানদের সম্মিলনের পবিত্র স্থান হলো মসজিদ। নামাজ আদায় ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডও এ মসজিদ থেকে পরিচালিত হতো। রাজশাহীতে ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। ফলে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রাথমিক সময়ের এসব মসজিদের ইতিহাস খুব বেশি পাওয়া যায় না। খানকার মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষার সুচনা হলেও মক্তবের মাধ্যমেই তা স্থায়িত্ব লাভ করে। মুসলিম আমলে মক্তব শিক্ষা মূলত দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। তখন প্রতিটি মসজিদে মক্তব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মসজিদকেন্দ্র ছাড়াও আলাদাভাবে ছোট কোন ঘরে মক্তব শিক্ষার প্রচলন ছিল। অনেক

ক্ষেত্রে এ জন্য সরকারি অনুদান ও পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মক্তব–মাদরাসার লাখেরাজ সম্পত্তি যখন জমিদারদের আওতায় চলে যায়, তখন এ মক্তবশিক্ষা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে শতাব্দিকাল পর্যন্ত ধর্মজ্ঞান থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজশাহীর মুসলমানরাও অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছিল।[৬]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসনপর্বের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকাংশে অনুসৃত হয়েছে। বৃটিশরা প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করলেও অচিরেই তারা সনাতন পদ্ধতির এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলোৎপাটন ঘটিয়ে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে।[৭] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সম্প্রসারণ তা সম্পূর্ণ কলকাতাভিত্তিক শিক্ষা। এ কার্যক্রমে হিন্দুসম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। শুধু শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনধারণের সার্বিক বিষয়ে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা ছিল খুবই কম। ফলে একদিকে যেমন দরিদ্রতা তাদের গ্রাস করে ফেলে অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা তাদেরকে আরো পিছিয়ে দেয়। সেইসাথে শাসকশ্রেণির একচোখা নীতি, হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তা-চেতনা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায়।[৮] এছাড়া ইংরেজরা পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের উপর সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালিয়েছে। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের কোন ধরনের আনুকূল্যই পায়নি। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানদেরকে হতাশা-বঞ্চনা এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকল্পে কাজ শুরু করেন সমাজকর্মী মনীষী নবাব আব্দুল লতিফ।[৯] তিনি ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেন।[১০] ১৮৭৪ সালে নবাব আব্দুল লতিফ মহসিন ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে মাদরাসা স্থাপন করেন। এর সাথে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজের ত্রাণকর্তার অন্যতম আর একজন নেতা ছিলেন সৈয়দ আমির আলী।[১১] শিক্ষার মশাল হাতে নিয়ে মুসলমান সমাজের আধুনিকীকরণে ব্রতী হন তিনিও। বৃটিশ শাসিত বাংলায় বৃটিশদের একচোখা নীতির কারণে রাজশাহী শহরে মুসলমানরা শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেকাংশে পিছিয়ে পড়লেও বাহ্যত বৃটিশ আমলেই রাজশাহীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ বৃটিশ শাসনামলে এতদাঞ্চলের সামাজিক নেতৃত্ব বিশেষত জমিদারদের অর্থানুকূল্যে বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে তৎকালীন পূর্ববাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।[১২] মূলত শিক্ষানগরী রাজশাহীর শুভযাত্রা শুরু হয় বৃটিশ শাসনপর্বেই।

পর্তুগিজ, ইংরেজ কোম্পানী কিংবা বৃটিশরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আসলেও রাজশক্তি দখল এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সে সূত্রে রাজশাহীতেও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য মিশনারীগণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৮৬২ সালে ইংল্যান্ড থেকে রেভারেন্ড বিহারীলাল সিং রাজশাহীর 'রামপুর বোয়ালিয়া'য় এসে শহরের বুলনপুর মৌজায় একটি মিশনকেন্দ্র খোলেন। সেখানে বাংলাসহ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। পরবর্তী দুই বছরের মধ্যেই অনেকগুলো পাঠশালাসহ একটি উন্নতমানের বিদ্যালয়, খ্রিস্টান উপাসনাগৃহ এবং মিশনারীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। এরপর বৃহত্তর রাজশাহীর জমিদারগণ নিজেদেরসহ প্রজা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের পড়ালেখার সুবিধার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। ১৮২৫ সালে রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর নাটোর থেকে রাজশাহী শহরে স্থানান্তরিত হয়। সকল প্রকার প্রশাসনিক দপ্তরসহ ফৌজদারি ও দিওয়ানী আদালত রাজশাহীর পদ্মার তীরবর্তী শ্রীরামপুর মৌজায় স্থাপিত হয়। বৃহত্তর রাজশাহীর ছোট বড় প্রায় সকল জমিদার, জোতদার, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, শিল্পীসহ নানা ধরনের পেশার সাথে সম্পৃক্ত মানুষেরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে রাজশাহী শহরে বসতি স্থাপন করেন। সে সময়ে রাজশাহী শহরের নাম ছিল বোয়ালিয়া। শ্রীরামপুর মৌজায় নতুন প্রশাসনিক ভবনসহ আদালত নির্মিত

হবার ফলে শহরের নামকরণ করা হয় 'রামপুর বোয়ালিয়া'। ইউরোপীয়ানদের অনেকেই পরিবারসহ বসবাস করতেন 'রামপুর বোয়ালিয়া' নামের রাজশাহী শহরে। তাদের সন্তানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। এ সকল কারণে বোয়ালিয়ায় সদর দপ্তর স্থাপনের সাথে সাথেই গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের সহায়তায় ১৮২৮ সালে বর্তমান কলেজিয়েট স্কুল থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল' নামে একটি বেসরকারি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩] ১৮২৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত শহরের দানশীল ব্যবসায়ী, জমিদার এবং রাজশাহীতে ব্যবসায়রত ইংরেজ কোম্পানীর আর্থিক সহায়তা ও অনুদানে স্কুলটি পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৩৬ সালের ১০ জুন বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুলটি জেলা স্কুল হিসেবে সরকারি মর্যাদা লাভ করে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সারদা প্রসাদ বসু স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৮৭২ সালে দুবলাহাটির জমিদার রাজা হরনাথ রায় রাজশাহীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তৎকালীন বাংলা সরকারকে প্রদান করেন। ১৮৭৩ সালে বোয়ালিয়া সরকারি ইংলিশ স্কুলে একজন মুসলিম ছাত্রসহ ছয়জন ছাত্র নিয়ে এফ.এ ক্লাশ চালুর মধ্যদিয়ে কলেজের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক হরগোবিন্দ সেন রাজশাহী কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ শুরু করেন।[১৪] অচিরেই স্কুলটি কলেজ সেকশনসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিকপর্বে খান বাহাদুর রশীদ আলী খান চৌধুরী কলেজ ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন। ১৮৭৭ সালে বোয়ালিয়া হাই স্কুলের নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নামকরণ হয় 'কলেজিয়েট স্কুল'। রাজশাহী এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন সভাপতি দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর রাজশাহী কলেজে ডিগ্রি কোর্স খোলার উদ্দেশ্যে এসোসিয়েশনের মাধ্যমে দেড় লক্ষ টাকা এককালীন দান করেন। ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন সরকার কর্তৃক রাজশাহী কলেজ অনুমতি লাভ করে এবং ১৮৭৮ সালে কলেজে বি.এ ক্লাশ খোলা খোলার পাশাপাশি কলেজটি প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত হয়ে 'রাজশাহী কলেজ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[১৫] অন্যদিকে একই ব্যবস্থাধীনে থাকার ফলে স্কুল অংশের নামকরণ করা হয় 'রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল'।

বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল, পরবর্তীকালের জেলাস্কুল এবং সর্বশেষ কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকে রাজশাহী শহরের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বচ্ছল মানুষেরা তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাগিদ অনুভব করেন। বৃহত্তর রাজশাহীর জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য পেশার স্বচ্ছল ব্যক্তিরা এই শহরে বসতি স্থাপন করেন। সন্তানদের শিক্ষার সহজ সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভের পর উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষালাভ শেষে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার্থে রাজশাহী কলেজে ভর্তির জন্য শহরমুখি হতে থাকে। এরপর 'রামপুর বোয়ালিয়া'য় একে একে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৮৪৭ সালে দরিদ্র বালকদের শিক্ষার জন্য রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর অবৈতনিকভাবে 'ইংরেজি বাংলা স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬২-১৯২১ সালের মধ্যে এটি 'মধ্য ইংরেজি স্কুল' এবং ১৯২১ সালের ১ জানুয়ারি 'ইংলিশ হাইস্কুলে' পরিণত হয়।[১৬] এ স্কুলটিই বর্তমানে 'লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। উপনিবেশিক শাসনামলের শেষার্ধে রাজশাহী অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে 'রাজসাহী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'। ১৯২৩ সালে গঠিত এ সমিতির প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজশাহী গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু নির্ম্মল চন্দ্র সেনগুপ্ত। গুরু ট্রেনিং স্কুলেই এর অফিসিয়াল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সংগঠনটির ভূমিকা এবং শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া জড়িত থাকার কারণে অল্পকালের মধ্যেই তদানীন্তন রাজশাহী জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও থানা পর্যায়ে এর শাখা স্থাপিত হয়। ১৯৪০ সালের মধ্যেই রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে এ সমিতির ৫০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] এ সমিতি পরবর্তীকালে 'নিখিল বঙ্গ প্রাইমারী শিক্ষক সমিতি'র সাথে যুক্ত হয়।

১৮৫২ সালে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে গেলে একদিকে যেমন ঐতিহ্যধারার শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় তেমনি মুসলমান শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক স্কুল ইন্সপেক্টর গুরুমহাশয়দের ট্রেনিং প্রদান করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য 'ভূদেব পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের নিম্নস্তরে শিক্ষাবিস্তারে এ পাঠশালার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।[১৮] তবে 'ভূদেব পাঠশালা'য় মুসলমানদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না।

দিঘাপতিয়ার জমিদার রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের সহযোগিতায় ১৮৬৮ সালে রাজশাহী শহরে বালিকাদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে ১৯৬০ সালে সরকারিকরণ করা হয়। রাজশাহীতে নারী শিক্ষার প্রসারে এ 'পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের' ভূমিকা অগ্রগণ্য। ১৮৯৮ সালের ১২ জুলাই অনুকুল চক্রবর্তী ও সুদর্শন চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে 'রাজশাহী একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালে স্কুলটি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থায়ী অনুমোদন লাভ করে। এ সময় খাজুরিয়ার জমিদার জীবন্তীনাথ খাঁ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ খাঁ এ স্কুলে আর্থিক অনুদান দিয়ে তাদের বাবার নাম যুক্ত করে 'রাজশাহী ভোলানাথ একাডেমী' নামকরণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় রেজিস্ট্রিকৃত দলীলমূলে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বভার অনুকুল চক্রবর্তীর উত্তরাধিকারগণের উপর অর্পণ করলে তারা অনুকুল চক্রবর্তীর পিতার নাম যুক্ত করে স্কুলের নাম দেন 'রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর একাডেমী'। পরে ১৯৩৯ সালে হিন্দু শব্দটি যোগ করে নামকরণ করা হয় 'রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমী'।[১৯] স্কুলটি রাজশাহীর শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

রাজশাহী আদালতের আইনজীবি খন্দকার ওয়াসিউদ্দীন হাতেম খান এলাকায় নিজ বাসভবনে ১৮৬৮ সালে একটি ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মুসলিম মেয়েরাসহ সব ধর্মের মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থাকলেও পরে এটি মিশনারী ডা. ডোনাল্ড মরিসনের তত্ত্বাবধানে স্কুলটি খ্রিস্টান মিশনারীদের হাতে চলে যায় এবং নাম ধারণ করে 'মিশন বালিকা বিদ্যালয়'। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত স্কুলটি চালু ছিল। ১৮৭৪ সালে হাজী মুহম্মদ মহসীন শিক্ষা তহবিলের সহায়তায় 'দরসে নিজামিয়া সিনিয়র মাদরাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে এটি 'নিউ স্কিম মাদরাসা' এবং ১৯৩০ সালে বাংলা সরকারের নতুন কারিকুলাম অনুয়ায়ী মাদরাসাটির নামকরণ করা হয় 'রাজশাহী হাই মাদরাসা'। সরকারি হাই মাদরাসা নাম অক্ষুন্ন রেখে ১৯৬০ সালে এটিকে সরকারি হাইস্কুলে পরিণত করা হয়। তবে প্রধান শিক্ষকের স্থলে একজন বিসিএস শিক্ষাক্যাডারকে দায়িত্ব দিয়ে পূর্বপ্রচলিত অধ্যক্ষ পদ বহাল রাখা হয়েছে। এটি বর্তমানে হাইস্কুলের পাঠ্যক্রম চালু রেখে রাজশাহীর শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। রাজশাহীর অন্যান্য প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৮৬৫ সালে 'রাজশাহী ট্রেনিং স্কুল, ১৮৬৮ সালে 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' ১৮৯৮ সালে 'ডায়মন্ড জুবিলী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ১৯০৬-৭ সালে 'সংস্কৃত কলেজ, ১৯২৭ সালে 'রাজশাহী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'রাজশাহী মূক ও বধির বিদ্যালয়' অন্যতম। এছাড়া রাজশাহী শহরের হরিচরণ মৈত্রেয়'র বাড়িতে ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি 'হরিচরণ শিশু বিদ্যালয়' চালু হলেও পরবর্তীতে দিঘাপতিয়ার কুমার হেমন্ত কুমার রায় স্কুলের বর্তমান ভবনটি ক্রয় করে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরপূর্বক নামকরণ করেন 'সাবিত্রী শিক্ষা বিদ্যালয়'।[২০] বর্তমানে এটি 'সাবিত্রী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলার অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে জ্ঞান বিতরণে সফল ভূমিকা পালন করে।

বৃটিশ বিদায়ের সময়কালে অর্থাৎ পাকিস্তান স্বাধীন হবার পরপরই মূলত রাজশাহীতে উচ্চশিক্ষাসহ বহুমুখি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। নব্যশিক্ষিত জনমণ্ডলী এবং নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্খা রাজশাহী অঞ্চলকে

শিক্ষা-সংস্কৃতির পাদপীঠ হিসেবে গ্রহণ করে। নারী শিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে আসা হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠিতি হয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্কুল, কলেজ, মাদরাস। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেশকিছু বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা কলেজ ও মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ করা হয়।[২১] ১৯৪৭ সালে রাজশাহী মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়, ১৯৪৭ সালে রিভারভিউ হাইস্কুল, ১৯৫২ সালে রাজশাহী কোর্ট একাডেমী, ১৯৫৫ সালে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ১৯৫৭ সালে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, ১৯৫৭ সালে দারুস সালাম মাদরাসা, ১৯৫৮ সালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, ১৯৫৯ সালে হামিদপুর নওদাপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৫৯ সালে শহীদ মামুন মাহমুদ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ১৯৬০ সালে লক্ষীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৬২ সালে রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, ১৯৬২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৯৬৪ সালে রাজশাহী নৈশ উচ্চবিদ্যালয়, ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, ১৯৬৬ সালে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ১৯৬৭ সালে সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬৭ সালে রাজশাহী সরকারি বালিকা (হেলেনাবাদ) উচ্চবিদ্যালয়, ১৯৬৯ সালে গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ১৯৬৯ সালে রাজশাহী স্যাটেলাইট টাউন হাইস্কুল, ১৯৬৯ সালে শাহ মখদুম মহাবিদ্যালয়, ১৯৭০ সালে রাজশাহী আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা জাগ্রত হয়।[২২] ১৯৬৩ সালে তৎকালিন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট' স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন মো. বদরুল হুদা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৮টি বিভাগ চালু আছে। এটি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।[২৩] ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ১৯৬২ সালে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১২ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঐ বছরের ১ জুলাই থেকে অন্যান্য প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের সাথে রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়কেও বিআইটিতে (বাংলাদেশ ইনস্টটিটিউট অব টেকনোলজি) রূপান্তরিত করা হয়।[২৪] ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) হিসেবে যাত্রা শুরু হলে রাজশাহীর শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করে।

রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য রাজশাহী জেলা বোর্ডের উদ্যোগে লোকনাথ উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তার পূর্বপার্শ্বে ১৮৯৮ সালে জেলার প্রথম শিল্প সংশ্লিষ্ট আধুনিক একটি রেশমশিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। স্কুলটি নির্মাণে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারবৃন্দ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রতিষ্ঠানটির সূচনালগ্নে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পাঁচ বৎসরকাল এখানে অধ্যাপনা করেছেন। এখানে গবেষণালব্ধ উৎপাদিত রেশম গুটি পোকার বীজ ভারত, জাপান, ইটালী ও ইংল্যান্ডে পাঠানো হতো। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রেশম শিল্পের অবনতি ঘটলে প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। পাকিস্তান আমলে স্কুলটির ধরণ বদলে ফেলে ১৯৫৫ সাল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে স্কুল হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে রেশম শিল্পে নিয়োজিত কিছু সংখ্যক উচ্চমানের কারিগর রাজশাহীতে আসেন। নবাগত কারিগরগণকে কেন্দ্র করে শহরের শিরোইল মহল্লায় ১৯৬২ সালে রেশম কারখানা এবং রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট গড়ে তোলেন। রেশম কারখানাটি বর্তমানে বন্ধ থাকলেও 'রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট' এর কার্যক্রম চালু রয়েছে। 'রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ' সারদা পুলিশ একাডেমীর নিকটবর্তী মোক্তারপুর নামক মৌজায় মোট ১২০ একর ভূমির উপর অবস্থিত। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে 'আইয়ুব ক্যাডেট কলেজ' নামে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র ক্যাডেট কলেজটি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর 'রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ' নামকরণ করা হয়।

বৃটিশ সময়ের শেষ দিকেও রাজশাহীতে চিকিৎসা বিষয়ক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯৪৯ সালে এ্যাডভোকেট মাদার বখশ, রাজশাহী পাবলিক হেলথ-এর সহকারী পরিচালক আব্দুল জব্বার, রাজশাহী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মজিদসহ রাজশাহীর দানশীল ব্যক্তিগণের আর্থিক সহায়তায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বেসরকারি 'মেডিক্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমাবস্থায় বরেন্দ্র জাদুঘরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মুসলিম ক্লাবের ঘরে অর্থাৎ বর্তমানে টি, বি, ক্লিনিক ভবনে স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৫ সালে স্কুলটি সরকারিকরণের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী কলেজের সাত নম্বর গ্যালারী হাজী মোহাম্মদ মোহসীন ভবন ও সদর হাসপাতালের একটি কক্ষে স্কুলের ক্লাস চলেছে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মানুষের চিকিৎসা সেবা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্যা সম্প্রসারণের নিমিত্তে স্কুলটি 'রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে' রূপান্তরিত হয়। লে. কর্ণেল ডা. গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এর প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বুরহানউদ্দীনের অবদানও চিরস্মরণীয়।[২৫] 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮ অক্টোবর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন রাজশাহী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. ইৎরাত হোসেন জুবেরী সর্ব প্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিষয়টিকে তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্ব প্রদান করেন মাদার বখশ। অচিরেই রাজশাহীর বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গঠন করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার ১৯৫২ সালে রাজশাহী সফরে এলে বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালের ১ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই ড. ইৎরাত হোসেন জুবেরীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।[২৬] শিক্ষানগরী রাজশাহীর প্রধানতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গৌরবের সাথে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। উন্মুক্ত হয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অবারিত সুযোগ। তখন থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে শহীদ নাজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৭৫ সালে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ১৯৭৭ রাজশাহী ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র মডেল স্কুল, ১৯৭৮ সালে আলহিকমাহ মুসলিম একাডেমী, ১৯৭৮ সালে রাজশাহী চারুকারু মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৯ সালে রাজশাহী মহিলা ফাজিল মাদরাসা, ১৯৭৯ সালে রাজশাহী সরকারী শারিরিক শিক্ষা কলেজ, ১৯৮০ সালে রাণীবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৮০ সালে শাহ মাখদুম হাই স্কুল, ১৯৮১ সালে মির্জাপুর মসজিদ মিশন একাডেমী, ১৯৮২ সালে মসজিদ মিশন স্কুল এন্ড কলেজ, ১৯৮৫ সালে সূর্যকণা উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৮৫ সালে সিরোইল কলোনী উচ্চবিদ্যালয়, ১৯৮৩ সালে মদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, ১৯৮৬ সালে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চবিদ্যালয়, ১৯৯৮ সালে রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ২০০৬ সালে রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজসহ বেশকিছু স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কওমী ও হাফিজিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭] এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরে পূর্ববাংলা বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে রাজশাহী স্বীকৃতি লাভ করে।

শিক্ষানগরী রাজশাহী গঠনে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ

'শিক্ষানগরী রাজশাহী' গঠনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষানুরাগীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অধুনা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নিকেতনগুলো খ্যাতিমান শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক পাঠদান করা হয়ে থাকে। অতিপ্রাচীন পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মহান শিক্ষকবৃন্দের অনেকের নাম ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। তদুপরি হোসেনীগঞ্জের কালা পণ্ডিত, শেখ পাড়ার ভূষণ পণ্ডিত, শেখপাড়ার তারিনী বাবু পণ্ডিত, কাদিরগঞ্জের বদর পণ্ডিত, সিরুশাপাড়া পাঠশালার আক্কেল পণ্ডিত, বেভারেন্ড বিহারীলাল সিং, ডা. ডোনাল্ড মরিসন, ডা. রবার্ট মরিসন,

হোসেন আলী পণ্ডিত, মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী পণ্ডিত প্রমুখের নাম বিভিন্নসূত্রে পাওয়া যায়। এ সব খ্যাতিমান শিক্ষক রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষার ভিত রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে রাজশাহীতে মাধ্যমিক শিক্ষারও উন্নয়ন সাধিত হয়। এ পর্যায়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীনপর্বের খ্যাতিমান যশস্বী শিক্ষকবৃন্দের মধ্যকার বিশেষ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন– সারদা প্রসাদ বসু, হরগোবিন্দ সেন, খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নলিনী মোহন ভদ্র, কাব্যতীর্থ কালাচাঁদ চক্রবর্তী, ইয়াসিন আলী, মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, মুহাম্মদ ইমরান আলী, মোহাম্মদ বাহাদুর আলী সরকার, মুহাম্মদ ইজহারুল হক, যাদব পণ্ডিত, সুদর্শন চক্রবর্তী, অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী, মোহাম্মদ আব্দুল মুইজ্জ, মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, মৌলভী বশীরউদ্দিন আহমেদ, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, আখতারুন্নেসা খানম, মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, গোষ্ঠবিহারী মজুমদার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নুরমহল খাতুন, চিন্তাহরণ ব্যানার্জী, মোহাম্মদ আলাউদ্দীন প্রমুখ। উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণে শিক্ষাবিদগণের ভূমিকা অনবদ্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপনারত শিক্ষকবৃন্দ রাজশাহীকে শিক্ষানগরী হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন। তাঁরা একদিকে যেমন শিক্ষাবিস্তারে ভূমিকা পালন করেছেন অন্যদিকে গবেষণা ও সৃজনশীল লেখালেখির মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করেছেন।[২৮] এ পরিসরে সকল শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যচর্চা বিশেষভাবে অগ্রগতি লাভ করে।

শিক্ষানগরী রাজশাহীর ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ও আবাসিকতা

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাল আমলে সোমপুর বিহারের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিকতা পদ্ধতি চালু ছিল। এখনো সেখানকার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে বুঝা যায় যে প্রত্যেক শিক্ষকের সাথে আবাসিকভাবে শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেন আমলের শিক্ষাব্যবস্থাতেও গুরু-শিষ্যের শিক্ষাপদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রাথমিক পর্বে আউলিয়া কিরামের খানকা কিংবা মসজিদ থেকেই ইসলাম শিক্ষার সবক প্রদান করা হতো। সুলতানী ও মোগল আমলে মসজিদভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি যে সব মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোতেও আবাসিকতার ব্যবস্থা ছিল। তবে মুসলিম সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণে লজিং বা জায়গির মাস্টার রাখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া হতো। নবাবী আমলের শেষে বৃটিশ শাসনামল এমনকি পাকিস্তান আমল পেরিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নব্বই দশকের শেষ সময় পর্যন্ত জায়গীর বা লজিং মাস্টার রাখার বিষয়টি খুব প্রচলিত ছিল। রাজশাহীর দরগাপাড়া, হেতেম খাঁসহ শহরের নানা শ্রেণিপেশার মানুষ ছাত্রদের লজিং রেখে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ায় লজিং পদ্ধতি মফস্বল এলাকাগুলোতেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি তথা রুয়েট, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো লজিংয়ের জন্য বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সচ্ছল পরিবারের পাশাপাশি অসচ্ছল, খেটে খাওয়া, মুদি দোকানদার, কসাই, এমনকি ছোটখাটো সবজি ব্যবসায়ীও বাড়িতে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য লজিং মাস্টার রেখেছেন। তাদের পরিবারের সাথে থেকে লেখাপড়া শিখে অনেকেই অনেক বড় বড় পদে আসীন হয়েছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে অতিথিপরায়ণ হিসেবে রাজশাহীবাসীর সুনাম অনেক আগে থেকেই ছড়িয়ে আছে। রাজশাহীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং শিক্ষার্থীদের রাজশাহীমুখি হবার ক্ষেত্রে এ অতিথিপরায়ণতা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষকরে লজিং বা জায়গীর মাস্টার হিসেবে দূরের শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করতে রাজশাহীর স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসনীয় ভূমিকা উল্লেখ করার মতো।

‘ওয়েস্টমিনিস্টার হোস্টেল’ নামে পরিচিত ভবনটিই রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের প্রথম আবাসিক ভবন। ১৯২৭ সালে প্রেসবিটারিয়ান মিশনারীগণ শহরের শ্রীরামপুর মহল্লায় সুন্দর একটি পাকা বৃহৎ আকারের ভবন নির্মাণ করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আসা সকল ধর্মের ও বর্ণের শিক্ষার্থীগণের থাকার জন্য এই হোস্টেল নির্মিত হয়েছিল। এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন মিশনারী ডগলাস ইউয়ার্ট। তাঁর স্ত্রী মিসেস ইউয়ার্ট ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত নার্স। ১৯৪৯ সালে খ্রিষ্টান মিশনারী হাসপাতালটি বুলনপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উল্লিখিত ওয়েস্টমিনিস্টার হোস্টেলে চলে আসে। এর ফলে হোস্টেলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহী কলেজের প্রতিষ্ঠা ছিল এই এলাকার জন্য মাইল ফলক। পুঠিয়ার রানী হেমন্ত কুমারী রাজশাহী কলেজের হিন্দু ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করেন। মুসলিম কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য কোন হোস্টেলের ব্যাবস্থা ছিলনা। খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ ১৯০৪ সাল থেকে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। উপমহাদেশের এ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৯ সালে রাজশাহী কলেজ চত্বরে মুসলিম ছাত্রদের থাকার জন্য ‘ফুলার মোহামেডান হোস্টেল’ নির্মিত হয়। এছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনেকেই রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার সুবিধা প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে নাটোরের খান চৌধুরী জমিদার পরিবার রাজশাহী শহরের হেতম খাঁ এলাকায় তাঁদের পারিবারিক বাসস্থান ‘চৌধুরী লজ’ এ প্রায় বিশজন ছাত্রের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তদানীন্তন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের শিক্ষার উন্নয়নে তাদের এই উৎসাহ ছিল প্রেরণাদায়ক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিকতার জন্য হল নির্মাণ শুরু হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য ১১টি এবং ছাত্রীদের আবাসিকতার জন্য ৬টি আবাসিক হল নির্মিত হয়। একই ধারায় রুয়েট, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী কলেজসহ অধিকাংশ কলেজেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিকভাবে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও আবাসিকতার ব্যবস্থা অনেক ভালো। বিশেষকরে মদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, দারুস সালাম কামিল মাদরাসা, রাজশাহী মহিলা মাদরাসাসহ অধিকাংশ আলিয়া, কওমী এবং হাফিজিয়া মাদরাসায় আবাসিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে।[২৯] আবাসিকতার সুবিধার কারণে দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীরা রাজশাহীতে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতে আগ্রহী হয়ে থাকে।

আবাসিকতার আরেক পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তি উদ্যোগে মেস ব্যবস্থাপনা। রাজশাহীকে শিক্ষানগরী হিসেবে গড়ে তুলতে এ ধরনের আবাসিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজশাহী শহরের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার সুবিধার্থে শিক্ষার পরিবেশবান্ধব মেস তৈরি ও ব্যবস্থাপনার আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে ফ্যামিলি বাড়িভাড়ার চেয়ে মেসভাড়ায় অর্থনৈতিক লাভ বেশি। তবে ব্যবস্থাপনার জন্য বাড়িওয়ালাদেরকে একটু বেশি তত্ত্বাবধান করতে হয়। তদুপরি এতে একদিকে যেমন তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন অন্যদিকে বৃহত্তরভাবে শিক্ষার উন্নয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি একটি সেবামূলক কর্মও সম্পাদিত হয়ে থাকে। ছোটখাটো পরিসরে নিজেদের বাসাবাড়িতে অবস্থানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিকতা প্রদানের যেমন নজির রয়েছে তেমনি শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিকতার জন্যই ছোটবড় ভবন তৈরিরও দৃষ্টান্ত চোখে পড়ার মতো। মূলত বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরই এ মেস ব্যবস্থাপনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নিজের বাসা-বাড়ির দু'একটা কক্ষ ভাড়া দেয়া থেকে শুরু করে নির্মাণ হতে থাকে বড় বড় ছাত্র-ছাত্রী নিবাস। এগুলো একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে ওঠা আবাসিক হলের মতো। বাণিজ্যিকভিত্তিতেই এ ধরনের মেসসমূহ গড়ে ওঠেছে। রাজশাহী শহরের অর্কিড, আরএইচ শিক্ষাভবন, স্বপ্নচূঁড়া, ফাইভ স্টার ছাত্রীনিবাস, বাথফাশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক বড় বড় ছাত্র-ছাত্রী নিবাস। এছাড়াও পাড়া-মহল্লায় অসংখ্য বাড়ি নির্মিত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিকতার জন্য।

এমনকি এ মেস ব্যবস্থাপনাকে আরো সুগঠিত করার জন্যে পাড়া-মহল্লায় মেস মালিক সমিতিও গঠিত হয়েছে।[৩০] সর্বোপরি এ সব মেসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনা অনেকাংশেই সহজলভ্য হবার কারণে দূরের শিক্ষার্থীরা অবলিলায় চলে আসতে পারেন রাজশাহীর যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। রাজশাহীকে শিক্ষানগরীতে রূপান্তর করতে আবাসিক সুবিধা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিক্ষা সম্প্রসারণে সংগঠন-লেখক-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মী

রাজশাহীকে শিক্ষানগরীর মর্যাদায় অভিষিক্তকরণে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের পুরোধাব্যক্তিদের অবদানকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে রাজশাহীর শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ভূমিকা পালন করেছেন। রাজশাহীর উল্লেখযোগ্য সংগঠনসমূহ হচ্ছে– রাজশাহী এসোসিয়েশন, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর, হেরিটেজ রাজশাহী, রাজশাহী সাহিত্য মজলিশ, দিশারী সাহিত্য মজলিশ, কতিপয় সাহিত্য গোষ্ঠী, কবিতা সারথি, নবপ্রবাহ সাহিত্য গোষ্ঠী, স্পন্দন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, বাংলা সাহিত্যিকী, প্রত্যয় সংস্কৃতি পরিষদ, অনির্বাণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ, হিমাচল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদ্বেল সাহিত্য গোষ্ঠী, উদ্ভাস সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, আব্দুল হাই সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ, বরেন্দ্র একাডেমী, ধ্রুব সাহিত্য গোষ্ঠী, আদিবাসী কাব্য শিল্প নিকেতন, রবিবাসরীয় সাহিত্য সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনন, শব্দায়ন, আড্ডা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লেখক ফোরাম, সন্দীপন সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী লেখিকা সংঘ, পরিচয় সংস্কৃতি সংসদ, রাজশাহী লেখক পরিষদ, মুক্ত সাহিত্য সমাবেশ, কবিকুঞ্জ, ধ্রুব সাহিত্য গোষ্ঠী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩১] এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন কোনটি বর্তমানে নিষ্ক্রিয়। গবেষণা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন অনেকেই। এ ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে অনেকের নাম বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেছে আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে। অনেকে আবার রাজশাহীর অঙ্গনে বেশ পরিচিত। এমন ব্যক্তিও আছেন যাদের নাম হয়তো রাজশাহীর স্থানীয় অধিবাসীরাও খুববেশি জানেন না। কিন্তু তারা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করে রাজশাহীকে আলোকিত করেছেন; এগিয়ে নিয়ে গেছেন শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহীকে। তাদের সকলের নাম স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য বৈকি।[৩২] শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহীর উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারীদের লেখক-গবেষকদের অন্যতম ব্যক্তিগণের কয়েকজন হচ্ছেন– মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, কামাল লোহানী, আজিজ মিসির, কালিনাথ চৌধুরী, স্যার যদুনাথ সরকার, হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার, মীর নুরুল ইসলাম, মোসলেম আলী বিশ্বাস, উস্তাদ সুফী মাস্টার, কবি বন্দে আলী মিয়া, উস্তাদ হরিপদ দাস, ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন, রহমতুল্লাহ বাঙ্গালী, লেখক ও শিক্ষাবিদ শফিউদ্দীন সরদার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, ভাষাসৈনিক অধ্যাপক মুহাম্মদ একরামুল হক প্রমুখ।

পাঠপরিবেশ তৈরি ও সাধারণ জনগণের মমত্ববোধ

শান্তির শহর রাজশাহী। আধুনিককালে বিশ্বজরিপেও এমন কথা উঠে এসেছে। এটা যেমন বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি অনেক আগেও রাজশাহীর ব্যাপারে এমন মন্তব্য পাওয়া যেতো। বিশেষ করে রাজশাহীর জীবন-জীবিকা অত্যন্ত মন্থর। এখানকার মানুষ অত্যন্ত সরলতার আবহে পরিচালিত। নিজে শিক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারেনি এমন সাধারণ মানুষও শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে অত্যন্ত মমত্ববোধে উজ্জীবিত। দূরদূরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীদের ভালোবাসার সাথেই গ্রহণ করে থাকেন এখানকার সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ-পরিবেশ যেমন অন্যান্য স্থানের চেয়ে সুন্দর তেমনি যানজটমুক্ত পরিচ্ছন্ন শহর পাঠ-পরিবেশকে আরো ইতিবাচক করে তুলেছে। প্রতিটি মেস মালিকই তাদের আবাসিক স্থানটুকুতে পাঠ-পরিবেশ সুন্দর রাখার ব্যাপারে যত্নবান।

অল্পে তুষ্ট রাজশাহীবাসী। আতিথেয়তা, পরোপকার, মমত্ববোধ এবং সরলতায় রাজশাহীর সাধারণ মানুষের খ্যাতি দেশব্যাপী সমাদৃত। লজিং মাস্টার, মেস বর্ডার কিংবা যে কোন ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল এখানকার মানুষ। খেটে খাওয়া মানুষগুলো, বিশেষত রিকশাওয়ালা, ছোটখাটো মুদি দোকানদার, চা স্টল কিংবা ছোটখাটো হোটেল মালিকের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা সন্তানতুল্য। যে কারণে ছাত্র-ছাত্রীরাও এ সব শ্রেণি-পেশার লোকজনকে 'মামা' বলে সম্বোধন করে থাকে।[৩৩] অন্যদিকে মেসের কাজের মহিলা কিংবা বাসার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলাদেরকে অন্যান্য স্থানে বুয়া বলে সম্বোধন করা হলেও রাজশাহীতে তাদেরকে মায়ের মর্যাদায় 'খালা' বলে ডাকা হয়ে থাকে। খালারাও নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্নেই রাখার চেষ্টা করে থাকেন মেসবোর্ডার কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের। স্নেহের কারণে সন্তানের বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেকেই বেটা কিংবা বেটি বলে সম্বোধন করে থাকেন। এ সব ডাকের মধ্যে ভীষণ আন্তরিকতা এবং মমত্ববোধের স্পর্শ থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, রাজশাহীর উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত বৃটিশ সময় থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত অসংখ্য শিক্ষা কেন্দ্র রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী শহরে কিংবা শহর সন্নিহিত এলাকায় এখন অবধি উল্লেখ করার মতো কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করেই উত্তরাঞ্চলের প্রধান নগরী আজকের রাজশাহী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকলে শহরটি অনেকটাই জনমানবহীন কোলাহলশূন্য জনপদে পরিণত হয়। এখানকার অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এখানকার শিক্ষার্থী শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মানুষেরা। রাজশাহী মহানগরীর ভাড়া বাড়ির প্রায় চল্লিশ শতাংশে সাময়িকভাবে বসবাস করছেন প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বাংলাদেশের অন্য কোন শহর বা নগরে এ জাতীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষার অবারিত সুযোগের জন্য যেমন রাজশাহী এদেশের মানুষের কাছে শিক্ষানগরী হিসেবে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। সেইসাথে এখানকার জীবন যাপনের ব্যয়-সূচক বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে সাশ্রয়ী। তাছাড়া অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার কারণে প্রচুর শিক্ষিত জনশক্তি পাওয়া যায়, যারা পার্টটাইম চাকরি সন্ধানী। এ শিক্ষিত যুবশ্রেণিকে কাজে লাগিয়ে রাজশাহীতে আইটিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এখন সময়ের দাবী। পাশাপাশি প্রচলিত শিক্ষার সাথে সাথে এখানে কর্মসংস্থানভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ বিষয়গুলো নজরে নিয়ে আসতে পারলে রাজশাহীই হবে বাংলাদেশের স্বীকৃত শিক্ষানগরী।

তথ্যনির্দেশ

১ ভিক্ষু সুখী আনন্দ, *বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ: ১৫১।

২ A.K.M Yaqub Ali, "The Educational System in British Bengal", *Research Journal*, vol. I, Rajshahi University, P. 210.

৩ দীনেশ চন্দ্র সেন, *বংলা ভাষা ও সাহিত্য* (কোলকাতা: দাশগুপ্ত এন্ড সন্স, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃ: ৭৩-৭৪।

৪ ড. এ, কে, এম, ইয়াকুব আলী: *রাজশাহীতে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২), পৃ.।

৫ Dr. A.K.M Ayyub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh), P. 12.

৬ *Ibid*, P. 13.

[৭] Willam Adam, *Report on the State of Education in Bengal,* A. N. Basu edited (Calcutta: University of Calcutta, 1941), P. XIII.

[৮] Pradip Kumar Lahiri, *Bengali Muslim Thought (1818-1947),* (Calcutta: K.P. Bagchi and Company, 1991), P. 7.

[৯] নবাব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল লতিফ কলিকাতা মাদরাসায় বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষায় পাশ করেন। দ্রঃ ড. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারণা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩) পৃঃ ৮৪।

[১০] এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৯), পৃঃ ১২৩।

[১১] *তদেব*, পৃঃ ৯৫-১০০। উল্লেখ্য, প্রাকবৃটিশ আমল অর্থাৎ পাল, সেন এবং মুসলিম প্রশাসনের বিশেষত সুলতানী ও মোগল আমলে রাজশাহী মহানগরীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া কষ্টকর। তবে বৃহত্তর রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অঞ্চল শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব থেকেই বেশ সমৃদ্ধ ছিল- একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টিও বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে।

[১২] আরিফুল হক কুমার, 'প্রস্তাবনাঃ শিক্ষানগরী রাজশাহী', *বরেন্দ্রের বাতিঘর, অগ্রযাত্রার ৩ বছর*, (রাজশাহীঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০১১), পৃ. ১৭৫।

[১৩] কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (ঢাকাঃ প্র.বি, ১৯৬৫), পৃ. ১০৮।

[১৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজশাহী শহরে শিক্ষার উন্নয়নে জমিদারদের অবদান, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৬৯৪-৭১১।

[১৫] রাজশাহী কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড. মো. মনজুর কাদির, রাজশাহী কলেজের অতীত ইতিহাস, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৬৩৭-৬৪৪

[১৬] কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ১১৩-১৪।

[১৭] ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, বিশশতকের ত্রিশের দশকে রাজশাহী শহরের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৫৭৯-৮০।

[১৮] ড. সাবরিনা আনাম, রাজশাহী মহনগরীতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২, পৃ. ৫৯১।

[১৯] *তদেব*, পৃ. ৬০১।

[২০] *তদেব*, পৃ. ৬০৩।

[২১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মো. ছাবেদ আলী, ১৯৭১-পূর্ব রাজশাহী শহরে নারী শিক্ষার উন্নয়ন, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৬৫৯-৬৭২; নাজনীন বেগম, বাংলাদেশে নারী শিক্ষা : রাজশাহী মহানগরীর উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের উপর একটি সমীক্ষা, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৬৭৩-৮২।

[২২] ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, রাজশাহী মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা : অতীত ও বর্তমান, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৫৯৮-৬০০।

[২৩] 'রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট' *বার্ষিকী*, ২০০৯, পৃ. ২০-২১।

[২৪] মো. গোলাম মুরতজা, পাবলিক রিলেশন অফিসার, রুয়েট, "রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদন" রাজশাহী, পৃ. ১-২।

[২৫] ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, রাজশাহী মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা : অতীত ও বর্তমান, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৩১-৬৩২।

[২৬] ড. মো. মাহবুবর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, *রাজশাহী মহনগরীঃ অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৬৪৫-৪৮।

[২৭] ড. সাধন কুমার বিশ্বাস, রাজশাহী মহানগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা : অতীত ও বর্তমান, *রাজশাহী মহনগরী: অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৯৮-৬৩৬।

[২৮] শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গবেষণা সম্প্রারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. মযহারুল ইসলাম, ড. কাজী আব্দুল মান্নান, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ড. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি আতাউর রহমান, প্রফেসর ড. গোলাম সাকলায়েন, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব, প্রফেসর ড. আবদুর রহীম খোন্দকার, প্রফেসর ড. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, প্রফেসর ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. আলী আনোয়ার, প্রফেসর ড. এ. আর. মল্লিক, ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, ড. শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী, অধ্যাপক এসএম আবদুল লতিফ, প্রফেসর ইমেরিটাস এবিএম হোসেন, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, প্রফেসর ইমেরিটাস অরুণ কুমার বসাক, প্রফেসর ড. মুখলেসুর রহমান, প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ, প্রফেসর ড. সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. একেএম আজহারুল ইসলাম, প্রফেসর ড. রশীদুল আলম, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শেখ আতাউর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও নাম উল্লেখ না করা অনেকেই শিল্প-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-গবেষণায় অনন্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রাজশাহীকে শিক্ষানগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– সুখেন মখোপাধ্যায়, “রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য : অতীত ও বর্তমান” *বরেন্দ্রের বাতিঘর, অগ্রযাত্রার ৩ বছর*, (রাজশাহীঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০১১), পৃ. ১৯৩-২১৬।

[২৯] এ প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক রাজশাহীর বিভিন্ন আবাসিকতার সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেছেন।

[৩০] এ প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক রাজশাহী শহরের বিভিন্ন মেসে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন।

[৩১] এ প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক এ সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই সরেজমিন ভ্রমণ করেছেন।

[৩২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ড. তসিকুল ইসলাম রাজা, “বরেন্দ্রভূমির প্রাণকেন্দ্র রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন” *বরেন্দ্রের বাতিঘর, অগ্রযাত্রার ৩ বছর*, (রাজশাহীঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০১১), পৃ. ৭৩; কামরুল বাহার আরিফ, “রাজশাহীর সাহিত্যচর্চা : অতীত ও বর্তমান” *বরেন্দ্রের বাতিঘর, অগ্রযাত্রার ৫ বছর*, (রাজশাহীঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২০১৩), পৃ. ৩৬৭-৩৮৩।

[৩৩] মায়ের ভাই মামা। এ ডাকের মধ্যে একটা মমত্ববোধ আছে। তবে ইতোপূর্বে এ ডাকটি খুব আদুরে থাকলেও ইদানিং কেউ কেউ অপছন্দ করেন। এমনকি কোন কোন দোকানে লেখাও থাকে ‘প্লিজ, মামা বলবেন না’। তবুও মামা ডাক একেবারে থেমে নেই।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

ড. মো: সাজিদুল হক*

Abstract: Ahmad Shawqi is famous Egyptian poet and writer who pioneered the modern Arabic literary movement. He is considered to be one of the most important Arabian poets in the 20th Century. His literary production is highly rich and developed. He did not leave any section of poetry without writing in it with excellence and quality. He wrote the poetry in the field of description, pride, philosophy, praise or lament. Shawqi even wrote simplified children's poetry which included wisdom, love and humanity. Shawqi's poem was distinguished by its particular music which was felt by the recipient through, its letters, structure and rhyme. Shawqi's contribution to modern Arabic literature is tremendous. He contributed immensely to the development of dramatic poetry in modern Arabic literature. In regards of literary production, Shawqi excelled all his contemporaries and on the basis of the support of Arabian poets he was crowned by the Egyptian government *Amir al-Shu'araa* (The Prince of Poets) in recognition of his considerable contributions to the literary field. He is the only poet in the modern Arabic literature who was granted this great title. This article is about Ahmad Shawqi and his work in Arabic literature.

ভূমিকা

আহমাদ শাওকী আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর কাব্যচর্চা ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এক সোনালী অধ্যায় যুক্ত হয়। তিনি গ্রীক ও আরব কাব্য প্রতিভা জন্ম সূত্রেই প্রাপ্ত হন। আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন কবিদের রচনা তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ক্লাসিক্যাল আরবী কাব্য, বিশেষ করে আব্বাসীয় যুগের কাব্য অধ্যয়ন ও চর্চার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভাব-কল্পনাগুলোকে বিকশিত করে। তিনি আরবী সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেন তেমনি বিশ্ব সাহিত্য দরবারে আরবী ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। তিনি অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি পাশ্চাত্যের কাব্যরীতির আদলে আরবী কাব্যাঙ্গনে নাট্যকাব্যের ধারা সংযোজন করেন। দিন দিন আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ও সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মিসরসহ আরব বিশ্বের প্রায় সকল কবি সাহিত্যিকের সমর্থনে মিসরীয় সরকার তাঁকে কবি সম্রাট (*The Prince of Poets*) উপাধি প্রদান করে। এটি আরবী কাব্য জগতে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনাপূর্বক মূল্যায়ন তুলে ধরা হবে।

আহমাদ শাওকীর পরিচয়

মিসরীয় কবি আহমাদ শাওকীর পুরো নাম আহমাদ শাওকী বেগ, পিতার নাম আলী বেগ ও দাদার নাম আহমাদ শাওকী বেগ।[১] কবিকে তাঁর দাদার নামে নামকরণ করা হয়। তিনি খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে ১৮৬৮ সালে মিসরের কায়রো শহরের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি মাতৃস্নেহ বেশী দিন লাভ করতে পারেননি। তাঁর জন্মের মাত্র তিন বছর পর তাঁর মাতা

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মাতামহ তাঁকে দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে তিনি ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদের পরিচারিকা ছিলেন। ফলে কবি রাজপ্রাসাদের আনন্দমুখর পরিবেশে বেড়ে উঠেন।[৩]

শাওকী চার বছর বয়স থেকে মক্তবে (প্রাথমিক বিদ্যালয়) যাতায়ত শুরু করেন এবং মাত্র পনের বছর বয়সের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর ১৮৮৫ সালে আইন কলেজে ভর্তি হলে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আইন বিষয়ে লেখা পড়া করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠে। ফলে তিনি দ্রুত চাকুরী লাভের আশায় সেখানকার অনুবাদ বিভাগে দুই বছর অধ্যয়ন করে ডিগ্রী লাভ করেন। অনুবাদ বিভাগে অধ্যয়নকালে আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মাদ বসয়ূনীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সময় তাঁর মধ্যে প্রগাঢ় কাব্যানুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।[৪] আইন কলেজের লেখাপড়া শেষে সরকারী অর্থায়নে তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে ১৮৮৭ সালে ফ্রান্স গমণ করেন এবং লেখাপড়া শেষে ১৮৯১ সালে মিসরে ফিরে এসে রাজপ্রাসাদে চাকুরী গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি তাঁর জীবনের বিশটি বছর রাজপ্রাসাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়গুলোতে কবির সাথে জনগণের তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না।[৫]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কবিকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ফলে কবি ১৯১৪ সাল থেকে যুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময় স্পেনে কাটান। এই সময়ে তাঁর মধ্যে জন্মভূমি মিসরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। তাঁর মধ্যে তীব্রভাবে দেশপ্রেম জেগে উঠে। ফলে তিনি মিসরের ইতিহাস, সৌন্দর্য্য ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা রচনা করেন। ১৯১৯ সালে দেশে ফিরে আসার পর তিনি মিসরের রাজনৈতিক অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখতে পান। ফলে তিনি রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে জনগণের কাতারে সামিল হন এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাদের মৌলিক সমস্যাবলী কবিতায় তুলে ধরেন।[৬] ১৯২৭ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ শাওকীয়াত (الشوقيات) এর দ্বিতীয় মুদ্রণ উপলক্ষে কায়রোর শাহী অপেরা হাউজে এক বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এখানে মিসরসহ আরব বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সকলের সর্ব সম্মতিক্রমে মিসরীয় সরকার শাওকীকে কবি সম্রাট (أمير الشعراء) খিতাবে ভূষিত করেন।[৭] এটি আরবী কাব্য জগতে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

কবি আহমাদ শাওকী এ মহান খিতাবে ভূষিত হওয়ার পর থেকে আরো নতুন উদ্যোমে কাব্যচর্চা শুরু করেন। তিনি পাশ্চাত্যের কাব্যরীতির আদলে নতুন কাব্যপ্রাসাদ নির্মানের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি আরবী কাব্যাঙ্গনে নাট্যকাব্য সংযোজন করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি এ নতুন ধারার দিকে একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। অবশেষে ১৯৩২ সালের ১৩ অক্টোবর কবি আহমাদ শাওকী মিসরে ইন্তিকাল করেন।[৮] তাঁর মৃত্যুতে মিসরসহ গোটা আরব জগতে শোকের ছায়া পড়ে যায় এবং বিভিন্ন আরব কবি তাঁর শোক গাঁথা রচনা করেন।

আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম

আহমাদ শাওকী বিরল প্রতিভাবান এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর এ প্রতিভা খোদা প্রদত্ত হওয়ায় তিনি অতি সহজে তাঁর মনের আবেগ-অনুভূতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। তিনি শুধু আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত কবিই নন; বরং একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকও বটে। তিনি তাঁর কাব্য রচনা দ্বারা যেমনভাবে আরবী কাব্যকে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে উপস্থাপন করেছেন, তেমনভাবে তাঁর সাহিত্যকর্ম দ্বারা আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনেই তাঁর সফল পদচারণা ছিল। তিনি অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেন। নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হল।

কাব্য সাহিত্য

আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যে আহমাদ শাওকী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি আরবী কাব্যের হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন। আরব সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরবী কাব্যের ইতিহাসে মুতানাব্বীর পরে আরব বিশ্বে আহমাদ শাওকীই একজন প্রতিভাবান কবি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছেন, যিনি নতুনভাবে আরবী কাব্যকে আধুনিকায়ন করেছেন। তিনি সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন, সাথে সাথে তিনি রাজনীতি, স্বাধীনতা, দেশপ্রম, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয় তাঁর কবিতায় আলোচনা করেছেন। তাঁর বিশাল কাব্যভাণ্ডারকে আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিম্নে তাঁর কাব্যগ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

আশ শাওকিয়াত: আহমাদ শাওকীর কবিতাবলীর বৃহদাকার সংকলন গ্রন্থ হলো *আশ শাওকিয়াত* (الشوقيات)। তাঁর দীওয়ানটি চার খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ডটি **১৮৯৮** খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৯] তাঁর জীবনের প্রথম দিকের প্রায় সকল কবিতা এতে স্থান পায়। তিনি গ্রন্থের শুরুতে কবি এবং কাব্যের উপর একটি মূল্যবান ভূমিকা সংযোজন করেন, যেখানে কবি হৃদয়ের মহত্ব এবং কবির গৌরবোজ্জ্বল অবদানের উপর দার্শনিক অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপন করেন।[১০] এটি ছিল তাঁর সকল কবিতার একটি সমন্বিত সংকলন। এতে প্রশংসাগীতি, শোকগাঁথা, সঙ্গীত, কাহিনীকাব্যসহ সমাজ, রাজনীতি এবং মিসরের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতাবলী সন্নিবেশিত হয়। পরবর্তীতে **১৯২৫** খ্রিস্টাব্দে এটি পুনঃমুদ্রিত হলে প্রশংসাগীতিসহ আরও কিছু কবিতা বাদ দিয়ে খণ্ডটিকে আরও মার্জিত করা হয়। খণ্ডটির শুরুতে ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল[১১] (১৮৮০-১৯৫৬) এর একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়, যেখানে কবি আহমাদ শাওকীর কবিতা, কাব্য প্রতিভা, মন ও মনীষা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপিত হয়।[১২] আশ শাওকিয়াত এর দ্বিতীয় খণ্ড সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৩০** খ্রিস্টাব্দে। এতে প্রেম এবং বিবরণমূলক কবিতাবলী স্থান পায়। এ ছাড়া ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমাজ এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত কবিতাবলী এবং প্রাচীন যুগের আরবী দীওয়ানগুলোকে অবলম্বন করে রচিত কিছু কাসীদা এতে সন্নিবেশিত হয়।[১৩] **১৯৩৬** খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আশ শাওকিয়াত এর তৃতীয় খণ্ড। এতে ইতিহাসের কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তি বিশেষ করে মিসরের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর শোকগাঁথামূলক কবিতাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৪] আশ শাওকিয়াত এর চতুর্থ খণ্ডটি সর্ব প্রথম **১৯৪৩** খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে, তবে সেগুলোর মধ্যে শিক্ষামূলক কবিতা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি এসব কবিতার মাঝে জীবন এবং সমাজ বিনির্মানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-চেতনা, ভাব-দর্শনের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

দুয়ালুল 'আরাব ওয়া 'উযামাউল ইসলাম: ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য কেন্দ্রীক কবি আহমাদ শাওকী রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম *দুয়ালুল 'আরাব ওয়া 'উযামাউল ইসলাম* (دول العرب وعظماء الإسلام)। পঁচিশটি কবিতায় এর সর্ব মোট চরণ সংখ্যা **১৭২৬** টি। এ বিশাল কাব্যসমুদ্রে অবগাহন করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রিয় রাসূলে কারীম (সা.) সহ তাঁর বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের জীবনাদর্শগুলো কতটা আন্তরিকতার সাথে ছন্দের জাদুকরী ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন। ইসলামের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই কবির এই কাব্য সম্ভারের জন্ম হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি যখন স্পেনে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করছিলেন, তখন তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থকে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। এখানে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ইতিহাস, তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, নীতি আদর্শ যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি খুলাফায়ে রাশিদীনের ইতিহাস-ঐতিহ্য সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। উমাইয়া, আব্বাসী এবং ফাতিমী সাম্রাজ্যের ইতিহাসও এই গ্রন্থে মর্যাদার সাথে আলোচিত হয়েছে।[১৬]

শিশু সাহিত্য

শিশুরা জাতির ভবিষ্যত কর্ণধর। শিশুদের বিকাশের জন্য মননশীল শিশু সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আহমাদ শাওকীর কাব্যচিন্তায় এ বিষয়টিও বাদ পড়েনি। শিশুদের নৈতিকতা, জাতীয়তাবোধ ও মননশীলতা জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি বহু কবিতা রচনা করেন, যেগুলো শিশু সাহিত্য হিসেবে সবার নিকট পরিচিত। শিশুদের জন্য রচিত কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষামূলক রম্যকবিতা। বিভিন্ন পশু-পাখি ও প্রাণীর আচার-আচরণ অবলম্বনে হাসি রস মিশিয়ে শিক্ষামূলক বেশ কিছু কবিতা তিনি রচনা করেন, যা কাব্যরসের পাশাপাশি পথনির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য দ্বারা সমৃদ্ধ। এ ছাড়াও তিনি শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা, উপদেশ, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে *দীওয়ানুল আতফাল* শিরোনামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর রচিত এ কাব্যগ্রন্থটি শিশু সাহিত্যের অনন্য নিদর্শন।

দীওয়ানুল আতফাল: শিশুদের জন্য প্রকাশিত সুন্দর একটি কাব্যগ্রন্থ হলো *দিওয়ানুল আতফাল* (ديوان الأطفال)। কলেবরের দিক থেকে খুব বড় নয়, মাত্র দশটি কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। এর সর্বমোট চরণ সংখ্যা ১২৩ টি। কবিতাগুলোকে তিনি শিশুচিত্তের হৃদয়গ্রাহী ছন্দরূপে উপস্থাপন করেছেন। কবিতার ছন্দে ছন্দে তিনি তাদের হৃদয়ে পিতা-মাতা, দাদা-দাদীসহ বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পশু-পাখীর প্রতি মমত্ববোধ এবং দেশ মাতৃকার প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটির শেষে তিনি শিশুদের উপযোগী করে তাদের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সঙ্গীত উপহার দিয়েছেন।[১৭]

নাট্য সাহিত্য

আহমাদ শাওকী একজন কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও তিনি একজন সফল নাট্যকার ছিলেন। তিনি নাট্যসাহিত্যকে কাব্যিকরূপে উপস্থাপন করেন। আরবী নাট্যকাব্য তাঁর প্রতিভার আরেকটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। আধুনিক আরবী সাহিত্যে নাট্যকাব্যের সংযোজন তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। তাঁর নাট্যকাব্যগুলো আরবী সাহিত্যের মানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে এবং এর মাধ্যমে আরবী কাব্যচর্চায় একটি নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে। শাওকী নাট্যকাব্য ছাড়াও গদ্য নাটক রচনা করেন, তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাননি।

কাব্য নাটক

কবি আহমাদ শাওকী সর্ব প্রথম সফলভাবে আরবী কাব্যধারায় নাটক সংযোজন করেন। যদিও তাঁর পূর্বে এর সামান্য প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু সেগুলো তেমন প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে আরবী কাব্য জগতের এই দুর্বল অংশের সমৃদ্ধি সাধন করেন। আরবী কাব্য নাটক তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। জীবনের শেষ চার বছরে তিনি ছয়টি কাব্য নাটক রচনা করেন।[১৮] নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল:

মাসরা'উ কালিউবাতরা: কবি আহমাদ শাওকীর অন্যতম একটি নাট্যকাব্য *মাসরা'উ কালিউবাতরা* (مصرع كليوباترا)। মিসরীয় ইতিহাসের প্রভাবশালী রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে উপলক্ষ করে নাট্যকাব্যটি রচিত।[১৯] এটি একটি বিয়োগান্ত নাট্যগীতি। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত তাঁর এই নাট্যকাব্য আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মৌলিক আরবী নাট্যকাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শাওকী তাঁর নাট্যকাব্যটি চারটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত করেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদ একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত। নাট্যকাব্যটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন, প্রথমটি ঐতিহাসিক বিষয়াবলী, দ্বিতীয়টি শেকসপিয়রের অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা (Antony & Cleopatra) নাটক, তৃতীয়টি জাতীয়তাবাদী অনুভূতি।[২০] খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দের দিকে আলেকজান্দ্রিয়া এবং তার বিভিন্ন উপকণ্ঠে সংঘটিত ঘটনাবলী এতে স্থান পায়। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রেম এবং তাদের মর্মান্তিক পরিণতি। নাটকটিতে ইতিহাসের

ধারা সংরক্ষণে লেখক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তবে চরিত্র চিত্রায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। নাট্য শিল্পের বিচারে এটি কবির একটি অনবদ্য উপহার। কবিতার ছন্দে ঘটনার ধারাবাহিকতা, ভাব-কল্পনার সুন্দর বিন্যাস এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলোর অনুপম চিত্রায়নের জন্য এটি অতুলনীয়।[২১]

মাজনূন লায়লা: আহমাদ শাওকীর রচিত দ্বিতীয় নাট্যকাব্য *মাজনূন লায়লা* (مجنون ليلى)। তবে খাঁটি আরবীয় উপাখ্যানকে অবলম্বন করে রচিত এটি তাঁর প্রথম নাট্যকাব্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাট্যকাব্যটি বিয়োগান্ত নাট্যগীতির অন্তর্ভূক্ত, **১৯৩১** খ্রিস্টাব্দে এটি প্রথম প্রকাশ পায়।[২২] এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। কিতাবুল আগানী নামক গ্রন্থে মাজনূনকে উপলক্ষ করে একটি কাহিনী বিধৃত হয়েছে, কবি সে কাহিনীকেই মূলত নাট্যরূপ দিয়েছেন।[২৩] নাটকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল লায়লার জন্য মাজনূনের প্রেম, মনোবিকারত্ব এবং পরিণতিতে মর্মান্তিক মৃত্যু। বলা হয়ে থাকে এটি উমাইয়া যুগের কায়েস নামে এক তরুণ কবি ও তার চাচাত বোন লায়লা আল আমিরীর অমর প্রেমকাহিনী। এ গল্পের উৎপত্তি নজদের মরু অঞ্চলে। পরে এটি নজদ, হেজায এবং তায়েফের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কবি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে এই কাহিনীটি উপস্থাপন করেছেন। তিনি মিসরের বাদশাহ ফারুককে এটি উপহার দেন। পরে কায়রো শহরে সর্বপ্রথম এই নাট্যকাব্যটি মঞ্চায়িত হয়।[২৪]

কামবীয: আহমাদ শাওকীর বিয়োগান্ত নাট্যকাব্যের অন্যতম হলো *কামবীয* (قمبيز)। পারস্যের সম্রাট কামবীয এর কাহিনী অবলম্বন করে কবি আহমাদ শাওকী **১৯৩১** সালে নাট্যকাব্যটি রচনা করেন।[২৫] খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে পারস্যের সম্রাট ছিলেন কামবীয। তিনি মিসরের সম্রাট আমাযীসের কন্যা নিফরীতকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু নিফরীত ভীনদেশে বিয়ে করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কামবীযের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করে মিসেরর পূর্ববর্তী সম্রাট আবারিয়াসের কন্যা নিতিতাস নিজেকে নিফরীত নাম ধারণ করে কামবীযের স্ত্রী হিসাবে সোর্পদ করে। পরবর্তীতে ফানীস নামে মিসরীয় সেনাবাহিনীর এক গ্রীক সেনাপতি এই বিয়ের গোপন রহস্য কামবীযের কাছে ফাঁস করে দেয়। ফলে কামবীয অগ্নিশর্মা হয়ে মিসর আক্রমণ করেন এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ চালান। নিফরীত কোন উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা করে। এতে কামবীয আরো বীভৎস হয়ে উঠেন। তিনি মিসরীয় গোদেবতা আবীসকে হত্যা করেন। ফলে এক পর্যায়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং আত্মহত্যা করেন। এভাবেই এই নাটকটির যবনিকাপাত হয়।[২৬] বর্ণিত কাহিনীটিই আলোচ্য নাট্যকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যা তিনটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছে। নাট্যকাব্যটির মাধ্যমে কবি মিসরীয় জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।[২৭]

'আলী বেক আল কাবীর: মিসরের ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত আহমাদ শাওকীর অন্যতম একটি নাট্যকাব্য হলো *'আলী বেক আল কাবীর* (علي بك الكبير)। কবি ফ্রান্সে অবস্থানের সময় **১৮৯৩** খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এ নাট্যকাব্যটির রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তিনি তা অসমাপ্ত রেখে দেন। পরবর্তীতে তিনি **১৯৩২** খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জিত করে এটিকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেন। এটিও একটি বিয়োগান্ত নাটক। **১৭৭০** খ্রিস্টাব্দের দিকে মিসরের ফুসতাত, সালেহিয়্যা, 'উকা প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়, তারই আলোকে এই নাটকটি রচিত হয়। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মিসরের তৎকালীন সম্রাট আলী বেগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তার অন্তরালে একটি প্রেমের কল্পচিত্র। নাট্যকাব্যটিতে ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাসের পাশাপাশি কাল্পনিক প্রেম কাহিনীও চিত্রিত হয়েছে।[২৮] চরিত্রের উপস্থিতি কিছুটা সংকোচিত করে নাট্যকাব্যটিকে তিনটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করা হয়েছে।[২৯] শাওকী তাঁর এ নাট্যকাব্যে চমৎকার রচনাশৈলী উপস্থাপন করেছেন এবং নাট্যকাব্যটি নির্মানের ক্ষেত্রে স্বার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।[৩০]

‘আনতারা: প্রাচীন আরবের ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত শাওকীর অন্যতম নাট্যকাব্য হলো *‘আনতারা* (عنترة)। এটি আরব্য উপাখ্যান অবলম্বন করে রচিত তাঁর দ্বিতীয় নাট্যকাব্য, আরবীয় উপাখ্যানের প্রথম নাটক ছিল মাজনুন লায়লা। *‘আনতারা* শাওকীর সর্বশেষ নাট্যকাব্য, যা কবির মৃত্যুর পর ১৯৩২ সালে প্রকাশ পায়। নাট্যকাব্যটির মূল বিষয় হলো, ‘আনতারা এবং তার চাচাত বোন ‘উবলার প্রেম কাহিনী। ‘আনতারা ছিল একজন কৃষ্ণকায় সাহসী তরুণ, যে ‘উবলাকে প্রচন্ড ভালবাসত। সে জীবনে সাহসিকতা ও বীরত্বের অনেক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ‘উবলার পিতা তার বীরত্বের স্বীকৃতি দিলেও কৃষ্ণকায়তার কারণে তাঁর সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হননি। পরবর্তীতে ‘উবলার পিতা মেয়েকে অন্যত্রে বিবাহ দিতে গেলে ‘আনতারা আক্রমণ করে ‘উবলাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে এবং তাকে বিয়ে করে।[৩১] শাওকী নাট্যকাব্যটির মূল বিষয়বস্তু কিতাবুল আগানীসহ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন।[৩২] কবি নাট্যকাব্যটিতে চরিত্র উপস্থাপনের পাশপাশি হাস্যরসের সংযোজন করেন, যা পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

আস সিত্তু হুদা: কবি আহমাদ শাওকীর একমাত্র কমেডীমূলক নাট্যকাব্য *আস সিত্তু হুদা* (الست هدى)। কবির মৃত্যুর পর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এ নাট্যকাব্যটি প্রকাশ পায়। তাঁর অন্যান্য নাট্যকাব্যগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও এ নাট্যকাব্যটি মিসরের সামাজিক জীবনচিত্র অবলম্বনে রচিত। এতে তিনি একজন ধনবতী কৃপণা মহিলার জীবনালেখ্য অঙ্কন করেছেন, যে বিশ্বাস করত অর্থ সম্পদই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অলঙ্কার, সম্পদেই মানুষের সুখ। তাই সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে চলিশোর্ধ্ব বয়সের অধিকারী হয়েও সে নিজেকে সর্বদা যুবতী হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইত। সে নয় জন পুরুষের পাণি গ্রহণ করে যাদের প্রত্যেকেই তার ভালবাসা এবং হৃদ্যতা পেতে চেয়েছে, কিন্তু সেই মহিলা তাদের চরিত্র নিয়ে উপহাস করত এবং তাদেরকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করত। তিনি এই নাটকটির রূপকতার মাধ্যমে সমাজের কিছু ত্রুটিপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন যা মানব সমাজে খুবই অপ্রত্যাশিত।[৩৩] নাট্যকাব্যটি মিসরের নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ করা হয়। শাওকীর অন্যান্য নাট্যকাব্য সমালোচনার সম্মুখীন হলেও এ নাট্যকাব্যটি সমালোচনা থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে।[৩৪] সংলাপ ও দৃশ্যগুলো খুবই চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও কবি নাট্যকাব্যটিতে অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়ক হয়েছে।

গদ্য নাটক

কবি আহমাদ শাওকী জীবনের শেষ দিনগুলোতে এসে নাটকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। মূলত নাট্যকাব্যের প্রতিই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ। তবে মিসরীয় নাট্যকারদের নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সাধু ভাষায় গদ্য নাটক রচনা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তবে তিনি একটি মাত্র গদ্য নাটক ছাড়া তেমন কোন নাটক রচনা করার সুযোগ লাভ করেননি। তাঁর একমাত্র গদ্য নাটকটি হলো *আমীরাতুল আন্দালুস*। এটি শাওকীর গদ্য সাহিত্যের সর্বশেষ চিহ্ন।

আমীরাতুল আন্দালুস: আহমাদ শাওকী স্পেনে নির্বাসনের সময়ে *আমীরাতুল আন্দালুস* (أميرة الأندلس) নাটকটি রচনার কাজ শুরু করেন, কিন্তু তিনি সে সময় তা সমাপ্ত করতে পারেননি। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসার পর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। নাটকটি ১৯৩২ সালে সর্ব প্রথম প্রকাশ পায়। স্পেনের কর্ডোভা, সেভিল এবং মরক্কোর কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এটি রচিত হয়। এতে দুটি বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। প্রথমত কবি এখানে সেভিল শাসক মু‘তামিদ ইবন ‘আব্বাদের সিংহাসনে আরোহণ অতঃপর ক্ষমতাচ্যুতি এবং নির্বাসিত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়ত একটি প্রেমের ঘটনাকে তিনি ভাষা দান করেছেন।[৩৫] আর তা হলো, শাসক মু‘তামিদ ইবন ‘আব্বাদের কন্যা বুসায়না একদিন পুরুষ ছদ্মবেশে কর্ডোভা শহরে গেলে সেখানে এক তরুণকে কিছু বই কিনতে দেখে সে

তার সাথে কথা বলে। ছদ্মবেশে স্বল্প পরিচয়ে বুসায়না যুবকটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে যুবকটির খোঁজ খবর নিয়ে বুসায়না জানতে পারে যে, সেই তরুণটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল হাসানের পুত্র হাসসূন। এরপর তাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়, আলোচনার এক পর্যায়ে বুসায়না তার ভাইয়ের হত্যার প্রকৃত খবর জানতে পারে।[৩৬] এদিকে বুসায়নার পিতা মু'তামিদ ইবন আব্বাদের জীবনে দুঃখ নেমে আসে। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার পরিবারকে মরক্কোতে নির্বাসন দেয়া হয়। বুসায়না মরক্কোর এক ব্যক্তির দাসীতে পরিণত হয়। হাসসূনের পিতা বিষয়টি জানতে পেরে বুসায়নাকে ক্রয় করে তার ছেলের কাছে নিয়ে আসে, কিন্তু পিতার সম্মতি ছাড়া বুসায়না হাসসূনকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় তারা সবাই বুসায়নার পিতার কাছে যায় এবং সেখানে তাদের বিয়ে হয়।[৩৭] নাটকটিতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। শাওকী নাট্যকার হিসেবে পরিচিত না হলেও তিনি নাটকটির চরিত্রগুলো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, বিশেষকরে নাটকটির সমাপনী দৃশ্য চমৎকারভাবে চিত্রায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা না গেলেও স্বার্থক নাট্যকার বলা যেতে পারে।

উপন্যাস সাহিত্য

আহমাদ শাওকী শুধু একজন কবি বা নাট্যকারই ছিলেন না; বরং তিনি একজন বিজ্ঞ ঔপন্যাসিকও ছিলেন। উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর সফল বিচরণ দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাঁর কাব্যসাহিত্যের প্রভাবে তাঁর রচিত অন্যান্য সাহিত্যকর্ম মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। আরবী সাহিত্যের অনেক গবেষকদের নিকট তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে অজানা রয়েছে। অনেকের ধারনা কবি আহমাদ শাওকী শুধু কবিতাই রচনা করেছেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা তথা নাটক-উপন্যাস তিনি রচনা করেননি। শাওকী সংক্রান্ত এ ধারনা ভুল হিসেবে বিবেচিত হয়, যখন আমরা তাঁর রচিত একাধিক উপন্যাস প্রকাশিত অবস্থায় দেখতে পাই। মূলত তাঁর পাঁচটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রয়েছে, যেগুলো তিনি জীবনের প্রথম দিকে রচনা করেন। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলো।

'আযরাউল হিন্দ: শাওকীর '*আযরাউল হিন্দ* (عذراء الهند) একটি বিখ্যাত উপন্যাস গ্রন্থ। ১৮৯৭ সালে সর্বপ্রথম এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৩৮] প্রাচীন মিসরের রাজা দ্বিতীয় রামাসিসের ভারত বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তাঁর পুত্র আশীম এর সাথে ভারতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসনকর্তা দাহনিসের কন্যা 'আযরার প্রেমকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। উপন্যাসটিতে তিনটি অধ্যায় রয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়ে আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানফিস (প্রাচীন মিসরের প্রথম রাজধানী) শহরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে, তৃতীয় অধ্যায়ে তায়বাহ (ফারাউ যুগের রাজধানী) শহরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসটি একটি বিয়োগান্ত উপন্যাস। উপন্যাসটির শেষ দৃশ্যে আশীম 'আযরার চাচাতো ভাই ছারছার কর্তৃক নিহত হয় এবং 'আযরা নীলনদে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।[৩৯] এতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতার সাথে তাঁর ভাব-কল্পনা এবং আবেগের সংমিশ্রণ ঘটেছে। চরিত্র চিত্রায়ন এবং পরিবেশ পরিপার্শ্বিকতার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা অতি চমৎকার।[৪০]

লাদিয়াস: আহমাদ শাওকী মিসরের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে তিনি যে সমস্ত কবিতা, নাটক, উপন্যাস রচনা করেছেন, *লাদিয়াস* (لاديياس) উপন্যাসটি সে ধারাবাহিকতারই একটি অংশ।[৪১] উপন্যাসটিতে শাওকী গ্রীক রাজা বুলকিরাত এর কন্যা লাদিয়াস ও মিসরীয় সৈন্য হামাস এর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপরন্তু দ্বিতীয় বাসমাতিকের পরবর্তী মিসরীয় ফারাউ (সম্রাট) আবারিয়াসের শাসনামলে মিসরের চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন।[৪২] এ উপন্যাসটি ১৮৯৮ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৪৩] বর্তমানে কায়রোর মুআসসাসাতু হিন্দাবী লিত তালীম ওয়াস সাকাফাহ প্রকাশনী ২০১২ সালে উপন্যাসটি প্রকাশ করে। উপন্যাসটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায়ে গ্রীকে সংঘটিত ঘটনাবলীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়

এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে মিসরে সংঘটিত ঘটনাবলীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। *লাদিয়াস* একটি মিলনাত্মক উপন্যাস। লাদিয়াসের পিতা তাঁর কন্যার বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের জন্য কিছু শর্ত প্রদান করে, যেগুলো হামাস পূরণ করতে সক্ষম হয়। ফলে উপন্যাসের সমাপনী দৃশ্যে লাদিয়াস ও হামাসের বিবাহ উৎসব দেখতে পাওয়া যায়।[৪৪] শাওকী অত্যন্ত যত্নসহকারে উপন্যাসটি রচনা করেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ তুলে ধরেন। এটি তাঁর স্বার্থক উপন্যাস হিসেবে পাঠক মহলে খ্যাতি অর্জন করে।

দাল ওয়া তীইমান: জর্জ ইবরিস কর্তৃক রচিত ওয়ারদাতু মিসর উপন্যাসটির আলোকে আহমাদ শাওকী *দাল ওয়া তীইমান* (دل وتيمان) উপন্যাসটি রচনা করেন।[৪৫] এ উপন্যাসটি মূলত *লাদিয়াস* উপন্যাসের অবশিষ্টাংশ। শাওকী ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থানীয় পত্রিকায় উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন ও ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তা সমাপ্ত করেন। উপন্যাসটি পুস্তক আকারে কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি; রবং তা দীর্ঘ দিন অপ্রকাশিত থাকে।[৪৬] উপন্যাসটিতে পয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে। উপন্যাসটিতে শাওকী প্রাচীন মিসরের ক্ষমতাচ্যুত রাজা আবরিয়াসের কন্যা দাল (নাতীতাস) এর সাথে প্রাসাদ প্রহরী তীইমানের প্রেমের ঘটনা আলোচনা করেন।[৪৭] এটি একটি বিয়োগাত্মক উপন্যাস। পারস্য সম্রাট কামবীয তৎকালীন মিসরীয় সম্রাট আমাযীস এর কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। আমাযীস কন্যা কামবীযের এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আবারিয়াসের কন্যা দালকে কামবীযের জন্য নির্ধারণ করা হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে দাল তার প্রেমকে উৎসর্গ করে পারস্য সম্রাট কামবীযকে বিবাহ করে। গ্রীক সেনাপতি ফানিসের চক্রান্তের কারণে পারস্য সম্রাট কামবীয বিষয়টি বুঝতে পারেন। ফলে তিনি মিসর দখল করতে আসলে মিসরীয় সৈন্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যুদ্ধে দাল ও তীইমান নিহত হয়। পরবর্তীতে কামবীযও আত্মহত্যা করেন। শাওকী এ উপন্যাসে ক্ষমতা দখলকারী মিসরীয় সম্রাট আমাযীস এর শাসনামলে মিসরে গ্রীকদের প্রভাব ও মিসরের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন এবং দেশ রক্ষার্থে দাল যে অবদান রেখেছিল, তা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেন। উপন্যাসটি মিসরের জাতীয় জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ওরাকাতুল আস্: আহমাদ শাওকী রচিত উপন্যাসের মধ্যে *ওরাকাতুল আস্* (ورقة الآس) একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে শাওকী উপন্যাসটি রচনা করেন।[৪৮] ইসলাম পূর্ব প্রাচীন পারস্য সম্রাট সাবূরের শাসনামলের একটি বিখ্যাত ঘটনাকে উপজীব্য করে এটি রচিত হয়।[৪৯] ইরাকে অবস্থিত হাদর[৫০] অঞ্চলের রাজা যীযান পারস্য সম্রাট সাবূর কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। এমতাবস্থায় যীযানের কন্যা নাদীরা সাবূরের প্রেমে পড়ে যায়। ফলে পিতার কথা অমান্য করে ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর সে পুনরায় তার ছোট ভাই আরদাশীরের প্রেমে পড়ে, কিন্তু সে তার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। নাদীরা এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরদাশীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাবূরের নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করে। ফলে সাবূর তাকে হত্যার আসামী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে নাদীরার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায় এবং সে দোষী সাব্যস্ত হয়। সম্রাট সাবূর নাদীরার অপরাধ সহ্য করতে না পেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।[৫১] শাওকী দশটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসটির গল্প সমাপ্ত করেন। আরব জনগণের মাঝে এ উপন্যাসটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চরিত্র চিত্রায়ন, কাহিনী বিন্যাস এবং ভাব-কল্পনার সুন্দর প্রকাশ এই উপন্যাসটিকে যথেষ্ট সার্থক করেছে।[৫২]

শায়তানু বিনতাউর: বিনতাউর প্রাচীন মিসরের একজন প্রসিদ্ধ কবি। *শায়তানু বিনতাউর* (شيطان بنتاؤور) এর অর্থ হলো বিনতাউরের দৈত্য। (আরবরা মনে করত প্রত্যেক কবিদের নিকট একটি করে দৈত্য থাকে, যে কবিতার কথাগুলো তার মনে ঢেলে দেয়।) উপন্যাসটি ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৫৩] এটি পনেরটি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত। উপন্যাসটিতে দেখানো হয় যে, বিনতাউরের দৈত্য ও শাওকীর দৈত্য পাখির রূপ নিয়ে একটি স্থানে মিলিত হওয়ার পর একে অপরের সাথে পরিচয় হয়। পরবর্তীতে তাদের এ

আলাপচারিতা দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে। মূলত এ দু'টি পাখির আলোচনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। শাওকী এ উপন্যাসে প্রাচীন ও আধুনিক মিসরের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। সাথে সাথে তিনি সমাজে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেন।

প্রবন্ধ সাহিত্য

আহমাদ শাওকী একজন যুগ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বায়িত্ববোধ তাকে সমাজ, রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। এ গণসচেতনতা তিনি শুধু কবিতা উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে এমন উন্নত রচনাশৈলী ও ভাষা ব্যবহার করেন যে তা আরব ভাষাভাষি লোকদের নিকট সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলো একটি গ্রন্থে সংকলন করা হয়, যা *আসওয়াকুয যাহাব* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

আসওয়াকুয যাহাব: কবি আহমাদ শাওকীর সামাজিক প্রবন্ধগুলোর সংকলন গ্রন্থ হলো *আসওয়াকুয যাহাব* (أسواق الذهب)। ১৯৩২ সালে সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[৫৪] এই প্রবন্ধগুলোতে অসংখ্য বিষয় সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থটির ভূমিকায় কবি শাওকী বলেন, এটি প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি দিগন্ত। এই গ্রন্থটির নাম আল্লামা যামাখশারীর *আতওয়াকুয যাহাব* অথবা আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর *আতবাকুয যাহাব* এর মত হলেও এর বিভিন্নমুখী কল্যাণের কথা চিন্তা করে এর নামকরণ করা হয়েছে *আসওয়াকুয যাহাব*। এতে তাঁর জন্মভূমি মিসর, মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সুয়েজ খাল, পিরামিড প্রভৃতি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া এতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে।[৫৫]

আহমাদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন

কবি আহমাদ শাওকীর রচনাসমগ্রের বিশালতা দেখেই সাহিত্য জগতে তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। তিনি আধুনিক যুগের আরব কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। সাহিত্যে তিনি যেমন আরব রীতি-ঐতিহ্য মেনে চলেছেন তেমনি বিষয়বস্তু নির্ধারণ, ভাব-ভাষা এবং কল্পনা বিন্যাসে আধুনিকতার সুস্পষ্ট প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। অধিকন্তু আরবী কাব্যাঙ্গনে তিনি নাট্যধারাকে সমৃদ্ধ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর শক্তিশালী বর্ণনারীতি, সাবলীল ও গতিশীল ভাষার ফলে আরবী কবিতা আধুনিক বিশ্বে উন্নত ও সমৃদ্ধ কাব্যাঙ্গন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরবী সাহিত্যের সমালোচকগণ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, কবি আহমাদ শাওকী আরবী সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। কবি মুতানাব্বীর পরে আরবী কাব্য জগতে যে শুণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সময়ের ব্যবধানে কবি শাওকীর জন্ম সেই শুণ্যতাকে বহুলাংশে পূর্ণ করে দেয়।[৫৬]

মানুষ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, তাই কবি সম্রাট আহমাদ শাওকীও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ, ইসমাঈল মাযহাব, মাহমূদ আল আসমার, মাযেনী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ আহমাদ শাওকীর কবি সত্ত্বা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৫৭] তথাপি আহমাদ শাওকী যুগ শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনেই ছিল তাঁর সফল পদচারণা। তিনি কাব্য সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল ধারার সাথে আধুনিক ধারার সমন্বয় সাধন করে আরবী সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে যেমন সমহিমায় সুগ্রোথিত করেছেন, তেমনি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আরবী সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আহমাদ শাওকী একজন অনুসন্ধান প্রিয় কবি। তিনি মিসরসহ আরব বিশ্বের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে যেমন গবেষণা করেছেন, সেগুলোকে অতি যত্নে কাব্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু বানিয়েছেন, তেমনি রচনাশৈলী নির্ধারণেও তিনি প্রাচীন আরব কবিদের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। প্রশংসাগীতি, শোকগাঁথা, প্রেমগাঁথা ইত্যাদিতে তিনি যথেষ্ট স্বার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।[৫৮] তাঁর কবিতার ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল, অধিকন্তু তা শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। এছাড়া সুন্দর চিত্রকল্প, সুক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি, গীতিময়তা ও ছন্দের সুললিত ঝংকার প্রভৃতি তাঁর কবিতাকে অপরিমেয় মাধুর্য দান করেছে। তিনি শব্দগুলোকে এমনভাবে একের পর এক সুন্দর ও অভিনব পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত করেন যে, মনে হয় তিনি একটি সুউচ্চ সুরম্য প্রাসাদ নির্মান করেছেন। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অভিরুচি বারুদীর অভিরুচির প্রায় কাছাকাছি এবং হাফিযের অভিরুচির চেয়ে কিছুটা উন্নত।[৫৯] এ ক্ষেত্রে আমরা শাওকীকে বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তুলনা করতে পারি। শাওকীর কবিতার ছন্দ ও সুরের অপূর্ব লালিত্য তাঁর সমকালীন কবিদের চেয়ে অনেকখানি মনমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়। এ জন্য তাঁর অনেক কবিতা সমকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক ও গায়িকাদের নিকট সমাদর লাভ করতে দেখা যায়। তৎকালীন মিসরের জনপ্রিয় গায়ক আব্দুল ওয়াহাব ও প্রসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পী উম্মে কুলসুম তাঁর কবিতায় সুর এবং কণ্ঠ প্রদান করেন। শুধু শব্দ ও ছন্দই নয়, ভাবের দিক থেকেও শাওকী অনেক সমকালীন কবিদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন উপমা ও রূপকালঙ্কার দ্বারা কবিতার শোভা বর্ধন করেন।[৬০]

আহমাদ শাওকীর কাব্যপ্রতিভা ও সাহিত্যচর্চা পর্যালোচনা করলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি আধুনিক আরবী কাব্যের পঞ্চস্তম্ভ (মাহমুদ সামী বারুদী, ইসমাঈল সবরী, আহমাদ শাওকী, হাফিয ইবরাহীম, খলীল মুতরান) এর মধ্যে অন্যতম কবি। তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্যচর্চা ও অনুপম সাহিত্যকর্মের ফলে আধুনিক আরবী সাহিত্যে এক রেনেসাঁর অভ্যুদয় হয় এবং আরবী কাব্যে সুচিত হয় এক নতুন ধারা। তাঁর আধুনিকায়ন আরবী কাব্যসাহিত্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তাঁর উন্নত ভাবধারা, আধুনিক বিষয়বস্তুর অবতারণা, আকর্ষণীয় রচনাশৈলী, জনগণের মাঝে জাতীয় চেতনার জাগরণ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য অধিকাংশ সমালোচক এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, আহমাদ শাওকী আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠ কবি।

উপসংহার

আহমাদ শাওকী আধুনিক যুগের একজন মিসরীয় কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের সুযোগ পান এবং ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি স্পেনে নির্বাসিত হন এবং দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থানের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের নানা দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে বিচরণ করতে থাকেন। প্রাচীন মিসর, ইউরোপীয় দেশগুলোর দূর্লভ ইতিহাস-ঐতিহ্য তিনি খুঁজে বের করেন। ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্য তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যবসায় আর অনুসন্ধানের বিষয়গুলোকে তিনি তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী করেন। উন্নত ভাবধারা ও সুন্দর কাঠামো তাঁর সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা প্রদান করেছে। শাওকীর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর দুর্লভ প্রতিভার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের বিকাশে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে স্থান করে নিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আরবী কাব্যের আধুনিকায়ন ও আরবী সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক অবদানের জন্য তিনি আরব ভাষাভাষি লোকজনসহ সকল সাহিত্যপ্রেমীদের নিকট স্বরনীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যনির্দেশ

১. বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৩; খায়রুদ্দীন আয যিরাকলী, *আল আ'লাম*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিলমালায়ীন, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৩৬; উমার রিযা কাহহালা, *মু'জামুল মুয়াল্লিফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, সং: বি:, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।

২. আহমাদ আল হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাততু তারিখিল আরাবী, প্রথম সংস্করণ, তা: বি:), পৃ. ২৫৫; উমার ফার্‌রূখ, *আহমাদ শাওকী আমীরুশ শু'আরা ফিল আসরিল হাদীছ* (বৈরুত: মাকতাবাতু মায়মানাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৫।

৩. বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

৪. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শায়িরুল আসরিল হাদীছ* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৫. ইউসুফ 'আতা তুরায়ফী, *আমীরুশ শু'আরা আহমাদ শাওকী: হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু* ('আম্মান: আল আহলিয়া লিন নাশরি ওয়াত তাওযি', প্রথম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২।

৬. হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী-আল আদাবুল হাদীছ* (বৈরুত: দারুল জীল, সং: বি:, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩৮-৪৩৯; ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (চট্টগ্রাম: আল আকিব প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৯।

৭. উমার ফাররূখ, *আহমাদ শাওকী আমীরুশ শু'আরা ফিল আসরিল হাদীছ* পৃ. ৭; আহমাদ আল ইসকানদারী ও অন্যান্য, *আল মুফাস্‌সাল ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: ইহ্‌ইয়াউল উলূম, সং: বি:, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৭১; হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী-আল আদাবুল হাদীছ*, পৃ. ৪৩৯.

৮. মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ্ শি'র ফিল আসরিল আরাবী আল হাদীছ*, ১ম খণ্ড (মাদ্রাজ: হাফিযা হাউস, সং: বি:, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৮০।

৯. ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।

১০. আহমাদ কাব্বিশ, *তারিখুশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীছ* (বৈরুত: দারুল জীল, সং: বি:, ১৮৭১ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

১১. **মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল:** মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল (১৮৮৮-১৯৫৬) একজন মিসরীয় কবি, লেখক, ঔপন্যাসিক, ইতিহাসবিদ এবং রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৮৮ সালে মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কায়রোতে ক্রেডিভ ল স্কুলে আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৯০৯ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। অত:পর তিনি ১৯১২ সালে ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আহমেদ লুৎফী আল সাঈদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তিনি শেখ মোহাম্মদ আবদুহ, কাসিম আমিন ও অন্যান্য মিসরীয় রাজনীতিবিদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ১৯৪৫ সালে আরব লীগের চার্টারে স্বাক্ষরিত সৌদি আরবকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং জাতিসংঘের একাধিকবার মিসরীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয় নিয়ে যেমন কাজ করেন, তেমনি তিনি একই সময়ে আধুনিক মিসরে জনসাধারণের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে ৬৮ বছর বয়সে মিসরের কায়রো শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্রষ্টব্য: *https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Hussein_Heikal* (লগ ইন তারিখ: ২৫-০২-২০১৯ খ্রি.)

১২. আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়াত*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), ভূমিকা অংশ।

১৩. আহমাদ কাব্বিশ, *তারিখুশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীছ*, পৃ. ৭৫।

১৪. *তদেব*।

[১৫]. হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী-আল আদাবুল হাদীছ* (বৈরুতঃ দারুল জীল, সং: বিঃ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৪১।

[১৬]. মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ্ শি'র ফিল আসরিল আরাবী আল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০।

[১৭]. আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়াত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

[১৮]. বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬।

[১৯]. ক্লিওপেট্রার জীবনালেখ্যকে উপজীব্য করে অসংখ্য কাহিনী, কবিতা, নাটক এবং উপন্যাস রচিত হয়েছে। একটি পরিসংখ্যান মতে কেবল ফ্রান্সেই পনেরটি নাটক রচিত হয়। ইংরেজীতে প্রায় ছয়টি, ইটালী ভাষায় চারটি। এছাড়া বিশ্বের আরও অন্যান্য ভাষায় এই কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়েছে। কবি আহমাদ শাওকীর *মাসরা'উ কালিউবাতরা* নাট্যকাব্যটি এ ধারাবাহিকতারই একটি অংশ এবং এ জাতীয় সাহিত্যে আরবী ভাষার মুখপত্র।

দ্রষ্টব্য: ড. আহমাদ হায়কাল, *আল-আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফি মিসর* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩০৮।

[২০]. ইউসুফ 'আতা তুরায়ফী, *আমীরুশ শু'আরা আহমাদ শাওকী: হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু*, পৃ. ৫৬।

[২১]. বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩২৭।

[২২]. আহমাদ কাব্বিশ, *তারিখুশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীছ*, পৃ. ৮৪।

[২৩]. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শায়িরুল 'আসরিল হাদীছ*, পৃ. ২২৭।

[২৪]. ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফি মিসর*, পৃ. ৩২৭-৩৩৭।

[২৫]. ড. আব্দুল মাজীদ আল হুর, *আহমাদ শাওকী: আমীরুশ শু'আরা ওয়া নাগামিল লাহনি ওয়াল গিনা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৮৭।

[২৬]. মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ্ শি'র ফিল আসরিল 'আরাবী আল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮; বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭-৩৪০।

[২৭]. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শায়িরুল আসরিল হাদীছ*, পৃ. ২০২।

[২৮]. 'উমার আদ্ দাসূকী, *আল মাসরাহিয়া* (কায়রোঃ দারুল ফিকর আল 'আরাবী, সং: বিঃ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪; ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ নাজম, *আল মাসরাহিয়াতু ফিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীছ* (বৈরুতঃ দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩০২-৩০৯।

[২৯]. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শায়িরুল 'আসরিল হাদীছ*, পৃ. ২১৫।

[৩০]. *তদেব*।

[৩১]. বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৬; ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফি মিসর*, পৃ. ৩৩৭।

[৩২]. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শা'য়িরুল আসরিল হাদীছ*, পৃ. ২৪৭।

[৩৩]. ড. আব্দুল মাজীদ আল হুর, *আহমাদ শাওকী: আমীরুশ শু'আরা ওয়া নাগামিল লাহনি ওয়াল গিনা*, পৃ. ১৮৮।

[৩৪]. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *শাওকী শায়িরুল আসরিল হাদীছ*, পৃ. ২৪৭।

[৩৫]. ড. আব্দুল মাজীদ আল হুর, *আহমাদ শাওকী: আমীরুশ শু'আরা ওয়া নাগামিল লাহনি ওয়াল গিনা*, পৃ. ১৮৭।

[৩৬]. আহমাদ শাওকী, *আমীরাতুল আন্দালুস* (কায়রোঃ মাতবায়াহ দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, সং: বিঃ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১৫৭; বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৪।

[৩৭]. ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফি মিসর*, পৃ. ৩৪৭-৩৫৮।

[৩৮]. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯২।

[৩৯]. আছীল আব্দুল ওয়াহাব, *আহমাদ শাওকী: দিরাসাতুন ফি আ'মালিহির রিওয়ায়্যাহ* (ফিলিস্তিন: আন নাজাহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাষ্টার্স থিসিস, ২০১০ খ্রি.) পৃ. ৩৭।

[৪০]. হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী আল আদাবুল হাদীছ*, পৃ. ৪৪১।

[৪১]. দ্রষ্টব্য: আহমাদ শাওকী, *লাদিয়াস*, কায়রো: মুআসসাসাতু হিন্দাবী লিত তালীম ওয়াছ ছিকাফাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.।

[৪২]. আহমাদ কাব্বিশ, *তারিখুশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীছ*, পৃ. ৭৬।

[৪৩]. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ৯২।

[৪৪]. আছীল আব্দুল ওয়াহাব, *আহমাদ শাওকী: দিরাসাতুন ফি আ'মালিহির রিওয়ায়্যাহ*, পৃ. ৪৩।

[৪৫]. *তদেব*, পৃ. ৫১।

[৪৬]. মুহাম্মাদ সাবরী কবি আহমাদ শাওকীর অপ্রকশিত রচনাগুলোকে একত্রিত করে *আশ শাওকিয়াতুল মাজহুলাহ* শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি সে গ্রন্থে এ উপন্যাসের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

দ্রষ্টব্য: আছীল আব্দুল ওয়াহাব, *আহমাদ শাওকী: দিরাসাতুন ফি আ'মালিহির রিওয়ায়্যাহ*, পৃ. ৫১।

[৪৭]. দ্রষ্টব্য: আহমাদ শাওকী, *দাল ওয়া তীইমান*, কায়রো: আল মাজলিসুল আ'লা লিন নাশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.।

[৪৮]. আছীল আব্দুল ওয়াহাব, *আহমাদ শাওকী: দিরাসাতুন ফি আ'মালিহির রিওয়ায়্যাহ*, পৃ. ৬০।

[৪৯]. ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

[৫০]. হাদর: ইরাকের নিনাওয়া প্রদেশের এবং আল কারেন অঞ্চলের একটি প্রাচীন শহর। বাংলা ভাষায় এ অঞ্চলকে হাত্রা আরবী ভাষায় الحضر এবং ইংরেজী ভাষায় Hadr বলা হয়। নামটি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় এবং এটা পারস্যের খাভারানের প্রদেশ ছিলো। শহরটি বাগদাদের ২৯০ কিমি (১৮০ মা) উত্তর-পশ্চিমে এবং মগুলের ১১০ কিমি (৬৮ মা) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। হাদর (হাত্রা) সম্ভবত তৃতীয় বা দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেলেকি সাম্রাজ্য কর্তৃক নির্মিত হয়। পরবর্তীতে পার্থিয়ান সাম্রাজ্য এটা দখল করে নেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এটা ধর্ম ও ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। পরবর্তীতে শহরটি সম্ভবত প্রথম আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে উঠে। হাদর থেকে শাসিত অঞ্চল আরব রাজ্য নামে পরিচিত পায়, যা আরব রাজপুত্র কর্তৃক পরিচালিত হতো। হাদর অচিরেই একটি সুরক্ষিত দুর্গ শহরে পরিণত হয় এবং রোমান সামাজ্যের বারবার করা আক্রমণ রুখে দিতে থাকে। দ্বিতীয় পার্থিয়ান যুদ্ধে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। ২৩৮ খ্রিস্টাব্দে হাত্রা শাহরাযুর যুদ্ধে ইরানীদের পরাজিত করে, কিন্তু ২৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরানি সাসানিয় সম্রাট প্রথম শাপুরের কাছে পরাজিত হয়। ঐতিহ্যময়ী গল্পগুলোতে হাদর অঞ্চলের পতন সম্পর্কে বলা হয় আরব রাজার কন্যা নাদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে শহরটি শাপুরের হাতে তুলে দেয়। গল্পটিতে বলা হয়, শাপুর হাদর অঞ্চলের রাজাকে হত্যা করে নাদিরা কে বিবাহ করে, কিন্তু পরবর্তীতে তাকেও হত্যা করে।

দ্রষ্টব্য: *https://bn.wikipedia.org/wiki/হাত্রা* (লগ ইন তারিখ: ২৫-০২-২০১৯ খ্রি.)

[৫১]. আছীল আব্দুল ওয়াহাব, *আহমাদ শাওকী: দিরাসাতুন ফি আ'মালিহির রিওয়ায়্যাহ*, পৃ. ৬২।

[৫২]. *তদেব*, পৃ. ৬৩-৬৪।

[৫৩]. *তদেব*, পৃ. ৬৫।

[৫৪]. ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

[৫৫]. 'উমার দাসূকী, *নাশআতুন নাছর আল হাদীছ ওয়া তাতাউয়ারুহু* (কায়রো: দারুল ফিকর আল 'আরাবী, সং: বি:, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৩১-১৩২।

[৫৬]. ড. মাহমূদ শওকত ও ড. রাজা ঈদ, *মুকাওয়ামাতুশ্ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীছ ওয়াল মু'য়াসির* (কায়রো: দারুল ফিকর আল 'আরাবী, সং: বি:, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ১৩১-১৩২।

[৫৭]. ড. মুহাম্মাদ আল কাত্তাবী, *আস সিরাউ বায়নাল কাদীম ওয়াল জাদীদ ফিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীছ*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুস সাকাফা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৯৭২; মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ্ শি'র ফিল আসরিল আরাবী আল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

[৫৮]. আহমাদ আল ইসকানদারী ও অন্যান্য, *আল মুফাস্সাল ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ৫৭৬।

[৫৯]. ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

[৬০]. *তদেব*।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

আল-হাদীছের শব্দালংকার: একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ মতিউর রহমান*

Abstract: Al-Hadith is the second source of Islami shariah. Its place is just after the Quran. Generally what Prophet Muhammad (Sm) did, said and asked people to do are Hadith. However, the teachings and sayings of his Sahabi and Tabeyi are also called Hadith. In this article, Hadith refers to the teachings/ sayings of the Prophet Muhammad (Sm). The language of the Prophet was very lucid. His choice of words and style of expression is very good and praiseworthy. He talked in simple language directly. He avoided difficult words and reduntant things in his talk. He talked to people in a mild tone with a smiling face. The prof of all those things is found in the Hadith. One must have the language about rhetoric it one wants to understand the rhetoric of the Hadith. In Arabic, this rhetoric is of two kinds: semantic and metaphorical. According to Arabic metaphorical uses if language becomes metaphoric due to words it is called metaphor. An Arabic metaphoric uses has some specific rules. This article attempts to analyze the ornaments of language of Al-Hadith by referring to some important rules and their applications in the Hadith.

ভূমিকা

আল-হাদীছ শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক এবং এর পরিধিও অনেক বিস্তৃত। এখানে হাদীছ বলতে এককভাবে রাসূল (সা.) এর বাণীকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা.) এর ভাষা ছিল অত্যন্ত মিষ্টি ও সুমধুর। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। অল্প কথাই বেশী ভাব প্রকাশ করতেন; এজন্য তাঁকে "জাওয়ামি'উল কালাম" বলা হতো। তিনি আরবের বুকে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। যার ফলে তিনি নিজেকে আফসাহুল আরব বলেও আখ্যায়িত করেছেন। রাসূল (সা.) এর বাণী খুব চমৎকার ও অলংকারময়। তাঁর শব্দচয়ন ছিল অতি সুন্দর ও সাবলীল। তাই রাসূল (সা.) এর বাণী বা আল-হাদীছের শব্দালংকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হলে অলংকার শাস্ত্রের ভাষা অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভাষা অলংকার সাধারণত দু'ভাবে হয়ে থাকে। শব্দগতভাবে এবং অর্থগতভাবে। শব্দের দিক থেকে ভাষা অলংকারপূর্ণ হওয়াকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় المحسنات اللفظية বা শব্দালংকার বলা হয়। আরবী অলংকার শাস্ত্রে المحسنات اللفظية এর কিছু সূত্র রয়েছে। যেমন الجناس -سجع -التصدير ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে হাদীছে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনার মাধ্যমে আলোচ্য প্রবন্ধে আল-হাদীছের শব্দালংকার বিশ্লেষণ করা হলো।

الجناس পরিচিতি ও আল-হাদীছ এর ব্যবহার

الجناس আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। الجناس এর ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী ভাষার সৌন্দর্য ফুটে উঠে। এ পর্যায়ে الجناس এর পরিচয় ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

الجناس এর পরিচয়

الجناس শব্দটি باب مفاعلة এর مصدر । ج – ن - س এ তিনটি আরবী মূল অক্ষর থেকে শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। অলংকার শাস্ত্রের দিক থেকে শব্দটির বাংলা অর্থ: বাক্যের দুই অংশের মধ্যে মিল, শ্লেষ, শ্লেষালংকার, শ্লেষবাক্য।[১] শব্দটির মৌলিকতা ও অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

جانس جناسا مجانسة: شاكله واتحد معه فى الجنس[২]

"সে তার সমআকৃতি ধারণ করেছে এবং সমজাতীয় হয়েছে।"

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে:

الجناس فى البديع: تشابه الكلمتين فى اللفظ كله نحو "العين" أى الباصرة و "العين" أى ينبوع الماء أو بعضه نحو "ساه: و "ساهر".[৩]

"علم البديع তে جناس হলো বাক্যের মাঝে শব্দগত দিক থেকে দু'টি শব্দ পূর্ণরূপে মিল হওয়া। যেমন: العين অর্থ চক্ষু আবার العين অর্থ পানির ঝর্ণা। অথবা আংশিকভাবে মিল হওয়া যেমন: ساه এবং ساهر শব্দ।"

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়, "ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট একই ধরনের দুই বা ততোধিক শব্দ ব্যবহার করাকে جناس বলা হয়।"[৪]

الجناس সম্পর্কে বলা হয়েছে:

تشابه الكلمتين فى اللفظ مع اختلاف فى المعنى.[৫]

"শব্দগত দিক থেকে দু'টি শব্দের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া এবং অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য হওয়াকে جناس বলা হয়।"

الجناس এর প্রকার

الجناس মূলত দু'প্রকার ১. تام বা পূর্ণাঙ্গ ২. غير تام বা অপূর্ণাঙ্গ।

تام সম্পর্কে বলা হয়েছে:

تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي: نوع الحروف وشكلها وعددها و ترتيبها-[৬]

"বাক্যের মাঝে দুটি শব্দে চারটি বিষয়ে মিল থাকলে তাকে تام বলা হয়। বিষয়গুলো হলো: ১. হরফের শ্রেণী, ২. হরফের আকৃতি, ৩. হরফের সংখ্যা, ৪. হরফের বিন্যাস।"

যেমন: আল্লাহর বাণী,

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ[৭]

"যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নি।"

غير تام : وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة-[৮]

"কোন বাক্যে দুটি শব্দের মাঝে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের কোন একটিতে অমিল থাকলে তাকে

غير تام বলা হয়।"

প্রকাশ থাকে যে, الجناس غير تام কে الجناس الناقص ও বলা হয়। الجناس الناقص- এর আরও কিছু প্রকার রয়েছে, অবস্থার চাহিদানুসারে সেগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হবে।

আল-হাদীছে الجناس এর ব্যবহার

الجناس এর সংজ্ঞার আলোকে হাদীছে অনেক বাক্য পাওয়া যায়, যেগুলোতে جناس এর ব্যবহার ঘটেছে। এ পর্যায়ে হাদীছের এমন কিছু উক্তি পর্যালোচনা করা হলো, যার মধ্যে جناس এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন, إنما الماء من الماء[৯] "পানিতেই পানির প্রয়োজন।"

রাসূল (সা.) এর বাণীর এ অংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাক্যের মাঝে الماء শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বাক্যের মাঝে একই শব্দ দু'বার ব্যবহৃত হলেও শব্দটি দুবার পৃথক দুটি অর্থে ব্যবহৃত হযেছে। যেমন ماء শব্দটি প্রথমবার পানি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। আর দ্বিতীয় ماء দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে যে বীর্য নির্গত হয় তা বুঝানো হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। [১০] من الماء أى من أجل خروج الماء الدافق وهو المنى

"পানি হতে অর্থাৎ সবেগে স্খলিত পানি বের হওয়ার কারণে আর তা হলো বীর্য।"

আলোচ্য হাদিছাংশে একই বাক্যে একই শব্দ দু'বার ব্যবহৃত হয়ে দুটি অর্থ প্রকাশ করার ফলে হাদীছের মাঝে جناس تام এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন:

الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة [১১]

"কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা রয়েছে।"

আলোচ্য হাদীছের বাক্যাংশটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে ব্যবহৃত দু'টি শব্দ خيل এবং خير এর মাঝে অনেকাংশে মিল রয়েছে। শুধুমাত্র خيل শব্দের শেষে ل এবং خير শব্দের শেষে ر অক্ষরের অমিল রয়েছ। তবে শব্দ দু'টির মাঝে যথেষ্ট মিল থাকা সত্বেও অর্থগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অমিল রয়েছে। কেননা خيل শব্দের অর্থ অশ্ব, ঘোড়া।[১২] আর خير শব্দের অর্থ ভাল, উত্তম, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।[১৩] তাই রাসূল (সা.) এর বাণীর মাঝে অলংকার শাস্ত্রের جناس এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, [১৪] اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

"অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা অত্যাচার ক্বিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে।"

হাদীছের আলোচ্য বাক্যাংশে উল্লেখিত الظلم এবং ظلمات শব্দ দু'টির মাঝে আকৃতি ও বর্ণের সংখ্যায় অমিল থাকলেও মূলগত দিক খেকে শব্দ দু'টির মাঝে মিল রয়েছে। কেননা শব্দ দু'টির একই মূল অক্ষর থেকে উৎপত্তি ঘটেছে। তবে শব্দ দু'টির মাঝে অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এখানে الظلم অর্থ অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি।[১৫] আর ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। যার অর্থ অন্ধকার, আঁধার, তিমির ইত্যাদি।[১৬] এখানে অন্ধকার বলে কিয়ামত দিবসের কঠিন বিপদকে বুঝানো হয়েছে। যেমন এ

সম্পর্কে বলা হয়েছে, [১৭] وقيل المراد بالظلمات الشدائد "আর বলা হয়েছে الظلمات অর্থ কঠিন বিপদ।" তাই শব্দ দুটি একই মূল অক্ষর থেকে উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও অর্থের দিক থেকে পার্থক্য হওয়ার কারণে এখানে جناس এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, [১৮] من استفاد مالا فلا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول

"যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদের মালিক হবে, এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এ ধন সম্পদে তাকে যাকাত দিতে হবে না।"

আলোচ্য হাদীছাংশে উল্লেখিত দু'টি শব্দ يحول এবং حول একই মূল অক্ষর থেকে এসেছে। তবে এখানে يحول শব্দটি فعل যার অর্থ অতিবাহিত হবে, শেষ হবে।[১৯] আর حول শব্দটি اسم একবচন , বহুবচন أحوال যার অর্থ বছর, সাল, বৎসর।[২০] তাই শব্দ দু'টি উৎপত্তিগত দিক থেকে একইরকম হলেও অর্থের দিক থেকে পার্থক্য হওয়ার কারণে হাদীছের বাক্যের মাঝে جناس এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

سجع পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

سجع আরবী অলংকার শাস্ত্রের المحسنات اللفظية বা শব্দালংকারের একটি অন্যতম প্রকার। سجع এর মূল ব্যবহার ক্ষেত্র গদ্য সাহিত্য। তবে পদ্য সাহিত্যেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। হাদীছকে সাধারণত গদ্য সাহিত্য হিসেবেই ধরা হয়। রাসূল (সা.) এর বাণী হিসেবে এর সাহিত্যিক মান অনেক উন্নত। হাদীছের অনেক স্থানে سجع এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যার মাধ্যমে হাদীছের মাঝে অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকার সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ে سجع এর পরিচিতি তুলে ধরে হাদীছের মাঝে এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

سجع এর পরিচিতি

سجع শব্দটি একবচন, বহুবচনে اسجاع ব্যবহৃত হয়। এর শাব্দিক অর্থ অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্যাংশ, অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্য।[২১] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় سجع হলো-

السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وافضله ماتساوت فقره.[২২]

"দু'টি বাক্যের শেষাক্ষরে মিল হওয়াকে سجع বলা হয়। আর শ্রেষ্ঠ سجع যার সকল অনুচ্ছেদে মিল থাকে।"

سجع সুন্দর ও সার্থক হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে-

প্রথমত: বাক্যের প্রতিটি শব্দ সুগঠিত, সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: বাক্যের সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে অর্থের অনুযায়ী এবং অনুগামী হতে হবে। কোনরূপ কম বেশি হলে তা কৃত্রিম ও অপছন্দনীয় রূপে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত: বাক্য গঠনের সময় অর্থ হবে মনোরম ও আকর্ষণীয়, কখনই অপছন্দনীয় হবে না।

চতুর্থত: প্রতিটি অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্য যেন এমন অর্থ প্রকাশ করে যা দ্বিতীয় বাক্যের অর্থের বিপরীত হয়, কখনই দ্বিরুক্ত না হয়। অন্যথায় অন্ত্যমিলযুক্ত শব্দ ব্যবহার অনর্থক হয়ে পড়বে।[২৩]

سجع এর প্রকার

অলংকার শাস্ত্রে سجع এর প্রকার সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وهو على ثلاثة اضرب: مرصع، متواز و مطرف

"سجع তিন প্রকার: مرصع، متواز، مطرف"

দু'টি বাক্যের সকল শব্দে অথবা অধিকাংশ শব্দে ওযন এবং অন্ত্যমিল উভয় দিক থেকে মিল হওয়াকে السجع المرصع বলা হয়। যেমন: হারীরীর উক্তি-[২৪] فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه

দু'টি বাক্যের শেষ দু'টি শব্দে ওযন এবং বর্ণে মিল হওয়াকে السجع المتوازى বলা হয়। যেমন: আল্লাহর বাণী- فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ[২৫]

"সেথায় থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র।"

দু'টি বাক্যের শেষ দু'টি শব্দের শেষে ওযনে মিল না হয়ে শুধু বর্ণে মিল হওয়াকে السجع المطرف বলা হয়।[২৬] যেমন: আল্লাহর বাণী- مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً[২৭]

"তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না! অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"

আল-হাদীছে سجع এর ব্যবহার

سجع এর সংজ্ঞার আলোকে হাদীছের মাঝে এমন কিছু উক্তি পাওয়া যায়। যার মাঝে سجع এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। سجع এর পরিচিতি আলোচনা করার পর এ পর্যায়ে হাদীছের মাঝে سجع এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

রাসূল (সা.) বলেন, اللهم إنا نجعلك فى نحورهم و نعوذبك من شرورهم[২৮]

"হে আল্লাহ! তাদের দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পণ করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।"

রাসূল (সা.) এর এ বাণীতে দু'টি বাক্য রয়েছে اللهم إنا نجعلك فى نحورهم এবং نعوذبك من شرورهم। বাক্য দু'টির শেষের দু'টি শব্দ نحورهم এবং شرورهم এর মাঝে ওযন এবং শেষাক্ষরে মিল রয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে অন্ত্যমিলের শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, يا أبا عمير ما فعل النغير[২৯] "হে আবূ 'উমাইর! তোমার ছোট বুলবুলিটির কি হল?"

হাদীছের আলোচ্য বাক্যাংশে عمير এবং نغير শব্দ দু'টির মাঝে ওযন এবং শেষ বর্ণে মিল রয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে سجع এর অলংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন,

انه بكل تسبيحة صدقة و بكل تكبيرة صدقة و بكل تهليلة صدقة و بكل تحميدة صدقة[৩০]

"নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবীহ সদাক্বাহ, প্রত্যেক তাকবীর সদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহমীদ সদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহলীল সদাক্বাহ।"

উল্লেখিত হাদীছের মাঝে চারটি বাক্য রয়েছে। বাক্য চারটির প্রতিটি শব্দের ওযন এবং শেষ বর্ণে মিল রয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মধ্যে অন্ত্যমিলের শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন,

أفشو السلام وأطعموا الطعام و صلوا الأرحام وصلوا بالليل و الناس نيام تدخل الجنة بسلام[৩১]

"তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় কর, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ কর, রাত্রিবেলায় লোকদের ঘুমানো অবস্থায় নামায আদায় কর, তাহলে প্রশান্তচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আলোচ্য হাদীছের মাঝে ছোট ছোট বাক্যে ওযন এবং শেষ বর্ণে মিল রয়েছে। তাই এখানে سجع এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন,

أن من البيان سحرا وأن من العلم جهلا وأن من الشعر حكما و أن من القول عيالا[৩২]

"কোন কোন বর্ণনা যাদুর মত হৃদয়গ্রাহী হয়, কোন কোন ইলম অজ্ঞতাপূর্ণ হয়, কোন কোন কবিতা হিকমতপূর্ণ হয় এবং কোন কোন কথা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।"

আলোচ্য হাদীছের অংশের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে চারটি বাক্য রয়েছে, প্রতিটি বাক্যে শব্দের সংখ্যা একই রকম ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রতিটি বাক্যের শেষে একই মিল রক্ষা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, এখানে سجع বা অন্ত্যমিলের অলংকার অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

التصدير পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

আরবী অলংকার শাস্ত্রে التصدير শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। আরবী সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আরবী ভাষায় শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আরবী অলংকার শাস্ত্রে একে ردالعجز على الصدر বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩] হাদীছের মাঝে অনেক বাক্যে التصدير এর ব্যবহার পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে التصدير এর পরিচয় ও হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

التصدير এর পরিচয়

التصدير শব্দটি باب تفعيل এর مصدر। আরবী ص – د - ر মূল অক্ষর থেকে শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। এর শাব্দিক অর্থ রপ্তানি করা, নেতা বানানো, সামনে বসানো।[৩৪]

পারিভাষিক অর্থে التصدير হলো:

هو فى النثر أن يجعل أحد الركنين فى أول الفقرة والأخر فى أ خرها، و فى النظم أن يجعل أحد الفريقين من ذلك فى أخر البيت فى أول صدره.[৩৫]

"গদ্যে বাক্যের দু'টি মূল অংশের মধ্যে একই জাতীয় দু'টি শব্দের একটিকে বাক্যের প্রথমে এবং অন্যটিকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করা। আর পদ্যে ছত্রের صدر এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দকে عجز এর মধ্যে পুনরায় নিয়ে আসা। যেমন: আল্লাহর বাণী- وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ[৩৬]

"তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।"

আমরা এভাবে বলতে পারি পৌনঃপুনিকতা বা একজাতীয় দু'টি শব্দের একটিকে বাক্যের প্রথমে এবং অপরটিকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করাকে التصدير বলা হয়।

আল-হাদীছে التصدير এর ব্যবহার

হাদীছের মাঝে রাসূল (সা.) এর অনেক উক্তি রয়েছে, যে গুলোতে التصدير এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে হাদীছের কিছু উক্তি তুলে ধরে সে গুলোর মাঝে التصدير এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

হাদীছের মাঝে বর্ণিত হয়েছে, একজন ব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হলে রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি তাকে ভালোবাস? লোকটি উত্তরে বললেন,

أحبك الله كما أحبه[৩৭] "আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুক যেমন আমি তাকে ভালোবাসি।"

হাদীছের আলোচ্য উক্তিটি লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে বাক্যের প্রথমে احب শব্দ রয়েছে এবং শেষেও احب শব্দ রয়েছে। احب এবং احب শব্দ দু'টিই আরবী একই মূল অক্ষর থেকে উৎপত্তি ঘটেছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে পৌনঃপুনিকতা বা التصدير এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন, فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت[৩৮]

"দেখো এ কাফেলা কার? অতপর আমি দেখলাম।"

আলোচ্য হাদীছের বাক্যাংশে দেখা যায়, বাক্যের প্রথম শব্দটি انظر এবং শেষ শব্দটি نظرت । দু'টি শব্দই একই আরবী মূল অক্ষর থেকে উৎপত্তি ঘটেছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে التصدير এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ[৩৯]

"ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে অচিরেই সে অবস্থায় ফিরে যাবে যেভাবে শুরু হয়েছে।"

উল্লেখিত হাদীছের উক্তি লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে بدأ শব্দ দ্বারা বাক্য শুরু করা হয়েছে আবার بدأ শব্দ দ্বারাই বাক্য শেষ করা হয়েছে। বাক্যের প্রথম ও শেষে একই শব্দ ব্যবহার করার ফলে হাদীছের মাঝে التصدير বা পৌনঃপুনিকতার শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন, ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته[৪০] "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়ীত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

হাদীছের উল্লেখিত বাক্যে দেখা যায়, প্রথমে راع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার শেষেও رعيته শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় শব্দ আরবী একই মূল অক্ষর থেকে আসার কারণে বাক্যের মাঝে التصدير এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেন, [৪১] أدبني ربي فأحسن تأديبي "আমার প্রতিপালক আমাকে কত উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন!"

আলোচ্য হাদীছের মধ্যে প্রথম এবং শেষ শব্দ একই মূল অক্ষর থেকে আসার কারণে এখানে التصدير বা পৌনঃপুনিকতার অলংকার প্রকাশ পেয়েছে।

لزوم ما لا يلزم পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

لزوم ما لا يلزم আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম উপাদান। গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে لزوم ما لا يلزم এর পরিচিতি ও হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলো।

لزوم ما لا يلزم পরিচিতি

لزوم ما لا يلزم একটি যৌগিক শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অনাবশ্যক কে আবশ্যক করা। এর পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, [৪২] لزوم ما لا يلزم هو أن يؤتى قبل حرف الروي بما ليس بلازم في التقفية

حرف الروي (যে অক্ষরে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়) এর পূর্বে অন্ত্যমিলের জন্য অনাবশ্যক কিছু নিয়ে আসাকে অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় لزوم ما لا يلزم বলা হয়। যেমন জনৈক কবি বলেন,

يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فان مدامعي تطفيه

أحرق بها جسدي و كل جوارحي وأحرص على قلبي فانك فيه [৪৩]

"ওহে আগুনে প্রেয়সীর চেহারাকে দগ্ধকারী! থামো, আমার অশ্রু তা নির্বাপিত করে দিবে। তুমি আগুনে আমার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ দগ্ধ কর, তবে আমার অন্তরের প্রতি করুনা কর। কারণ, তাতে তুমি রয়েছ।"

আলোচ্য কবিতা পংক্তিতে কবি কবিতার উভয় অংশেই حرف الروي (ه) এর পূর্বে অতিরিক্ত ف ও ي বৃদ্ধি করেছেন। যা ছন্দমিল রক্ষার জন্য আবশ্যক ছিল না। ফলে এখানে কবিতার মাঝে لزوم ما لا يلزم এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

হাদীছে لزوم ما لا يلزم এর ব্যবহার

হাদীছের মাঝে অনেক স্থানে لزوم ما لا يلزم এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে হাদীছের দু'একটি উক্তি উল্লেখ করে সেগুলোর মাঝে لزوم ما لا يلزم এর ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

রাসূল (সা.) বলেন, [৪৪] أطعموا الطعام و أفشوا السلام تدخل الجنة بسلام

"তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, পরস্পর সালাম বিনিময় কর, তাহলে প্রশান্তচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হাদীছের আলোচ্য বাক্যগুলোর মাঝে م অক্ষর দ্বারা অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বাক্যের শেষ শব্দের শেষ অক্ষর م এর পূর্বে الف নিয়ে আসা হয়েছে, যা অন্ত্যমিল রক্ষার জন্য আবশ্যক ছিল না। ফলে এখানে হাদীছের মাঝে لزوم ما لا يلزم এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন,

ولا أبالي ولو أن أولكم و أخركم و حيكم و ميتكم و رطبكم و يابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة[৪৫]

“আমি এ ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। যদিও তোমাদের পূর্বের ও পরের, জীবিত ও মৃত, সিক্ত ও শুষ্ক তথা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সকলেই মিলে আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবুও একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না।”

আলোচ্য হাদীছে লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে প্রতিটি বাক্যে م দ্বারা অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি বাক্যের শেষ শব্দের শেষ অক্ষর م এর পূর্বে ك অক্ষর রয়েছে, যা অন্ত্যমিল রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল না। তাই এখানে হাদীছের মাঝে لزوم ما لا يلزم এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেন, [৪৬] ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا “সে আমাদের সাথে নেই যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না।”

আলোচ্য হাদীছের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে দু’টি বাক্য রয়েছে এবং প্রতিটি বাক্যের শেষে الف দ্বারা অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি বাক্যের শেষ শব্দের শেষ অক্ষর الف এর পূর্বে ن অক্ষর রয়েছে, যা অন্ত্যমিল রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল না। তাই এখানে হাদীছের মাঝে لزوم ما لا يلزم এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

التوزيع পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার

التوزيع আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকারের একটি অন্যতম সূত্র। التوزيع এর মাধ্যমে বাক্যের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে التوزيع পরিচিতি ও আল-হাদীছে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

التوزيع পরিচিতি

التوزيع শব্দের শাব্দিক অর্থ বন্টন, বিতরণ, বিলি, পরিবেশন, ভাগকরণ।[৪৭] অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় التوزيع বলতে কোন বাক্যের প্রতিটি শব্দে নির্দিষ্ট কোন বর্ণ নিয়ে আসা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

هو أن يلتزم حرف في كل لفظ من العبارة[৪৮]

“التوزيع হলো বাক্যের প্রতিটি শব্দে কোন একটি বর্ণকে ব্যবহার করা।”

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فسوف يحاسب حسابا يسيرا[৪৯]

“শীঘ্রই তার হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে।”

আলোচ্য আয়াতের মাঝে প্রতিটি শব্দেই سين বর্ণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাই এখানে التوزيع এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

হাদীছে التوزيع এর ব্যবহার

التوزيع এর সংজ্ঞার আলোকে হাদীছের মাঝে এমন অনেক বাক্য পাওয়া যায়, যে গুলোর মাঝে التوزيع এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে হাদীছের কিছু উক্তি তুলে ধরে সেগুলোর মাঝে التوزيع এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

রাসূল (সা.) বলেন, أيما مسلم كسا مسلما[৫০]

"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাপড় পরাবে।"

হাদীছের আলোচ্য অংশটি লক্ষ করলে দেখা যায়। এখানে হাদীছের প্রতিটি শব্দের মাঝে س বর্ণটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে التوزيع এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, أيما مسلم أطعم مسلما[৫১]

"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিমকে খাওয়াবে।"

আলোচ্য হাদীছাংশে লক্ষ করা যায়, এখানে প্রতিটি শব্দের মাঝে م অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে বাক্যের মাঝে التوزيع এর শব্দালংকার ফুটে উঠেছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, أيما مسلم سقا مسلما[৫২]

"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তিকে পান করাবে।"

উল্লেখিত হাদীছের বাক্যের মাঝে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি মূল শব্দে س অক্ষরের ব্যবহার ঘটেছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে التوزيع এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

রাসূল (সা.) আরও বলেন, الظلم ظلمات يوم القيا مة[৫৩]

"অত্যাচার ক্বিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে।"

উল্লিখিত হাদীছাংশে দেখা যায়, এখানে প্রতিটি শব্দে م অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে বাক্যের মাঝে التوزيع এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেন, الراحمون يرحمهم الرحمن[৫৪] "করুণাকারীর প্রতি আল্লাহ করুণা করবেন।"

আলোচ্য হাদীছের বাক্যের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে প্রতিটি শব্দে ح এবং م অক্ষর বিদ্যমান রয়েছে। তাই এখানে হাদীছের মাঝে التوزيع এর শব্দালংকার প্রকাশ পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এভাবে রাসূল (সা.) এর প্রতিটি হাদীছের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি হাদীছে অলংকার শাস্ত্রের কোন না কোন সূত্রের ব্যবহার ঘটেছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকার একটি অন্যতম বিষয়। হাদীছ শাস্ত্র অধিক বিস্তৃত হওয়ার কারণে একটি প্রবন্ধে আল-হাদীছের শব্দালংকার আলোচনা করা সম্ভব নয়। সে দিকে লক্ষ রেখে আলোচ্য প্রবন্ধে অলংকার শাস্ত্রের শব্দালংকারের উল্লেখযোগ্য কিছু বিশেষ বিশেষ সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে উদাহরণ স্বরূপ রাসূল (সা.) এর কিছু উক্তির মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে আল-হাদীছের শব্দালংকারের একটি চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠক সমাজ এখান থেকে আল-হাদীছের শব্দালংকার সম্পর্কে ধারণা পেতে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১২।

[২] *আল-মুনজিদ* (বৈরুত, লেবানন: আল-মাকতাবাহ আশ-শারকিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

[৩] *তদেব*।

[৪] অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ* (কলিকাতা: বাণী মনযিল, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ভূমিকাংশ।

[৫] আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, *'উলূমুল বালাগাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯৭।

[৬] মুস্তফা আমীন ও আলী আল-জারিম, *আল-বালাগাহ আল-ওয়াযিহাহ* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবাহ আত-থানুভী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ.২৬১।

[৭] সূরা আর-রূম: ৫৫।

[৮] *আল-বালাগাহ আল-ওয়াযিহাহ* পৃ. ২৬১।

[৯] ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-খাতীব আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ৪৭।

[১০] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, টীকা নং- ১০, পৃ. ৪৮।

[১১] আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি.), খণ্ড ৪র্থ, পৃ.১৭৩, হাদীছ নং-১৬৩৬

[১২] *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৩৮১।

[১৩] *তদেব*।

[১৪] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি.), খণ্ড ৪র্থ, পৃ. ১৯৯৬, হাদীছ নং-২৫৭৮।

[১৫] *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫৪৯।

[১৬] *তদেব*।

[১৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, টীকা নং- ৯, পৃ. ৪৩৪।

[১৮] *সুনানুত তিরমিযী*, খণ্ড ৩য়, পৃ.২৬, হাদীছ নং- ৬৩২।

[১৯] *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৩৫৪।

[২০] *তদেব*, পৃ.৩২৩।

[২১] *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৪৫৮।

[২২] *আল-বালাগাহ আল-ওয়াযিহাহ*, পৃ. ২৬৯।

[২৩] *'উলূমুল বালাগাহ*, পৃ. ৩০২।

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৩০৩।

[২৫] সূরা গাশিয়াহ: ১৩-১৪।

[২৬] *'উলূমুল বালাগাহ*, পৃ. ৩০৩।

[২৭] সূরা নূহ: ১৩-১৪।

[২৮] সুলায়মান ইবনু আশ'আছ আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), খণ্ড ১ম, পৃ. ৪৮০, হাদীছ নং- ১৫৩৭ ।

[২৯] মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-খাতীব আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সং. ১৯৮৫ খ্রি.), খণ্ড ৩য়, পৃ. ৫৮, হাদীছ নং- ৪৮৮৪ ।

[৩০] আবু 'আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল আশ-শাইবানী, *মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল* (কায়রোঃ মুয়াসসাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি.) খণ্ড ৫ম. পৃ.১৬৮, হাদীছ নং- ২১৫২০ ।

[৩১] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আবু 'আব্দিল্লাহ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), খণ্ড ২য়, পৃ. ১০৮৩, হাদীছ নং- ৩২৫১ ।

[৩২] *সুনানু আবী দাউদ*, খণ্ড ২য়, পৃ. ৭২১, হাদীছ নং ৫০১২ ।

[৩৩] *জাওয়াহিরুল বালাগাহ,* পৃ. ৩২৭ ।

[৩৪] *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫১৩ ।

[৩৫] নাসীফ আল-ইয়াযিজী আল-লুবনানী, *মাজমূ'উল আদব ফী ফুনূনিল আরব* (বৈরূতঃ আল-মাতবা'আহ আল উম্মাহ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১৬৬ ।

[৩৬] সূরা আল আহযাবঃ ৩৭ ।

[৩৭] আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ ৫ম. সং. ১৪২০হি.), খণ্ড ৪র্থ, পৃ. ৩২২, হাদীছ নং- ১৮৬৯ ।

[৩৮] আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (দারু তাউকিন্নাজাহ, ১ম সং, ১৪২২ হি.), খণ্ড ২য়, পৃ. ৮০, হাদীছ নং- ১২৮৭ ।

[৩৯] *সহীহ মুসলিম*, খণ্ড ১ম, পৃ.১৩০, হাদীছ নং- ২৩২ ।

[৪০] *সহীহুল বুখারী* (দারু তাউকিন্নাজাহ ১ম. সং. ১৪২২ হি.), খণ্ড ২য়, পৃ. ২৬১১, হাদীছ নং- ৬৭১৯ ।

[৪১] ইমাম ইবন তাইমিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া,* ১৮ খণ্ড, পৃ. ৩৭৫ ।

[৪২] *মাজমূ'উল আদব ফী ফুনূনিল আরব*, পৃ. ১৭২ ।

[৪৩] *জাওয়াহিরুল বালাগাহ*, পৃ. ৩২৬ ।

[৪৪] *সুনানু ইবনি মাজাহ*, খণ্ড ২য়, পৃ. ১০৮৩, হাদীছ নং- ৩২৫১ ।

[৪৫] *সুনানুত তিরমিযী*, খণ্ড ৪র্থ, পৃ. ৬৫৬, হাদীছ নং- ২৪৯৫ ।

[৪৬] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ৪২৩ ।

[৪৭] *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃ. ২৭৯ ।

[৪৮] *মাজমূ'উল আদব ফী ফুনূনিল আরব*, পৃ. ১৭২ ।

[৪৯] *আল-কুরআন, সূরা আল-ইনশিকাক*, আয়াতঃ ৮ ।

[৫০] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খণ্ড ১ম, পৃ. ৪৩১, হাদীছ নং- ১৯১৩ ।

[৫১] *তদেব* ।

[৫২] *তদেব* ।

[৫৩] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ৪৩৪ ।

[৫৪] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ৪২৩ ।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

মুখাদরাম কবিদের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য : একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহা. বিলাল হুসাইন*

Abstract: Literature is called the mirror of a society. The culture, values, norms and behavioral pattern of a specific society are reflected through the literature of contemporary litterateur. With the change of decade/with the passage of time, the variation is seen both in the pace and nature of literature and also in the subject matter of literature. In ancient period numerous Poet wrote their poetry in Arabic language. Among their those who have gotten both the age of Ignorance and the Islamic era are called the Mukhadram Poet. A few number among the Mukhadram poet extremely resisted in the publicity and extention of Islam. In this situation, Prophet Mohammad (SM) Urged the poet, believing in Islamic values, to Utilize their endowment for rejoining the opponent. Among the poet who came forward Hassan ibn Sabit, K`ab ibn Juhair, Abdullah Ibn Rawaha were worth sound. They were adorned as the "Shayerur Rasul". The poetry of ignorance era discusses the nobility, arrogance and the desire of revenge. On the other hand the poetry of Islamic era discusses Tawhid, Risalah and Jihad. Beside this the subject matter of the poetry of Mukhadram poet discusses the context of Allah and Rasul, Taqwa. Magfirah, Battle and strife, Favour of jannah, condemnation and Indignation of kufor. This paper aims at highlighting on the mukhadram poets and their multidimensional themes.

ভূমিকা

প্রত্যেকটি মানুষের মানসিক বিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা অনন্য। সমাজের সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা লোকাচার ও লোকমানসের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যিকদের সাহিত্য সম্ভারে। ফলে সাহিত্যচর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে সমাজের গুণগত পরিবর্তন হয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের গতি প্রকৃতি যেমন আবর্তিত হয় তেমনি বিষয়বস্তুতেও আমূল বৈচিত্র্য সাধিত হয়। প্রাচীনকালে অসংখ্য কবি আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করে এ সাহিত্যকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছায়ে দিয়েছে। যে সব কবি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ প্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে মুখাদরাম কবি বলা হয়। এই মুখাদরাম কবিদের কিছু সংখ্যক ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তীব্র বিরোধিতা করেন। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবিদের কাব্য প্রতিভাকে প্রতিপক্ষের জবাব দানে নিয়োজিত করার আহবান জানান। এ ক্ষেত্রে যারা এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.), কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্জন করেছিলেন। জাহিলী কাব্যে মদ ও জুয়া, নারী বংশগৌরব, অহমিকা ও প্রতিশোধের স্পৃহা দেখা যায় পক্ষান্তরে ইসলামী যুগে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, ঈমান, তাওহীদ, রিসালাত ও জিহাদের প্রসঙ্গ স্থান করে নিয়েছে। বিশেষ করে কবিতাচর্চায় একটি আমূল ধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া মুখাদরাম কবিদের কবিতার বিষয়বস্তুতে আরো যা স্থান পেয়েছে দুনিয়ার কামিয়াব জীবন, আখিরাত, তাকওয়া, মাগফিরাত, নামাজের মাধ্যমে দু'আ, যুদ্ধ বিগ্রহ, জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, কুফরীর প্রতি নিন্দা ও ধিক্কার।

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান স্বল্প পরিসরে হলেও এভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত। প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই এ ভাষায় অত্যন্ত উচ্চমানের সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে। প্রাচীন আরবে সাহিত্য মানেই কবিতা। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায়ও কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে। জাহিলী যুগে আরবের লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার গোত্রীয়

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবন যাপন করলেও তাদের প্রত্যেক গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবি ছিলেন। যাদেরকে জাহিলী যুগে 'অতিমানব' হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হতো।[১] সে যুগের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের প্রচলিত জীবনধারা সম্পর্কে কবিতার ভিতর নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করতেন। একজন কবি গোত্রের মান-মর্যাদা সুরক্ষার ক্ষেত্রে অতন্ত্র প্রহরীরূপে কাজ করতেন; ভিন্ন গোত্রের কেউ হিজা বা নিন্দাবাদ করলে তার সমুচিত জবাব দিতেন। এছাড়াও জাহিলী যুগে আরবদের কাব্যচর্চায় 'উকাযমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২] যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কবিতা রচয়িতাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেওয়া হতো। ইসলামী যুগে এসেও কবিতাচর্চার এ ধারা অব্যাহত থাকে। জাহিলী যুগের অসংখ্য কবি আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাদেরকে আরবী সাহিত্যের পরিভাষায় জাহিলী কবি বলা হয়। অপরদিকে যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিক প্রাক্-ইসলামী ও ইসলামী উভয় যুগেই কবিতা রচনা করে কাব্যসাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদেরকে মুখাদরাম কবি বলা হয়। মুখাদরাম কবিদের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ। তাদের বর্ণনাভঙ্গি কাব্যধারাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে ইসলামী যুগের কবিতাগুলো ছিল খুবই উন্নতমানের, যা সমগ্র আরবী সাহিত্যের অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে ধরা হয়।[৩]

জাহিলী যুগের সাহিত্য বলতে কাব্য সাহিত্যকেই বুঝায়।[৪] যেখানে নানা ধরণের নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয় স্থান করে নেয়, গোত্রীয় অহমিকা তাদের জীবনকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। ইসলামের আর্বিভাবে গোত্রীয় ও স্বাজাত্যবোধের চেতনা ধুলায় মিশে যায়। কুলজি বন্ধন ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বের স্থলে ধর্মীয় বন্ধন ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর আদর্শিক এই পরিবর্তনের হাওয়া আরবদের চিন্তা, মনন ও সাহিত্য মানসেও দোলা দেয়। তবে সাহিত্যের অঙ্গনে ইসলামের এই প্রভাব শুরুতে সর্বব্যাপী ছিল না। এটি কেবল আনসার-মুহাজিরদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সীমিত ছিল। অন্যথায় যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিংবা আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেননি তাঁদের মাঝে জাহিলী যুগের বেদুঈনী স্বভাব তথা গোত্রীয় অহমিকা, বংশগৌরব, প্রতিশোধ স্পৃহা, মাদকাশক্তি, নারী প্রণয় ইত্যাকার জাহিলী ভাবধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়; যা তাদের রচিত কাব্যে প্রতিফলিত হয়।[৫]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুখাদরাম কবি ছিলেন। যারা আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই জাহিলী যুগেও খ্যাতিমান কবি ও বাগ্মি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যারা ইসলাম গ্রহণের পরও সুদীর্ঘকাল কাব্যচর্চা করেছেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে কবিতাচর্চা তাদের পেশা বা নেশা কিছুই ছিল না। তারা প্রয়োজনের তাকিদে কবিতা বলতেন এবং কবি ও কবিতার কদর করতেন।[৬]

তৎকালিন যুগে মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে আরবী সাহিত্যের অন্যতম শাখা খুতবার সাহায্য নিলেও তখন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা কবিতার সাহায্য পাননি। যার ফলে মক্কার কবিরা ইসলাম ও রাসূলের বিরোধীতায় কোমর বেঁধে নামে। ইসলামের মান মর্যাদা ও মাহাত্ম সমুন্নত রাখতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাস্‌সান ইবন ছাবিত (মৃ. ৬৭৪খ্রি./৫৪হি.), কা'ব ইবন মালিক (মৃ. ৬৭০খ্রি. /৫০হি.),'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (মৃ. ৬২৯খ্রি./৮হি.) প্রমুখ সাহাবীদের সাহায্য কামনা করেন। যাদেরকে মুখাদরাম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৭] এছাড়া অন্যান্য মুখাদরাম কবিদের মধ্যে 'আলী ইবন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন হুযায়ফাহ, সাফিয়্যাহ বিনত 'আবদিল মুত্তালিব, আতিকাহ বিনত 'আবদিল মুত্তালিব, কা'ব ইবন মালিক, নুমান ইবন বাশীর, লাবীদ ইবন রাবী'আহ, হুতাইয়া, নাবিগাহ আল জা'দী, আবূ যুওয়ায়ব আল হুযালী, 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যিবিরা, আল'আব্বাস ইবন মিরদাস অন্যতম।

মুখাদরাম কবিদের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য

মুখাদরাম কবিগণ কাব্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা তাদের কাব্যের ভাব, ভাষা ও ছন্দের অলংকার সবই আরবী সাহিত্যের অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁদের কাব্যে বিষয়বস্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুখাদরাম কবিগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করে উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে আহমাদ হাসান আয্ যাইয়াত বলেন- জাহিলী ও মুখাদরাম কবিদের মাঝে– মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কারণ মুখাদরাম কবিদের নিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণী ভাগ করা বাহুল্য মাত্র। কেননা তাদের কাব্যাদর্শ জাহিলী আর্দশেরই নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘায়িত ধারা।[৮] আর এজন্যই বিশিষ্ট কাব্য সমালোচক মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ. ৮৪৬খ্রি./২৩২হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তবাকাতুশ শু'আরায়' কবিদের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে মুখাদরাম কবিদেরকে জাহিলী কবিদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। তবে মুখাদরাম কবিদের কবিতার বিষয়বস্তুতে আগের নিয়মে প্রেয়সির প্রতি প্রেম নিবেদন, বাস্তুভিটার স্মৃতিচারণ, স্বীয় বাহনে উটের বর্ণনা ইত্যাকার বিষয়ের অবতারণা পূর্বক কবিগণ তাঁদের কাব্য-বিষয় উপস্থাপন করতে দেখা যায়নি বরং এদের কবিতার বিষয়বস্তুতে মহান আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয়, জাহান্নামের ভয়, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জিহাদ, তাকওয়া, মাগফিরাত, যুদ্ধ বিগ্রহ, যুগ বা কাল, উপদেশ, জীবন প্রসঙ্গ, জান্নাতের নিয়ামত, কুফরীর প্রতি নিন্দা ও ধিক্কার, আল্লাহর প্রসংসা ও রাসূলের স্তুতি প্রভৃতি বিষয় স্থান দিয়েছেন।[৯] নিম্নে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলোঃ

আল্লাহ প্রসঙ্গ

মুখাদরাম কবিদের কবিতার বিষয়বস্তুতে আল্লাহ প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁদের কবিতায় আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ প্রদান করেছেন। দুনিয়ার সকল প্রাণীর লালন-পালন ও রিযিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীকে খেতে দেন তেমনি বড় প্রাণীর আহারও যোগান। আল্লাহ আমাদের অভিভাবক। তিনি সবসময় আমাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহকে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব আছে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন, সর্বস্থানে তিনি বিরাজমান। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাঁর কবিতায় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন-

شهدت بأن وعد الله حق- وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء حق - وفوق العرش رب العلمينا.[১০]

[আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কাফিরদের ঠিকানা দোযখ, আরশ ছিল পানির উপর, আরশের উপর ছিলেন বিশ্বের প্রতিপালক।]

রাসূল প্রসঙ্গ

প্রাক-ইসলামী যুগের কবিদের কাসীদা রচনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত কিছু রীতি-নীতি অনুসরণ করত। তারা প্রিয়ার ছলাকলা, মানসিক অবস্থা, তার দৈহিক সৌন্দর্য, উষ্ট্রী ইত্যাদি দ্বারা কাসীদা রচনা করতেন। ইসলাম আগমনের ফলে তাদের কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সূচিত হয়। ইসলাম তাদের কবিতায় সততা ও মাধুর্য দান করেছে। কবিতায় তারা ইসলামের বহু বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। রাসূল (সা.) এর প্রশংসা গীতি বা বানা'তে রাসূল রচনা করেছেন। ইসলামী জীবনের কবিতায় যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশংসা করেছেন তেমনি নিন্দা করেছেন পৌত্তলিকদের যারা আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের সাথে দুশমনি করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সাহাবী কবি কা'ব লিখেছেন-

إن الرسول لنور يستضاء به- وصارم من سيوف الله مسلول
فى عصبة من قريش قال قائلهم- ببطن مكة لما أسلموازولوا
زالوا فمازال أنكاس ولاكشف - يوم اللقاء ولاسود معازيل[১১]

[নিশ্চয় রাসূল (সা.) এমনই এক জ্যোতি, যা দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহর ধারালো তরবারিসমূহের অন্যতম তরবারি যা সতত কোষমুক্ত। কুরায়শদের একটি দল যখন মক্কার উপত্যাকায় ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের একজন বলেছিল; তোমরা মক্কা থেকে মদীনায় সরে যাও। তাই তারা মদীনার দিকে সরে পড়ে। তবে যারা দুর্বল এবং সম্মুখ সমরে বর্মহীন, অস্ত্রহীন এবং অশ্বোপরি ঢলে পড়ে, তারা সরে নি।]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল (সা.) কে উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সকল দিক থেকে তাঁকে করেছেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর সুন্দর চরিত্রের এমন কোনো দিক নেই যা রাসূল (সা.) এর ব্যক্তিত্বে পূর্ণতা পায়নি। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে ঘিরে সুশোভিত হয়েছে সকল প্রকার নান্দনিক সৌন্দয্যাবলি।'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাসূলের প্রশংসায় বলেন-

إنى تفرست فيك الخير أعرفه- و الله يعلم أنما خانني البصر
أنت النبى ومن يحرم شفاعته- يوم الحساب فقد أزرى به القدر
يا ال هاشم الله فضلكم- على البرية فضلا مالم غير[১২]

[আমি আপনার মাঝে কল্যাণ অনুসন্ধান করেছি ও পেয়েছি। আল্লাহর শপথ এতে আমার চক্ষু কোনো খিয়ানত করেনি। আপনি এমন একজন নবী বিচার দিবসে (কিয়ামতের দিন) যে ব্যক্তি আপনার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে সে নিতান্তই দুর্ভাগা। হে হাশেমের বংশধর নিশ্চয় আল্লাহ জগৎবাসীর উপর তোমাদেরকে এমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্য আর কাউকে দেয়া হয়নি।

জীবন প্রসঙ্গ

জীবন প্রসঙ্গে 'আলী ইবন আবী তালিব-এর বিষয়বস্তু বিচিত্রধর্মী। বংশ অহমিকা, মুর্খের সাহচর্য, যুগের বিশ্বাসঘাতকতা, যুগ-যন্ত্রণা, দুনিয়ার মোহ, বন্ধত্বের রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ের কথা বলেছেন। বংশ অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সে কথা বলেছেন এভাবে-

الناس من جهة التمثال أكفاء - أبوهم أدم و الأم حواء
وإنما أمهات الناس أوعية- مستودعات وللأحساب آباء[১৩]

[আকার আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমকক্ষ, কেননা তাদের পিতা আদম (আ.) এবং মাতা হাওয়া (আ.)। প্রকৃতপক্ষে মায়েরা মানবজাতির সংরক্ষিত আধার, আর পিতারা বংশের জন্য।]

তাঁর মতে জীবন কতগুলি নিঃশ্বাসের সমধি বৈ আর কিছুই নয়, প্রতিটি নিঃশ্বাসের এ জীবনের একটি মূল্যবান অংশের প্রস্থান ঘটে। যে নিঃশ্বাসটি চলে যায় তা আর কোনো দিন ফিরে আসে না। মানুষের এ জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। একটি ফুটন্ত ফুলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন একটি ফুল তার পাপড়ী মেলাতে মেলাতেই মৃত্যুর সাথে দিন গুণতে থাকে, ঠিক তেমনি মানুষের জীবন আছে, একটু পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান সামান্য, আর মৃত্যুই হলো আসল ঠিকানা। নিম্নোক্ত কবিতা ছত্রে তাঁর এ চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে।

قد كنت ميتافصرت حيا- وعن قليل تصير ميتا[১৪]

[তুমি তো মৃত্যু ছিলে অতঃপর জীবন পেলে, একটু পরেই মৃতে পরিণত হবে।]

জিহাদের চেতনা

জিহাদ সম্পর্কে মুখাদরাম কবিগণ বহু কাব্য রচনা করেছেন। জিহাদ যে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটির তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা কাব্যে তুলে ধরেছেন। ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে মাল,

জান, বুদ্ধি-জ্ঞান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ্য উৎসর্গ করার চেতনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টম হিজরী সনে মুতার যুদ্ধে রাসূল (সা.) তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেছিলেন। যারা হলেন- যায়দ ইবন হারিছ, জাফর ইবন আবি তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহ। প্রথম দুইজন শাহাদাত বরণ করলে 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। জিহাদের ময়দানে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হন যার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

أقسمت يا نفس لتنزلنة - لتنزلن أو لتكرهنه
إن أجلب الناس وشدوا الرنة- مالى أراك تكرهين الجنة
وقد طال ما قد كنت مطمئنه - هل أنتإلانطفة فى شنه
يانفس إلا تقتلى تموتى- هذا حمام الموت قد صليت
وما تمنيت فقد أعطيت- إن تفعلى فعلهما هديت[১৫]

[হে আমার প্রাণ! আমি কসম করেছি, তুমি অবশ্যই নামবে, তুমি স্বেচ্ছায় নামবে অথবা নামতে বাধ্য করা হবে। মানুষের চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। তোমার কী হয়েছে যে, এখনও জান্নাতকে অবজ্ঞা করছো? সেই কত দিন থেকে না এই জান্নাতের প্রত্যাশা করে আসছো, পুরানো ফুটো মশকের এক বিন্দু পানি ছাড়া তো তুমি আর কিছু নও। হে আমার প্রাণ, আজ তুমি নিহত না হলেও একদিন তুমি মরবে। এই মৃত্যুর হাম্মাম এখানে উত্তপ্ত করা হচ্ছে, তুমি যা কামনা করতে এখন তোমাকে তাই দেয়া হয়েছে। তুমি তোমার সঙ্গীদ্বয়ের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে হিদায়াত পাবে।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সামান্য ভুলের কারণে পৌত্তলিক দল রাসূলের (সা.) উপর আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পতাকাবাহী মুস'আব ইবন উমাইর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথে 'আলী (রা.) ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন। সুযোগ পেয়ে আবূ সা'দ ইবন তালহা তাঁর উপর আক্রমন করে। কিন্তু 'আলীর প্রচণ্ড আক্রমনে তালহা নিহত হন।[১৬]

যুদ্ধ শেষে 'আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বললেন, ফাতিমা! তরবারিটি রাখো। আজ এটি দিয়ে খুব যুদ্ধ করেছি। অত:পর তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন-

أفاطم هاك السيف غيرذميم - فلست بر عديد ولابلئيم
لعمرى لقد أبليت فى نصرأحمد- ومرضاة رب بالعباد عليم[১৭]

[হে ফাতিমা! এ তরবারিটি রাখো যা কখনো কলঙ্কিত হয়নি। আর আমিও ভীরু কাপুরুষ নই এবং নীচ। আমার জীবনের কসম! নবী আহমাদের সাহায্যার্থে এবং বান্দার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আমি এটাকে ব্যবহার করে পুরনো করে ফেলেছি।]

মুসলিম শহীদের স্মরণ

শোকগাথা বা মৃত্যু ব্যক্তির স্মরণে কাব্য রচনায় মুখাদরাম কবিগণ ছিলেন খুবই দক্ষ। বিভিন্ন সময় মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শহীদদের অবদানের কথা কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রার সময়ে রাসূল (সা.) 'ছানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদের বিদায় জানান। বিদায় বেলা মদীনাবাসীরা তাদেরকে বলল: তোমরা নিরাপদে থাকো এবং কামিয়াব হয়ে ফিরে এসো। 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা বলল: কাঁদার কি আছে? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহাব্বতে আমি কাঁদছিনা। শহীদ স্মরণে আমার দুই নয়নে অশ্রুসিক্ত হচ্ছে। রাসূল (সা.) এর চাচা হামজা (রা.) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন-

بكت عينى وحق لها بكاها - وما يغنى البكاء ولا العويل

على أسد الإله غداة قالوا- أحمزة ذاكم الرجل القتيل
أصيب المسلمون به جميعا- هناك وقد أصيب به الرسول[১৮]

[আমার চক্ষুদ্বয় ক্রন্দন করেছে, আর তাঁর ক্রন্দন করা উচিত। কারণ ক্রন্দন ও বিলাপেরই মুখাপেক্ষী আসাদুল ইলাহের (হামজা রা.) উপর যার সম্বন্ধে গতকাল বলাবলী হয়েছে যে, হামজা (রা.) নিহত হয়েছেন। এতে সকল মুসলিম ভারাক্রান্ত হয়েছে এবং রাসূল (সা.) ব্যথিত হয়েছেন।]

মাগফিরাত সম্পর্কে বর্ণনা

মাগফিরাত অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা, অনুতপ্ত হওয়া। মুখাদরাম কবিগণ সারা জীবন অনুতপ্ত হয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমার্পণ করেছেন। আমাদের পাপের সীমা নেই। তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমার দরজাতো অসীম। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবেনা। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এসব বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। তিনি সূরা মারইয়াম এর ৭১ নং আয়াত- তোমাদের প্রত্যেককেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার রব- এর অনিবার্য সিদ্ধান্ত পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কি সেই পুলসিরাত পার হতে পারবো? লোকেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: আল্লাহ তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে আবার মিলিত করবেন। তখন তিনি স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:

ولكنى أسأل الرحمن مغفرة- وضربة ذات فرع تقذف الزبدا
أوطعنة بيدى حران مجهزة- بحربة تنفذ الأحشاء و الكبدا
حتى يقال إذا مروا على جدثى- أرشده الله من غازو قد رشدا[১৯]

[তবে আমি রহমানের কাছে মাগফিরাত কামনা করি, আর কামনা করি অসির অন্তরভেদী একটি আঘাত অথবা কলিজা ও নাড়িতে পৌঁছে যায় নিযার এমন একটি খোঁচা। আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যেন বলে- হায় আল্লাহ, সে কত ভালো যোদ্ধা ও গাজী ছিল।]

তাকওয়া সম্পর্কে

মুখাদরাম কবিগণ তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও তাকওয়া অর্জনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাকওয়া আল্লাহর ভয়, উৎকৃষ্ট পাথেয় সঞ্চয় এবং আল্লাহভীরু লোকের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিরাট ছাওয়াব। তাকওয়া সম্পন্ন মানুষ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। যেটা অর্জন করা কঠিন। তারা বিশ্বাস করতেন, দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগের মধ্যে প্রকৃত কোনো সৌভাগ্য নেই। ইসলাম গ্রহণের পর আল হুতায়আ (রা.) একজন ভালো ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তাকওয়া সম্পর্কে তিনি এভাবে কবিতা আবৃত্তি করলেন-

ولست أرى السعادة جمع مال- ولكن التقى هو السعيد
وتقوى الله خير الزاد ذخرا- وعبد الله للأتقى مزيد[২০]

[ধন সম্পদ সঞ্চয় করাকে আমি কোনো সৌভাগ্য বলে মনে করি না বরং আল্লাহকে যে ভয় করে সেই সৌভাগ্যবান। আল্লাহর ভয় উৎকৃষ্ট পাথেয় ও সঞ্চয় এবং আল্লাহ ভীরু লোকের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিরাট ছাওয়াব।]

আরশের বর্ণনা

মুখাদরাম কবিগণ আরশের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আরশ মহান রাব্বুল আলামিনের এক মহান সৃষ্টি। যেটি একটি বিস্ময়কর যা মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত চিন্তার খোরাক। সপ্তম আসমানের উপর মহান আল্লাহর তা'আলার আরশ, কুরছী অবস্থিত। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী আরশ কুরছী

এত বিশাল যে, তা সমগ্র আকাশ ও জমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা আরশের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

إن العرش فوق الماء حاف- وفوق العرش رب العلمينا
تحمله ملائكة كرام- ملائكة إلاله مسومينا[২১]

[নিশ্চয় আরশ পানির উপর প্রদক্ষিত। আর আরশের উপর রয়েছেন আমাদের প্রতিপালক। আর তা বহন করে আছেন সম্মানিত ও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফিরিশতারা। আল্লাহর ফিরিশতারা শ্বেত-শুভ্র চিহ্ন বিশিষ্ট।]

কুফুরীর প্রতি নিন্দা ও ধিক্কার

মুখাদরাম কবিদের বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে নিন্দা ও ধিক্কার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা প্রতিপক্ষকে নিন্দা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। কবি হাসসানের নিন্দাবাদের মধ্যে শুধু গালিই থাকতো না, তাতে থাকতো প্রতিরোধ ও প্রত্যুত্তর। তাঁর স্টাইলটি ছিল অতি চমৎকার। কুরাইশদের নিন্দার রচিত তাঁর কবিতা-

واشهد أن لك من قريش- كإل السقب من ولد النعام[২২]

[আমি জানি যে তোমার আত্মীয়তা কুরায়শদের সঙ্গে আছে। তবে তা এ রকম যেমন উট-শাবকের সাথে উট পাখীর ছানার সাদৃশ্য হয়ে থাকে।]

তাছাড়া আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাচাতো ও দুধ ভাই। ইসলামপূর্ব সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তার খুবই ভাব ছিল। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর সাথে দুশমনি শুরু হয়। তিনি ছিলেন একজন কবি। রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের নিন্দার জবাবে কবিতা রচনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। আবূ সুফিয়ানের নিন্দায় হাসসান (রা.) এর কবিতা-

هجوت محمدا فأجبتعنه - وعند الله فى ذاك الجزاء
هجوت مباركا برا حنيفا- أمين الله شيمته الوفاء[২৩]

[তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর এর প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে। তুমি নিন্দা করেছো একজন পবিত্র পুন্যবান ও সত্যপন্থী ব্যক্তির। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং অঙ্গিকার পালন করা যার স্বভাব।]

উপসংহার

মোটকথা মুখাদরাম কবিদের কবিতাচর্চা তৎকালীন আরবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁদের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ। কবিতার বর্ণনাভঙ্গি ও বৈচিত্র্য কাব্যধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁরা আমুল পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বংশ গৌরব, গোত্রীয় অহমিকা, হিংসা বিদ্বেষ যেখানে ছিল কবিতার মূল উপজীব্য, সেখানে জান্নাতের বর্ণনা, সুখ শান্তির বর্ণনা, ক্ষমা প্রার্থনা, নাযাতের পথের মতো বিষয় বৈচিত্র্যকে সামনে এনে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। ফলে মুখাদরাম যুগের কবিতাগুলো খুবই উন্নত মানের যা সমগ্র আরবী সাহিত্যের অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে ধরা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: নোবেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ২০।

[২] ইবন 'আবদ রাব্বিহ, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: লাজনাতুত তা'লীফ, ১৯৬৫হি.), পৃ. ১১৬।

[৩] আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ১৫৫।

[৪] ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবি কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ২৫।

[৫] *আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী* (প্রকাশনালয়ের নাম ও তারিখ বিহীন), পৃ. ৬৪-৬৫।

[৬] ইউসুফ আল-কানধালুবী, *হায়াতুস সাহাবা* (দিমাশক: দারুল কালাম, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ২০।

[৭] ড. শাওকী দায়ফ, *আত্ তাতাওউরু ওয়াত তাজদীদু ফিশ শি'রিল 'উমাভী* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১৬-১৭।

[৮] *আহমাদ হাসান আয যাইয়াত*, পৃ. ৭৯।

[৯] *প্রাচীন আরবী কবিতা; ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ২২।

[১০] আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, *আদ দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল উলূম, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৯২।

[১১] ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১২৩।

[১২] *দীওয়ানু 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা*, সম্পাদনা: ড. ওয়ালিদ কিসাব (সৌদি আরব: দারুল উলূম, ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ১৫৩।

[১৩] 'আলী ইবন আবি তালিব, *আদ দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

[১৪] ড. ইউসুফ ফারহাত, *শারহু দীওয়ানিল ইমাম 'আলী ইবন আবি তালিব (রা.)* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

[১৫] *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, পৃ. ৮৯।

[১৬] *দীওয়ান-ই-'আলী*, ভাষান্তর: মুহাম্মাদ হাসান রহমতী, ১ম খণ্ড (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৯৫।

[১৭] 'আলী ইবন আবি তালিব, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ১০৫।

[১৮] *দীওয়ানু 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা*, পৃ. ১৩২; *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, পৃ. ৮৭।

[১৯] *দীওয়ানু 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা*, পৃ. ১৪৭; *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৯-৩০; *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, পৃ. ৮৮।

[২০] আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: মু'আসসাসাতু জাম্মাল, তা.বি.), পৃ. ১৭৫।

[২১] *দীওয়ানু 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা*, পৃ. ১৪৪; আল-কুরতুবী, *আল-ইসতী'আব টীকা: আল ইসাবা ফী তাময়ীয আস সাহাবা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ৩৬২।

[২২] হাসসান ইবন ছাবিত, *আদ দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৬৬খ্রি.), পৃ. ২৪২।

[২৩] *তদেব*, পৃ. ২০; *কিতাবুন আগানী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবা*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়া' আত-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৬৩খ্রি.), পৃ. ১১৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

’ইমরু’উল কায়স ও ‘আনতারার কাব্যে অশ্ববন্দনা: একটি পর্যালোচনা

ড. ছালেকুজ্জামান খান*

Abstract: Poetry of Jahily is unfading peace of Arabic literature. Poets portrayed the society in sensible contexture through those poems. Poetry has a trace or every walk of Arablife along with peace, warfare and so more. Since Arabs were nomad travelers on the desert, pets were daily part of their sustentation. Horse had very vital importance to them among the benevolent animals. Therefore, the objects related to horse like prides for it, benefits and necessities to it are well defined. Rearing of horses, giving diverse names to them, regarding as blessed, use of them as transportation and war equipments along with other salutary things have been immortalized precisely through these ancient poems. These worth very high rhetorical values in the Arabic literature. About all the poets of Jahily explained nicely about their homesteads, carriages and most beloved. They poured very great wisdom on the illustrations of vehicles horses, camels and asses. They showed no thrift to furhish with unique analogies and examples. Imru’l Qais and ‘Antara got specialities in their poems in depiction of horses. The poems of these two scholars about horses bear definite praises. They presented all about horses from physical structures to good qualities excellently and nicely.

ভূমিকা

জাহিলী যুগের কবিতা আরবী সাহিত্যের অমর সৃষ্টি। কবিগণ তাঁদের জীবনাচার নিপূণভাবে কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেন। কবিতা তৎকালিন আরব সমাজের প্রতিবিম্ব। যাতে তাঁদের শান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহসহ জীবনের প্রতিটি বিষয় প্রতিফলিত হয়। জাহিলী আরবরা মরুচারী ছিল বলে তাঁদের জীবন-জীবিকার সাথে গৃহপালিত প্রাণীর সম্পর্ক ছিল অপরিসীম। আর বিভিন্ন উপকারী প্রাণীর মধ্যে তাঁদের কাছে অশ্ব বা ঘোড়া ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ। ফলে আরবী কবিতায় ঘোড়ার সম্মান, উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা, প্রতিপালন, বিভিন্ন নামে নামকরণ, বরকতময় হওয়া, যুদ্ধ এবং পরিবহণে ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। সাহিত্যের আলংকারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো খুবই উচ্চ মানের। এ প্রবন্ধে কবি ’ইমরু’উল কায়স ও ‘আনতারার কবিতায় ঘোড়া প্রসঙ্গে আলোচনা করার আশা রাখি।

ঘোড়ার পরিচয়

ঘোড়ার আরবী প্রতিশব্দ হল فرس। এ শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। فرس এর বহুবচন افراسও فروس।[১] ঘোড়ার আরোহীকে فارس বলা হয়। এটি বহুবচনে فرسان ও فوارس ব্যবহৃত হয়।[২] আরবী ভাষায় সাধারণ ঘোড়া, বড় ঘোড়া, ছোট ঘোড়া, সাদা, কালোসহ বিভিন্ন আকার ও রঙের ঘোড়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রয়েছে। যথা নর ঘোড়াকে বলা হয় حصان। এর বহুবচন حصن। আর মাদী ঘোড়াকে বলা হয় حجر। যার বহুবচন احجر (আহজার) ও حجر (হুজর)।[৩] অনেকগুলো ঘোড়া বুঝাতে আরবীতে الخيل শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারো মতে এর একবচন خائل ও বহুবচন হল خيول।[৪] ঘোড়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Horse.[৫] ঘোড়ার উপাধি হল ابو شجاع (সাহসীর পিতা) ابو طالب (তালেবের পিতা) ابو مدرك, ابو المنجى, ابو المضمار, ابو مضاء ইত্যাদি[৬]।

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে ঘোড়ার বর্ণনা

আল-কুরআনের একাধিক স্থানে ঘোড়ার বিষয়ে আলোচনা এসেছে। যা থেকে বুঝা যায় ঘোড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি বিশেষ একটি নেয়ামত। আল্লাহ ঘোড়াকে দিয়েছেন মর্যাদা, শক্তি এবং তাঁর রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য সাহায্যকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:[৭]

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . "তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা জান না"। এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী বলেন "ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে উত্তম মালিকানায় রাখা, উত্তমরূপে যত্ন নেওয়া, এগুলোর প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া এবং অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে বাহনের কাজে ব্যবহার করা উচিত।[৮] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:[৯]

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ . "আর প্রস্তুত কর তাঁদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার, নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আল-কুরআনে ঘোড়াকে যুদ্ধাস্ত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ফলে মুসলমানগণ ঘোড়াকে ইসলামের শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। তাঁরা এটিকে উত্তম বাহন হিসেবে গ্রহণ করে। আর ঘোড়ার বিষয়ে তাঁরা অধিক যত্নশীল হয়। কুরআনে যেমন ঘোড়ার বিষয়ে বর্ণনা এসেছে তেমনি নবী (সা.) এর হাদীছেও ঘোড়ার শ্রেষ্ঠত্ব, ঘোড়ার বরকতময় হওয়া এবং ঘোড়ার প্রতি যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন:[১০] الخيل فى نواصيها الخير الى يوم القيامة ''কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" মহানবী (সা.) অন্য হাদীছে বলেন:[১১]

لاتقصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير.

বর্ণিত আছে যে, এক সময় ঘোড়া অন্যান্য প্রাণীর মত বনে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করত। আর মানুষেরা ইহার গোশত ভক্ষণ এবং তাঁর চামড়া দ্বারা উপকার লাভের জন্য এটিকে শিকার করত। তখনো সাওয়ারী হিসাবে ঘোড়ার ব্যবহার ছিলনা। অত:পর আল্লাহ তা'আলা মানুষের খেদমতে ঘোড়াকে অনুগত করে দিলেন। ফলে ইসমাঈল (আ.) এ ঘোড়ার উপর সওয়ার হন এবং নিজের অধীন করে রাখেন।[১২] ইবনুল কালবী বলেন:[১৩] وأول من ركب الخيل واتخذها اسماعيل ابن ابراهيم، وانما كانت وحشا لاتطاق حتى سخرت لإسماعيل " ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম (আ.) প্রথম ঘোড়ায় আরোহণ করেন। ইত:পূর্বে ঘোড়া বন্যপ্রাণী ছিল, এটিকে ইসমাঈল (আ.)-এর জন্য অনুগত করে দেয়া হয়।" আল্লাহর নবী (সা.) বলেন:[১৪]

اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل "তোমরা ঘোড়ার উপর আরোহন কর, কারণ এটি তোমাদের পিতা ইসমাইলের (আ.) ওয়ারিশ।"

আরবী কবিতায় ঘোড়ার বর্ণনা

আরবদের জীবনে ঘোড়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁরা ঘোড়াকে অত্যধিক ভালবাসত, এর যত্ন নিত এবং অন্যান্য সব প্রাণীর উপর প্রাধান্য দিত। জাহিলী আরবরা ঘোড়ার কুলজিধারা বা বংশের ইতিহাস সংরক্ষণ করতে গুরুত্বারোপ করত। তাঁদের ঘোড়ার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকত। যা পরবর্তীতে "নাসাবুল খায়ল" বা ঘোড়ার বংশ তালিকা নামে গ্রন্থও রচিত হয়।[১৫] আরবরা ঘোড়াকে তাঁদের বাহন এবং মাল পরিবহণের কাজে ব্যবহার করত। পরবর্তীতে ইসলামের বিজয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান হিসেবে এটি গৃহীত হয়। তৎকালীন আরবে ঘোড়ার মালিক কখনো ঘোড়াকে তাঁর স্ত্রী, সন্তান এমনকি নিজের উপরও প্রাধান্য দিত। সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকলেও ঘোড়াকে উপোষ রাখতনা। সে ঘোড়ার জন্য শীতকালে গরম পানি ও গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করত। ঠাণ্ডা থেকে রক্ষার জন্য ঘোড়ার শরীরে কাপড় পড়িয়ে দিত। তাকে

দামী খেজুর খাওয়াত।[১৬] ইসলাম আগমনের পরে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঘোড়ার সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, যুদ্ধের জন্য ঘোড়াকে প্রস্তুত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বর্ণিত হয়। আল্লাহর নবীর (সা.) হাদীছেও ঘোড়া সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। আল্লাহর নবী (সা.) ঘোড়াকে বরকতময় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সব পশুর মধ্যে যাকাত নির্ধারন করেন। কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে বলেন:[১৭] ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسه. "মুসলমানের উপর তাঁর দাস ও ঘোড়ার যাকাত ফরয নয়"। ফলে আরবরা ঘোড়ার প্রতি অধিক যত্নশীল হয়। আরবদের সমাজ জীবনের দর্পণ ছিল কবিতা। তাই কবিতায় তাঁদের ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা, যত্নশীল হওয়া, বিভিন্ন নামে নামকরণ করা এবং ঘোড়ার বংশ পরম্পরাসহ বিভিন্ন দিক ফুটে উঠে।[১৮]

ইসলামে ঘোড়াকে সম্মান প্রদর্শন করার মূল কারণ হল মুমিনদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে এটি বাহন হিসেবে কাজ করবে। এটি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে।[১৯] এ কারণে আল্লাহর নবী (সা.) ঘোড়াকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (ক) আল্লাহর ঘোড়া (খ) মানুষের ঘোড়া (গ) শয়তানের ঘোড়া। তন্মধ্যে আল্লাহর ঘোড়া হল সেই ঘোড়া যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহৃত হয় এবং যার উপর চড়ে আল্লাহর শত্রুদের হত্যা করা হয়।[২০] আরবরা তাঁদের ঘোড়ার বংশ পরম্পরা স্মরণ রাখত। তাঁরা তাঁদের ঘোড়াকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করত। বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) এর সাতটি ঘোড়া ছিল, প্রত্যেকটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হল 'السكب' যার উপর আরোহণ করে আল্লাহর নবী (সা.) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।[২১] জিবরাইল (আ.) এর ঘোড়ার নাম হল হায়যূম।[২২] হাসান ইবন আলী ইবন আবী তালিব (রা.) এর ঘোড়ার নাম ইয়াহমূম।[২৩] আবূ যার গিফারী (রা.) এর ঘোড়ার নাম আল আজদাল।[২৪] সাহাবী খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) এর ঘোড়ার নাম আল আইয়ার।[২৫] 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর ঘোড়ার নাম আল ওয়ারদ। এটি তামীম দারী নবী (সা.) কে হাদিয়া দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে নবী (সা.) এটি 'উমার (রা.) কে হাদিয়া দেন। 'উমার (রা.) এর উপর আরোহণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৬] এ সকল ঘোড়ার নাম ও বংশতালিকা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমকালীন কবিগণ তাঁদের কবিতায় নিজেদের ঘোড়ার নাম উল্লেখ করে কবিতা রচনা করতেন। যেমন কবি 'ইমরু'উল কায়সের ঘোড়ার নাম আল জাউন।[২৭] 'আনতারা ইবন শাদ্দাদ এর ঘোড়ার নাম আবজার।[২৮] উভয় কবিই তাঁদের ঘোড়ার নামে কাব্য রচনা করেন।

আরবী কবিতার সাথে ঘোড়ার সম্পর্ক

জাহিলী আরবদের জীবনে ঘোড়া অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় এক বস্তুর নাম। ঘোড়ার প্রতি তাঁদের ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। কখনো তাঁরা ঘোড়াকে তাঁদের জীবনের মতই ভালবাসত। আবার কখনো তাঁরা নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসত।[২৯] তাঁদের কাছে অশ্বারোহণ ছিল শক্তি প্রদর্শন ও বীরত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তাঁদের অনেকেই অশ্বারোহণে অধিক আগ্রহী ছিল। অশ্বারোহণ নিয়ে তাঁরা প্রতিযোগিতা করত। এতে যারা শক্তি ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে এগিয়ে থাকত তাঁরা আরবদের কাছে সম্মান ও সুখ্যাতির আসনে সমাসীন হত। প্রাচীন আরবী কবিদের দেওয়ানে অশ্বারোহণ বিষয়ে কবিতার ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়।[৩০] নিম্নোক্ত কতিপয় কারণে আরবদের কবিতায় ঘোড়ার গুরুত্ব ফুটে উঠে।

(ক) যুদ্ধ-বিগ্রহ

আরবদের মাঝে তুচ্ছ বিষয় নিয়েও যুদ্ধ লেগে থাকত। আর এসব যুদ্ধে শত্রুর মুকাবেলায় নিজেকে আত্মরক্ষা এবং প্রতিপক্ষকে দ্রুত পরাজিত করতে তাঁরা ঘোড়াকে অন্যতম বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। ঘোড়া ছিল তাঁদের কাছে সম্পদশালী ও দায়িত্ব প্রাপ্তির অন্যতম কারণ। ঘোড়ার মাধ্যমে তাঁরা যুদ্ধে বিজয়

লাভ করে সম্মান ও সম্পদ লাভে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে পরাজিত গোত্রের জন্য অভাব ও স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়ানোর কারণ হয়।[৩১] কবি সালামা ইবনুল জানদাল বলেন: [৩২]

كم من فقير بأذن الله قد جبرت * وذى غنى بوّأته دار محروب

"আল্লাহর ইচ্ছায় কত দরিদ্র ধনী হয়েছে। এবং কত ধনীকে করেছে দরিদ্র।"

(খ) শিকার করা

জাহিলী যুগের আরবদের অধিকাংশই শিকার পছন্দ করত। তাঁরা শিকারে ঘোড়াকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করত। শক্তিশালী ও দ্রুতগামী ঘোড়াকে নিজেদের জন্য উঁচু-নিচু পাহাড়ি ও সমতল সব স্থানে উত্তম বাহন হিসেবে গ্রহণ করত। এ কারণেই তৎকালীন প্রায় সব কবিদের কবিতায় শিকার ও তাতে ব্যবহৃত বাহন সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি 'ইমরু'উল কায়স বলেন: [৩৩]

وقد اغتدى والطير فى وكناتها * بمنجرد قيد الأوابد هيكل

"আমি অতি প্রত্যুষে শিকারে বের হই যখন পাখীরা তাঁদের নীড়ে অবস্থান করে। আমি শিকারে বের হই এমন ঘোড়ায় চড়ে যা হ্রস্ব পশম বিশিষ্ট, সুঠাম দেহী, দ্রুতগতি সম্পন্ন।"

(গ) পারস্পরিক গর্ব ও অহংকারের বস্তু

ঘোড়া আরবদের জীবনে তাঁদের আলোচনা ও মজলিসে পারস্পরিক গর্ব ও অহংকারের অন্যতম উপকরণ ছিল। উত্তম ঘোড়ার মালিক হওয়া তাঁদের কাছে ছিল সম্মানের বিষয়। ফলে তাঁদের কবিতায় অশ্বারোহণ, ঘোড়ার প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং এ বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে বিনিময় করার প্রসংগ উঠত। তাঁদের আলোচনার মজলিসে ঘোড়ার বিষয় সৌন্দর্য্য বর্ধন করত।[৩৪] কবি আলকামাহ বলেন: [৩৫]

وقد اقود أمام الحى سلهبة * يهدى بها نسب فى الحى معلوم

"আমি দীর্ঘদেহী ঘোড়ার উপর চড়ে গোত্রের লোকদের নেতৃত্ব দেই। যার দ্বারা উচ্চ বংশের প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে।" কবি আল মুরাক্কিশুল আসগার তাঁর ঘোড়ার বর্ণনায় বলেন: [৩৬]

على مثله اتى الندىّ مخايلا * واغمز سرّا أىّ أمرىّ أربح

"আমি আমার বাহনে আরোহণ করে মজলিসে গমন করি, এর দ্বারা আমি অন্যদের (গোত্রের) উপর সম্মানিত বোধ করি।"

কবি 'ইমরু'উল কায়স ও 'আনতারার কবিতায় ঘোড়া

(ক) ঘোড়ার দৈহিক কাঠামো

জাহিলী যুগের কবিগণ তাঁদের কবিতায় ঘোড়াকে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা কবিতায় ঘোড়ার দৈহিক কাঠামো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ক্ষিপ্রতা এবং গায়ের রং সহ বিভিন্ন কিছু বর্ণনা করেন। তাঁরা ঘোড়াকে কখনো থালা, নালা, লাঠি ও বর্শার সাথে তুলনা করেনছেন। আর এগুলো তাঁরা তাঁদের ঘোড়ার শক্তি, দৃঢ়তা ও শীর্নতা প্রকাশ করার জন্য করেন।[৩৭] কারণ ঘোড়া হলো তাঁদের অন্যতম বন্ধুসুলভ বাহন। কবি 'ইমরু'উল কায়স বলেন: [৩৮]

بعجلزة قد اتزر الجرى لحمها * كميت كأنها هراوة منوال

"আমি লালচে কালো রঙের ঘোড়ার মাধ্যমে পথ অতিক্রম করি, যা দ্রুতগামী তাঁতের লাঠির মত দ্রুত চলে।" কবি 'আনতারা তাঁর কবিতায় দীর্ঘদেহী ও হ্রস্ব পশম বিশিষ্ট ঘোড়ার বর্ণনা করে বলেন: [৩৯]

والخيل تقتحم الخبار عوابسا * من بين شيظمة واخر شيظم

"যখন শত্রুপক্ষের দীর্ঘদেহী ঘোটকী এবং হ্রস্ব পশম বিশিষ্ট ঘোটকগুলো নরম মাটিতে আক্রমণ চালাতে গিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল।"

জাহিলী কবিগণ তাঁদের কবিতায় প্রিয় বাহন ঘোড়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তাঁরা এর কিছুই বাদ দেয়নি। অনেক কবি তাঁদের ঘোড়াকে পঙ্গপাল, ঈগল, বাজপাখি এবং চিলের সাথে তুলনা করেন।[৪০] যে সকল জাহিলী কবি ঘোড়ার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'ইমরু'উল কায়স অন্যতম। তিনি প্রথম কবি যিনি ঘোড়াকে হরিণ, নেকড়ে ও উটপাখির সাথে তুলনা করেনন, পরবর্তী কবিগণ এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেন।[৪১] তিনি তাঁর ঘোড়ার দৈহিক গঠণ এবং শক্তির ব্যাপারে বলেন: [৪২]

وقد اغتدى والطير فى وكناتها * بمنجرد قيد الأوابد هيكل

له أيطلا ظبى وساقا نعامة * وارخاء سرحان وتقريب تتفل

"অতি প্রত্যুষে যখন পাখীরা বাসায় অবস্থান করে আমি আমার হ্রস্ব পশম বিশিষ্ট সুঠাম দেহী, দ্রুতগতি সম্পন্ন শিকারী অশ্ব নিয়ে বের হয়ে পড়ি। তাঁর পাঁজর হরিণের মতো, পা উট পাখীর মতো, গতি নেকড়ে বাঘের মতো, আর দৌড় খেকশিয়ালের মতো।"

(খ) ঘোড়ার ক্ষিপ্রতা

ঘোড়া একটি দ্রুতগামী প্রাণী। এটি তাঁর গন্তব্যে ক্ষিপ্রতার সাথে এগিয়ে যায়। ফলে অশ্বারোহী আরবরা দ্রুতগামী ঘোড়াকে তাঁদের বাহন গ্রহণ করে। তাঁরা দ্রুতগতির বর্ণনায় ঘোড়াকে বিভিন্ন প্রাণীর সাথে তুলনা করেন।[৪৩] ঘোড়ার ক্ষিক্রতার জন্য কখনো তাঁরা এটিকে পাখি, হরিণ, নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, পানির ঢল, বালতি, আগুন ও তীরের সাথে তুলনা করেন। কবি 'ইমরু'উল কায়স বলেন:[৪৪]

مكر مفر مقبل مدبر معا * كجلمود صخر حطه السيل من عل

على الذبل جياش كأن اهتزامه * اذا جاش فيه حميه غلى مرجل

مسح اذ ما السابحات على الونى * اثرن الغبار بالكديد المركل

درير كخذروف الوليد امره * تتابع كفيه بخيط موصل

"সেই অশ্ব আক্রমণের সময় একই সঙ্গে ডানে, বামে, অগ্রে, পশ্চাদে তীব্রগতিতে ধাবিত হয়, মনে হয় যেন কোন প্রস্তর খণ্ড কোন উচ্চস্থান হতে স্রোতের বেগে নীচে ছিটকে পড়ছে।"

"তার (দৈহিক) ক্লান্তি সত্ত্বেও সে তীব্র বেগে দৌঁড়ায়, যখন সে তাঁর শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁর শরীরের উত্তাপ ডেকচীর মধ্যে ফুটন্ত পানির উত্তাপের মত হয়ে যায়।"

"এটি একটি দ্রুতগতি বিশিষ্ট অশ্ব, যখন অন্য অশ্বদল দৌঁড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে তাঁর খুরের আঘাতে ধুলো উড়িয়ে তাঁদের পদদলিত করে।"

"সে কোন বালকের লাটিমের মত ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন, যাকে একটি পাকানো সুতার সাহায্যে ত্বরিতগতি হস্ত দ্বারা ঘোরানো হয়েছে।"

কবি 'আনতারা তাঁর মু'আল্লাকায় ঘোড়ার বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। কারণ তাঁর ঘোড়াটি ছিল যুদ্ধে তাঁর জন্য উত্তম বাহন। তাঁর ঘোড়া ছিল দ্রুতগতিসম্পন্ন ও সুঠাম দেহী যার দ্বারা তিনি শত্রুপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়তেন। কবি বলেন: [৪৫]

هلا سألت الخيل يا إبنة مالك * ان كنت جاهلة بما لم تعلمى

إذ لا ازال على رحال سابح * نهد تعاوره الكماة مكلم

"হে মালিক নন্দিনী! তুমি যদি আমার (বীরত্ব) সম্বন্ধে অজ্ঞ হও তাহলে তুমি যা অবগত নও সেই বিষয়ে অশ্বারোহী সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করতে পার।"

"কারণ যখন বীর সেনাগণ আমার দ্রুতগতি সম্পন্ন, সুঠাম দেহী ও আহত অশ্বকে বারবার আঘাত হানে তখনও আমি (নির্ভয়ে) অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন থাকি।"

(গ) ঘোড়ার রঙ

জাহিলী যুগের কবিগণ তাঁদের কবিতায় ঘোড়ার রঙ এর বর্ণনা দিতেও কার্পণ্য করেননি। তাঁরা ঘোড়ার ত্বকের নির্মলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতার বর্ণনা তুলে ধরেন। তাঁদের কাছে সুঠাম দেহী ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট ঘোড়া অধিক প্রিয়।[৪৬] আদহাম (ادهم) গাঢ় কালো রঙ এর ঘোড়াকে বলে। এবং কালো রঙ এর মধ্যে লালের প্রাধান্য হলে তাকে বলা হয় কুমাইত (كميت)।[৪৭] আর এ দুটি শব্দই কবি 'আনতারা ও 'ইমরু'উল কায়সের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। কবি 'ইমরু'উল কায়স বলেন: [৪৮]

كميت يزل اللبد عن حال متنه * كما زلت الصفواء بالمتنزل

"সে একটি রক্তবর্ণের অশ্ব, যার পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর জিন পিছলে পড়ে, ঠিক বারিধারায় গড়িয়ে পড়া মসৃণ উপল খণ্ডের মত।" কবি 'আনতারা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর কৃষ্ণকায় ঘোড়ার বর্ণনায় বলেন: [৪৯]

يدعون عنتر والرماح كأنها * اشطان بئر فى لبان الأدهم

"তারা ডাকছিল 'আনতারা (বলে), আর তখন আমার কৃষ্ণকায় অশ্বের দেহে বর্শাগুলো (বিদ্ধ হয়ে) কূপের পানি উত্তোলন করা রশির মত ঝুলছিল।" ادهم অর্থ গাঢ় কালো। কবি 'আনতারার ঘোড়ার রঙ ছিল গাঢ় কালো রঙের।

এ যুগের কবিগণ ঘোড়ার দেহের এমন কোন অঙ্গ নেই যা সম্পর্কে তাঁরা আলোকপাত করেননি। ঘোড়ার চেহারায় কম গোস্ত বিশিষ্ট হওয়া তাঁদের কাছে প্রশংসনীয় ছিল। ঘোড়ার চোখের তীক্ষ্ণতা ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া এটি অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত করে। ঘোড়ার দেহের গঠন ও আকৃতির বর্ণনা আরবী কবিতায় বিদ্যমান। কবিগণ দীর্ঘ ও উচ্চ দেহের ঘোড়াকে অন্য ঘোড়ার উপর প্রাধান্য দিতেন।[৫০]

ঘোড়ার বর্ণনার শৈল্পিক মূল্যায়ন

(ক) উপমা (التشبيه)

তাশবীহ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি আরবী অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম শাখা। এটি একটি চমৎকার ও উন্নত মানের বাকরীতি। এর মাধ্যমে বক্তব্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বক্তব্য অধিক স্পষ্ট হয় এবং বাক্য সৌন্দর্যপূর্ণ হয়। আরবী কবিতায় এর সর্বাধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সাথে কোন গুণের দিক দিয়ে, কোন উদ্দেশ্যে তুলনা করাকে তাশবীহ (التشبيه) বলে।[৫১] মনীষীগণ তাশবীহ এর সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে প্রদান করেছেন।

আরব উপদ্বীপে একজন আরব তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাঁর জন্য শক্তিশালী ও বৃহৎ আকারের ঘোড়াকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। ফলে জাহিলী যুগের কবিগণ তাঁদের ঘোড়াকে কখনো বড় লাঠি, কখনো রাখালের হাতের লাঠি আবার কখনো বিরাট উঁচু অট্টালিকার সাথে তুলনা করেনছেন। কখনো তাঁরা

ঘোড়াকে শক্তিশালী বন্যগরুর সাথে তুলনা করেনছেন। কবি 'আনতারা তাঁর বাহনকে বাতাসের সাথে তুলনা করেন: [৫২]

من كل أدهم كالرياح إذا جرى * او أشهب عالى المطا او اشقر

উক্ত কবিতায় কবি 'আনতারা শক্তি ও দ্রুতগামিতায় তাঁর ঘোড়াকে বাতাসের সাথে তুলনা করেনন। কারণ বাতাস যেভাবে ভারী মেঘমালাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায় সেভাবে ঘোড়া ও তাঁর মালিক ও তাঁর কওমের লোকদের জন্য সুনাম ও সুখ্যাতি বয়ে নিয়ে আসে। কবি 'ইমরু'উল কায়স তাঁর ঘোড়াকে বড় লাঠির সাথে তুলনা করেন বলেন: [৫৩]

بعجلزة قد اتزر الجرى لحمها * كميت كأنها هراوة منوال

উক্ত কবিতায় 'ইমরু'উল কায়স বলেন, তিনি লালচে কালো রঙের ঘোড়াকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন যে কিনা দ্রুতগামী তাঁতের লাঠির মত। এখানে কবি তাঁর ঘোড়াকে কাপড় বোনার যন্ত্রের লাঠির সাথে তুলনা করেনছেন। কবি তাঁর ঘোড়ার দুইটি গুণ তুলে ধরেছেন একটি দ্রুতগামী অন্যটি লাঠির মত শক্তিশালী, কারণ লাঠি শক্ত ও মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়।

(খ) রূপকালঙ্কার (الاستعارة)

الاستعارة আরবী অলংকার বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন শব্দকে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে একটি তুলনা আরোপ করা হয়।[৫৪] সাইয়েদ আহমদ আল হাশিমী বলেন:[৫৫]

الاستعارة: هى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة صارفة عن ارادة المعنى الاصلى.

মোট কথা: الاستعارة এমন একটি শব্দ যার প্রকৃত অর্থ ও ব্যবহৃত অর্থের মধ্যে সর্বদা এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বাধা প্রদানকারী কারণে তা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য এখানে مستعار له ও مستعار منه এর যে কোন একটি উল্লেখ থাকে। অবশিষ্ট সবই উহ্য থাকে। কবি 'ইমরু'উল কায়স বলেন:[৫৬]

كأن على المتنين منه اذا انتحى * مداك عروس اوصلاية حنظل

"(ঘোড়াটি) গৃহের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর পৃষ্ঠদেশ দেখে মনে হয় কনের জন্য সুগন্ধি চূর্ণ করার পাথরের (পাটা) মত অথবা মসলা (হানজাল ফল) পেষা শিলের মত।"

উল্লিখিত কবিতায় কবি 'ইমরু'উল কায়স তাঁর ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশকে উজ্জ্বলতা ও পিচ্ছিলতার ক্ষেত্রে মসৃণ ও পরিস্কার পাটার সাথে তুলনা করেনন। অথবা ঘোড়ার পৃষ্ঠের মসৃণতা লেবু জাতীয় হানযাল ফল যার দ্বারা তেল বের করা হয় তাঁর মত। আর ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশের মসৃণতা ও পিচ্ছিলতা ঘোড়ার সুঠাম দেহ, শক্তিশালী ও সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহণ করে।

(গ) পরোক্ষ উল্লেখ (الكناية)

আরবী অলংকার বিজ্ঞানের এক অন্যতম শাখা হল الكناية। আর الكناية অর্থ ইংগিত ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা।[৫৭] পরিভাষায় الكناية ঐ শব্দকে বলা হয় যার আসল অর্থ (معنى حقيقى) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معنى لازم) গ্রহণ করা হয়। তবে তাঁর আসল অর্থ গ্রহণ করাও বৈধ।[৫৮] আরবী কবিতায় الكناية এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর الكناية আরবী বালাগাতের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যেমন কবি 'আনতারা তাঁর কবিতায় الخيل (ঘোড়া) শব্দ ব্যবহার করে الفرسان অশ্বারোহীর প্রতি ইংগিত করেছেন। কবি বলেন: [৫৯]

هلا سألت الخيل يا إبنة مالك * إن كنت جاهلة بما لم تعلمى

"হে মালিক নন্দিনী! তুমি যদি আমার (বীরত্ব) সম্বন্ধে অজ্ঞ হও তাহলে তুমি যা অবগত নও সেই বিষয়ে অশ্বারোহী সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করতে পার।"

উল্লিখিত কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সী মালিক কন্যা চাচাত বোন আবলাকে সম্বোধন করে বলেন। হে আবলা তুমি যদি যুদ্ধের ময়দানে আমার সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে না জান তাহলে (ঘোড়া) কে জিজ্ঞাসা কর। এখানে কবি ঘোড়ার দ্বারা ঘোড়ার আরোহীকে ইংগিত করেছেন। তা ছাড়া ঘোড়াকে তো কিছু জিজ্ঞাস করা যায় না। এখানে الخيل উল্লেখ করে অশ্বারোহীর প্রতি ইংগিত করা হল অলংকার শাস্ত্রের ভাষায় কেনায়া (كناية)।

উপসংহার:

জাহিলী যুগের প্রায় সব কবিই তাঁদের কবিতায় নিজেদের বাহন, প্রেয়সী ও বাস্তুভিটার বর্ণনা চমৎকার ভাবে আলোকপাত করেন। তাঁরা বাহনের বর্ণনায় ঘোড়া, উট ও গাধার আলোচনায় পাণ্ডিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁরা সুন্দর উপমা-উদাহরণ স্থাপনে কৃপণতা করেননি। ঘোড়ার বর্ণনায় কবি 'ইমরু'উল কায়স ও 'আনতারা অন্য সব কবির উপর বিশেষত্ব লাভ করেন। ঘোড়া সম্পর্কে এ দুজন কবির কবিতা প্রশংসার দাবিদার। তাঁরা ঘোড়ার দৈহিক গঠন বলতে এর অঙ্গ-প্রতঙ্গসহ যাবতীয় কিছু বর্ণনা করেন। তাঁরা ঘোড়াকে লাঠি ও বর্শার সাথে তুলনা করেন। তাঁরা তাঁদের ঘোড়ার শক্তি, দৃঢ়তা ও শীর্নতা প্রকাশ করতে অনেক কিছুর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করেন। ঘোড়ার দ্রুতগতির বর্ণনায় তাঁরা কখনো হরিণ, পাখি, নেকড়ে ও খেঁকশিয়ালের সাথে এটিকে তুলনা করেন। তাঁরা ঘোড়ার রঙের বর্ণনায় বিশেষ করে লালচে কালো ও গাঢ় কালো রঙের উল্লেখ করেন। তাঁদের বর্ণনায় সাহিত্যের রস ও অলংকার বিদ্যমান।

তথ্যনির্দেশ

১ আয যুবাইদী, *তাজুল 'আরুস*, ১৬শ খণ্ড (কুয়েত: মাতবা'আতু হুকুমাতিল কুয়েত, ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৩২৩. ইবন মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুসাদির, তা. বি.), পৃ. ১৫৯।

২ আল জাওহারী, *আসসিহাহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলমি লিল মালাইন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯খ্রি), পৃ. ৯৫৭; লুয়ইস মা'লূফ, *আল মুনজিদ ফিল লুগাহ* (বৈরুত: আল মাতবা'আতুল কালাসিলিকিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৫৭৫; আল ফাইরুযাবাদী, *আল কামূসুল মুহীত* (বৈরুত: মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪২৬ হি/ ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৫৬২।

৩ শাকের হাদী শাকের, *আল হায়ওয়ান ফিল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবাতুন নাহযাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ২৮; সম্পদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪শ খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ৭১৬-৭১৭।

৪ সানাদ ইবন মুতলাক আস সাবিঈ, *আল খায়ল মাকূদুন ফী নাওয়াসীহাল খায়র* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবিকান, ১৪২৪হি./২০০৪খ্রি.) পৃ. ১৩। দ্রুতগামী উন্নত জাতের ঘোড়াকে العرب বলা হয়। যে ঘোড়ার মা-বাবা আরবীয় তাকে الجواد বলা হয়। আর এ জাতীয় ঘোড়া সম্মানিত, শক্তিশালী, অধিক ওজন বহনকারী এবং বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারনকারী। যে ঘোড়ার মা-বাবা অনারব বংশোদ্ভূত তাকে البرزون বলা হয়। যে ঘোড়ার বাবা আরবী এবং মা অনারবী তাকে الهجين বলা হয়। (দ্র: *আল খায়ল মাকূদুন ফী নাওয়াসিহাল খায়র*, পৃ. ১৪)

৫ HANS WEHR, *A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC* (LONDON: MACDONALD & EVANS LTD, 1980), P. 704.

৬ কামালুদ্দীন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়ওয়ান*, ৩য় খণ্ড (দামিশক: দারুল বাশাইর, ১৪২৬হি./২০০৫খ্রি.), পৃ. ৩৭৩।

---

[৭] সূরাহ আন নাহল, আয়াত: ৮

[৮] ইমাম আল কুরতুবী, *আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন*, ১২শ খণ্ড (বৈরুত: মুআসাসিসাতুর রিসালাহ, ১৪২৭হি./ ২০০৬খ্রি.), পৃ. ২৮৬।

[৯] সূরাহ আল আনফাল, আয়াত: ৬০; উল্লিখিত আয়াত দুটি ব্যতিত আরো অনেক আয়াতে ঘোড়া সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। যথা (১) সূরাহ আল ইমরান, আয়াত: ১৪; زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ . (মানবকুলকে মোহগ্রস্থ করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আর্কষনীয় বস্তু সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।) (২) সূরাহ আল ইসরা, আয়াত: ৬৪; (৩) সূরাহ্ আল হাশর, আয়াত: ৬; (৪) সূরাহ আস সোয়াদ, আয়াত: ৩০-৩৩; (৫) সূরাহ আল 'আদিয়াত, আয়াত: ১-৩.

[১০] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৮৪৯।

[১১] সুলায়মান বিন আশআছ আল আসদী আস সিজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ* (রিয়াদ: দারুল হাযারাহ, ১৪৩৬হি./ ২০১৫খ্রি.), কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৩২৫।

[১২] *আল খায়লু মাকূদুন ফী নাওয়াসিহাল খায়র*, পৃ. ৩৯।

[১৩] ইবনুল কালবী, *নাসাবুল খায়ল ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়াল ইসলামি ওয়া আখবারুহা* (বাগদাদ: কুল্লিয়াতুল আদাব, ১৯৮৫খ্রি./১৪০৬হি.), পৃ. ২৪।

[১৪] আল্লামা আবুল ফরজ নূরুদ্দীন আল হালবী আশ শাফিঈ, *ইনসানুল উয়ূন ফী সীরাতিল আমীনিল মামূন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৩০।

[১৫] ড. নূরী হামুদী আল কায়সী, *আত তাবী'আতু ফিশ শি'রিল জাহিলী* (বৈরুত: আশ শারিকা আল মুত্তাহিদাহ লিত তাওযী, ১৯৭০ খ্রি./১৩৯০হি.), পৃ. ১০৬; আল আসওয়াদ আল গুনদিজানী, *আসমা'উ খায়লিল 'আরাব ওয়া আনসাবিহা* (দিমাশক: মাকতাবাতুল গুনদিজাল তা: বি:), পৃ. ১৫-১৬.

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮; *আল খায়লু মাকূদুন ফী নাওয়াসিহাল খায়র*, পৃ. ১৬-১৭।

[১৭] ইবনুল আছীর, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল*, ৪র্থ খণ্ড (মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১৩৯০হি./ ১৯৭০খ্রি.), পৃ. ৬২৩ হাদীছ নং ২৭০৮।

[১৮] ইবনুল কালবী, *নাসাবুল খায়ল*, পৃ. ২১-২২; *আল খায়লু মা'কূদুন ফী নাওয়াসীহাল খায়র*, পৃ. ২৭।

[১৯] *আসমা'উ খায়লিল 'আরাব ওয়া আনসাবুহা*, পৃ. ২২-২৩।

[২০] হাফেজ আল মানযিরী, *আত তারগীব ওয়াত তারহীব ফিল হাদীছিস শরীফ*, ২য় খণ্ড (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১৩৮৮হি/১৯৬৮খ্রি.), পৃ. ২৬১।

[২১] *আসমা'উ খায়লিল 'আরাব ওয়া আনসাবুহা*, পৃ. ১২৭; *হায়াতুল হায়ওয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১।

[২২] *আসমা'উ খায়লিল 'আরাব ওয়া আনসাবুহা*, পৃ. ৭১।

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০।

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২; *হায়াতুল হায়ওয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০১।

[২৭] *আসমা'উ খায়লিল ওয়া আনসাবুহা*, পৃ. ৬৫; *নাসাবুল খায়ল*, পৃ. ৫৩।

[২৮] *আসমা'উ খায়লিল 'আরাব ওয়া আনসাবুহা*, পৃ. ২৯; *নাসাবুল খায়ল*, পৃ. ৪৬।

[২৯] ইবন হুযাইল, *হিলয়াতুল ফুরসান ওয়া শি'আরুশ শুজ'আন* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৯খ্রি.), পৃ. ৪৩।

[৩০] নূরুদ্দীন আরামী, *সুরাতুল খায়ল ফিশশি'রিল জাহিলি*, দিওয়ানু 'আনতারাতুবনু শাদ্দাদ (মাস্টারস ডিগ্রী সনদ প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত, তত্ত্বাবধানঃ হায়াত মা'আশ, বিসকারাহ মুহাম্মদ খায়দার বিশ্ববিদ্যালয়, আলজেরিয়া। ২০১২-২০১৩খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[৩১] যায়দ ইবন মুহাম্মদ ইবন গানিম আল জুহানী, *আস সূরাতুল ফান্নিয়্যাহ ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত*, ১ম খণ্ড (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ মাকতাবাতু মালিক ফাহাদ আল ওয়াতানিয়্যাহ ১৪২৫হি.), পৃ. ৩৬৩।

[৩২] সালামা ইবন জানদাল, *আদদীওয়ান* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭খ্রি./১৪০৭হি.), পৃ. ১০৫।

[৩৩] 'ইমরু'উল কায়স, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৩২।

[৩৪] হাসান মুহাম্মাদ আননাসী, *আল খায়ল ফিল আশ'আরিল 'আরাব* (রিয়াদঃ মাকতাবতুল মালিক আব্দুল আযীয আল আম্মাহ, ১৪১৬হি.), পৃ. ১৮।

[৩৫] *আস সূরাতুল ফান্নিয়্যাহ ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; সাইয়েদ আহমদ সাকার, *শারহু দীওয়ানি ও আল কামাহ আল ফাহল* (কায়রোঃ আল মাতবা'আতুল মাহমুদিয়্যাহ, ১৯৩৫ খ্রি.), পৃ. ৭০।

[৩৬] *আস সূরাতুল ফান্নিয়্যাহ ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; *দীওয়ানুল মুরাক্কিশাইন* (বৈরুতঃ দারুসাদির, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৮৯।

[৩৭] *আততাবী'আতু ফিশ শি'রিল জাহিলী*, পৃ. ১১১; *আস সূরাতুল ফান্নিয়্যাহ ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত*, পৃ. ৩৬৫।

[৩৮] 'ইমরু'উল কায়স, *আদদীওয়ান*, পৃ. ১৩৯।

[৩৯] 'আনতারা ইবন সাদ্দাদ, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৬৮; আযযাওযানী, *শারহুল মুআল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১৬৭।

[৪০] *আততাবী'আতু ফিশশি'রিল জাহিলী*, পৃ. ১১৪।

[৪১] ইবনে আবদ রাব্বিহী, *আল 'ইকদুল ফারীদ*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৪২।

[৪২] 'ইমরু'উল কায়স, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৫৩-৫৯। আশশানকীতী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার* পৃ. ৩৫-৩৬। আয যাওযানী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল সাব'* পৃ. ৩২-৩৬।

[৪৩] *আসসূরাতুল ফান্নিয়্যাহ ফিল মুফাদ্দালিয়াত*, পৃ. ৩৬৯; *আত তাবীআতু ফিশশি'রিল জাহিলী*, পৃ. ১১৩।

[৪৪] 'ইমরু'উল কায়স, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৫৪-৫৬; আশ শানকীতী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার* পৃ. ৩৫-৩৬।

[৪৫] 'আনতারা ইবন শাদ্দাদ, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৬৩; আশ শানকীতী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার*, পৃ. ১৫৯।

[৪৬] *আততাবী'আতু ফিশশি'রিল 'আরাবী*, পৃ. ১১৪

[৪৭] *হিলয়াতুল ফুরসান ও শি'আরুশ শুজ'আন*, পৃ. ৮৪।

[৪৮] 'ইমরু'উল কায়স, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৫৫; আশশানকীতী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার*, পৃ. ৩৫।

[৪৯] 'আনতারা ইবন শাদ্দাদ, *আদদীওয়ান*, পৃ. ৬৭।

[৫০] *মাওসূআতুস সূরাতিল ফান্নিইয়্যা ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত*, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯; *আততাবী'আতু ফিশশি'রিল জাহিলী*, পৃ. ১০৮।

[৫১] প্রফেসর ড. নকিবুল্লাহ; *আরবী অলংকার বিজ্ঞান* (রাজশাহী: ২০১৪ খ্রী.), পৃ. ১৫৯; শায়খ নাসীফ আল ইয়াযিজী আল লুবনানী বলেন: التشبيه هو الدلالة على مشاركة امر لأحد فى معنى على غير استعارة ولا تجريد" استعارة ও تجريد ছাড়া কোন একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়কে একি অর্থে তুলনা করাকে তাশবীহ বলে।" দ্র: শায়খ নাসীফ আল ইয়াযিহী আল লুবনানী, মাজমূউল আদাব ফী ফুনুনিল 'আরাব (বৈরুত: আল মাতবা'আতুল উম্মাহ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১০০; সাইয়েদ আহমদ আল হাশিমী বলেন: التشبيه عند علماء البيان مشاركة امر فى معنى بأدوات معلومات, দ্র: সাইয়েদ আহমদ আল হাশিমী, জাওয়াহিরুল বালাগাহ ফিল মাআনী ওয়াল বায়ান ওয়াল বাদী (কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২০৬।

[৫২] 'আনতারা ইবন শাদ্দাদ, *আদদীওয়ান*, পৃ. ১১৪।

[৫৩] 'ইমরু'উল কায়স, আদদীওয়ান, পৃ. ১৩৯।

[৫৪] অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *আরবী অলংকার ও ছন্দপ্রকরণ* (কলিকাতা: ১৭, বানী মনযিল, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৬।

[৫৫] *জাওয়াহিরুল বালাগাহ*, পৃ. ১৮৯; উদাহরণ: মহান আল্লাহর বাণী: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور (اى من الضلالة الى الهدى) দ্র: সূরাহ ইবরাহীম, আয়াত: ১ (আমি আপনার প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকেতথা– গোমরাহী হতে হেদায়াতের দিকে) বের করে নিয়ে আসেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমায় ظلمات ও ضلالة এবং نور ও هداية এর মধ্যে تشبيه এর সম্পর্ক রয়েছে। এবং ظلمات ও نور প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন অর্থে (পথভ্রষ্টতা ও হেদায়েত) ব্যবহৃত হয়েছে। আর প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বাধা প্রদানকারী قرينةহলো বাক্যের প্রথম অংশ كتاب انزلناه। কারণ কেউ মানুষকে কিতাব দ্বারা অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসেনা। বরং পথভ্রষ্টতা হতে হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসে। দ্র: সাইয়েদ আব্দুল আহাদ আল কাসিমী, *দুরুসুল বালাগাহ উর্দূ ব্যাখ্যাসহ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, তা.বি.), পৃ. ১৫০।

[৫৬] আযযাওযানী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল সাব'* (কায়রো: দারুল গাদদ আল জাদীদ, ২০০৬খ্রি./১৪২৭হি.), পৃ. ৩৭।

[৫৭] *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৮০২; আব্দুল হাফিয বিলয়াবী, *মিসবাহুল লুগাত* (দিল্লী: মাকতাবাতু বুরহান, ১৯৮৬), পৃ. ৭৫৪।

[৫৮] الكناية لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه দ্র: *মাজমা'উল আদাব*, পৃ. ১৩৭; সাইয়েদ আহমদ আল হাশিমী বলেন: الكناية لفظ اطلق واريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من ارادة المعنى الاصلى দ্র: *জাওয়াহিরুল বালাগাহ*, পৃ. ২৭৩।

[৫৯] আয যাওযানী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'*, পৃ. ১৬০।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

আরবী আত্মজীবনী সাহিত্য: উৎপত্তি ও বিকাশ

মোঃ কামারুজ্জামান*

Abstract : In Arabic prose literary field, Biographical Literature is one of the impeccable additions that entertain the readers entirely. The preprimary and present conditions of Arabic Biographical Literature have flourished as a ground work pertinently. Different aspects of Arabic literature have been discussed with much importance but the compendium of Biographical Literature has supplied less foraging to expatiate. This is an important branch of literature though it has not extended like poetry or dramaturgy. There has been an attempt to discuss about the origin and development of Arabic Biographical Literature. In this regard, some distinguished literatures and their literary works have also been discussed here. References have been used properly. It is hoped that, this article will add a new dimension to Arabic gens de letters.

ভূমিকা

ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর নিজ জীবনের ধারাবাহিক লিখিত বর্ণনাকে আত্মজীবনী (السيرة الذاتية) বলে। ছোট গল্প, রম্য সাহিত্য, নাটক ও উপন্যাসের ন্যায় আত্মজীবনী সাহিত্যও আজ পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত। যদিও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় আত্মজীবনী (السيرة الذاتية) খুব একটি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি এবং কবিতা বা নাট্যশিল্পের মত এটি ততটা প্রসারিতও হয়নি, তবুও এটি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় ব্যাপকতা লাভ না করার অন্যতম কারণ এটি সাহিত্যের নতুন একটি শাখা। এ পরিভাষাটির বয়স মাত্র দুই শতাব্দীর মত। আরবী সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও এর প্রচলন লক্ষণীয়। তবে উনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় কোন আত্মজীবনী লেখা হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতিকবিতায় ভণিতার মাধ্যমে আত্মপরিচয় তুলে ধরার একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কাহিনী কাব্যে আত্মপরিচয় অনেকটা বিস্তৃত আকারে লেখা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল এরূপ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক ধারায় আত্মপরিচয় বা আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় এগুলো তার মধ্যে পড়ে না। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিকদের অনেকেই আত্মজীবনী সাহিত্য রচনা করেছেন। যারা এ মহৎ কর্মে মনোনিবেশ করেছেন তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ লেখক হচ্ছেন মিশরের প্রতিভাবান ও অন্ধ সাহিত্যিক ড. ত্বহা হুসাইন। তিনি তাঁর লেখা আত্মজীবনীগ্রন্থ 'আল আইয়্যাম' এর মাধ্যমে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পরিপূর্ণ সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি মিশরের অন্য একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আহমাদ আমীন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক حياتي (হায়াতী) এর মধ্যে আধুনিক রীতিনীতি অবলম্বন করে তাঁর জীবনের সমস্ত বিষয়ের চমকপ্রদ বর্ণনা পেশ করেন।

আত্মজীবনী (السيرة الذاتية) সাহিত্যের পরিচয়

আত্মজীবনীর আরবী প্রতিশব্দ السيرة الذاتية। এটি যৌগিক শব্দ। প্রথমটি السيرة অন্যটি الذاتية। السيرةএর আভিধানিক অর্থ السنة والطريقة (অর্থাৎ-রীতি, নীতি, পদ্ধতি)।[১]

আর পরিভাষায়-

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

هى تدل على تاريخ الحياة للأفراد.[২]

"ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস বর্ণনাকে আত্মজীবনী বলে।"

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرَتَهَا الأُولَى۝[৩]

"তিনি বললেন: সেটি ধর এবং ভয় করোনা, আমি সেটিকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিব।"

এছাড়া 'আব্দুল্লাহ হাক্বীল আত্মজীবনী সাহিত্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

انهانوع من أنواع الأدب، وانها تتميز بأن كاتبها يكشف عن خبايا نفسه ويعرض حياته وتربيته وأساليب تعامله، وما اعترى حياته من تجارب وخبرات وذكريات وممارسات وما واجهه من متاعب وما صادفه من هواقف طريقة مثيرة، وكذا توضيح الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التى لازمت مسيرة عمله.[8]

"আত্মজীবনী এক প্রকার সাহিত্য। এর বৈশিষ্ট্য হলো- এর লেখক নিজের জীবনের না বলা বিষয়কে মানুষের সামনে প্রকাশ করেন। তাঁর জীবন-যাপন, লালন-পালন, আচরণ পদ্ধতি, জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, গচ্ছিত স্মৃতি, বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন এবং জীবনে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার বিবরণ দেন। সাথে সাথে জীবনে সংঘটিত আনন্দদায়ক বিষয়াবলিকেও উল্লেখ করেন। আর যে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণ তাঁর চলার পথে মিশে ছিল সেগুলো প্রকাশ করেন আত্মজীবনীর মাধ্যমে।"

আরবরা প্রথমে السيرة শব্দটি শুধু রাসূল (সা.)এর জীবন-চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত। পরে এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। তারা রাসূল (সা.) ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তির জীবনীতে السيرة শব্দটির ব্যবহার করে। যেমন سيرة صلاح الدين الأيوبي (সালাহ উদ্দীন আল-আইয়ুবীর সীরাত) এবং سيرة أحمد بن طولون (আহমাদ ইবন তুলুন এর সীরাত)। রাসূল (সা.) এর উপর সীরাত রচনার পরে সর্বপ্রথম জীবনী রচনা করেন عوانة الكلبى ('আওয়ানাহ আল-কালবী)। ইবনে নাদীম তাঁর লিখিত الفهر ست এ سيرة معاوية وبنى أمية শিরোনামে সেটি উল্লেখ করেছেন।[৫] তবে এ ধরণের সীরাতকে السيرة الغريبة বা السيرة غير الذاتية বা Biography বলে।[৬]

উপরে বর্ণিত السيرة غير الذاتية এটি আমাদেরকে অন্য এক সীরাতের দিকে ইঙ্গিত দেয়। সেটি হল السيرة الذاتية বা Autobiography বা আত্মজীবনী। নামের পার্থক্যের সাথে সাথে উভয় প্রকার সীরাতের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও কেউ কেউ বলেছেন উদ্দেশ্য, গঠন ও বিষয়বস্তুর দিকে থেকে উভয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। শুধু পার্থক্য এটুকু যে, السيرة الذاتية জীবন-চরিত লেখা হয় উত্তম পুরুষের ব্যবহারে আর আত্মজীবনী লেখা হয় নাম পুরুষের ব্যবহারে। তবে বাস্তবে দেখা যায় কিছু কিছু আত্মজীবনী নামপুরুষের ব্যবহারে লেখা হয়েছে। যেমন- ত্বহা হুসাইনের প্রসিদ্ধ আত্মজীবনী আল-আইয়াম। এজন্য আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচকগণ বলেছেন, উভয় সীরাত হুবহু এক নয় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এ কারণে তারা শাব্দিকভাবে উভয়কে আলাদা নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ السيرة غير الذاتية বা Biography এবং السيرة

السيرة الذاتية বা Autobiography বা আত্মজীবনী নামে অভিহিত করে।[৭] নিম্নে উভয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।

জীবনী সাহিত্য ও আত্মজীবনী সাহিত্যের পার্থক্য

السيرة غير الذاتية এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে বলা হয়েছে-

البحث عن الحقيقة فى حياة انسان فذ، والكشف عن مواهبه واسرارعبقريته من ظروف حياته التيى عاشها، والأحداث التى واجهها محيطه، والأثر الذى خلفه فى جيله.[৮]

"অর্থাৎ السيرة غير الذاتية হল কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তির জীবনের বাস্তব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা, তাঁর জীবন যাপনের বিভিন্ন কার্যাবলী থেকে তার মেধা ও প্রতিভার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করা, তাঁর জীবনকালে যে সমস্ত ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়েছেন তার বিবরণ তুলে ধরা এবং সে যুগে তাঁর রেখে যাওয়া নিদর্শনাবলী উল্লেখ করা।"

মোদ্দাকথায় কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উন্নত ব্যক্তিত্ব ও উন্নত মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য তাঁর সম্পর্কে অন্যের লিখিত বর্ণনাকে السيرة غير الذاتية বলে।

পক্ষান্তরে আত্মজীবনীর (السيرة الذاتية) পরিচয় বিভিন্ন অভিধানবেত্তা, সাহিত্যিক, সমালোচক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের এই মতানৈক্যের কারণ আত্মজীবনী শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। তবে সহজভাবে এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

السيرة الذاتية وهو سرد متواصل يكتبه شخص ما عن حياته الماضية.[৯]

"কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর অতীত জীবনের ধারাবাহিক লিখিত বর্ণনাকে আত্মজীবনী বলে।"

এক কথায় আমরা বলতে পারি, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উন্নত ব্যক্তিত্ব ও উন্নত মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য তাঁর সম্পর্কে অন্যের লিখিত বর্ণনাকে السيرة غير الذاتية বা জীবনী বলে। অপরদিকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর জীবনের ধারাবাহিক লিখিত বর্ণনাকে আত্মজীবনী বলে।

আত্মজীবনী (السيرةالذاتية) পরিভাষার উৎপত্তি

যদিও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় আত্মজীবনী (السيرة الذاتية) বেশী ব্যাপকতা লাভ করেনি। এবং কবিতা বা নাট্যশিল্পের মত এটি ততটা প্রসারিত হয়নি, তবুও এটি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় ব্যপকতা লাভ না করার অন্যতম কারণ এটি সাহিত্যের নতুন একটি শাখা। এ পরিভাষাটির বয়স মাত্র দুই শতাব্দীর মত।

এ কারণে সমালোচকগণ এখনো পর্যন্ত আত্মজীবনীর পরিপূর্ণ ও গ্রহণীয় সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেননি। তবে তাঁরা এ পরিভাষাটির উৎপত্তির ইতিহাস নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সামিয়াহ্ আস'আদ মনে করেন السيرة الذاتية বা আত্মজীবনী শব্দের প্রচলন সর্বপ্রথম উনিশ শতকের শুরুতে ইংরেজি ভাষায় Autobiography নামে শুরু হয়। এরপর ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায় এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। আরও নির্দিষ্ট করে তিনি এর উৎপত্তি আঠরো শত খ্রিস্টাব্দের দিকে বলে মত দিয়েছেন।[১০]

আবার কেউ কেউ বলেন السيرة الذاتية বা ব্যক্তি কর্তৃক নিজ জীবন কাহিনী রচনার ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। ইবরাহীম আল-সামরায়ী বলেন, আরবী السيرة الذاتية পরিভাষা ফরাসি শব্দ Autobiography এর অনুবাদ যেমনটি ইংরেজিতেও ব্যবহৃত হয়। মূলত এটি পাশ্চাত্য সাহিত্যে শ্রেণীর একটি প্রকার। এটি কোন ব্যক্তির জীবন-চরিত বর্ণনা, যার রচয়িতা সে নিজেই। এখানে তিনি তার পক্ষের বা বিপক্ষের সকল বিষয় তুলে ধরেন।

অপরদিকে ড. ইয়াহিয়া আবদুদ্ দায়েম এর মতে, আজকের প্রচলিত ও স্বীকৃত পরিভাষাটিও সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। আর এর প্রকৃত ক্রমবিকাশের যুগ হলো অষ্টাদশ শতাব্দী। এ যুগের শেষের দিকের রচিত জীবূন (جيبون) নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থেও এই শিল্পের গঠনগত পরিপূর্ণতা আসে। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আত্মজীবনীর আত্মপ্রকাশ হয়। আরবীতে আত্মজীবনীর কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন السيرة الذاتية অথবা الترجمة الذاتية অথবা الترجمة الشخصية তবে এর মধ্যে السيرة الذاتية সবচেয়ে বেশী বেশী প্রচলিত।

এখন আমরা আত্মজীবনী সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং ঐতিহাসিক ও সমালোচকগন এর বিকাশকে কিভাবে চিত্রায়িত করেছেন তার একটি প্রমাণ্য চিত্র অংকন করব।

আত্মজীবনী সাহিত্যের উৎপত্তি

আত্মজীবনীর উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। কেউ কেউ মনে করেন এটি সাহিত্যের প্রাচীন শাখার একটি। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি আধুনিক সাহিত্যের একটি শাখা। আর এই বিতর্কের প্রধান কারণ হল আত্মজীবনীর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে উভয়ের চিন্তার পার্থক্য। যারা প্রাচীন শাখা মনে করেন তাদের যুক্তি হল প্রতিটি গদ্য-লেখা যেখানে লেখক নিজের জীবনের কোন কিছু বর্ণনা করেছেন সেটিই আত্মজীবনী। আর যারা এটিকে আধুনিক শাখা মনে করেন তাদের মতে আত্মজীবনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত হতে থাকে।

যারা প্রাচীন পন্থী তাঁদের অনেকে মনে করেন এটি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার একটি সৃষ্টি। এদের মধ্যে আল ওয়াইরীল দিউরান্ট এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালে প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যে علم البرديات বা Papyrology নামে এক ধরণের সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। এর কিছু কিছু অংশ আত্মজীবনীমূলক ছিল। যেমন সেখানে এক নাবিকের ঘটনা বিদ্যমান, যার নৌকা সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে জীবন ও আবেগ অনুভূতি বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।[১১] দিউরান্ট এর মতে সুমেরীয়রা ও ব্যাবিলনীয়রা নিজেদের সম্পর্কে আলোচনা করেছে কিন্তু সেটি ঐতিহাসিক আলোচনা মিশরীয়দের মত কাহিনীমূলক না।[১২]

অন্যদিকে ড. শাওক্বী দায়্যিফ বলেন, আত্মজীবনীর প্রাচীন রূপ হলো সে সময়ের মানুষরা মৃত ব্যক্তিদের সমাধি ফলকে যা চিত্রিত করত সেটিই। ফের‘আউনী যুগে মিসর সমাধিসৌধ ও পিরামিডে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কার্যাবলীর বিভিন্ন বিষয় চিত্রিত করত।

তবে আত্মজীবনীর উৎপত্তি সম্পর্কে মাহির হাসান ফাহ্মীর মতটি আরও বিস্তারিত। তিনি বলেন-

تاريخ السيرة الذاتية هو إلى حدكبير صورة من العقلية الإنسانية فى مغامر انها من أجل البحث عن الحقيقة، و من أجل ذلك كانت جذورها كانت متشعبة فى الحضارات القديمة ، كالمصرية والبابلية والهلينية وغير ها.[১৩]

"আত্মজীবনীর ইতিহাস বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতার সেই চিত্রকে বুঝায়, প্রকৃত বিষয় আলোচনার জন্য যার উদ্যোগ সে গ্রহণ করে। এ কারণে এর মূল প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন শাখায় শাখায় বিভক্তি ছিল। যেমন মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, হেলেনীয় প্রভৃতি।"

যারা বলেন আত্মজীবনীর উৎপত্তি আধুনিককালে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন, জর্জ মাই। তাঁর মতে, আধুনিক হওয়ার কারণে আত্মজীবনীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। ড. শুকরী আল-মাখবুত তাঁর মতকে সমর্থন করে বলেন-

هذا الجنس الأدبي حديث نسبيا بال لعله أحدث الأجناس الأدبية.[১৪]

"সাহিত্যের এ শাখাটি তুলনামূলকভাবে আধুনিক, বরং সম্ভবত এটি সাহিত্যের সর্বাধিক শ্রেণী।"

তবে শুকরী স্বীকার করেন যে, এর আগে স্বীকারোক্তি বা জবানবন্দী (الاعتر افات) এর উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। যেটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জ্যাঁন জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) লিখেছিলেন। রুশোর আগেও الاعترافات এর অস্তিত্ব ছিল। এর মধ্যে Saint Augustine এর الاعترافات কে সবচেয়ে প্রাচীন আত্মজীবনীর উপাধি দিয়ে থাকে।

আর অনেকে এ দুই মতের সমন্বয় করেছেন এভাবে যে, আত্মজীবনী সাহিত্যের একটি বিশেষ শৈল্পিক গঠন থাকে। আর সচেতনভাবে সেই গঠন অনুসরণ করে রচিত আত্মজীবনীর সূচনা হয় রুশোর الاعترافات এর মাধ্যমেই। আসলে আত্মজীবনীর উৎপত্তি ইতিহাস নিয়ে বিতর্কের গ্রহণীয় সমাধান খুবই কঠিন। কারণ আত্মজীবনীর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় আমরা যদি রুশোর الاعترافات (জবানবন্দী) কে আত্মজীবনীর সূচনা হিসেবে ধরি তবে সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে সঠিক হবেনা। তাঁর الاعترافات এর মধ্যে রুশো প্রধানত তাঁর জীবনের ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের চিত্র তুলে ধরেছেন। অথচ আত্মজীবনীতে জীবনের সকল দিকের বিবরণ আসা অত্যন্ত জরুরী। অপরদিকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিতে রচিত Saint Augustine এর الاعترافات কে যদিও আত্মজীবনীর গঠন প্রণালী থেকে অনেক দূরের মনে করি, তথাপি রুশো ও অগাস্টিনের মধ্যবর্তী সময়ে বহু সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়, যা আত্মজীবনীর সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। যেমন Encyclopedia of Britannica তে বলা হয়েছে, আত্মজীবনীর প্রকাশ শুরু হয়েছে আধুনিক যুগে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে Margery Kampe নামে এক মহিলার হাতে। যিনি জীবনের শেষ সময়ে এসে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত ও মানবিক দিক এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যা সে সময়ের অনেকের উপর প্রভাব ফেলেছে।[১৫]

আরবী আত্মজীবনী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

ইতোপূর্বে আত্মজীবনী সাহিত্যের উৎপত্তি ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার অলোকপাত করা হবে এর ক্রমবিকাশ নিয়ে। শুকরী মাখবুত এবং জর্জ মাই আরবী সাহিত্যে আত্মজীবনীর মূল উৎসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের মতে আত্মজীবনী অভিব্যক্তি প্রকাশের একটি পদ্ধতি, যেটি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথেই সম্পৃক্ত। শুকরী মাখবুত বলেন-

وكان من يكتب سيرة ذاتية من غير الغربيين إنما هو مقلد لهم ، متأثر بثقافتهم.[১৬]

"পশ্চিমা লোকেরা ছাড়া যে আত্মজীবনী লিখেছেন সে তাদের অনুকরণকারী মাত্র এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত।"

তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, উপর্যুক্ত মতটি সত্যের মাপকাঠিতে সঠিক নয়। কারণ আরবী সাহিত্যে আত্মজীবনীর মূল ভিত্তি পাওয়া যায় হিজরী প্রথম শতাব্দীতে। অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। আর অধুনিক যুগে এসে একটি পাশ্চাত্য আত্মজীবনী গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আরবরা এ ক্ষেত্রে তাদের আরবী ঐতিহ্য পরিত্যাগ করেনি। এ জন্য আমরা যদি Encyclopedia of Britannica এর মত গ্রহণ করে পাশ্চাত্যে আত্মজীবনী সাহিত্যের উৎপত্তি খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী হিসেবে ধরি, তাহলে এটি বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের আগেই আরবদের নিকট এর উৎপত্তি হয়। এ মতটি অনেক গবেষক বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন লুইস বুওয়াযবিহ তিনি বলেন-

ربما كان كتاب الاعتبار الأسامة بن منقد فى القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادي، وكتاب التعريف لابن خلدون فى أواخر القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى أقرب الأثرين فى القرون الوسطى إلى الفن المذكور بمعناه الاصطلاحى المحصور ومن الجدير بالذكر أن هذا الفن لم يفتشر كثيرا فى الأدب الغربى إلا مؤخرا فى القرنين السابع عشر والثامن الميلديين.[১৭]

“সম্ভবত খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত উসামাহ বিন মুনক্বিজ এর গ্রন্থ কিতাবুল ই‘তিবার এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত ইবন খালদুনের গ্রন্থ ‘কিতাবুত তা‘রীফ’ আত্মজীবনীর নির্ধারিত পারিভাষিক অর্থেও বিবেচনায় সবচেয়ে কাছাকাছি নিদর্শন। আর এটি উল্লেখযোগ্য যে, এ শিল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিস্তৃতি লাভ করে।”

আগেই বলেছি গবেষকদের মধ্যে একদল মনে করেন, আত্মজীবনী সাহিত্য আধুনিক সৃষ্টি। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এটি প্রাচীন সৃষ্টি; তবে তা আরবদের দিয়ে নয়। যেমন আব্দুর রহমান বাদাভীর মতে, সামী জাতি আত্মজীবনী লিখতে সমর্থ নয়। তবে এ কথাটি প্রমাণ করা খুবই কঠিন যে, আরবদের অনুভূতি খুবই দুর্বল ছিল এবং তারা আত্মজীবনী লিখতে সমর্থ নয়। তবে এ কথাটি প্রমাণ করা খুবই কঠিন যে, আরবদের অনুভূতি খুবই দুর্বল ছিল এবং তারা আত্মজীবনী লিখতে অক্ষম ছিল। কারণ মানুষ সবসময় নতুন নতুন বিষয় ও নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহী থাকে, তাই সে যে জাতিরই হোক না কেন। তারা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের প্রভাবে সমাজের বিভিন্ন রঙে নিজেদের রাঙাতে চেষ্টা করে। আরবরা এর ব্যতিক্রম নয়।

আমরা জানি আরবদের মধ্যে গোত্র প্রীতি খুব প্রবল ছিল। প্রত্যেক গোত্র অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতো। এ কারণে তারা নিজ নিজ গোত্রের বংশ পরিচয়, ইতিহাস এবং গর্বের বিষয়গুলো তুলে ধরত। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ শেষে বিজয়ী গোত্রের কবিগণ তাঁদের বিজয়গাথা তুলে ধরে কবিতা রচনা করতেন। আর এটি করতে গিয়ে কবিগন গোত্রের পাশাপাশি নিজের বংশ পরিচয়, শৌর্য-বীর্য, মান-মর্যাদার কাহিনী বর্ণনা করত। গোত্রের লোকজন এটি খুব পছন্দ করত। এমনকি নিজের গোত্র ন্যায়-অন্যায় যাই করুক না কেন তাকে সমর্থন করা কর্তব্য মনে করত। তাদের এ গোত্রপ্রীতি তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা এটি প্রমাণ করে যে, আরবরা প্রখর অনুভূতি সম্পন্ন, আত্মগৌরব ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাতি ছিল। এজন্য অনেকে মনে করেন, আরবদের কাছে আত্মজীবনীর বীজ বপন করা হয় জাহিলী যুগে। সে সময় তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি, দিনাতিপাত, বংশ পরিচয় ও বংশ মর্যাদা প্রভৃতি উল্লেখ করে গল্প করত।[১৮]

তবে প্রশ্ন জাগতে পারে কেন জাহিলী যুগের লোকদের দ্বারা লিখিত তাদের জীবন-কাহিনী সম্বলিত কোন গদ্য লেখা আমাদের কানে পৌঁছায়নি? এর উত্তর হচ্ছে তখন লেখার প্রচলন খুবই কম ছিল। কবিরা তাঁদের জীবনানুভূতি মান-মর্যাদা, গোত্রের মর্যাদা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরতেন কবিতার মাধ্যমে। স্বাভাবিক কারণে

কবিতাই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর বর্ণনাকারীদের জন্য কবিতা মুখস্ত করা ও উপস্থাপন করা গদ্যের চেয়ে সহজ ছিল।

ইসলামী যুগের সর্বপ্রথম আত্মজীবনীর যে অংশ আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা হল, হযরত সালমান ফারসী কর্তৃক বর্ণিত নিজ জীবনের কিছু কথা। আল-খতীব আল বাগদাদী উপরোক্ত অংশটি তার 'তারীখু বাগদাদ' নামক গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এর সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৯] এখানে হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর বংশ পরিচয়, তাঁর প্রতি পিতার ভালবাসা, পিতার প্রতি তাঁর আশঙ্কা, তাঁর অগ্নিপূজা ত্যাগ করার কারণ, খ্রিস্টান ধর্ম পালন পভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে খ্রিস্টান ধর্মযাজক কর্তৃক তাকে নতুন নবীর সাক্ষাত লাভের সুসংবাদ দান, খ্রিস্টান ধর্মযাজক কর্তৃক সেই নবীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ এবং সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে পাওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করেছেন। হিজরী প্রথম সালে রচিত হযরত সালমান ফারসী (রা.) এই অংশের মাধ্যমেই আত্মজীবনীর বীজ বপন হয়। এছাড়া আত্মজীবনীর আরও কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া যায় আবুল ফারাস আল-ইস্পাহনী এর গ্রন্থ 'কিতাবুল আগানী'- এর মধ্যে। এখানে উমাইয়া কবি নুসাইব এর আত্মজীবনী উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি কবিতার সাথে সম্পৃক্ততা ও কবিতায় তাঁর পারদর্শিতা তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আল-ফারাযদাক, আইমান ইবন খুরাইম (মৃ. ৭০০ খ্রি.) সহ আরও কিছু কবির হিংসার কথা বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে আব্দুল 'আজীজ ইবন মারওয়ান এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরে তিনি তাঁর বোনকে বলেন-

أي أخيه، إنى قد قلت شعرا، وأنا أريد عبد العزير بن مروان، وأرجو أن يعتفك الله عز وجل به وأمك، ومن كان مرموقا من أهل قرابتى[২০]

"বোন আমার, আমি কবিতা রচনা করলাম আব্দুল 'আজীজ ইবন মারওয়ান এর জন্য, আমি আশা করি আল্লাহ এর দ্বারা তোমাকে ও তোমার মাকে এবং আমার আত্মীয় স্বজনের পরিবারকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন।"

কিতাবুল আগানীতে আরও যে সমস্ত আত্মজীবনী পাওয়া যায় তার মধ্যে ইব্রাহীম আল-মৌছিলী (মৃ. ৮০৬ খ্রি.) এর জীবনী অন্যতম। হিলারী কিলপ্যাট্রিক মনে করেন, এটি আত্মজীবনী শাস্ত্রের সাথে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আত্মজীবনীমূলক অনেকগুলো বিক্ষিপ্ত অংশের সমষ্টি যদিও এর এক অংশের সাথে অপরাংশ ততটা সম্পৃক্ত নয়। তারপরেও এখানে ইব্রাহীম আল-মৌছিলীর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া রাজা-বাদশাদের সামনে তাঁর সাহসিকতার কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের হুকুম অমান্য করে তাদের দরবার ত্যাগ করার চেয়ে মদ পান ত্যাগ করা তাঁর জন্য যে কঠিন কাজ, সেটি আলোকপাত করে বলেন-

وكان المهدى لا يشرب، فأر ادنى على ملازمقه، وترك الشرب فأبيت عليه، وكنت أغيب عنه الأيام ، فإذا جئته منتشيا، فغاظه ذلك منى فضربنى وحبسنى.[২১]

"মাহদী মদ পান করতেন না, তাই আমাকে মদ ত্যাগ করতে ও তাঁর সাথেই থাকতে বললেন। আমি সেটি অস্বীকার করলাম। তাঁর কাছ থেকে অনেকদিন দূরে থাকলাম। তারপর তাঁর কাছে আসলাম মাতাল হয়ে। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে আমাকে প্রহার করলেন এবং বন্দী করলেন।"

এছাড়া কিতাবুল আগানীতে ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-মৌছিলীর (৭৬৯-৮৪৯ খ্রি.) আত্মজীবনীর কিছু অংশবর্ণিত হয়েছে। তিনি আব্বাসী আমলের একজন সঙ্গীত বিশারদ ও সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার পেছনে পিতার অবদানের কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি যেসব

ঘটনা, সমস্যা ও অবস্থা তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে সেগুলোকে আত্মজীবনীর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল আগানী ছাড়া অন্য যে সমস্ত গ্রন্থে আত্মজীবনীমূলক অংশ বিদ্যমান তন্মধ্যে ইবন আবী উসাইবা'আহ (মৃ. ৬৬৮ হি.) কর্তৃক রচিত عيون الأنبيء فى طبقات الأطباء। এখানে হুনাইন ইবন ইসহাক (মৃ. ২৬০ হি.) এর আত্মজীবনীর কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে। হুনাইন ইবন ইসহাক তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁর সাথে সমসাময়িক অন্যান্যদের, এমনকি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের হিংসার কথা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এখানে আরও এক দার্শনিক এর আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ আছে। আর সেটি হল ৪১৭ হিজরীতে লেখা ইবনুল হাইসাম (মৃ. ৪৩০ হি.) এর আত্মজীবনী। ইবনুল হাইসাম গ্রীক পণ্ডিত جالينوس (মৃ. ১৯৯ খ্রি.) দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়া। তাঁর মত নিজ জীবনের অবস্থার বিবরণ প্রভৃতি বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। ড. ইহসান আব্বাস মনে করেন, ইবনুল হাইসাম তাঁর আত্মজীবনীতে খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন। যার দ্বারা মানুষের মাঝে সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২২]

এছাড়া ইবন আবী হাইসাম এর গ্রন্থে আরও যাদের আত্মজীবনীর অংশ-বিশেষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তারা হলেন ইবনে সীনাহ (মৃ. ৪২৮ হি.) এবং আব্দুল লতীফ আল বাগদাদী (মৃ. ৬২৯ হি.)। ইবন সীনাহ তাঁর আত্মজীবনীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি দাবী করেন চিকিৎসা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যায় তিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। এখানে তিনি তাঁর জীবনের ভাল-খারাপ উভয় দিকের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তিনি দুটি পরস্পর বিরোধী পন্থা অনুসরণ করেছেন। একদিকে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চেয়েছেন নামাজের মাধ্যমে অন্যদিকে পড়াশুনা ও গবেষণার জন্য রাত্রি জাগরণের নিমিত্তে তিনি মদ পান করেছেন। তিনি বলেন,

"কোন বিষয়ে আমি যখন দিশেহারা হয়ে পড়তাম এবং এর সমাধান করতে পারতাম না তখন আমি বারবার মসজিদে যেতাম, নামাজ আদায় করতাম, সকল বিষয়ের আবিষ্কারকের নিকট অনুনয়-বিনয় করতাম, যতক্ষণ না তিনি আমার জন্য পথ খুলে দেন এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেন। এরপর রাতে আমি আমার ঘরে ফিরতাম, আলো জ্বালাতাম, পড়তে ও লিখতে নিমগ্ন হতাম। অতঃপর যখন ঘুম আমাকে পরাজিত করত অথবা কোন রকম দুর্বলতা অনুভব করতাম তখন মদের পেয়ালার আশ্রয় নিতাম, যতক্ষণ না আমার কাজ করার শক্তি ফিরে আসে। এরপর আবার পড়ায় ফিরতাম।"[২৩]

এছাড়া জীবন-বৃত্তান্তমূলক যে সমস্ত গ্রন্থে আত্মজীবনীর অংশ বিশেষ পাওয়া যায় তার মধ্যে ياقوت الحموى এর মু'জামুল উদাবা একটি। এখানে গ্রন্থাকারে আলী ইবন যায়দ আল-বায়হাকী (মৃ. ৫৬৫ হি.) এর আত্মজীবনীর কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। মূলত এটি বায়হাকীর নিজের লেখা গ্রন্থ 'মাশারিবুত তাজারুব' এর কিছু অংশ, যা ইয়াকূত তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। যদিও বায়হাকীর গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। বায়হাকী এখানে তাঁর জন্ম, জন্মস্থান, জীবন যাপনের স্থানসমূহ, শিক্ষকবৃন্দ, গঠিত গ্রন্থসমূহ, পেশা এবং বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণের বিবরণ তুলে ধরেন। প্রাচীন আত্মজীবনীর এ সমস্ত দৃষ্টান্ত ছাড়াও আত্মজীবনীমূলক অনেক রাসাইল রচিত। যেমন মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়্যা আল-রাজী (মৃ. ৩১৩ হি.) এর রিসালাহ। এখানে তিনি তাঁর জীবনী এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করেন।[২৪] এছাড়া আবু হাইয়্যান আত-তাওহীদী (মৃ. ৪১৪ হি.) এর রিসালাহ 'আস সাদাক্বাহ ওয়াস সাদীক্ব' এর মধ্যে রচয়িতার আত্মজীবনীর কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এখানে তিনি জীবন সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি এবং তাঁর হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেই বলেন "আমি আমার মনের মধ্যে যে ব্যথা, বেদনা, জ্বালা, দুঃখ, হতাশা, ক্রোধ এবং বিষণ্নতা আছে সে সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এটি লিখেছি।"[২৫]

এছাড়া ইবনুল জাওজী (মৃ. ৫৯৭ হি.) এর রচিত 'লুফতাতুল কাবাদ ইলা নাসিহাতিল ওয়ালাদ' গ্রন্থটিও আত্মজীবনীমূলক। এখানে তিনি তাঁর পুত্রকে বিভিন্ন উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতে নিজের জীবন কাহিনী

তুলে ধরেছেন। তবে নিজের জীবনের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করে রচিত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে সবেচেয় প্রসিদ্ধ হল ইবন হায্ম আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৫৬ হি.) এর রচিত 'তাওকুল হামামাহ ফিল আলফাতি ওয়াল আল্লাফ'। এ জন্য ইহসান আব্বাস বলেন, "ইবন হায্ম ছিলেন আত্মজীবনীমূলক বিষয়াদি লেখার পথিকৃত যা তিনি তাঁর গ্রন্থ 'তাওকুল হামামাহ'তে একত্রিত করেছেন।[২৬] এখানে বিশেষ করে তাঁর জীবনের ভালবাসার দিকের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন।

অন্যদিকে নিজ জীবনের রাজনৈতিক দিকের বর্ণনা তুলে ধরে লিখেছেন আল-মুওয়ায়্যিদ ফিদ-দ্বীন দা'য়িউদ দু'আত (মৃ. ৪৭০ হি.)। এখানে ফাতেমী খিলাফত প্রসারে তার প্রচেষ্টার কথা এবং আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতি তাঁর আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে সুলতান আবু কালিজার সাথে তাঁর যে সমস্ত কাহিনী জড়িত আছে সেগুলোর চিত্র এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়া বিদ্যমান রাজনৈতিক আত্মজীবনীমূলক লেখনীর মধ্যে গ্রানাডার বনু যাইরী গোত্রের শেষ বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবন বালকীন (মৃ. ৪৮৩ হি.) এর লেখা 'আত-তিবইয়ানু 'আনিল হাদীছাহ আল কায়িনাহ বি দাওলাতি বানী যাইরী ফী গ্রানাত্বাহ' নামক গ্রন্থ অন্যতম। এটি গ্রন্থের মূল নাম। যা পরবর্তীতে 'মুযাক্কিরাতু আমীর আব্দুল্লাহ' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি তাঁর পরিবার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির বর্ণনা তুলে ধরে ঐ সমস্ত লোকদের সমালোচনার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন যারা তাঁকে গ্রনাডার পতনের জন্য দায়ী করেন।[২৭]

সে সময়ের আত্মবিবৃতিমূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম গাযযালী এর 'আল মুনক্বিজ মিনাদ দ্বালাল' অন্যতম। যেখানে তিনি সূফীবাদ ও আত্মসংযম বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সমস্যা সমূহের আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন কালাম ও দর্শনশাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন তরীকা সম্পর্কে। সূফীবাদী জীবনকাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। তবে এ ধরনের লেখাগুলো পরিপূর্ণ আত্মজীবনী নয়।[২৮] এছাড়া সূফীবাদী জীবনচরিত রচয়িতাদের মধ্যে ইবন আরাবী (মৃ. ৬৩৮ হি.) এর নাম উল্লেখযোগ্য। যার প্রায় সব গ্রন্থ তাঁর সূফীতাত্ত্বিক জীবনচিত্র কেন্দ্রিক। এখানে কাশফ এবং ওয়াহদাতুল উযুদ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের পর্দা উন্মোচিত হয়।[২৯]

এছাড়া সে সময়কার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে 'আমারাতুল ইয়ামানী (মৃ. ৫২৭ হি.) এর লেখা 'আন-নুকাতুল আছরিয়্যাহ ফী আখবারিল উজারা আল মিছরিয়্যাহ' উল্লেখযোগ্য। যেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া তাঁর পরিবার, বংশ মর্যাদা, পড়াশোনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মিশরের মন্ত্রীদের মাঝে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণও দিয়েছেন এ গ্রন্থে। তবে যেহেতু সে সময়ে আস সীরাহ আজ যাতিয়্যাহ পরিভাষা প্রচলিত ছিল না, সেহেতু 'আমারাহ তাঁর গ্রন্থের ধরণ সম্পর্কে বলেন, "এ রচনা দিয়ে আমি বিশেষ কোন বিষয়কে বুঝাইনি এবং বিশেষ কোন শাস্ত্রকেও নির্দেশ করিনি, বরং এটি কিছু কাহিনী, যার দ্বারা আমি বিভিন্ন বিষয়কে উদ্দেশ্য করেছি যেগুলো সত্যের মাপকাঠিতে যাচাইকৃত।"[৩০]

'আমারাহ আল ইয়ামানীর আত্মজীবনীর পরে আমরা উসামাহ ইবন মুনক্বিজ (মৃ. ১১৮৮ খ্রি.) এর লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ পাই। যার নাম 'আল ই'তিবার'। এখানে তিনি অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এক জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। গ্রন্থে লেখকের শৈশব, সমর পরীক্ষা, তাঁর বীরত্ব এবং মুসলমান ও খ্রিস্টান নারী-পুরুষদের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকসমূহের বিবরণ তুলে ধরেছেন।[৩১] এখানে আরও ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং প্রাণী জগতের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনা কথোপকথনের ভঙ্গিতে করা হয়েছে। এ কথোপকথন কখনো অপরের সাথে আবার কখনো নিজের সাথে নিজে করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

فورد على قلبى من هذا هم عظيم ، وقلت أترك أولادى ، وإخوتى وأهلى فى الحصار وأسير إلى الموصل.[৩২]

"এজন্য আমার হৃদয়ে অনেক বড় দুশ্চিন্তা নেমে এসেছিল। আর আমি বলেছিলাম, আমার সন্তান-সন্ততি, ভাই বোন ও পরিবার হিছারে রেখে আমি মূসলে চলে যাবো।"

প্রাচীন আরবী সাহিত্যে আত্মজীবনীর সর্বশেষ উৎস পাওয়া যায় ইবন খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.) এর গ্রন্থ 'আত তা'রীফ বি ইবনে খালদূল ওয়া রিহলাতুহু শারক্বান ওয়া গারবান' নামক গ্রন্থে। এটি তিনি তাঁর বিখ্যাত 'তারিখ' এর পরিশিষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি পশ্চিম ইয়েমেনে অবস্থিত তাঁর পরিবারের বংশ পরিচয় দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন-

ونسبنا فى حضرموت من عرب اليمن ، إلى وائل بن حجر من أقيال العرب.[৩৩]

"হাদরামাউতে আমাদের বংশ হল, ইয়েমেনী আরবের অন্তর্ভুক্ত। সেটি আরব সর্দার ওয়ায়েল ইবন হাযর পর্যন্ত পৌঁছেছে।"

এছাড়া তিনি এখানে তাঁর পরিবারের ইসাবেলায় অবস্থান, পরবর্তীতে তিউনিশিয়ায় স্থানান্তর যেখানে তাঁর জন্ম ৭৩২ হিজরীতে। এরপর তাঁর বেড়ে ওঠা ও জ্ঞানার্জনসহ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এরপর তাঁর কর্ম ও তিউনিশিয়া থেকে স্পেনে ভ্রমণ, অতঃপর আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন, আলেকজেন্দ্রিয়ায় ভ্রমণ এবং কায়রোয় অবস্থানসহ আরও অনেক ভ্রমণের কথা এখানে বর্ণনা করেছেন। আসলে তাঁর এ গ্রন্থ লেখার প্রধান উদ্দেশ্যই হল তাঁর 'তারীখে' উল্লেখিত ঘটনাসমূহকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যদিকে আব্দুছ ছালাম মনে করেন, ইবন খালদুনের 'আত তা'রীফ বি ইবনে খালদুন' নামক গ্রন্থে আত্মজীবনী শাস্ত্র এসেছে একান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হিসেবে। এখানে লেখক তাঁর রাজনৈতিক ভ্রমণের বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে এগুলো উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন ও বিদ্রোহ করার যে সমস্ত অপবাদ দেয়া হতো তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে তাঁর অবস্থান ও অর্জনসমূহের বিবরণ দিয়েছেন এর মাধ্যমে।[৩৪] আত্মজীবনী সাহিত্যেও অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করার জন্য ইবন খালদুনের উল্লেখিত গ্রন্থকে প্রাচীন আরবী আত্মজীবনী সাহিত্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করা হয় এবং আধুনিক আত্মজীবনীর মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

আর যে যুগে আর এক ধরনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা হয়েছিল, যেখানে শুধু রচয়িতা তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত, শায়েখদের নাম, তাঁর পঠিত ও রচিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এর দিকে ইঙ্গিত করে একজন পশ্চিমা লেখক বলেন, "আরবী আত্মজীবনী সাহিত্যের অনেকগুলো শুধুমাত্র লেখকের জন্ম, শিক্ষা ও কর্মের দিন তারিখ উল্লেখের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁর ঘটনাবলীর পেছনে তাঁর লুকায়িত সত্ত্বা অস্পষ্ট ও অজানা রয়ে গেছে।" যে যুগে লিখিত এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে আবু সামাহ আল মুক্বাদ্দাসী এর লেখা 'তারাজিমুল ক্বারনাইন আস সাদিস ওয়াস সাবি' একটি। যেখানে লেখক ৫৯৯ হিজরীতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে তার জন্ম, শিক্ষা জীবন, শিক্ষকদের সংখ্যা ও নাম, পঠিত গ্রন্থসমূহ প্রভৃতি বিষয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। তবে এ সবের সাথে আবূ সামাহ তাঁর জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্য ও সারা জীবনের স্বপ্ন-সাধনার বর্ণনাও দিয়েছেন।

সে সময়ে এ ধরনের গ্রন্থ এত বেশী পরিমাণে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল যে কারণে অনেক ঐতিহাসিক ও হাদীসবেত্তা এ রীতিতে তাদের গ্রন্থ রচনা করেন। এ সম্পর্কে জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯৯১ হি.) বলেন-[৩৫]

انما ذكرت ترجمتى فى هذا الكتاب ، اقتداء بالمحدثين قبلى ، فقل أن ألف أحد منهم تاريخا ألا وذكر ترجمته فيه.

"এ গ্রন্থে আমিতো আমার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছি আগের মুহাদ্দিসগণের অনুসরণ করে। আর তাদের মধ্যে খুব কম ঐতিহাসিক আছেন, যারা তাঁদের গ্রন্থে নিজের জীবন কাহিনী লেখননি।"

তারা ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে নিজেদের জীবন কাহিনী লিখেছেন তাদের মধ্যে লিসানুদ্দীন ইবনুল খাত্বিব (মৃ. ৭৭৬ হি.) অন্যতম। তিনি তাঁর 'আল ইয়াত্বাতু ফী আখব্রি গারানাত্বাহ' গ্রন্থের শেষাংশে নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। এটি তিনি এ জন্য করেছেন, যাতে চিরদিন মানুষ তাঁকে স্মরণ করে।[৩৬] এ আত্মজীবনীতে লেখক তাঁর শৈশব, লেখাপড়া, শিক্ষকদের নাম, তাঁর রচিত কবিতার উপমা প্রভৃতি বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। তেমনিভাবে হিজরীর পঞ্চম শতকের আগে শুধুমাত্র আত্মজীবনী সম্বলিত আলাদা কোন গ্রন্থ ছিল না। বরং কিছু কিছু গ্রন্থ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করত।

উপসংহার

পরিশেষে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আরবী আত্মজীবনী সাহিত্য মাত্র দুই শতাব্দী পূর্বে আগত সাহিত্যের একটি নয়া দিগন্ত। এটি মূলত জীবনী সাহিত্যের অনুকরণেই রচিত হয়। এমনিভাবে আমরা দেখি প্রাচীন আরবী সাহিত্যে আত্মজীবনী রচনার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যদিও 'আস সীরাহ আয যাতিয়্যাহ' পরিভাষা সে সময়ে প্রচলিত ছিলনা। আরবী জীবনী সাহিত্যের ভাণ্ডার অনেক পুরাতন। রাসূল (সা.) এর জীবনীর উপর অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে রাসূল (সা.) এর মৃত্যুও প্রায় ১৩০ বছর পরে ইবনে ইসহাক (রহ.) "সীরাতে ইবনে হিশাম" নামক নির্ভরযোগ্য একখানা সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যদিকে অপর একটি নির্বাচিত, সুবিখ্যাত, সহীহ ও পুরস্কারপ্রাপ্ত সীরাত গ্রন্থ হচ্ছে "আর রাহীকুল মাখতুম"। এ জাতীয় গ্রন্থের অনুকরণেই আরবী আত্মজীবনী সাহিত্য তার নিজ কক্ষপথে পায়চারী শুরু করে বর্তমানে আধুনিক আরবী সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়া'কূব আল-ফিরোজ আবাদী, *আল-ক্বামুস আল-মুহীত* (বাইরুত: মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ৫২৮।

২ হানী আল 'আমদ, *দিরাসাতুন ফী কুতুব আল-তারাজিম ওয়া আল-সিয়ার* (জর্দান: আম্মান, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ৭৩।

৩ সূরা ত্বহা, আয়াত ২১।

৪ আব্দুল্লাহ আল হাকীল, *'আলা মায়িদাতিল আদাব* (রিয়াদ : ফারাযদাক প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৫ *দিরাসাতুন ফী কুতুব আল-তারাজিম ওয়া আল-সিয়ার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

৬ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন 'আবদুল হামীদ, *তাহকীক আওদাহ আল মাসালিক ইলা আলফিয়্যাতি ইবনে মালিক* (বাইরুত: দারুল জাইল, ১৯৭৯), পৃ. ১১১।

৭ ড. 'আব্দুল 'আজীজ শারফ, *আদাব আল-সীরাহ আল যাতিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাহ লুবনান, ১৯৯২), পৃ. ৩।

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩-৪।

৯ মাজদী ওয়াহবাহ ওয়া কামিল আল মুহানদিস, মু'*জামুল মুসত্বালাহাতিল 'আরাবিয়্যাহ ফীল লুগাতি ওয়াল আদাব* (লেবানন: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৯৪।

১০ ড. সামিয়াহ আহমাদ আস'আদ, *আদাবুস সীরাতিজ* (মাজাল্লাতুল ফাইসাল, সংখ্যা ৬৭, মুহাররাম ১৪০০ হি.), পৃ. ৭৮।

---

[১১] আল ওয়াইরীল দিউরান্ট, *কিছ্‌ছাতুল হাদারাহ*, অনূ.যাকী নাজীব মাহমুদ (বাইরুতঃ দারুল জাইল, ১ম খণ্ড, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১১১।

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩-৪।

[১৩] ড. মাহের হাসান ফাহমী, *আস সীরাতুত তারিখ ওয়াল ফান্ন* (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহদাহ আল মিসরী, ১৯৭০খ্রি.), পৃ. ২২৫।

[১৪] শুকরী আল মাখবুত, *সীরাতুল গায়িব সীরাতুল আতী* (তিউনিসঃ দারুল জুনুব, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ১০।

[১৫] Helen Hminngway, *The new Encyclopedia of Britannica* (Benton, Publisher, 1973-74), p. 1010.

[১৬] *সীরাতুল গায়িব সীরাতুল আতী*, পৃ. ১৯।

[১৭] লুইস বুযওয়াইহ, *মাজাহিরুস সীরাতিজ যাতিয়্যাহ* (বাইরুতঃ হাওলিয়্যাতুল জামি'আহ আল ইসু'ইয়্যাহ, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ২৫।

[১৮] কার্ল ব্রকেলমান, *মা ছান্নাফাল 'আরব মিন আহওয়ালি আনফুসিহিম*, খণ্ড ১, পৃ. ৩।

[১৯] আল খতীব আল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (বাইরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ), পৃ. ১৭৭।

[২০] আবুল ফারয আল ইসবাহানী, *আল আগানী* (বাইরুতঃ দারু ইহ্‌ইয়ায়িত তুরাছ, খণ্ড ১, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৯।

[২১] আল আগানী, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৯।

[২২] ড. ইহসান 'আব্বাস, *ফান্নুস সীরাহ* (বাইরুতঃ দারুস সাক্বাফাহ তাঃ বিঃ), পৃ. ১৩৬।

[২৩] ইবন আবী উসাইবি'আহ, *'উয়ূনুল আম্বিয়া ফী তাবাক্বাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৩৮।

[২৪] ড. শাওক্বী দায়্যিফ, *আত তারজামাতুত শাখছিয়্যাহ* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৫।

[২৫] আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, *লুফতাতুল কাবাদ ইলা নাছিহাতিল অলাদ* (মিসরঃ আস সালাফিয়্যাহ, ১৩৯৭ হি.), পৃ. ৪৬।

[২৬] *ফান্নুস সীরাহ*, পৃ. ১২১।

[২৭] আব্দুল্লাহ ইবন বালক্বীন, *মুজাক্বিরাতুল আমীর আব্দুল্লাহ* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ তাঃ বিঃ), পৃ. ৮২।

[২৮] *আত তারজামাতুত শাখছিয়্যাহ*, পৃ. ১৭৭।

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

[৩০] 'আমরাতুল ইয়ামানী, *আন নুকাতুল আছরিয়্যাহ ফী আখবারিল উযারা আল মিছরিয়্যাহ* (কায়রোঃ মাদবুলী, ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৬।

[৩১] *ফান্নুস সীরাহ*, পৃ. ১২১।

[৩২] উসামাহ ইবন মুনক্বিজ, *আল ই'তিরাব* (দামিশকঃ ওযারাতুছ ছাক্বাফাহ), পৃ. ৫।

[৩৩] আব্দুর রহমান ইবন খালদুন, *আত তা'রীফ বি ইবন খালদুন ওয়া রিহলাতুহু শারক্বান ওয়া গারবান* (কায়রোঃ লাজনাতুত তালীফ ওয়াত তারজামাতি ওয়ান নাশর, ১৯৫১খ্রি.), পৃ. ১।

[৩৪] *ফান্নুস সীরাহ*, পৃ. ১৩৩।

[৩৫] জালালুদ্দীন আস সুয়ীতী, *হুসনুল মুহাদারাহ ফী আখবারি মিছর ওয়াল ক্বাহিরাহ* (মিশরঃ মাতবা'আতুল মাওসু'আত, ১৩২১ হি.), পৃ. ১৫৫।

[৩৬] লিসাদুদ্দীন ইবনুল খাত্বিব, *আল ইহাত্বাতু ফী আখবারি গারানাত্বাহ* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৪৩৮।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর তাফসীর চর্চা

ড. আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান*

Abstract: Al-Quran is the latest and the true constitution for mankind. To understand the Quran many steps have been taken. One familier step is translation and *Tafsir* of the Quran. When a companion of Muhammad (*SM.*) did not understand any verse of the Quran, then he would go to the Prophet (*SM.*) and he explained the spirit of the verse. By this way, the *Tafsir* of the Quran started in Arabic. Later Muslims understood that, there are no alternatives but to understand the Quran through mother language. In this connection some Bengali Muslim scholars took some steps to spread the knowledge of the Quran through Bengali language. They wrote some books of *Tafsir* in their mother language. One of the famous writer is Maulana Shamsul Haque Faridpuri (R.). He wrote five books in this connection. Those are *Surah Yasin Sharif, Haqqani Tafsir (Panj Surah), Tafsir-e-Surah Fatiha, Haqqani Tafsir (Alif-Lam-Mim), Haqqani Tafsir (Ampara).* These five books are valuable works and important to understand the Quran. This article tries to focus on contribution of Maulana Shamsul Haque Faridpuri (R.) to *Tafsir* and it is also an attempt to review his said works.

ভূমিকা

আল-কুরআনুল কারীম বুঝার জন্য রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগ থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তাঁর যুগে যখন কোনো সাহাবী কোনো আয়াতের মর্ম বুঝতেন না, তখন তাঁরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর শরণাপন্ন হতেন এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্মোদ্ধার করতেন। এ ভাবেই 'আরবী ভাষায় তাফসীর শাস্ত্রের'[১] উৎপত্তি ঘটে। কালের পরিক্রমায় বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ, টীকাটিপ্পনি ও তাফসীর রচিত হয়েছে। এ অনুবাদ ও তাফসীর রচনায় যে সকল বাংলাভাষী 'আলিম অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী[২] (র.) (১৮৯৮-১৯৬৯) একজন। যিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলাম প্রচারে যেমন অসামান্য অবদান রেখেছেন, তেমনি তাফসীর রচনার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের নিকট ঐশী বাণীর ব্যাখ্যাও পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআন চর্চায় তিনি এতোই দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করেন যে, শিক্ষকতা ও পারিবারিক ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি আল-কুরআনের তাফসীর করেন। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ পাঁচটি হলো ছূরা ইয়াছীন শরীফ, হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সুরা), তফসীরে সূরা ফাতেহা (পাঞ্জ সূরা), হাক্কানী তফসীর আলিফ–লাম–মীম পারা (সুরা ফাতেহাসহ) ও হাক্কানী তফসীর (আমপারা)। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ খণ্ডাকারে রচিত। আল-কুরআন মানব জাতির একমাত্র পাথেয় হওয়ায় এটির তাফসীর জানা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য গ্রন্থগুলো অমূল্য সম্পদ। কারণ গ্রন্থগুলো বিশেষ ধারা ও প্রকৃতি অনুসারে রচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তাফসীর চর্চায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর অবদান এবং তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তাফসীর চর্চায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর অবদান

বাংলা ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) বাংলাভাষী মুসলমানদের কথা চিন্তা করে এমন কিছু সূরার তাফসীর রচনা করেন

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

যেগুলো প্রতিনিয়ত নামাযে তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর এ সকল গ্রন্থে সর্বমোট আটচল্লিশটি সূরার তাফসীর করেছেন। নিম্নে এ সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১. ছুরা ইয়াছীন শরীফ

'ছূরা ইয়াছীন শরীফ' গ্রন্থটির প্রকাশক মোহাম্মদ আব্দুল করিম, প্রকাশনায়: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। আমাদের হাতে যে কপিটি আছে তা প্রথম সংস্করণের। প্রকাশকাল ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১। বইটির বিক্রয় মূল্য ৩০.০০ টাকা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ:

বঙ্গানুবাদ ও তফছীরসহ

ছূরা ইয়াছীন শরীফ

হক্কানী তফছীর

ছুফীকূল শিরোমণি, চিন্তাবিদ আলেমে হক্কানী,

মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী

ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা।

এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঃ চকবাজার ঃ ঢাকা।

২. হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সুরা)

গ্রন্থটি মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) ও মাওলানা আজিজুল হক[৩] (র.) যৌথভাবে রচনা করেন। ১৯৬৬ সালে গ্রন্থটি ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এটির সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬ এবং বিক্রয় মূল্য ৩.৫০ টাকা। অতঃপর ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী একটি মুদ্রণ প্রকাশ করে। অতঃপর পুনরায় উক্ত সংস্থা প্রথম মুদ্রণ নামে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে আরও একটি সংস্করণ বের করে। এটির পৃষ্ঠা ছিল ১৫৩ এবং বিক্রয় মূল্য ছিল ২৯.৫০ টাকা। আর আমাদের হাতে যে গ্রন্থটি আছে তা এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। এটি তাদের প্রথম সংস্করণের ২য় মুদ্রণ। প্রকাশকাল ২০০২ সালের মার্চ মাস। এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৬, বিক্রয় মূল্য ৭০.০০ টাকা। এ গ্রন্থটিতে যে সকল সূরা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো- সূরা ইয়াসীন, সূরাতুর-রহমান, সূরাতুল ওয়াকি'আহ, সূরাতুল মূলক ও সূরাতুল মুয্যাম্মিল। এটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

বাংলা তরজমা ও ব্যাখ্যাসহ

হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)

হযরত মাওলানা শামছুল হক (র.)

প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা।

ও

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা।

৩. তফসীরে সূরা ফাতেহা (পাঞ্জ সূরা)

গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী। এটির ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করে একই সংস্থা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৭০ এবং বিক্রয় মূল্য ছিল ৩৬. ০০ টাকা। এ গ্রন্থটি আমরা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বাইতুল মোকাররম, লাইব্রেরিতে দেখেছি। আমাদের হাতে যে কপিটি আছে তার প্রকাশক ছিলেন মোঃ আব্দুল হামিদ ও মোঃ আব্দুল হালিম। প্রকাশনায় এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৯৮ মার্চ, তৃতীয় সংস্করণ। এটির সর্বমোট পৃষ্ঠ সংখ্যা ১৭৭ এবং বিক্রয় মূল্য ১০০.০০ টাকা। এ গ্রন্থটিতে মোট পাঁচটি সূরার তাফসীর করা হয়েছে বলে একে পাঞ্জসূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাফসীরকৃত পাঁচটি সূরা হলো সূরাতুল ফাতিহা, সূরাতুল হুজুরাত, সূরা ক্বাফ, সূরাতুস ছফ ও সূরাতুল জুমু'আহ।

এটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

তফসীরে সূরা-ফাতেহা

(পাঞ্জ সুরা)

হযরত মাওলানা শামছুল হক (র.) ফরিদপুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা।

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা।

৪. হাক্কানী তাফসীর

আলিফ–লাম–মীম পারা

(সুরা ফাতেহাসহ)

গ্রন্থটি সর্বপ্রথম কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। আমাদের হাতে যে কপিটি আছে তা দ্বিতীয় সংস্করণের। প্রকাশক গোলাম ফারুক, প্রকাশনায় হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড, ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১। প্রকাশকাল জুলাই ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২, বিক্রয় মূল্য ১৫০.০০ টাকা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

হাক্কানী তাফসীর

আলিফ-লাম-মীম-পারা

(সূরা ফাতেহাসহ)

মুজাহিদ আযম

আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)

(ছদর সাহেব হুযুর)

প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যালঃ

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া

লালবাগ, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম

গাওহারগঞ্জ, ফরিদপুর।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১।

৫. হাক্কানী তাফসীর

(আমপারা)

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল কত ছিল তা জানা যায় নি। আমাদের হাতে যে কপিটি আছে চতুর্থ সংস্করণের। প্রকাশকাল ২০০৪ ফেব্রুয়ারি। প্রকাশক গোলাম মারুফ, প্রকাশনায় ঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড, ৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৫ এবং বিক্রয় মূল্য ১৫০.০০ টাকা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ-

হাক্কানী তাফসীর

আমপারা

মুজাহিদে আযম

আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

(ছদর সাহেব হুযুর)

প্রতিষ্ঠাতা: প্রিন্সিপ্যাল

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া

প্রতিষ্ঠাতা ঃ দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম

গাওহার ডাঙ্গাঁ, ফরিদপুর।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১।

রচিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা যে সকল বৈশিষ্ট্য পাই নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

ক. গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ

গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন তফসীরে সূরা ফাতেহা (পাঞ্জ সূরা) রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেন, "সূরা ফাতেহাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। এই সূরাটি প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে একবার তিলাওয়াত করিতে হয়। এই সূরা পাঠ না করিলে নামায বিশুদ্ধ হয় না। তাই এই সূরার গুরুত্ব অন্যান্য সূরার চেয়ে অনেক বেশি। যদি মুসল্লীগণ এই সূরার অর্থ ও তাফসীর সম্পর্কে অবগত হইতে পারেন তবে তাহারা নামাযে আরোও মনযোগী হইবেন। এ আশায় আমি সূরা ফাতেহার তফসীর রচনায় মননিবেশ করি।"[৪]

খ. আয়াতের ব্যাখ্যায় আয়াত উল্লেখ

গ্রন্থকার একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় আরেকটি আয়াত উপস্থাপন করেছেন। যেমন সূরা ইয়াসীনের ৬৫ নং আয়াত الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -'আজ আমি তাদের

মুখসমূহে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাতসমূহ আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা-সমূহ সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত' এর ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার সূরা হা-মীম সাজদার ২০ নং আয়াত حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- "অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে" উপস্থাপন করেছেন।[৫]

গ. আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস উল্লেখ

গ্রন্থকার আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ইয়াসীনের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় যে হাদীস[৬] উল্লেখ করেছেন তা হলো قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ- "আল্লাহ বলবেন, সম্মানিত লেখকদ্বয়ের সাক্ষ্য তো আছেই, এটি ছাড়া আজ তোমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। অতঃপর তার মুখে মোহর মারা হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বলা হবে। তারা ব্যক্তির কর্ম সম্পর্কে কথা বলতে থাকবে। অতঃপর যখন তার বাকশক্তি পুনরায় দেয়া হবে তখন সে বলবে, তোমরা ভস্ম হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। (দুনিয়াতে) আমি তোমাদের জন্য কতই না প্রতিযোগিতা করতাম।"[৭]

গ. গ্রন্থসমূহের ভাষা

গ্রন্থকার প্রতিটি গ্রন্থ সাধু ভাষায় রচনা করেছেন। যেমন সূরাতুল মুলকের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি বলেন, "(কত মহান) কত অসীম অনন্ত বরকতের ভাণ্ডার তাঁহার (কত অফুরন্ত কল্যাণময়, মঙ্গলময় তিনি, যাঁহার হাতে সারা বিশ্বের রাজত্ব ও তাহার পরিচালন ভার, অধিকন্তু তিনি সর্বশক্তিমান। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে, এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, কে তোমাদিগের মধ্যে ভালো প্রমাণিত হয় কাজের বেলায়, অথচ তিনি ক্ষমতাশালী ও ক্ষমাশীল।"[৮]

ঘ. সূরার প্রারম্ভে আয়াত, শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা উল্লেখ

গ্রন্থকার কোনো সূরার তাফসীর করার প্রারম্ভে সূরাটির অবতীর্ণের স্থান, আয়াত, শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আয়াতমালা 'আরবীতে উল্লেখ করে সেগুলোর অনুবাদ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সূরাতুর রহমানের প্রারম্ভ দেখানো হলোঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে

সূরা রহমান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৮ ঃ রুকূ ৩ ঃ শব্দ ৩৫১ ঃ অক্ষর ঃ ১৬৩৬

الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)

১. দয়াময়। ২. তিনিই শিক্ষা দান করিয়াছেন মানুষকে কোরআন। ৩. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে। ৪. তিনিই মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন ভাষা-মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য।[৯]

ঙ. বঙ্গানুবাদ উল্লেখ

গ্রন্থকার স্বীয় তাফসীরকর্মে প্রতিটি সূরার অনুবাদের পূর্বে 'আরবীতে তাসমিয়া (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) লিখে সেটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। প্রকাশিত কুরআনের পৃষ্ঠার ডানে মূল 'আরবী ও বামে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরাতুন নাবার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো:

৭৮-সূরা নাবা	মক্কাবতীর্ণ	سُوْرَةُ النَّبَا مَكِّيَّةٌ (৭৮)
রুকু-২ আয়াত-৪০	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে	শব্দ-১৭৩ অক্ষর-৭৭০

১. কোন্ বিষয়ে তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?	১. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.
২. সেই ভীষণ সংবাদ সম্বন্ধে?	২. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ.
৩. যে বিষয়ে তারা মতভেদ করিতেছে?	৩. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ.
৪. কিছুতেই নহে, শীঘ্রই তাহারা জানিতে পারিবে।	৪. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ.
৫. পুণঃ বলিতেছি, কিছুতেই নহে, শীঘ্রই তাহারা জানিতে পারিবে।	৫. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ.

চ. তাফসীরযুক্ত অনুবাদ উল্লেখ

গ্রন্থকার বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনি উল্লেখ করলেও আলাদাভাবে বিস্তারিত তাফসীর করেননি। বরং অনুবাদের পর 'তফসীরযুক্ত তর্জমা' শিরোনামে বন্ধনীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ উল্লেখ করে পাশাপাশি সেগুলোর তাফসীর করেছেন। যেমন সূরাতুর রহমানের প্রথম চারটি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

তফ্সীরযুক্ত তর্জমা

"(দয়াময়) আল্লাহ। তাঁহার মানবের প্রতি সবচেয়ে বড় দয়া এই- (তিনিই শিক্ষা দান করিয়াছেন মানুষকে কোরআন। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে) অর্থাৎ অস্তিত্ব দান করিয়াছেন মানুষকে, সেই সৃষ্টিরহস্যও অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ। নির্জীব মাটির সার নির্যাস দ্বারা সৃষ্টি করেন মানুষের খাদ্যকে। খাদ্যের সার নির্যাসের দ্বারা সৃষ্টি করেন শুক্রবিন্দুকে। কদর্য কুৎসিৎ শুক্র দ্বারা সৃষ্টি করেন মানুষের অতি সুন্দর সুকোমল দেহকে। দেহের মধ্যে সৃষ্টি করেন চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়কে। কে বিশ্বাস করিতে পারে যে, এমন নগণ্য মাটির মধ্যে এমন সুন্দর চোখ, এমন সুন্দর কান, এমন সুন্দর জিহ্বা রাখা আছে? তারপর এই জড়পিণ্ডের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করেন কত সহস্র সহস্র বুদবুদের মনোবৃত্তি ও মনের ভাবকে। তারপর আবার সৃষ্টি করেন সেই সব ভাবকে বাইরে ব্যক্ত করার জন্য ভাষা।"[১০]

ছ. সন্দেহের নিরসন

গ্রন্থকার তাফসীরের কোনো কোনো স্থানে 'সন্দেহ ভঞ্জন' শিরোনামে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করে সন্দেহের নিরসন করেছেন। যেমন সূরা ইয়াসীনের ৩৮-৪০ নং আয়াতের[১১] ব্যাখ্যায় সূর্য ঘুরে নাকি পৃথিবী ঘুরে এর সুন্দর সমাধান প্রদান করেছেন। "ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা বলেন যে, সূর্য ঘুরে না বরং পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরে। গ্রন্থকার এ কথার প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন মানুষের জ্ঞান যতটুকু ততটুকুই সে দেখতে পায়। যেমন স্টেশনে আমরা যদি একটি থামানো গাড়ীতে থাকি, আমাদের গাড়ীর পার্শ্বেও আর একটি গাড়ী থামিয়ে আছে। যদি দ্বিতীয় গাড়ীটি চলতে শুরু করে তখন মনে হয় আমাদের গাড়ীটিই চলছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। আমাদের গাড়ীটি চলেনি। তাই বুঝতে হবে মানুষ পৃথিবী নামক থামানো গাড়ীতে বাস করছে। তাই তারা পৃথিবী ঘুরে এ কথা বিশ্বাস করতে চান না।"[১২]

জ. ফযীলত উল্লেখ করা

গ্রন্থকার কোনো কোনো সূরা পাঠ করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা ইয়াসীন পাঠ করার ফযীলত বর্ণনা করে মোট সাতটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। হাদীসসমূহের সারমর্ম এইযে, সূরা ইয়াসীন কুরআন মাজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূরা। এ সূরা যারা পাঠ করেন মহান আল্লাহ হাশরের মাঠে তাদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। সূরাটির বেশ কয়েকটি নাম আছে। তম্মধ্যে অন্যতম হলো 'আযীমা'। যেহেতু কুরআন মাজীদের মধ্যে মহান সূরা তাই তাকে 'আযীমা' বলা হয়। অনুরূপভাবে এ সূরাটিকে 'কালবুল কুরআন' বা কুরআন মাজীদের প্রাণ বলা হয়। যেহেতু এ সূরা পাঠের ফযীলত অনেক তাই এটিকে 'কালবুল কুরআন' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'মানুষের শরীরে একটি গোস্তপিণ্ড আছে, যদি সেটি সুস্থ থাকে তবে তার গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর যদি সেটি নষ্ট হয়ে যায় তবে তার গোটা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। আর সে গোস্তপিণ্ডটি হলো কালব বা অন্তর।'[১৩] তাই সূরা ইয়াসীন যেহেতু কুরআন মাজীদের অন্তর, তাই এ সূরার পাঠ সর্বদা চালু রাখা জরুরী।[১৪]

অনুরূপভাবে সূরাতুল মুলকের ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে, সূরা মুলক প্রতি রাতে পাঠ করলে কবর 'আযাব থেকে নাজাত পাওয়া যায়।'[১৫]

ঝ. শানেনুযূল উল্লেখ

অনুরূপভাবে বিশেষ কোনো সূরা বা আয়াতের শানে নুযূল থাকলে গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরাতুল 'আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত কোন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় তা তিনি বর্ণনা করেছেন।[১৬]

ঞ. 'উপদেশ' শিরোনামে বক্তব্য উল্লেখ

গ্রন্থকার কোনো কোনো সূরার তাফসীর শেষে 'উপদেশ' শিরোনামে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন সূরাতুত তাকাসুর (سورة التكاثر)[১৭] এর তাফসীর শেষে উপদেশ শিরোনামে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাহলো:

"আমরা যত বড় ধনী, সম্মানীত অথবা উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী হইনা কেন, ধর্ম ও আখিরাতকে বাদ দিয়া কোনোভাবে মুক্তির আশা করিতে পারি না। ধর্ম প্রত্যেককেই ঠিক রাখিতে হইবে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তি ধর্মবিদ্যার উপর। কাজেই ধর্মবিদ্যার উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।"[১৮]

ট. ভূমিকা ও সূচিপত্র উল্লেখ

গ্রন্থকার পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে চারটিতে লেখকের আরয, মুখবন্ধ, ভূমিকা, দু'টি কথা' প্রভৃতি শিরোনামে ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। কেবল হক্কানী তফ্সীর (পাঞ্জ সূরা) গ্রন্থে কোনো ভূমিকা উল্লেখ করেননি। এ ছাড়াও তিনি কোনো কোনো গ্রন্থে সূচিপত্র উল্লেখ করেছেন আবার কোনোটিতে সূচিপত্র উল্লেখ করেননি।

ঠ. শব্দের গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা

গ্রন্থকার কোনো কোনো শব্দের গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন সূরাতুল ফাতিহার তাফসীর বর্ণনায় اللهُ শব্দের গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, اَلَهَ يَأْلُهُ (অর্থ عَبَدَ يَعْبُدُ) ধাতু হইতে اله ياله (تحير) ধাতু হইতে اِلٰهٌ শব্দ (অর্থ معبود-مالوه) গঠিত হয়েছে এবং اِلٰهٌ শব্দের সহিত ال যোগ করিয়া اللهُ শব্দ গঠিত হইয়াছে।[১৯]

ড. 'আরবী বর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি উল্লেখ

কোনো কোনো গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার 'আরবী বর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ফাতেহার তাফসীরের শুরুতেই তিনি 'আরবী বর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, 'বাংলা ভাষায় ق ك ح ہ خ ظ ذ ع غ এই অক্ষরগুলোর উচ্চারণ ঠিকমত করা যায় না। এদের উচ্চারণ পৃথক পৃথক। উপযুক্ত

কারী ও ওস্তাদের নিকট মশক করে শিখে নেয়া দরকার। তিনি ز ذ ظ কে 'য' দ্বারা ইংরেজীতে z এবং ج কে 'জ' দ্বারা ইংরেজীতে j দ্বারা প্রকাশ করেছেন অত্র কিতাবে।[২০]

ঢ. আয়াতের শব্দে শব্দে অর্থ উল্লেখ

গ্রন্থকার কোনো কোনো সূরার তাফসীর বর্ণনাকালে আয়াতের মধ্যকার প্রতিটি শব্দের অর্থ আলাদা আলাদা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ফাতেহার তাফসীর বর্ণনায় শব্দে শব্দে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম আয়াতের শব্দে শব্দে অর্থ নিম্নরূপ:

> اَلْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা, لِ-জন্য, لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য, رَبِّ-প্রতিপালক, الْعَالَمِيْنَ-সারাজাহান, اَلرَّحْمٰن-দয়াময়
>
> اَلرَّحِيْم-অত্যন্ত দয়ালু, مَالِك-একচ্ছত্র মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি, يَوْم-দিন, দিবস, اَلدِّيْنُ - কর্মফল।[২১]

ণ. সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ উল্লেখ

গ্রন্থকার আয়াতের তাফসীর শেষে তার সারমর্ম অথবা সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। যেমন **سُوْرَةُ النَّبَا** (সূরাতুন নাবা)-এর ৬-১৪ নং আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

"কিয়ামত এবং কর্মফলে যাহারা বিশ্বাস করেনা বা সন্দেহ করে তাহাদের চিন্তা করা উচিৎ যে, আল্লাহর ক্ষমতা কত অসীম, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য কত গভীর। তাহলে তাহারা অতি সহজে বুঝিতে পারিবে যে, বিশাল বসুন্ধরাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিরাট পর্বতমালাকে যিনি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, নর-নারী মানুষকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, বিদ্যাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, রাত্রী-দিবাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশাল সুদৃঢ় সপ্ত আকাশকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্যকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মেঘকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি মানুষকে মৃত্যু দিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিয়া তাহাকে তাহার কর্মফল দিতে পারিবেন না?[২২] নিশ্চয়ই পারিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর পরিভাষায় ইহাই কিয়ামত বা আখিরাত। ইহাকে বলে শেষ বিচার দিবস[২৩] বা মীমাংসার দিন।"[২৪]

অনুরূপভাবে তিনি সূরা ইয়াসীন[২৫] ও সূরা মুয্যাম্মিলের[২৬] সারমর্মও উল্লেখ করেছেন।

ত. আয়াতের শিক্ষা উল্লেখ

গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে 'আয়াতের শিক্ষা' শিরোনামে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও সূরার শিক্ষাসমূহ উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ইয়াসীনের প্রথম রুকুর শিক্ষা আলোচনা করেছেন।[২৭]

থ. কবিতার উদ্ধৃতি উল্লেখ

গ্রন্থকার তাফসীরের কোনো কোনো স্থানে কবিতার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরাতুল ফাতিহার শেষ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে গ্রন্থকার কবি গোলাম মোস্তফা রচিত নিম্নোক্ত কবিতার উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন।

'সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি,
চালাও সে পথে যে পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি;

যে পথে তোমার চির অভিশাপ
যে পথে ভ্রান্তি চির-পরিতাপ,
হে মহাপরিচালক! মোদেরে কখনো
করো না সে পথগামী'।[২৮]

এ ছাড়াও আল্লাহর বান্দাগণের সহ্যগুণ সম্পর্কে বর্ণনাকালে গ্রন্থকার বলেন,

সহিতে এসেছি মোরা সহিয়া যাইব,
জ্বলিতে এসেছি মোরা পুড়িয়া মরিব।[২৯]

দ. ফিকহী মতামত আলোচনা

ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা, এ সুরা পাঠ শেষে 'আমিন' আস্তে নাকি সশব্দে বলতে হবে তার বিরোধপূর্ণ আলোচনা শেষে গ্রন্থকার নিরপেক্ষ সমাধান প্রদান করেছেন।[৩০]

ধ. বিসমিল্লাহ সম্পর্কিত আলোচনা

বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللهِ) সুরা ফাতিহার অংশ কিনা সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, এটি সুরা ফাতিহার কোনো আয়াত নয় বরং সুরাতুন নামলের একটি আয়াত।[৩১]

ন. পরিশিষ্ট উল্লেখ

গ্রন্থকার কোনো কোনো সূরার পরিশিষ্ট উল্লেখ করেছেন। যেখানে সমগ্র সূরার মূলভাব ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা ইয়াসীনের পরিশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২]

প. সহায়ক গ্রন্থাবলী

গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থসমূহ যে সকল গ্রন্থের সহায়তায় রচনা করেছেন তা হলো, তাফসীরে ইবন 'আব্বাস, তাফসীরুল কাবীর, আদ-দুররুল মানছুর, তাফসীর ইবন কাসির, রুহুল মা'আনি, আল-বাহরুল মুহীত, তাফসীরে জালালাইন, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, আল-মিসবাহুল মুনীর, আল-মাওরিদ, আল-কামুসুল মুহীত, লিসানুল 'আরব প্রভৃতি।

উপসংহার

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) কুরআন প্রেমীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি কুরআন এর উপর যে গবেষণা করেছেন তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থগুলোতে। তিনি তাঁর উল্লিখিত পাঁচটি পুস্তকে কুরআন মাজীদের প্রায় অর্ধশত সূরার তাফসীর করেছেন। যদিও সূরাগুলো ছোট, কিন্তু এগুলোর মর্মার্থ খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। বিশেষ করে ত্রিশপারার মধ্যে যে সকল সূরার তাফসীর করা হয়েছে তাতে প্রতিটি পাঠকের হৃদয় বিগলিত হয়েছে। কেননা প্রাত্যহিক নামাযে এ সূরাগুলোই পাঠ করা হয়ে থাকে এবং বাংলার ঘরে ঘরে ফজর নামায শেষে যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা হয় তখনও এ সূরাগুলো বেশি বেশি পাঠ করা হয়ে থাকে। তাই তাঁর তাফসীর গ্রন্থসমূহ সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে এবং পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। তাঁর এ সকল গ্রন্থ পাঠকালে পাঠকগণের নিকট কম-বেশি মুদ্রণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ে। যা অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মান ক্ষুন্ন করেনি এবং তাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। ফলে তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট সমভাবে সমাদৃত। যদি সে সকল মুদ্রণগত ত্রুটি সংশোধন করা যায় তবে গ্রন্থসমূহের মান আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থসমূহের কোনো কোনোটি বাজারে পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনটি পাওয়া যায় না। যদি কোনো প্রকাশনা সংস্থা এ সকল গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশ করতো, তবে কুরআন প্রেমী বাংলাভাষী পাঠকগণ আরো উপকৃত হতো। অপরদিকে গ্রন্থসমূহ খণ্ডাকারে রচিত হওয়ায় পাঠকগণ তাদের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত কপি ক্রয় করেন অতি

সহজে। কেননা, সকল শ্রেণির পাঠক বিশেষ করে যারা তাফসীর বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে চান তাদের জন্য এ সকল গ্রন্থ মহামূল্যবান সম্পদ।

তথ্যনির্দেশ

[১] বিশিষ্ট তাফসীরকারক আবু হাইয়্যান (৬৫৪–৭৪৫ হি.) বলেন, هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ كَيفِيَةَ النطْق، وَ مَدلُولَاتها، وَأَحْكَامهَا الإفْرَادِيةِ والتَركِيبِية، وَمَعَانِيْهَا الَّتِىْ تحمِلُ عَلَيْهَا حَالَة التَّرْكِيْبِ، وَتَتمات لِذَالِكَ.‘তাফসীর এমন একটি শাস্ত্র যাতে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, সেগুলোর অর্থ এবং বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর আলোচনা করা হয়েছে।’ দ্র. আবূ হাইয়্যান, *আল–বাহরুল মুহীত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪১২/১৯৯২) পৃ. ১৩।

[২] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় স্থানীয় পাটগতির এক হিন্দু পণ্ডিতের কাছে। অতঃপর তিনি টুঙ্গিপাড়া ও বরিশালের সুটিয়াকাঠি স্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্ত করে ১৯১৫ সালে নোয়াপাড়ার বাঘড়িয়া হাইস্কুল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণী পাস করেন। অতঃপর ১৯১৯ সালে কলকাতা ‘আলিয়া মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭), মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমিরী (১৮৭৫-১৯৩৩), মাওলানা সৈয়দ নবীর ইসলামিয়া (১৮০৫-১৯০২) প্রমুখের নিকট আরো চার বছর ধরে কুরআন হাদীসসহ বিভিন্ন মাস'আলা-মাসায়েল শিক্ষা শেষে সর্বোচ্চ সনদ অর্জন করেন। পরবর্তীতে মাওলানা আশরাফ ‘আলী থানভী (র)-এর দরবারে অবস্থান করে তার কাছ থেকে তরিকতের খিলাফত লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণের পর দেশের মানুষকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে ব্রাক্ষনবাড়ীয়ার ইউনুসিয়া মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৩৫ সালে বাগেরহাটের গজারিয়া ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ঢাকার লালবাগের হামেআ কোরআনিয়াতে মোহতামিম হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ‘আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন’ নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তার অবদান অপরিসীম। তিনি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ২১ জানুয়ারী ইন্তিকাল করেন। দ্র. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, *সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহ) জীবনী* (ঢাকা: খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ২৩-১৫৩।

[৩] মাওলানা আজিজুল হক বাংলাদেশে ‘শায়খুল হাদীস’ নামে সকলের নিকট সমধিক পরিচিত। তিনি সহীহ বুখারী পূর্ণাঙ্গরূপে বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি ঢাকার জামিয়া কোরআনিয়া মাদরাসাসহ বিভিন্ন কাওমী মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

[৪] মাওলনা শামছুল হক ফরিদপুরী, *তফসীরে সূরা ফাতেহা* (পাঞ্জ সূরা) (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৮) পৃ. ১।

[৫] হযরত মাওলানা শামছুল হক, *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)* (ঢাকা: এমদামিয়া লাইব্রেরী, ২য় মুদ্রণ, মার্চ ২০০২), পৃ. ৪৩।

[৬] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি), পৃ. ২২৮০।

[৭] *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ৪৪-৪৫।

[৮] তদেব, পৃ. ১১৯।

[৯] তদেব, পৃ. ৭৬।

[১০] তদেব, পৃ. ৭৭-৭৮।

[১১]. আয়াতগুলো হলো: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ . 'সূর্য তার নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার ন্যায় হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলেনা দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।'

[১২] *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ২৮-২৯।

[১৩] মূল হাদীসটি হলো: اَلَا وَ اِنَّ فِيْ الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ.

দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান (সাহারানপুর: মাকতাবাই রাশিদিয়্যাহ, তা বি.), পৃ. ১৩।

[১৪] মাওলানা শামছুল হক (র) ফরিদপুরী, *ছূরা ইয়াছীন শরীফ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম সং. ১৯৭৯), পৃ. ১-২।

[১৫] *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ১৩২।

[১৬] মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র), *হাক্কানী তাফসীর, আমপারা* (ঢাকা: হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড, ৪র্থ সং. ২০০৪), পৃ. ২১৪।

[১৭] সূরাতুত তাকাছুর কুরআন মাজীদের ১০২ নং সূরা।

[১৮] *হাক্কানী তাফসীর, আমপারা*, পৃ. ২১৪।

[১৯] *হাক্কানী তাফসীর (আলিফ-লাম-মীম)*, পৃ. ৩৮।

[২০] *তফসীরে সূরা ফাতেহা* (পাঞ্জ সূরা) পৃ. ১।

[২১] তদেব পৃ. ৩।

[২২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, . كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- 'কেমন করে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যুদান করেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।' দ্র. সূরাতুল বাকারা ২:২৮।

[২৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ . ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ . يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.- 'আপনি জানেন বিচার দিবস কী? অতঃপর আপনি জানেন বিচার দিবস কী? যে দিন কেউ কারও কোনো উপকার করতে পারবে না এবং সে দিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।' দ্র. সূরাতুল ইনফিতার, ৮২:১৭-১৯

[২৪] *হাক্কানী তাফসীর, আমপারা*, পৃ. ১১।

[২৫] *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ৫৮।

[২৬] *তদেব*, পৃ. ১৩৩।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ১৩।

[২৮] *তফসীরে সূরা ফাতেহা (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ৪৭।

[২৯] *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ৩৬।

[৩০] গ্রন্থকার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠের পর আমিন আস্তে ও সশব্দে বলা উভয় পক্ষেরই হাদিস উপস্থাপন করেছেন এবং সমাধান প্রদান করেছেন যে, আমিন আস্তে এবং সশব্দে উভয় প্রকার পড়াই বৈধ। দ্র. *তফসীরে সূরা ফাতেহা (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ২৬।

---

[৩১] তদেব, পৃ. ১২; আয়াতটি হলো, إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ‘নিশ্চয় এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে। আর নিশ্চয় এটা পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।’ দ্র. সূরাতুন নামল, ২৭:৩০।

[৩২] *হক্কানী তফসীর (পাঞ্জ সূরা)*, পৃ. ৬০।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

Tasawuf in the light of the Qur'an and Hadith : An Overview

Dr. Shah Mukhtar Ahmad*

Abstract : Tasawuf is one of the important branches of Islam. It has been defined as 'the apprehension of divine realities. Its main sources are the holy Qur'an and the Hadith but some Western Scholars have tried to trace Tasawuf from other sources. However, Islamic scholars strongly state that Tasawuf was originated during the period of the Prophet Muhammad (sm) and has been gradually developed till today. Although at the time of Prophet (sm) and his companions, the term Tasawuf was not exist as a distinct discipline. Rather, it was inseparably and essentially present in the spirituality of Islam. It was a reality without a name which was practiced in the daily lives of the companions through their spiritual initiations at the hand of the Prophet (sm). He was their 'living model' and their source of inspiration. The companions of the Prophet (sm) could historically be regarded as the first Sufis, because they regularly held gatherings of invocation (Zikr) and they were a living example of this Qur'anic verse: "Restrain yourself together with those who pray to their Rabb morning and evening, seeking His Face. Do not turn your eyes away from them in the quest for the good things of this life; nor obey anyone whose heart we have made heedless of our remembrance, who follows his own lust and gives loose reign to his desires." (Qur'an, Al-Kahaf 18:28). This paper is a humble attempt to fill up the gap on this point and focus on Tasawuf in the light of the Qur'an and Hadith.

Tasawuf is a term which is used for the inner or esoteric dimension of Islam that is also supported and complemented by outward or exoteric practices of Islam, such as Sharia. It can also be explained from the perspective of the three basic religious attitudes mentioned in the Qur'an. These are the attitudes of Islam, Iman and Ihsan. Islam means Submission to the Will of Allah which is the minimum qualification for being a Muslim.[1] Technically, it implies an acceptance, even if only formal, of the teachings contained in the Qur'an and the Traditions of the Prophet Muhammad (sm). Iman is a more advanced stage in the field of religion than Islam. It designates a further penetration into the heart of religion and a firm faith in its teachings.[2] Ihsan is the highest stage of spiritual advancement in Religion. At this stage the devotee has such a realization of the religious truths which amounts almost to their direct vision. This quality of Ihsan, is described in the Tradition by the Prophet (sm) as: أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ "Ihsan is to adore Allah as though thou do see Him for even if thou do not see Him, He nonetheless sees thee."[3] According to these three stages of religiosity, Tasawuf may be defined as the spiritual progress of a devotee from the initial stage of Islam to the final stage of Ihsan

Definition of Tasawuf

Tasawwuf is an Arabic word which is used for the process of realizing ethical and spiritual ideals. Its literal meaning is "to become a Sufi"[4] and it is generally translated

---

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi.

in English as Sufism. The etymologies for the term Sufi are various. The primary meaning of the term comes from *suf*, "wool,"[5] the traditional ascetic garment of Prophets and Saints in the Near East. The term has also been connected to *safa›* , "purity," or *safwa*, "the chosen ones," emphasizing the psychological dimension of purifying the heart and the role of divine grace in choosing the saintly. Another etymology links Sufi with *suffa* or bench, referring to a group of poor Muslims contemporary to the Prophet Muhammad (sm), known as the People of the Bench, signifying a community of shared poverty. Another view is that the word Sufi is derived from the Arabic word *saff*, which means *line* or *row*, referring here to those early Muslim contemporaries of the Prophet (sm) who stood in the first row during prayer, having reached the mosque well in time.

The historian and philosopher Abu Rayhaan Al-Bayrooni (d.440 AH) mentioned that the word "Sufi" springs from the Greek term "Sophia" meaning wisdom. Though one cannot confirm nor deny the authenticity of this derivation, it is certain that Sufism during its course of development was highly influenced by the Greek and Hindu philosophies. This opinion is held by some important figures in Sufism like al-Qushayriee and al-Hujwairi (d.456 AH). They say it is just a given title. Such a claim is a strange and very weak one, because none of titles adopted by any sect lacks a meaning associated with it. These were the most important sayings regarding the origin of the word Tasawuf or Sufism. Such differences regarding this term is due to the mystic nature that folds Sufism in esoteric concepts which is open to all kinds of interpretations. Any Sufi master could add his own methodology and concepts based upon his own experiences. However, the ideal qualities evoked by these derivations are the key to the concept of *tasawwuf* as formulated by authors of the tenth century, such as Sulami (d. 1021). While acknowledging that the term Sufi was not present at the time of the Prophet (sm), Sufi theorists maintained that this specialization in spirituality arose in parallel with other disciplines such as Islamic law and Qur'anic exegesies. But the heart of Tasawuf, they maintained, in the ideal qualities of the Prophet Muhammad (sm) and his association with his followers. Many sufi scholars define it in many ways. Each definition uncovers a different aspects of Tasawuf, each correct in its proper context, and to grasp Sufism as a whole, one must consider as wide a range of definitions as possible. In order to clarify the nature of Sufism, therefore, the following definitions have been chosen and accumulated. A great Islamic saint, Maruf al Kharki defines it as "The apprehension of Divine Realities".[6] Another Islamic scholar Zunayd al Bagdady defines it as "The purification of the heart from associating with created beings, separation from natural characteristics, suppression of human qualities, avoiding the temptations of the carnal soul, taking up the qualities of the spirit, attachment to the sciences of the reality, using what is more proper to the eternal, counseling all the community, being truly faithfully to God and following the Prophet (saw) according to the law".[7] Allama Suhrawardi, a great sage was asked about Sufism and replied, "Its beginning is God, but it has no end".[8] It is also said that "Tasawuf or Sufism is to abandon one's own opinion and submit to God's will".[9] Thus, the essence of Sufism lies in the purification of the senses and the

will, the building up of inner and outer life and the attainment of eternal felicity and blessedness by apprehending the Divine Realities. All definitions of Tasawuf described ethical and spiritual goals and functioned as teaching tools to open up the possibilities of the soul. In practice, the term Sufi was often reserved for ideal usage, and many other terms described particular spiritual qualities and functions, such as poverty (*faqir*, *darvish*), knowledge (*ʿ alim*, *ʿ arif*), mastery (*shaykh, pir*), and so on.

Nature and Purpose of Sufism

- The goal of Sufism is not to acquire an intuitive knowledge of reality, but to be a servant of God. There is no stage higher than the stage of servanthood (abdiyat), and there is no truth beyond the Shari 'ah.
- The object of Sufi Tariqah is nothing but to produce conviction in the beliefs of the Shari 'ah and to facilitate the observance of its rules.
- The experience of fana[10] and baqa[11] is the essence of walayat; its purpose is to produce conviction.
- Visions and auditions are not the end of the Sufism; they are mere shadows, and God transcends them absolutely.

Tasawwuf in the Qur'an and Hadith

Tasawuf is not a new concept in Islam. It has been originated from the teachings of the Qur'an and Hadith. Like other branches of Islam its main sources are the Qur'an and Hadith. All Sufis obey the Holy Qur'an implicitly and also follow the Prophet's traditions (Hadith) rigidly. According to a great Islamic scholar Dr. Syed Nasr, Origin of Sufism is the Qur'an and Hadith that has been described earlier. The great Sufi of Baghdad, Sheikh Shihabuddin Suharwardi also writes in his famous book on Sufism entitled 'Awariful Marif' that though the term 'Sufi is not mentioned in the Holy Qur'an but the words Such: Mutawakkilin, Sadiqin, Salihin, Siddikin, Muqarribin, Aj-Juhud, Ihsan and Tajkiatunnafs etc. connote the same meaning which is expressed by Sufi. According to Dr. Yusuf Hussain Khan, all the mysticism is born in the bosom of Islam.[12] No Sufism without Islam. Sufism is the spirituality or mysticism of religion of Islam. Mysticism makes its appearance, as an inward dimension. A great Sufi of Baghdad, Zunaid Bagdadi says that Sufism has been originated from the Holy Qur'an. One who does not read the Holy Qur'an and does not write the Hadiths, does not have right to talk about Sufism. Zunaid Bagdadi also rightly remarks that the origin of Sufi tendency in Islam, has been matter by wide divergence of opinion and Sufi has been influenced by some external factors.

lbn Khaldun comments in his Muqaddimah that Sufism was one of the religious sciences which was born in Islam.[13] The way of the living of Sufis has been appreciated by the companions of the Prophet (sm), the Successors and the Successors of the Successors. The fundamental principles of Sufism are found in the companions and in the earlier Muslims.

According to them, Tasawwuf means “absolute love of God and selfless service of His creation under Shariat” because there is a clear indication in the Holy Qur’an that “God loves those who love Him”.[14] When a Sufi reaches the pinnacle of his career, he is above all worldly things. He then enters the domain of the “Spiritual World” the existence of which is as certain as this material world, Ma’arifat- Thus when the lover and the ‘Beloved’ are in divine harmony and unity, there is nothing else but a peaceful happiness, a rare type of happiness which no man or human intellect can describe on paper. It is this reciprocal link of divine love between God and man which is called Ma’arifat in Sufi vernacular.[15] Maulana Abul Kalam Azad clarifies this point nicely in his Tarjumaan-ul-Qur’an. He says “Again and again the Qur’an has revealed the fact that the relation of God with man is nothing but a relation of their ‘mutual love’.[16]

However, a lot of people have misunderstandings about Tasawwuf. Some of them think that it is something beyond the Qur’an and Hadith. Some delinquent Sufis as well as superficial Ulama, although on the opposite ends of the spectrum, are together in holding this mistaken notion. Consequently the first group has shunned the Qur’an and Hadith while the second group has shunned Tasawwuf. Actually, although the term Tasawwuf, like many other religious terms in use today, evolved later, the discipline is very much part of the Shariah. The department of the Shariah relating to external deeds like Salat and Zakat is called Fiqh while the one dealing with the internal feelings and states of the heart is called Tasawwuf. Both are commanded in the Qur’an, “Verily, he who has purified the heart is successful and he who has despoiled it has lost.”[17] Thus while commanding Salat and Zakat, the Qur’an also commands gratefulness and love of Allah and condemns the evil of pride and vanity. Similarly, in the books of Hadith, along with the chapters on Ibadat, trade and commerce, marriage and divorce, are to be found the chapters on Riya, Takabbur, Akhlaq etc. These commands are as much a mandatory requirement as the ones dealing with external deeds.

On reflection it will be realised that all the external deeds are designed for the reformation of the heart. That is the basis of success in the hereafter while its despoiling is the cause of total destruction. This is precisely what is known technically as *Tasawwuf*. Its focus is *Tahzeeb-I-Akhlaq* or the adornment of character; its motive is the attainment of divine pleasure; its method is total obedience to the commands of the Shariah. A great scholar lbn Khaldun comments in his Muqaddimah that Tasawuf was one of the religious sciences which was born in Islam. The way of the living of Sufis has been appreciated by the companions of the Prophet (sm), the Successors and the Successors of the Successors. The fundamental principles of Sufism found in the companions and the Muslims of old time are as follows.

i. Kashf is a source of knowledge.

ii. God is unique, eternal and all-pervading.

iii. The world is transitory.

iv. God is near to His creatures.[18]

All these principles are supported and recognised with the Qur'anic verses and the traditions of the Prophet Muhammad (sm). The following quotations from the holy Qur'an and Hadith substantiate the claim that Tasawuf is reflected in the Qur'an and Hadith.

Quotations from the Qur'an :

Allah said,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"And when my servants ask you concerning Me. (tell them), I am nearby indeed, I answer the prayer of the supplicant when he prays to me, so they should respond to my call and believe in Me."[19]

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"His knowledge and suzerainty extend over the heavens and the earth and the care of them both tries Him not. He is the supreme, the Great."[20]

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"Soon Allah will produce a people whom He will love as they will love Him."[21]

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

"So, they found one of our servants on whom we had bestowed mercy from ourselves and whom we had taught knowledge from our own presence."[22]

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Allah is the extensive light of the heavens and the earth. His light can be compared to a pillar on which is a lamp. The lamp is inside a crystal globe. The globe of glass is as if it were a glittering star. It is lit by (the oil of) a blessed olive tree which belongs neither to the east nor to the west. Its oil is likely to glow forth of itself even if no fire touch it. This lamp is a combination of many lights over and over. Allah guides towards His light whoever desires (to be enlightened). And Allah sets forth excellent parables for the people and Allah alone has full knowledge of everything."[23]

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

"Call on no other god beside Allah. There is no God but He. Everything (that exists) will perish - except His own Face." [24]

وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"What dark suggestions his soul makes to him; for we are nearer to him than his jugular vein." [25]

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ– وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ – فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ – يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.

"All that is on earth will perish but will abide (forever) the Face of thy Lord, full of Majesty, Bounty and Honour. Then which of the favours of your Lord will you deny? Of Him seeks (its need) every creature in the heavens and on earth. Every day in (new) splendour doth He shine?" [26]

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"He is the First and the Last, the Evident and the Immanent." [27]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ,

"And those who strive hard in Our cause We will certainly guide them in the ways that lead to Us. Verily, Allah is always with the doers of good." [28]

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا,

"Or prolong it (a little more) and keep on reciting the Qur'an distinctly and thoughtfully well." [29]

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ,

"Behold! The friends of Allah, neither fear shall overwhelm them, nor shall they (ever) remain in grief." [30]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"He it is Whohas raised among the Arabs a grand messenger (who hails) from among themselves, who recites to them His revelations to rid them of their impurities and teaches them the Book and Wisdom, though before (the advent of the Prophet) they…"[31]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"Verily, that person who purifies himself truly will succeed (both in this life and in the hereafter), and remembers and extols the name of his Lord andoffers Prayers."[32]

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"Verily Allah has bestowed a favour on the believers when He has raised amongst them a great Messenger from amongst themselves who recites to them His Messages, and purifies them and teaches them the Book and the wisdom; although before this they were steeped in flagrant error."[33]

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ,

"The day when wealth will not avail, nor sons (be of any good), But (he alone will be saved) who comes to Allah with a sound and pure heart." [34]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"O you who believe! keep your duty to Allah and be with the truthful." [35]

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا,

"And those who obey Allah and this perfect messenger, it is these who are with those upon whom Allah has bestowed His blessings (in this life and Hereafter) the Prophets, the Truthful (in their belief, words and deeds), and the bearers of Testimony (to the truth of thr religion of Allah by their words and deeds), as well as the Martyrs, and Rightious (who stick to the right course under all circumstances), and how excellent companions they are!"[36]

Quotations from the Hadith

The Prophet Muhammad (sm) said,

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،

God said: "My servant continues to draw near to me through works of suprogation until I love him. And when I love him I am his ear so that he hears by Me and his eyes so that he sees by me and his hands so that he takes by Me.[37]

مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ النَّقِيِّ التَّقِيِّ الْوَدَاعِ اللَّيِّنِ

God said: "My earth and My heaven contain Me not but the heart of My faithful servant containeth Me".[38]

كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا في عرفوني.

God said: "1 was a hidden treasure and I desired to be known, I created the creation in order that I might be known".[39]

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

O "Whosoever knows himself knows his Lord". [40]

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Beware! There is a piece of flesh in the body if it becomes good (reformed) the whole body becomes good but if it gets spoilt the whole body gets spoilt and that is the heart. **[41]**

وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه – وهو التعبد في الليالي ذوات العدد

He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship (Allah alone) continuously for many days. [42]

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاء

"The world is sweet and green (alluring) and verily Allah is going to install you as vicegerent in it in order to see how you act. So avoid the allurement of women: verily, the first trial for the people of Isra'il was caused by women."[43]

لِيبْعَثن الله أَقْوَامًا يَوْم الْقِيَامَة فِي وُجُوههم النُّور على مَنَابِر اللُّؤْلُؤ يَغْبِطهُمْ النَّاس لَيْسُوا بِأَنْبِيَاء وَلَا شُهَدَاء قَالَ فجثى أَعْرَابِي على رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله جلهم لنا نعرفهم قَالَ هم المتحابون فِي الله من قبائل شَتَّى وبلاد شَتَّى يَجْتَمعُونَ على ذكر الله يذكرُونَهُ

"May Allah send them resurrection on the Day of Resurrection in their faces light on the platforms of pearls people are not captivated by Prophets nor martyrs said Fajti Arabi on his knees and said, O Messenger of Allah Glahm to us know them said they are lovers of God from various tribes and the various countries meet on the mention of God remind him"[44]

سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلِ الْكَرَمِ ، فَقِيلَ : مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ

"The people of the day will know the people of the vineyard. He said: "Who are the people of the vineyard, O Messenger of Allaah?" He said: "The people of the masculine councils in the mosques."[45]

If we think deeply and analyse the above mentioned Qur'anic verses and the traditions of the Prophet (sm) we can see that each of the verses and traditions contains and expresses the spirit, theme and features of tasawuf directly and indirectly. Examples include words like *tajkiatun nafs, zikrullah, majaliszzikr, taqwallah, sadiqeen, salihin, muhsinin, muttaqin and qalb-e-salim* etc. among others that have been quoted in the discussion above. In addition, we can also see that in appreciation of man's own wonderful creation, God has expectation nothing but his love and devotion only". A true devotee of God thus becomes His true lover. And, at this stage, the devotee is very near to God. Having attained the position of God's "beloved", he soars high in the spiritual World or the so-called "other- worldliness, and this is the ultimate goal of a Sufi-the true meaning of all his devotion and Mujaheds (strivings).The Qur'an gives a central place to its religious principles in order to guide the conduct of man in his life, and that is why all Sufis follow it scrupulously to develop their love of God and win His pleasure and blessings. God says: "O Mohammed (sm), we have given you the Book as well as the secrets of our Hikmat (Divine knowledge) and we shall tell you those things which you never knew." As promised, the Prophet (sm) receive this divine wisdom or the secret knowledge and in turn, imparted and passed it on to some of his very near associates, especially to Hazrat Ali, who were indeed "the source of Light" or the guiding stars of Tasawwuf for the succeeding generations of a particular class of Muslim ascetics who played such a glorious role in the service of mankind at various critical junctures of Islamic History.

Conclusion

In concluding remark, it can be certainly said that Tasawuf has played a tremendous role in the formation of Muslim society for ages. It is a movement which aims at making people good and better Muslims. It is a call to them to actualize truly and internally those teachings of Islam they have accepted only formally or intellectually as part of their inheritance. It is said that it is to Islam what the heart is to body. There is no Sufism without Islam because Sufism is the spirituality or Mysticism of the religion of Islam. So everybody should practice Tasawuf (Sufism) in their practical lives.

Notes & References

[1] Syed Mahmudul Hasan, *Islam* (Dhaka: Islamic Foundation, 2002), p. 46

[2] *Ibid, p. 50*

[3] Imam Muslim al Naisapuri, *Sahih Muslim,* Kitab al Iman, Hadith no. 40

[4] *Islam, Ibid,* p. 307

[5] Suhrawardi, *The Awarif-ul-Ma’arif* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf T. L. Clark, 1973), p.8

[6] Dr. Muhammad Abdul Haq Ansari, *Sufi Perspective on Experience and Reality* (New Delhi: Markazi Maktaba Islami Publishers, 2015), p. 9

[7] *Islam*, Ibid, p. 307

[8] *The Awarif-ul-Ma’arif,* Ibid, p.11

[9] Dr. Muhammad Abdul Haq Ansari, *Sufism and Shariah* (New Delhi: Markazi Maktaba Islami Publishers, 1997), p. 31

[10] Fana: Literally, ‘extinction’. In Sufism it means to die to the world and to subsist in God alone. This state of subsisting in God is called baqa and is the end of the sufi journey. vide, *Sufism, op.cit,* p. 222

[11] Baqa: Literally, ‘remaining’, ‘subsisting’. It is final stage of a mystic who has been annihilated (*fana*) in God and lives in Him and through Him. vide, *Ibid.*

[12] Sufi Perspective on Experience and Reality, *Ibid*, p. 30

[13] Kamal Khalil Yazijee, As Sufiyyah baynal Ams wal Yawm, (Lebanon: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 1997), p. 112; Ibn Taimiyyah, Majmu al Fatawa, vol-10, pp. 366-67; Ibn al Jawzee, Tablees Iblees, pp. 156-58

[14] M.M. Sharif, *A History o Muslim Philosophy* (Delhi: Adam Publishers, 1961), p. 75

[15] *Ibid,* p.81

[16] *Sufi Perspective on Experience and Reality, Ibid, p.11*

[17] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, Al Quran, Surah al Shams, vers no – 09-10

[18] *Sufism and Shariah, Ibid, p.33*

[19] Al Quran, 02 : 186

[20] Al Quran, 02 : 255

[21] Al Quran, 05 : 54

[22] Al Quran, 18 : 65

[23] Al Quran, 24 : 35

[24] Al Quran, 28 : 88

[25] Al Quran, 55 : 26 - 29

[26] Al Quran, 50 : 16

[27] Al Quran, 57 : 03

[28] Al Quran, 29 : 69

[29] Al Quran, 73 : 04

[30] Al Quran, 10 : 62

[31] Al Quran, 62 : 02

[32] Al Quran, 87 : 14-15

[33] Al Quran, 03 : 164

[34] Al Quran, 26 : 88-89

[35] Al Quran, 09 : 119

[36] Al Quran, 04 : 69

[37] Muhammad ibn Ismail al Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Egypt: Daru tawk an-najat, 1st edition 1422 hijri), vol-08, p.105, Hadith No 6502

[38] Imam ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa* (Saudia Arabia: Majma` al-mulk Fahad, 1st edition 1995 CE), vol-02, p.384

[39] Ismail Ibn Muhammad al-Ajaluni, *Kasful khafa* (Ciro: Maktabah al-Kudsi, 1st edition 1351 hijri), vol-02, p.132, Hadith No 2016

[40] Abu Nuaim Ahmad Ibn Abdullah Asbahani, *Huleatul Awulia* (Byrut: Darul Kitab al-Arabi, 1st edition 1974 CE), vol-13, p.208

[41] *Sahih al-Bukhari*, op.cit, vol-01, p.20, Hadith No 52

[42] *Ibid*, p.07, Hadith No 3

[43] Muslim Ibn Hajjaj an-Nisabury, *Shahih Muslim* (Byrut: Daru Ihya al-Turas al-Arabi, without date), vol-04, p.2098, Hadith No 2742

[44] Jakiuddin al-Munjeri, *At-Targib wat-Tarhib* (Byrut: Darul Kutub Ilmiah, 1st edition 1417 hijri), vol-04, p.12, Hadith No 4573

[45] Muhammad Ibn Hibban, *Shahih Ibne Hibban* (Byrut: Muassasah ar-Risalah, 1st edition 1988 CE), vol-03, p.98, Hadith No 816

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : লক্ষ্য ও মূলনীতি

ড. মো. আব্দুল হান্নান*

Abstract: Religion is an important and sensitive matter in human life. All religions of the world teach man to be logical, liberal and self-restrained and inspire to obtain perfection of one's own character by gaining the highest values of life. All religions give message of peace. It is not possible to gain peace without religion. So religion and peace is complimentary to each other. But it is a matter of that amity and fellow-feeling is spoilt everywhere by using great regret religion. In order to avoid this unstable environment, we have to follow a way which will help us to build a stable society and state and each other's love will enter in the depth of heart. So this desirable path is inter-religious dialogue. It is an appropriate and important matter for age. It's actively is noticeable in different countries including Bangladesh. In this article, introduction, aim and principles of inter-religious dialogue have been highlighted.

১. ভূমিকা (Introduction)

বিশ্বায়নের এ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পরের নিকট আসছে, একত্রিত হচ্ছে ও একসঙ্গে কথাবার্তা বলছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন যেমন সহজতর হয়ে উঠেছে, তেমনি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি ইত্যাদির মাঝে মতপার্থক্য, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পরমত অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১] এ পরিস্থিতি অবসানপূর্বক পারস্পরিক অনুপম পরিবেশ সৃষ্টির অনন্য মাধ্যম হলো 'সংলাপ'।

অতীতে ধর্মগুলো স্ব স্ব গণ্ডিবদ্ধ আচারনিষ্ঠার কারণে পারস্পরিক সহযোগিতায় অক্ষম ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধীতামূলক মনোভাব পোষণ করতো। কিন্তু সময়ের বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির কারণে পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একটি অংশ বিশ্বশান্তির নিমিত্তে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, ধর্মানুসারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি না হলে অধার্মিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়ে পৃথিবী আরও সংকটের দিকে ধাবিত হবে। পরিণামে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও দর্শন বিপথগামী হবে। তাই যে কোন মূল্যে মানব সমাজের গঠনকাঠামোর নৈতিক দিকটাকে গুরুত্ব দিতে হবে।[২] আর এজন্য প্রয়োজন 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ'।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সুত্রপাত ঘটে বহু শতাব্দি পূর্বে। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩] ষোড়শ শতাব্দিতে মোঘল সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪]১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে (Parliament of World Religions) ধারাবাহিকভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা পৃথিবী জুড়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৫] পরবর্তীতে আমেরিকাসহ এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশেই এই জাতীয় ধর্মসভার আয়োজন করেন। খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ মহোদয়গণের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিক মিশনগুলো হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে মৈত্রী ভাব প্রতিষ্ঠায় রত।[৬]

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়া অনেক দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ তাঁদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ, বই ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্বমানবের বিবেককে মানবতা ও ধর্মের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছেন। তাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সংলাপের মাধ্যমে যাতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়, সেদিকেই সকলের দৃষ্টি দেয়া একান্ত কর্তব্য।

২. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পরিচয় (Definition of Interreligious Dialogue)

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিভাষাটি ইংরেজি ভাষায় Interreligious Dialogue (আন্তঃধর্মীয় সংলাপ) অথবা Interfaith Dialogue (আন্তঃপ্রত্যয় সংলাপ) অথবা Interreligious Harmony (আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি) অথবা Interbelief Dialogue (আন্তঃবিশ্বাস সংলাপ) নামে পরিদৃষ্ট হয়। তবে Interreligious Dialogue নামে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।[৭] আরবী ভাষায় এটি 'আল-হিওয়ার বাইনাল আদইয়ান' (الحوار بينالأديان) নামে প্রচলিত। বিষয়টির উৎপত্তি প্রাচীনকালে হলেও বর্তমান সময়ে এর ব্যবহার ও বিকাশ লক্ষণীয়। এটি মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা আরম্ভ করলেও বিংশ ও একবিংশ শতাব্দিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে ব্যাপক প্রসার ঘটে।[৮] বাংলাদেশেও এর চর্চা ও অনুশীলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে 'সংলাপ' (Dialogue) পদবাচ্যটির ব্যবহার বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বাংলা ভাষায় 'সংলাপ' একটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যা দু'টি শব্দ (সম্+লপ্+অ) এর সমষ্টি। এর অর্থ আলাপ, কথোপকথন, নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ইত্যাদি।[৯] সংলাপ শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, 'সং' শব্দের অর্থ সম বা সমান।

ইংরেজিতে সংলাপ এর প্রতিশব্দ 'Dialogue (dia+log) ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ Conversation, Discussion।[১০] এটি গ্রীক দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। Dia অর্থ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত (Through) আর Logos অর্থ ব্যাখ্যা করা (Interpreted)। অর্থাৎ বলা ও লেখার মাধ্যমে সংলাপে কোন অর্থ তৈরি করা।[১১] আরবী ভাষায় সংলাপের প্রতিশব্দ 'আল-হিওয়ার' (الحوار) ব্যবহৃত হয়। হিওয়ার (حوار) শব্দটি আল-হাওরুন (الحور) ধাতুমূল থেকে র্নিগত। এর অর্থ কোনো কিছু থেকে প্রত্যাবর্তন করা, কোনো কিছু বৃদ্ধির পর তা আবার কমে আসা অর্থাৎ পুনরায় পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা।[১২]

পরিভাষায়, বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, উদার, নিরপেক্ষ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে পারস্পরিক যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।[১৩] মি. যোসেফ বিশ্বাস এর মতে, সংলাপ হলো নিজের সত্যতা, ধর্মীয় মূল বিশ্বাস, ন্যায্যতা তথা সমুদয় মূল্যবোধ বজায় রেখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে পারস্পরিক যে আলাপ সহভাগিতা করা হয়, তাই সংলাপ।[১৪] ধর্মতত্ত্ববিদ ড. লিওনার্ড সুইডলার এর ভাষায়,

> 'Dialogue' is a conversation on a common subject between two or more persons with differing views, the primary purpose of which is for each participant to learn from the other so that he or she can changed and grow.[১৫]
>
> 'সংলাপ' হলো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয়াদি নিয়ে কথোপকথন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অন্যের নিকট থেকে শিখবে, যাতে করে সে (পুং/স্ত্রী) পরিবর্তন ও উন্নত হতে পারে।

ফাদার জেম্‌স ক্রুশ মনে করেন যে, সংলাপের আভিধানিক অর্থ হলো এক সঙ্গে আলাপ করা, সংবাদ বিনিময় করা। আলাপ হলো একটি সংবাদ এবং সংলাপের মাধ্যমে জীবন সংলাপ হয়। পারিভাষিক অর্থে সংলাপ হলো ধর্মভিত্তিক আলাপ-আলোচনা এবং ধর্মাবলম্বীদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা। তাই নিজের সত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, ন্যায্যতা তথা সমুদয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রেখে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মহানুভবতা প্রদর্শনপূর্বক পারস্পরিক যে আলাপ-আলোচনা করা হয়, তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।[১৬] এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ববিদ এফ.এন. মামবী-এর ভাষ্য নিম্নরূপ। তিনি বলেন,

> 'Dialogue' is an encounter of people of different religions and faiths in an atmosphere of freedom and openness for each partner to listen and understand himself and other. One person speaks and another listens and responds and vice versa. Dialogue is no more than this respectful communication of two different subjects.[১৭]
>
> 'সংলাপ' হলো বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে মুখোমুখী সাক্ষাৎ, যেখানে প্রত্যেকের একে অপরের কথা শ্রবণ ও উপলব্ধি করার জন্য মুক্ত ও অবাধ পরিবেশ রয়েছে। এক ব্যক্তি বলবে আর অপরজন শ্রবণ করবে ও সাঁড়া দিবে, আবার একজন শ্রবণ করবে অন্যজন বলবে। আর সংলাপ দু'টি ভিন্ন বিষয়ে সম্মানজনক সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়।

অতএব, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হলো বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ অথবা কাছাকাছি সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কথোপকথন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কেবলমাত্র ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেষ্টনে যে কোনো সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক সংলাপ হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা, ভালবাসা, উদারতা, নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতি।[১৮] এ প্রসঙ্গে বি গাজালীর ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> It depicts, interaction and communication among people of different religions and ethnicity in socio-economic activities that they have experienced over more than a century ago as a form of Interreligious Dialogue.[১৯]
>
> এটি (সংলাপ) বিভিন্ন ধর্মের লোক ও নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের পারস্পরিক মত বিনিময় বর্ণনা করে। যাদের (নৃগোষ্ঠী) একটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অবকাঠামো হিসেবে এক শতাব্দির বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সুতরাং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হলো বিভিন্ন মন-মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংলাপ। এটি একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। যেখানে একজন শুধু অন্যদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে না কিন্তু সেই সাথে নিজের ধর্ম সম্পর্কেও শেখে। এটি কোনক্রমেই বিতর্ক নয় বা একই মনের ব্যক্তিদের একত্রিত করে শক্তিশালী করে তোলাও নয়।

৩. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য (Aim of Interreligious Dialogue)

মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র। তাই বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের পারস্পরিক আলোচনা বিশ্লেষণের বিশ্লেষণ নয়, আবার বিশ্লেষণের সমন্বয়ও নয়। সংলাপের মাধ্যমে সর্বজন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে (Unanimity) পৌঁছাতে না পারলেও মোটামোটি কার্যকর ঐক্যে (Unity) পৌঁছানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার, বাক-বিতণ্ডা, দ্বন্দ্ব-কলহ করা যাবে না। ধর্মতত্ত্ববিদ খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসি বলেন, 'মৌলিক সত্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক এমন আলাপ-আলোচনা, যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় পরিচালিত এবং ঝগড়া-বিবাদ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রীতিমুক্ত এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের আকাংখা বিমুক্ত।'[২০]বস্তুত, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নামে ধর্মীয় সহিংসতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি না করে সকল জনগণ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও

গবেষকবৃন্দকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সর্বাত্মক লক্ষ্য রাখা উচিৎ। নতুবা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সামগ্রিকভাবে কলংকিত ও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সমাজে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি বিরাজ করবে। যা কারও কাম্য নয়।

৩.১ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য হলো উদার, নিরপেক্ষ ও সহানুভূতির সাথে ধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো রয়েছে তা প্রকাশ করা ও গুরুত্বসহকারে তা মেনে নেয়া। অন্য ধর্মকে গ্রহণ করা এবং অন্যধর্মে দীক্ষিত হওয়া নয়, বরং সকলের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।[২১] এ প্রসংগে হেনড্রিক ক্রেইমার বলেন,

> It is not a matter of regular conversion to discovering oneself somehow a 'spiritual relative' of theirs.[২২]
>
> এটি (সংলাপ) নিজেকে নিয়মিত ধর্মপরিবর্তনের বিষয় হিসেবে প্রকাশ করে না; বরং তাদের (ধর্মগুলোর মধ্যে) একটি আত্মিক সম্বন্ধ সৃষ্টি করে।

৩.২ সংলাপের লক্ষ্য হলো সকল ধর্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করা। এটি শুধুমাত্র একক ও ব্যক্তিগত কোন কর্মতৎপরতা নয়, বরং একটি যৌথ কার্যক্রমও বটে।[২৩] দার্শনিক প্রীতিভূষণ চ্যার্টাজী এ প্রসংগে বলেন,

> It will enable us to understand the truth underlying other religions. Such a dialogue will not undermine one's own religious faith, but will give the participants a deeper understanding of their respective religions.[২৪]
>
> এটি (সংলাপ) অন্যান্য ধর্মগুলোর অন্তর্নিহিত উপলব্ধি করতে আমাদেরকে সহায়তা করবে। এ ধরণের সংলাপ কারো নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসকে হেয় করবে না, বরং আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের স্ব স্ব ধর্মগুলোর গভীর ধীশক্তি দান করবে।

৩.৩ বিভিন্ন ধর্মকে পরিহার করে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা সংলাপের লক্ষ্য নয়। যেহেতু সকল ধর্মের সাধারণ সত্য একই। তাই সেখানে একটি সাধারণ স্টেশন রয়েছে, যার উপর ধর্মগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।[২৫] দার্শনিক প্রীতিভূষণ চ্যার্টাজী বলেন,

> It should be noted at the outset that the aim of this dialogue is not to establish one universal religion excluding the varieties of religion. The possibility of a dialogue presumes the existance of many religions and yet at the same time it holds that as the basic truth of all religions is the same, there is a common platform on which religions can meet.[২৬]
>
> 'এটি প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিৎ যে, এই সংলাপের লক্ষ্য বিভিন্ন ধর্মকে বর্জন করে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা নয়। সংলাপের সম্ভাবনা বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্বের মধ্যে অনুমান করা হয় এবং একই ভাবে এই অভিমত পোষণ করা হয় যে, যেহেতু সকলধর্মের সাধারণ সত্য একই, সেখানে একটি সাধারণ স্টেশন প্রাঙ্গন রয়েছে, যার উপরে সকলধর্ম মিলিত হতে পারে।

৩.৪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য হলো দার্শনিক যুক্তি দ্বারা ধর্মগুলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা কিংবা ধীশক্তি নিদর্শন দ্বারা ধর্মের সাধারণ উপাদানগুলো খুঁজে বের করা নয়। বরং ধর্মের মধ্যে পার্থক্যগুলো সযত্নে অবলোকন ও অনুধাবন করা।[২৭]এ প্রসঙ্গে নিনিয়ান স্মার্ট এর ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> The Purpose of the dialogue which follows is not to settle abstruse philosophical questions about Prim Movers and Necessary Beings. It is rather to show the kinds of considerations - the reasons which are relevant in religions discussions. It is to show how the great religions can differ and agree upon principles.[২৮]

> সংলাপের উদ্দেশ্য 'Prim Movers and Necessary Beings' সম্বন্ধে জটিল দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা নয়। বরং এটি বিবেচনাকে প্রদর্শন করে– কারণগুলো যা ধর্মীয় আলোচনায় সুসংগত। এটি আরও প্রদর্শন করে, কিভাবে ধর্মগুলো মূলনীতির উপরে পৃথক এবং অনুরূপ হতে পারে।

৩.৫ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য হলো যে, স্ব ধর্ম বা অন্য ধর্ম সম্পর্কে কোন ধরণের হঠকারী মন্তব্য করা যাবে না। কোন প্রকার অতি সরলীকরণ (Over simplification) বা মিথ্যা সার্বিকীকরণ (illicit generalization) ধর্মের ক্ষেত্রে আশ্রয় দেয়া যাবে না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু সাদৃশ্যগুলোর উপরই গুরুত্ব দিলে একপ্রকার শূন্য সর্বজনীনতার সৃষ্টি হবে। ফলে প্রতিটি ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিঘ্নিত হবে। অপরদিকে, শুধু বৈসাদৃশ্যগুলোর উপর গুরুত্ব দিলে একপ্রকার সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার উদ্ভব ঘটবে। যা মোটেই শোভনীয় ও কাম্য নয়।[২৯]

৩.৬ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পারস্পরিক সমঝোতা নয়, অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা ও আপন করে নেয়া এর লক্ষ্য। যদিও এটি সহজ কাজ নয়। তবুও করা উচিৎ। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা ও সহানভূতি ত্বরান্বিত হবে।[৩০]

৩.৭ সংলাপের লক্ষ্য হলো একে অপরকে চেনা ও জানা। অন্যধর্মকে জয় করা অথবা হেয় করা নয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ ও বিবাদ রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং এগুলোর সম্মানজনক সমাধান করে ঐক্যের পরিবেশ ও বন্ধন রচনা করা।[৩১] এ প্রসংগে রাইমন্ডু পানিকর এর বার্তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> The aim of the interreligious dialogue is understanding. It is not win over the other or to come to a total agreement or a universal religion. The ideal is communication in order to bridge the gulfs of mutual ignorance and the misunderstanding between the different cultures of the world, letting them speak and speak out their own insights in their own languages.[৩২]
>
> 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য হলো পরস্পরকে জানা। এটি অন্য ধর্মকে জয় করা নয়। অন্য ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা নয়। এর আদর্শ হলো, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অজ্ঞানজনিত যে বিরোধ রয়েছে তার মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিকে অনুধাবন করা। ফলে তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ভাষার নিজস্ব সার বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে পারবে।'

৩.৮ বিশ্বের সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য, সমঝোতা ও সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে দেয়াই আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য। এটি 'Love of God and Love of the Neighbor, or Love of the Good and Love of the Neighbor' অর্থাৎ ঈশ্বরের ভালবাসা এবং প্রতিবেশীর ভালবাসা, অথবা ভালোর ভালবাসা এবং প্রতিবেশীর ভালবাসা– দ্বারা সকলধর্মের মানুষকে পারস্পরিক আলোচনায় আমন্ত্রণ জানায়।[৩৩]

৩.৯ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য হলো একাত্মতা নয় বরং ঐক্য ও উপলব্ধি, কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব নয় বরং উন্নয়ন। তাই প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে সকলের জন্য কিছু জায়গা সৃষ্টি করা ও সহানুভূতির উন্মেষ ঘটানো।[৩৪]দার্শনিক প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জীর ভাষায়,

> Its aim is to develop toleration towards other religions and to create harmony among all of them.[৩৫]
>
> 'এটির (সংলাপ) লক্ষ্য হলো অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং সকলধর্মের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করা।

৩.১০ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি অরাজনৈতিক পদক্ষেপ। এখানে তর্ক-বির্তক ও প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩৬] وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তোমরা উত্তমপন্থা ব্যতিত

কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না।' বরং খোলা মন নিয়ে একত্রিত হওয়া ও পারস্পরিক আলোচনা ও মতামত বিনিময় করা উচিত।[৩৭] এ প্রসঙ্গে দার্শনিক প্রীতিভূষণ চ্যার্টাজী বলেন,

> It should be motivated only by a desire for straight thinking and not done simply for the sake of mere opposition.[৩৮]
>
> 'এটি (সংলাপ) সহজ ও সরল চিন্তার আকাংখা নিয়ে অগ্রসর হয়, বিরোধীতার জন্য নয়।'

৩.১১ অন্য ধর্মের প্রতি পারস্পরিক ক্ষমাপরায়ণতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধের উন্নতি ঘটানো আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলাএ প্রসঙ্গে বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে এড়িয়ে চল।'[৩৯]এমনকি এটি সমাজে বসবাসরত সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে ঐক্যের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ফলে সকলেই নিজ নিজ ধর্মীয় কর্মকাণ্ড অবাধ ও স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে।[৪০] তাই এ ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে (At the world's Parliament of Religions) বক্তৃতাকালে বলেন,

> But if anyone here hopes that this unity will come by the triumph of any one of the religions and the destruction of the others, to him I say, 'Brother, yours is an impossible hope'. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. Do I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid. .... The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth.[৪১]
>
> 'কিন্তু যদি কেউ আশা করেন যে, এই ঐক্য ধর্মের একজনের জয় এবং অন্যের ধ্বংস নিয়ে আসবে। তাকে আমি বলছি, ভাই, একটি আপনার অসম্ভব প্রত্যাশা। আমি কি আশা করি যে, খ্রিষ্টান লোক হিন্দু হবে? ঈশ্বর নিষেধ করেন। আমি কি আশা করি যে, হিন্দু বা বৌদ্ধ লোক খ্রিষ্টানে পরিণত হবে? ঈশ্বর নিষেধ করেন। ... খ্রিষ্টান একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ নয়, কিংবা একজন হিন্দু বা একজন বৌদ্ধ খ্রিষ্টান নন। কিন্তু প্রত্যেকের অন্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত এবং তথাপি তার ব্যক্তিত্বকে তার নিজস্ব উন্নতির আইন অনুসারে সংরক্ষণ করা এবং বৃদ্ধি করা উচিত।

৩.১২ একে অপরের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য আদান-প্রদান করাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য। একটি সংলাপে সাধারণত: দুই ধর্মের অনুসারী অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই অন্যের থেকে কিছু গ্রহণ করে আবার অন্যকে কিছু প্রদান করে। এমনিভাবে অন্যের থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে আবার অন্যকে কিছু শিক্ষা প্রদান করে। এখানে একধর্মের অনুসারী অন্যধর্মের অনুসারী দ্বারা প্রভাবিত কিংবা বিতারিত হয় না। তাই একটি সংলাপ ধর্মীয় বিষয়ে আদান-প্রদানের প্রবণতা ও মানসিকতা গভীরভাবে প্রত্যাশা করে।[৪২]

৩.১৩ সমাজে তৃণমূল পর্যায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শকে হেয় বা তাচ্ছিল্য করা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য নয়। বরং আধ্যাত্মিক অর্ন্তদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সত্যের মুখোমুখির পরিবেশ সৃষ্টি করা। যা মানবজীবনের গভীরতম পর্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়।[৪৩]

৩.১৪ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মমত পরিলক্ষিত হয়। সকল ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ ও চর্চার মধ্যে এক ধরনের রেষারেষি লক্ষ্য করা যায়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দূরীভূত করে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান দান করে। ফলে সমাজে সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ পরিহার করে একই ছায়াতলে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুযোগ সৃষ্টি করে।[৪৪]

৩.১৫ বর্তমান বিশ্বে মানব জাতি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় আর্দর্শিকভাবে চরম হুমকির সম্মুখীন। সাধারণ মানুষ নির্বিকার। জাতি উদ্বিগ্ন ও হতাশ। মানবাধিকার কমিশন অসহায়। এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান, অনুভূতি ও চর্চার মাধ্যমে মানুষকে রক্ষা করা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য। কেননা নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ দ্বারা একটি আলোকিত মানুষ বা জাতি গঠন সম্ভব। ফলে সমাজে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, অনিয়ম, দূর্নীতি ও অস্থিরতা চিরতরে নিমূল হবে।[৪৫] এ প্রসংগে এস. জি. সামর্থ বলেন,

> To work together for a common purpose in society, particularly where human rights, social and economic justice and peace in the community and the Nation are concerned.[৪৬]
>
> এটি (সংলাপ) সমাজে মানবাধিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার এবং যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতি উদ্বিগ্ন– সে ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে।

৩.১৬ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কারও ধর্মীয় বিশ্বাস, চেতনা ও অনুভূতিকে কটাক্ষ্য, নিরুৎসাহিত ও আঘাত করে না, বরং সকলের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে সংলাপে ধর্মগুলোর মধ্যে বিদ্যমান লুকায়িত সত্য উন্মোচিত হয়। একে অপরের নিকট থেকে ধর্মীয় আদর্শ শিখতে পারে।[৪৭] এ প্রসংগে স্বামী নিখিলান্দ এর ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> Different religions can learn from one another. Thus Hinduism can teach the art of meditation, Christianity social service, Buddhism inner peace through desirelessness, Judaism justice and righteousness, and Islam equality and brotherhood.[৪৮]
>
> বিভিন্ন ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। সুতরাং হিন্দু ধর্ম গভীর চিন্তার কলাকৌশল, খ্রিষ্টানধর্ম, সমাজ সেবা, বৌদ্ধধর্ম প্রত্যাশিতভাবে মনের প্রশান্তি, ইয়াহুদী ধর্ম ন্যায়বিচার ও ধর্মপ্রাণতা এবং ইসলাম ধর্ম সমতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিতে পারে।

৩.১৭ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অন্যতম লক্ষ্য হলো খ্রিষ্টান-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের অবিশ্বাস, অস্তিরতা ও চাপা উত্তেজনার কারণগুলো চিহ্নিতকরণ। এই কারণগুলো অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে দায়ী বলে পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ববিদগণ মন্তব্য করেন।[৪৯] এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সকল মুসলিম দেশের ১৩৭ জন স্বনামধন্য বিদ্বগ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক এক স্বাক্ষরিত পত্র ২০০৭ সালে খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতাদের নিকট প্রেরণ করেন। পত্রের অংশবিশেষ বার্তা নিম্নরূপঃ

> 'Muslims and Christians together make up over half the world's population. Without peace and justice between these two religious communities, there can be no meningful peace in the world. The future of the wrold depends on peace between Muslims and Christians.'[৫০]
>
> মুসলমান ও খ্রিস্টান একত্রে বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছাড়া বিশ্বে কোন অর্থবহ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিশ্বের ভবিষ্যৎ মুসলিম ও খ্রিস্টানদের শান্তির উপর নির্ভরশীল।

৩.১৮ ধর্মের গণতন্ত্র (Democracy of Religions) সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য। মানুষ সামাজিক জীব। তাদের বাকশক্তি, স্বাধীনতা, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস রয়েছে। ফলে সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। ধর্মমতগুলোর প্রতি যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকে এবং তাদের কর্মকাণ্ড অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে প্রচার ও প্রকাশ করতে না দেয়া হয়, তাহলে সমাজে অশান্তি বিরাজ করবে। ধর্মীয় গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে। এটি মোটেই কাম্য নয়। কারণ সকল ধর্মই একই পথের পথিক। সকলেই সেই এক মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলে নিরবে-নিভৃতে আরাধনা করে এবং পরিত্রাণ চায়।[৫১] এ

প্রসঙ্গে ড. এ. সি. দাস এর ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৯৭০ সালে ভারতে পুনপ্রদেশে অনুষ্ঠিত The Indian Philosophical Congress এর ৪৪তম সভায় ধর্মের গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন,

> 'all we mean is negatively this, that the religions are not opposed to each other, and positively that they are on the same footing in so far as their goal and achievement are concerned. The ignorant people nonetheless extol their own religion at the expense of the others.... In our spisitual pursuits we would indeed be comrades both in our failure and success, failure to exhaust God and success in realizing what of God is vouchsafed to us. This is Democreay of Religions in full sense of the term.'[৫২]

> 'আমরা যা বুঝি এটি তার বিপরীত। ধর্মগুলো একে অপরের বিপরীত নয়। তাদের লক্ষ্য ও অর্জন হলো সম্পর্কযুক্ত। এতদসত্ত্বেও অজ্ঞ লোকেরা নিজের ধর্মকে অন্যের ধর্ম চেয়ে খুব প্রশংসা করে....। প্রকৃতপক্ষে আমরা ব্যর্থতা ও সফলতার সঙ্গী হতে পারি। ব্যর্থতা হলো ব্যয় আর সফলতা হলো ঈশ্বর আমাদের জন্য কি প্রদান করেন, তা উপলব্ধি করা। এটিই হলো ধর্মের গণতন্ত্রের স্বার্থকতা।'

৩.১৯ সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রোতামণ্ডলীর মনযোগ আকর্ষণই এর অন্যতম লক্ষ্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে কারো প্রতি অশালীন ও অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না; বরং অনুপম ও হৃদয়মর্মস্পর্শী ভাষায় সম্বোধন সংলাপের প্রাণ।[৫৩]এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, [৫৪]ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'কৌশল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ দ্বারা তুমি তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক কর।'

৪. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূলনীতি (Rule of Interreligious Dialogue)

বিভিন্ন ধর্মকে বুঝবার ও উপলব্ধি করবার যতগুলো উপায় আছে তার মধ্যে সংলাপ অন্যতম। আমরা কে এবং কী তা জানার জন্য আমাদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হলো আমাদের নিজেদেরকে জানা এবং আমাদের নিজেদেরকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হলো অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানা। ভাষা সম্পর্কে যেমন বলা হয়, যে শুধু একটি ভাষা জানে সে দাবি করতে পারে না যে ঐ ভাষা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান আছে। ঠিক তেমনিভাবে বলা যায়, যে শুধু একটি মাত্র ধর্মকে জানে সে কোনো ধর্মই সঠিকভাবে জানে না। তাই হান্‌স কুংগ (Hans Kung) যথার্থই বলেছেন, তুমি যদি শুধু ইংল্যান্ডকে জানো তাহলে তুমি ইংল্যান্ডকে জানো না। জোয়াকিম ওয়াচ (Joachim Wach) ও মনে করেন, সব ধর্ম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করলেই একটা বিশেষ ধর্মকে জানি বলে দাবি করতে পারি।[৫৫]

তাই আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ চাই তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আমরা একটা বৃহৎ পরিবারের সদস্য হিসেবে কাজ করছি। সকলেই আমরা ভালোবাসা ও সত্যের আত্মিক বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান। আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'[৫৬]

সুতরাং আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে কার্যকর, অর্থবহ ও ফলোৎপাদক করতে হলে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মূলনীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। নচেৎ সংলাপ সামগ্রিকভাবে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ববিদ ড. লিওনার্ড সুইডলার (Dr. Leonard Swidler) সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের দশটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা বিধৃত হলো:

৪.১ *সংলাপে একজন অপরজনের নিকট থেকে শেখার প্রস্তুতি থাকা উচিত।* সংলাপের উদ্দেশ্য হলো শেখা। এর অর্থ ধারণার পরিবর্তন, উন্নতি ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা।

৪.২ *সংলাপ কখনই একমুখী হতে পারে না, এটি দ্বিমুখী হতে হবে।* যেহেতু আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হলো সহযোগিতামূলক, সেহেতু এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো সকল সঙ্গীদের জন্য শেখা এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করা ও বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হওয়া। তবে সংলাপের ফলাফল সকল অংশগ্রহণকারীর ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিমন্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে।

৪.৩ *অংশগ্রহণকারীদের সংলাপের আদর্শের প্রতি সত্যবাদী হওয়া উচিত। সকল অংশগ্রহণকারীদের পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে সংলাপের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত।* যদি কোন অংশগ্রহণকারী অন্তরালে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তাহলে সংলাপের উদ্দেশ্য বাঁধাগ্রস্ত ও ব্যহত হবে। তাই সংলাপে কোন প্রকার মিথ্যা ও প্রতারণার স্থান নেই।

৪.৪ *সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের মুক্ত মন নিয়ে আসা উচিত।* পূর্ব ধারণা বা প্রস্তুতি ব্যতিত কোন অংশগ্রহণকারী সংলাপে যোগদান উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ যদি একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম নিকৃষ্টতর অথবা একজন হিন্দুলোকের দৃষ্টিতে ইসলামধর্ম নিকৃষ্টতর হয়, তবে এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রকৃত সংলাপ হতে পারে না। অংশগ্রহণকারীদের কোন নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত পার্থক্যের বিষয় নিয়ে সংলাপে আসাও যৌক্তিক হবে না। সে ক্ষেত্রে উভয় অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব ঐতিহ্যের সততা ঠিক রেখে সম্পূর্ণ অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহানুভূতির সঙ্গে অন্যের কথা শ্রবণ করা কর্তব্য। তবে আলোচনায় উভয় পক্ষকে যতদূর সম্ভব ঐক্যমতে পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত।

৪.৫ *সংলাপ অবশ্যই মুখোমুখী হওয়া উচিত। অংশগ্রহণকারীদের একে অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।* যদি আমরা একজনের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, তবে এটি হবে স্বাগত বক্তব্য, সংলাপ নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং অপরজন অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে কোন অর্থবহ, ফলপ্রদ ও কার্যকর সংলাপ হতে পারে না। অপরদিকে, একজন মুসলমান ও হিন্দু লোকের মধ্যে একটি যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য সংলাপের জন্য উভয়কে প্রাথমিকভাবে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতে হবে। কেবলমাত্র তখনই তারা সামনে সামনে কথা বলবে। তবে এ ক্ষেত্রে একমুখী সংলাপের সুযোগ নেই।

৪.৬ *সংলাপ পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।* যে কোন সংলাপের পূর্বশর্ত হলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মনে রাখা উচিত যে, যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে সংলাপ নেই। এটি নীতিগতভাবে সত্য যে, কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরই সংলাপে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, যাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস রয়েছে।

৪.৭ *সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের আত্মসমালোচনার প্রস্তুতি থাকা উচিত এবং অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করা উচিত।* এ ধরনের আত্মসমালোচনা যে কোন ঘাটতি ফলস্বরূপ প্রকাশ করবে। তাই একটি আদর্শ আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের সততা ও বিশ্বাস যৌক্তিক আত্মসমালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে।

৪.৮ *সংলাপে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নিজেকে সংজ্ঞায়িত করা এবং ব্যাখ্যার উপযুক্ত হিসেবে প্রমাণ করা উচিত।*

৪.৯ *প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অনুমোদিত বিষয়ের সীমালঙ্ঘন করে সংলাপে যোগদান করা অনুচিত।*

৪.১০ *অংশগ্রহণকারীর উভয় পক্ষকে অভিজ্ঞতার আলোকে সংলাপ পরিচালনা করা উচিত।*[৫৭]

৫. উপসংহার (Conclusion)

'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ' একটি যুগোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ধর্মকে বুঝবার ও উপলব্ধি করবার যতগুলো উপায় রয়েছে 'সংলাপ' তার মধ্যে একটি। তাই এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য সংলাপ তুলনামূলক ধর্মের একটি উপায় মাত্র। সংলাপের শুরুতেই মনে রাখতে হবে যে, সকল ধর্মই নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপ করে। নৈতিক মূল্যবোধই মানবজাতিকে ঐক্যের জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং মানুষের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নৈতিক মূল্যবোধ শক্তির দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না; বরং অবাধ, নিরপেক্ষ, সহানুভূতিশীল ও আন্তরিক সংলাপের মাধ্যমেই এগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব। আর এক্ষেত্রে সকলকেই সংলাপের লক্ষ্য ও মূলনীতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে, নতুবা সংলাপ সামগ্রিকভাবে ব্যাহত ও বিতর্কিত হবে- যা কারও
কাম্য নয়।

তথ্যনির্দেশ

১ Hans Kung, *Christianity and the World Religions*, Tr. Peter Heinegg (London: Collins Publishers, 1986), p. 442; শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেন গুপ্ত, *ধর্ম দর্শন* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৯), পৃ. ৩৫৫-৩৫৬; ধর্মের লক্ষণ দশটি: সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, চিত্তসংযম, অস্তেয়, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। তাই যেখানেই ধর্ম আছে সেখানে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা, অরাজকতা ইত্যাদি থাকতেই পারে না।

২ ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ* (ঢাকা: সংবেদ, ২০১৬), পৃ. ৮৫।

৩ ড. আহমাদ শালাবী, *মুকারানাতুল আদইয়ান: আল-ইয়াহুদিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুল নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩১।

৪ Louis Henry Jordan, *Comparative Religion: Its Genesis and Growth* (London: Morrison & Gibb Limited, 1905), p. 135; 21 June 2019, at. 00.15 <https://en.m.wikipedia.org/wiki/internet

৫ Swami Vivekanamda, *Chicago Addresses* (Kolkata: Advaita Ashrama, 2016), PP. 19-60.

৬ 21 June 2019, at. 00.15 <https://en.m.wikipedia.org/wiki/internet

৭ Sourcebook of the World's Religions- An Interfaith Guide to Religion and Spirituality, edited by Beversluis, Joel (Califormia; New World Library, 2000), P. 159; Comparative Religion, edited by Amarjit Singh Sethi, Reinhard Pummer (New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, 1979), PP. 6-7

৮ From Wikipedia, The free encyclopedia, Interfaith dialogue.

৯ *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), পৃ. ১১০২।

১০ A formal disucssion between two groups or countries, especiall when they are trying to solve a problem, end a disagreement. cf. *Oxford Advanced learner's Dictionary*, English edition (New York: Oxford University Press, 2010), P. 418.

১১ Chemehemi Ya Ukweli, *Manual For Interelisgious Dialoguge* (Kenya: Franciscan Kolbe Press, 2012), P. 11.

১২ মুহাম্মদ শামছুদ্দীন খাজা, *আল-হিওয়ার আদাবহু ওয়া মুনতালাকাতুহু ওয়া তারবিয়াতুল আবনাই আলাইহি* (রিয়াদ: মারকাজুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল ওয়াতানী, ২০০৮), পৃ. ১৭।

১৩ Pritibhushan Chatterji, *Studies in Comparative Religion* (Calcutta: Das Gupta & Co. Private LTD, 1971), PP. 426-428; Toleration, in its proper sense, does not mean any meek or cowardly submission to the agressiveness of the followers of other religions, but is, as Radhakrishnan Says, the "homage which the finite mind pays to the inexhaustibility of the Infinite". cf. S, Radhakrishana, *Eastern Religions and Western thought* (Oxford: Clarendon Press, 1940), P. 317.

[১৪] মি. যোসেফ বিশ্বাস, জাতীয় সংলাপ সেমিনার ১৯৯২-এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, *মাসিক মঙ্গলবার্তা*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ২৩।

[১৫] Leonard Swidler, "The Dialogue Decalogue: Ground rules for Interreligious, Interideological Dialogue", *Melanesian Journal of Theology*, Vol. 1-2, 1985, P. 187.

[১৬] ফাদার জেমস্ ক্রুশ, আন্তঃধর্মীয় সংলাপে পুরোহিতের ভূমিকা, *দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা*, ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-আগস্ট, ২০১০), পৃ. ৭; Shaharon also describes interaction that occurs among people of different religious and ethnic background residentials areas, hospitals, schools, markets or workplaces as dialouge of life. cf. S. T. M. Shahrom, *Religious Civilization Dialogue in Malaysia: Practice and its Relevancy Today* (Kqalalumpur: 2004), P. 61.

[১৭] Frederic Ntedika Mvumbi, Interfaith Dialogue - A Catholic View (The Catholic University of Eastern Africa, 2009), P. 18; Interfaith dialogue is a process of mutual understading among men at the level where they seek to know the mystery of human existence. cf. M. A. Thomas, *op.cit*, PP. 103-104.

[১৮] Dr. Nathan Kollar, *Phuratity and Ambigunity: Hermencuties*, Religion, Hope (Chicago: University of Chicago, 1987), P. 19.

[১৯] B. Ghazali, *Inter-Religious dialogue in Malaysia* (Kualalumpur: 2005), P. 87.

[২০] খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসি, *আল-হিওয়ার আদাবুহু ওয়া তাতবিকাতুহু ফীত তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদঃ মারকাজুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল-ওয়াতানী, ১৪২৫ হিঃ), পৃ. ২২।

[২১] K. N. Islam, *Interreligious Dialogue: Some Rules and Assumptions Dialogue and Alliance*, Vol. 25., No. 2, (2011, Dhaka University, Bangladesh), PP. 122.

[২২] Hendrik Kraemer, *World Cultures and World Religions* (Columbia: Columbia University Press, 1963), P. 357.

[২৩] *Guidelines on Dialogue with people of living faiths and Ideologies* (Geneva: WCC Publications, 1990), P. 201; সম্পাদকীয়, "খ্রীষ্টীয় সংলাপের মনোভাব ও উপায়সমূহ" *দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা*, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৩), পৃ. ১।

[২৪] Pritibhushan Chatterji, *op.cit.*, P. 421.

[২৫] Raimundo Panikkar, *The Interreligious Dialogue* (New York: Paulist Press, 1918), P. XIV.

[২৬] Pritibhushan Chatterji, *op.cit.*, P. 424.

[২৭] *Ibid*, P. 422.

[২৮] Ninian Smart, *World Religions: A Diaoluge* (London: Pelican Book, 1961), P. 1.

[২৯] Philip H. Hwang, "An Interetigious Dialogue: Its Reason, Attitudes and Necessary Assumptions". in Henry O. Thompson (ed.), *The Global Congress of the World Religions* (New York: The Rose of Sheraton Press, 1982), P. 80; দ্র. ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

[৩০] Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion* (Delhi: Motilal Banassidass, 1992), P. 5; Dr. Nathan Kollar, *op.cit.*, P. 19.

[৩১] *Ibid*; Leonard Swidler, *Toward a Universal Theology of Religion* (Philadelphia: Temple University Press, 2000), P. 26.

[৩২] Raimundo Panikkar, *op.cit.*, P. XIV.

[৩৩] 22 February 2019<https://world interfaith harmeny week.com/about_us/our_aims_objective

[৩৪] Kazi Nurul Islam, "World peace through Interreligious Dialogue". *Philosophy and Progress*, Vol. V (Dev Centre for Philosophical Studies, Dhaka University, Dhaka, 1986), P. 3.

---

৩৫ Pritibhushan Chatterji, *op.cit.*, P. 428.

৩৬ আল-কুরআন, সূরাহ আল-আনকাবুত: ৪৬।

৩৭ Vincent Sekhar, "Give Away Violence" Preserve Life - Call of the Sramana Religions", in *Journal of Dharma*, Vol. 25, No. 2 (April - June, 2000), PP. 162-164.

৩৮ Pritibhushan Chatterji, *op.cit.*, P. 423.

৩৯ আল-কুরআন, সূরাহ আল-আ'রাফ: ১৯৯।

৪০ *Ibid*, P. 428.

৪১ Swami Vivekananda, *op.cit.*, PP. 59-60.

৪২ Pritibhushan Chatterji, op.cit., P. 421

৪৩ 22 February 2019<https://world interfaith harmony week. com/about_us/our_aims_objective

৪৪ *Manual for Inter-Religious Dialogue*, P. XIII.

৪৫ Jacob Parappally, "Interreligious Dialouge: a sharing of Hope", *Jeevadhara*, Vol. 26, No. 155, P. 372.

৪৬ S. J. Samartha, "Intereligious Relationships in the Secular state" in *Inter-faith, Dialogue and world community*, edited by Rao, Sreenivasa C. H. (Madras: The Christian Literature Society, 1991), PP. 62-63

৪৭ Pritibhushan Chatterji, *op.cit.*, PP. 421-422.

৪৮ Proceedings of the Parliament of Religions (held in Calculta in 1963-64), P. 403.

৪৯ *দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা*, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (মে-জুন, ২০০৩), পৃ. ৩-১৬।

৫০ January 9, 2013<https://sma.je/chapter-I-what-is-interreligious_dialogue/

৫১ Pritibhushan Chatterji, *op.cit.*, PP. 428-429.

৫২ See Dr. A. C. Das's Presidential Address at the 44th Session of the Indian Phologophical Congress held in poone in 1970.

৫৩ *দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা*, ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১২), পৃ. ২২-২৩

৫৪ আল-কুরআন, সূরাহ আল-নাহল: ১২৫।

৫৫ Joachim Wach, "Introduction: The Meaning and Task of the History of Religions", *The History of Religions* (ed.), Joseph Kitagawa (Chicago: University of Chicago Press, 1967), p. 7.

৫৬ Swami Vivekananda, *op.cit.*, p. 60.

৫৭ Leonard Swider, *The Dialogical Reflection* (Minneapolis: Fortress Press, 1990), pp. 42-46.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

ইসলামী দা'ওয়াহ্-এর প্রয়োগ ও পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম*

Abstract: The word Da`wah generally means "*Calling people towards Allah and His instructions.*" The practioner of preaching is known as Da`ee. This act is commonly thought of being limited to religious matters only like oneness of God, regarding the Holy Quran in Arabic, Hazrat Muhammad (PBUH) being the last prophet, beliving in prophets, day of judgement, offering Salah, Fasting, Zakat and Hajj etc, rather it is the complete package of advocating in favor of what is good. It includes both spiritual and secular Islamic instructions for sake of betterment of common pepple. It could be of two types: first, it can be the act of proselytizing, where the preacher tries to convey its message of religious convictions to non Muslim through convincing dialogue. Second, it can be for the purpose of reminding the present Muslim Ummah about their duties and responsibilities as per command of Al-Quran and Sunnah. In any case a Da`ee (preacher) must have sincerity, complete knowledge and wisdom, patience, constancy, modesty, empathy and above all it must be a great devotee of advocated teachings. Although it is a moral responsibility of any individual to spread a word of uprightness and tries to stop other from unlawful activity, but for a Muslim, it is not only its task from ethical point of view, but also a must do action from a sacred standpoint as well. So, it is one of the basic criteria for every Muslim to instruct follow human beings towards fundamental Islamic wisdom about the difference between correct and incorrect in order to thrive in our lives. Apart form that, being among the enlightened ones, we must strive to inform others about the impilications of such wisdom, eg knowing that without the belief on One Allah, no one can make it in the hereafter, we should tell our Muslim brothers and sisters to avoid begging in front of those so called spifitual leaders, who claim to fulfill needs without mentioning Allah`s guidance or using Quranic ayahs. In short, it may be said that Da`wah is an important matter in the term of Islamic Shari`ah as per mentioned by Al-Quran and Sunnah. So to focus the importance, application and methodology of Da`wah are the main object of this article.

ভূমিকা : ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: কালিমাহ্, নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ। এ পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলামের দিগন্তব্যাপী সুবিশাল মহীরূহ স্থাপিত। যদিও ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তথাপি এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে অসংখ্য বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনা। এসব বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনার ভূমিকা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় কোন অংশেই কম নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কোনটির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তেমনই একটি বিষয় হচ্ছে ইসলামী দা'ওয়াহ। দা'ওয়াহকে বলা হয় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাণ। প্রাণ না থাকলে যেমন দেহ মূল্যহীন তেমনি দা'ওয়াহ না থাকলে ইসলামী জীবন দর্শন অর্থহীন। কেননা যে কোন সংস্থা, সংগঠন ও জীবন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তায় দা'ওয়াহ বা প্রচার-প্রপাগান্ডা গুরুত্বপূর্ণ ও মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীতে যার প্রচার-প্রসার যত বেশী, তার ব্যাপকতা, বিশালতা ও স্থায়িত্ব তত বেশী। এজন্য ইসলামের শুরু থেকেই আমরা দা'ওয়াহ-এর ব্যবস্থা লক্ষ্য করে থাকি। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন প্রত্যেকেই এ দা'ওয়াতী কাজের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূল তার জাতির লোকদেরকে প্রথমত: তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ মেনে নেওয়ার দা'ওয়াত দিয়েছেন। এ মর্মে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ অর্থাৎ "আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে।

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সে বললো: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (এর পরেও কি) তোমরা সংযত হবে না।"[১] এমনি ভাবে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) ও আরবে তার স্বজাতি কুরাইশ-পৌত্তলিক সম্প্রদায়সহ সকলের কাছে সারা জীবনব্যাপী হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে ইসলামের মহান দা'ওয়াত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর (সা:) দা'ওয়াহ প্রদানের সে পদ্ধতি, যার মাধ্যমে এসেছিল সফলতা, ঘটেছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর বিপ্লব, তা আজ মানব সভ্যতার ইতিহাসে গবেষণার ও আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। মহানবী (সা:) এর পর প্রতি যুগের ইসলাম প্রচারকগণ দা'ওয়াতের সে পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মুসলমানগণ যুগে যুগে যখনই সেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা ও দলাদলি, যা বর্তমান বিশ্বেও দৃশ্যমান। মুসলিম উম্মাহর দাঈ'গণ (ইসলাম প্রচারকগণ) আজ শতধা বিভক্ত। এর অন্যতম কারণ আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে দা'ওয়াতের সঠিক পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞানের অভাব। তাই এমনি পরিস্থিতিতে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিচয়, তার প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচণা ও পর্যালোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। এ লক্ষ্যেই এখানে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিচয়, তার প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপন করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইসলামী দা'ওয়াহ-এর পরিচয়

দা'ওয়াহ-এর শাব্দিক অর্থ

ইসলামী শরী'য়াতের পরিভাষায় দা'ওয়াহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ। কেননা যুগে যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানগণ এ দা'ওয়াতের কাজই অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দা'ওয়াত শব্দটি 'আরবী। এর 'আরবী শব্দরূপ دعوة (দা'ওয়াত)। এর মুল ধাতু অক্ষর د–ع–و। বহুবচন دعوات (দা'ওয়াতুন)। আভিধানিক দৃষ্টিকোনে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: আহ্বান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা ও অনুরোধ ইত্যাদি।[২] আল-কুরআনেও শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

১. আহ্বান করা: যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ "সে (নূহ আ:) বললো, হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে দিন-রাত *আহ্বান* করেছি। অত:পর আমার *আহ্বান* কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে।"[৩]

২. সাহায্য চাওয়া : যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

   وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
   অর্থাৎ "যদি এ সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত আর একটি সূরাহ রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যে সব সাহায্যকারী আছে (মনে কর), তাদের নিকটও তোমরা *সাহায্য* চাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"[৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করা: যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

   قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ" তিনি বললেন, তোমাদের *দু'আ* মঞ্জুর হয়েছে। অতএব তোমরা দু'জন অটল থাক এবং যারা অজ্ঞ তাদের পথে চলো না।"[৫]

৪. কোন কিছু প্রার্থনা করা : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ অর্থাৎ "আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। যে *প্রার্থনা* করে, আমি তার *প্রার্থনা* কবুল করে থাকি। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।"[৬]

৫. কোন মত, পথ বা কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো অথবা কোন বিষয় গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। তা ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ অর্থাৎ "সে (ইউসূফ আ:) বললো, হে পালনকর্তা তারা আমাকে যে কাজে *উদ্বুদ্ধ* করে, তার চেয়ে আমি কারাগারই বেশী পছন্দ করি।"[৭]

এ ছাড়া দা'ওয়াহ শব্দটি আমন্ত্রণ করা, শেষ বিচারের দিন মৃত ব্যক্তিদের কবর হতে উত্তোলন, ভোজ সভায় দা'ওয়াত করা, মযলুমের দু'আ প্রার্থনা এবং অঙ্গীকার করার ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার হতে দেখা যায়।[৮] তবে দা'ওয়াহ শব্দটি আল্লাহ তা'য়ালার পথে আহ্বান করা বা ডাকা অর্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইংরেজী অভিধান The Hanswher Dictionary of Modern Arabic-এ দা'ওয়াহ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, Missionary activity, Missionary work, Propaganda.[৯]

দা'ওয়াহ-এর পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে দা'ওয়াহ (دعوة) শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। কোন ব্যক্তির জীবনাদর্শ, চিন্তাধারা, জীবন প্রনালীর দিকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অপরকে আহ্বান করা, সে আহ্বান মেনে নিতে প্রভাবিত করা, মেনে নেওয়ার পর তা বাস্তব জীবনে চর্চার দিক-নির্দেশনা প্রদানের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে দা'ওয়াহ বলা হয়।[১০] কেউ কেউ বলেন, যে আহবানে ব্যক্তি বা সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প-সঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, তা গ্রহণ করা এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার জন্য প্রস্তুত করার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ।[১১] দা'ওয়াহ-এর সংজ্ঞা প্রদানে ড. আব্দুল খালেক পীরযাদাহ বলেন, ان كلمة الدعوة تعنى المحاولة العملية او القولية لامالة الناس الى شى অর্থাৎ "কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করাকে দা'ওয়াহ বলা হয়।"[১২] উল্লেখ্য, অভিধানে ধর্মীয় বা কোন ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার, প্রচারণা অর্থেও দা'ওয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দা'ওয়াহ-এর পরিচয় সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ বলেন,

Dawah is one such principle, It constitute a built in mechanism that keeps the community as well as the individuals who compose it, active and upright, ensures the moral health of the individual and the community and acts as a corrective force and blessing for the mind.

অর্থাৎ "দা'ওয়াহ হচ্ছে, এমন একটি নীতি যা একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির মত একটি সম্প্রদায়কেও নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে মানবতার সামনে আদর্শ সংশোধন ক্ষমতার মানদন্ড হিসাবে উপস্থাপন করে।"[১৩]

তাই দা'ওয়াহ যে কোন মত বা পথ গ্রহণ করার আহ্বান হতে পারে। তা ভালও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শব্দটির অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সূরাহ আল-মুমিনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ অর্থাৎ "হে আমার সম্প্রদায়,

ব্যাপার কি! আমি তোমাদের দা'ওয়াত দিই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে।"[১৪]

অতএব বুঝা যায়, যে কোন বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার অর্থে দা'ওয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। আর সে বিষয় কল্যানকর হতে পারে কিংবা ক্ষতিকরও হতে পারে। যেমন খ্রীষ্ট ধর্মের দিকে আহ্বান করা হলে খ্রীষ্টীয় দা'ওয়াহ, সমাজতন্ত্রের দিকে আহ্বান করা হলে সমাজতান্ত্রিক দা'ওয়াহ, জাতীয়তার দিকে আহ্বান করা হলে জাতীয়তাবাদী দা'ওয়াহ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের দিকে আহ্বান করা হলে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী দা'ওয়াহ প্রভৃতি। আবার কোনটা বস্তুর সাথে মানুষের বা বস্তুর সাথে বস্তুর সম্পর্ক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন: আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আবার কোনটা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ধর্মের বিভিন্ন Sect বা সম্প্রদায়। উপরের প্রতিটি দা'ওয়াতের সমন্বয়ে যে দা'ওয়াহ (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ক, মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক) সেটাই হচ্ছে ইসলামী দা'ওয়াহ।[১৫]

ইসলামী দা'ওয়াহ-এর পরিচয়

ইসলামী দা'ওয়াহ বলতে আভিধানিক অর্থে ইসলামের প্রতি আহ্বান, ইসলামের প্রচার ইত্যাদি বুঝায়। ইসলামের 'আকিদা-বিশ্বাস, সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দা'ওয়াহ বলা হয়। ইসলামী দা'ওয়াহ-এর সংজ্ঞা প্রদানে কেউ কেউ একে ওয়াজ-নসিহত, কারও মতে শুধু তাবলীগ ও মেহনত, আবার কারও মতে আন্দোলন বা ইকামাতে দ্বীন। আবার কেউ কেউ দা'ওয়াহকে 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুলতঃ ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়টির ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। শুধুমাত্র ওয়ায-নসীহত কিংবা তাবলীগ বা প্রচার-প্রচারণা অথবা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ইত্যাদির নামে দা'ওয়াহ বিষয়কে সীমায়িত করা সঠিক নয়। যদিও এ সমস্ত কাজ ইসলামী দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভূক্ত। দা'ওয়াহ বিষয়ে যারা গবেষণা করেছেন বা যারা গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত ও তাৎপর্যবহ। সুতরাং বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণের প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে বিষয়টি নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ এ সম্পর্কে ড. আব্দুল খালেক পীরযাদাহ[১৬] বলেন, فالمراد من الدعوة الاسلامية : بذل كافة الجهود العملية والقولية فى سبيل نشر دين الله و ابلاغه الاخرين অর্থাৎ "ইসলামী দা'ওয়াহর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নিজের বাকশক্তি এবং কর্মক্ষমতাকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা"।[১৭]

কারও কারও মতে ইসলামী দা'ওয়াহ হলোঃ الدعوة الى الاسلام تعنى المحاولة العملية او القولية لامالة النا س اليه অর্থাৎ "দা'ওয়াহ হলো মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত অথবা বাচনিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা।"[১৮] উপরোক্ত সংজ্ঞায় ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারনের দু'টি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ কার্যগত দিক হলো, দা'ঈ[১৯] তথা দা'ওয়াত প্রদানকারী কর্তৃক আচরণগত নমুনা পেশ। যেমনঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, শিক্ষা, প্রশিক্ষন, সমাজ সেবা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম, জিহাদ, পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কলাম প্রকাশ করা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়তঃ বাচনিক দিক হলো, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও বিভিন্ন সভা সমাবেশে আলোচনা, কথোপকথন, বক্তৃতা ও দারস ইত্যাদি পেশ। এ সম্পর্কে[২০] Dr. Ismail Haji Ibrahim বলেন, The Islamic Dawah is a movement of reformation which is in itself complete and comprehensive running in accordance with the injunctions of the Quran and the Sunnah. অর্থাৎ 'ইসলামী দা'ওয়াহ হচ্ছে এমন একটি

সংস্কারমূলক আন্দোলন যা আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ব্যাপকতর দিক থেকে পরিপূর্ণ।"[২১]

আল্লামা বাহী আল-খাওলী[২২] বলেন, দা'ওয়াহ হলো একটি জাতিকে এক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে যাওয়া। এটাই দা'ওয়াতের প্রধান কাজ। আর এখান থেকেই দা'ওয়াতের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি পাওয়া যায়।[২৩] দা'ওয়াহর পরিচয় প্রদানে ড. রউফ শালাবী[২৪] বলেন, الدعوة هى حركة نقل المجتمع الانساني من حالة الكفر إلى حالةالإيمان و من حالة الظلمة إلى حالة النور و من حالة الضيق إلى حالة السعة فى الدنيا والأخرة – অর্থাৎ "সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনই হলো দা'ওয়াহ। যে আন্দোলনের দ্বারা মানব সমাজকে কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনের সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়, সে পদ্ধতিই হলো দা'ওয়াহ।"[২৫] শায়খ আদম আবদুল্লাহ আল-আলোরীর মতে, "ইহা হলো মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধশক্তিকে পরিবর্তন বা ধাবিত করা এমন আকীদার দিকে, যা তাদের উপকারে আসবে এবং এমন মাসলেহাত তথা মঙ্গলকর বিষয়ের দিকে, যা তাদের কল্যাণ বয়ে আনবে। অধিকন্ত মানব জাতিকে বাঁচানো ঐ গোমরাহী থেকে, যাতে তারা লিপ্ত হতে যাচ্ছিল, এমন বিপদ হতে বাঁচানো, যা তাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছিল।"[২৬] তিনি তাঁর সংজ্ঞায় দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু ও ফলাফলের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অর্থাৎ দা'ওয়াতের মাধ্যমে মানব সমাজের আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি অর্জিত হয়। ড. খলীফা হুসাঈন আল-আসসাল বলেন, "মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামে বর্ণিত সকল কল্যাণময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম হলো ইসলামী দা'ওয়াহ।"[২৭] এ সংজ্ঞায় 'আল-আমর বিল মারুফ এবং আন-নাহী আনিল মুনকারের' উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারীর মতে, যে দা'ওয়াহ কার্যক্রমে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান ও শিল্প সম্মত উপায়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা এবং বাস্তব জীবনে তার চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত এবং ইসলামী শরীয়াহ সম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাই ইসলামী দা'ওয়াহ।[২৮] উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণে চারটি মৌলিক দিক ফুটে উঠে। যথা:

ক. সঠিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দা'য়ী কর্তৃক দা'ওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়া।
খ. বিজ্ঞান ও শিল্প সম্মত পন্থায় দা'ওয়াতী কাজ করা।
গ. বাস্তব জীবনে ইসলামী দা'ওয়াহ প্রতিফলনের কার্যকরী ব্যবস্থা থাকা এবং
ঘ. দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও শরীয়াহ সম্মত হওয়া।

মোটকথা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক ইসলামী জীবনাদর্শের দিকে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্মত উপায়ে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির আলোকে অন্যকে আহ্বান করা, মেনে নিতে প্রভাবিত করা, দিক নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তব জীবনে তা চর্চার জন্য দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে ইসলামী দা'ওয়াহ বলা হয়। যিনি আহ্বান করেন তাকে দা'য়ী এবং যাকে আহ্বান করা হয় তাকে মাদ'য়ু বলা হয়। ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত জীবন বিধান পালনের জন্য আহবানের দ্বারা পৃথিবীতে তা বাস্তবায়ন করার যোগ্যতা সম্পন্ন লোক তৈরীর মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তি হাসিল করা সম্ভব।

ইসলামী দা'ওয়াহ-এর উৎপত্তি ও বিকাশ

ইসলামী দা'ওয়াহর সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক গভীর ও প্রাচীন। কারণ ইসলামী দা'ওয়াহ মানব ইতিহাসের মতই প্রাচীন ও চিরন্তন। এ বিয়য়ের অভিজ্ঞ পন্ডিত, গবেষক ও জ্ঞান পিপাসুগণ ইসলামী দা'ওয়াতের উৎপত্তি ও বিকাশর ইতিহাসকে ছয়টি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। যথা:

১. রাসূল (সা:) এর পূর্ববর্তী যুগ।

২. রাসূল (সা:) এর যুগ।

৩. সাহাবীগনের (রা:) যুগ ।

৪. উমাইয়্যা যুগ।

৫. আব্বাসীয় ও ওসমানীয় যুগ।

৬. আধুনিক যুগ।[২৯]

পৃথিবীতে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার উষালগ্নেই ইসলামী দা'ওয়াহর সূচনা হয়। পরবর্তীতে নানা বিবর্তনের মাধ্যমেই মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর সে বিকাশের ক্রমধারাতেই ইসলামী দা'ওয়াহ উৎকর্ষ লাভ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১. রাসূল (সা:)-এর পূর্ববর্তী যুগ

ইসলামী দা'ওয়াহর এ সময়কালটি সবচেয়ে দীর্ঘ। আর এ সময়কালের উষালগ্নেই ইসলামী দা'ওয়াহ-এর অনির্বাণ শিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল হযরত আদম (আ:) এর মাধ্যমে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ অর্থাৎ "যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আমি বললাম, 'তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। অত:পর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যে হেদায়াত আসবে, তখন যারা আমার সে হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবে না।"[৩০]

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ:) এর মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াহ-এর অনির্বাণ শিখা প্রজ্জলিত হয়েছিল। আর সে প্রজ্বলিত শিখার বিচ্ছুরিত দীপ্তি সম্প্রসারিত হয়েছিল হযরত নূহ (আ:), হযরত হুদ (আ:), হযরত শীষ (আ:), হযরত ইবরাহীম (আ:), হযরত ইসমা'ঈল (আ:), হযরত ইসহাক (আ:), হযরত সালেহ (আ:), হযরত মূসা (আ:), হযরত 'ঈসা (আ:) প্রমুখ নবী ও রাসূলগণের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাঁরা স্বজাতির নিকট এসেছিলেন যুগশ্রেষ্ট মানবরূপে। তাঁরা ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁরা বিশৃঙ্খল সমাজ এবং পথভ্রষ্ট জাতিকে পুনর্গঠন ও সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে একনিষ্ট দা'য়ীর ভূমিকা পালন করেছেন।[৩১]

২. রাসূল (সা:) এর যুগ।

রাসূল (সা:)-এর যুগ হলো দা'ওয়াতে দ্বীনের ইতিহাসের পূর্ণতার যুগ। তাঁর আগমন ঘটেছিল মানব ইতিহাসের এক চরম ক্রান্তি লগ্নে। এ সময় দা'ওয়াতের কাজ ছিল নিষ্প্রভ। সমগ্র বিশ্বে ধর্ম, সমাজ, শান্তি-শৃঙ্খলা ও আধ্যাতিকতায় শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল।[৩২] বিশ্ব ছিল একজন ত্রাণকর্তার জন্য অপেক্ষমান।[৩৩] এমনি অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আর্বিভাব ঘটে। নবুওয়াত লাভের পর প্রথম তিন বছর তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে গোপনে দা'ওয়াত দানের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর পর প্রকাশ্যে দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ অর্থাৎ "তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা সবিস্তারে বর্ণনা কর।"[৩৪] তখন থেকে তিনি সাধারণ্যে দা'ওয়াত প্রদানে প্রবৃত্ত হন।[৩৫] নবুওয়াত লাভের পর তার সমগ্র জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ভীষণ বৈরিতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এমতাবস্থায় তার দা'ওয়াত পৃথিবীর

বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। রাসূল (সা:)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে দা'ওয়াতের কার্যক্রম অবিচল ধারায় অব্যাহত রাখেন।

৩. সাহাবীগণের (রা:) যুগ ।

রাসূল (সা:)-এর ইন্তেকালের পরপরই আরব ভূখণ্ডে ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের ফেতনার উদ্ভব ঘটে। খলীফা আবূবকর (রা:) তাদের ফিতনার মূলোৎপাটন করে ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। হযরত 'উমার (রা:)-এর যুগ ছিল ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য উর্বর যুগ। এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশে তিনি মুবাল্লিগ ও দা'ঈ নিয়োগ করেন, যেন তারা অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করতে পারেন এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতে পারেন। এ জন্য হযরত 'উবাদা ইবন সামিত (রা:), হযরত আবূ দারদা (রা:), হযরত মু'আয (রা:) কে সিরিয়ায়, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা:)-কে কূফায়, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা:), 'ইমরান ইবন হিসিন-(র:), মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা:) কে বসরায় নিয়োগ করেন। তাদের প্রচেষ্টায় ইসলামী জ্ঞানের অনেক প্রসার ঘটে। হযরত উসমান (রা:) (মৃ. ৩৫ হি.) অনেক অভিজাত সম্ভ্রান্ত অমুসলিমদের নিকট গিয়ে ইসলামী দা'ওয়াত দিতেন। হযরত 'আলী (রা:) (মৃ. ৪০ হি.) স্বীয় শাসনামলে (৩৫ হি: -৪০ হি:) উক্ত দা'ওয়াতী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

তৎপরবর্তী কালে তাবি'ঈ (تابع) ও তাবী'-তাবি'ঈগণ (تبعتابعى) সাহাবীগণের অনুসৃত কর্মসূচী পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত হাসান আল-বাসরী (মৃত: ১১০ হি:/ ৭২৮ খ্রী:), সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (মৃত: ১৩ হি:), সুফিয়ান আস-সওরী (মৃত: ১৬১ হি: / ৭৭৮ খ্রী:) প্রমুখ।[৩৬]

৪. উমাইয়া যুগ

খোলাফায়ে রাশেদার পর উমাইয়া বংশ ৬৬১ খ্রী: হতে ৭৫০ খ্রী: পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছর খিলাফত পরিচালনা করে। এ সময় দা'ওয়াতে দ্বীনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দ্বিতীয় উমর খ্যাত উমর ইবন 'আব্দুল 'আযিযের শাসনকাল (৭১৭খ্রী: -৭২০ খ্রী:) দা'ওয়াতে দ্বীনের এক স্বর্ণোজ্জল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে 'আব্বাসীয় যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে রেনেসাঁ সূচিত হয়। এ সময় মুসলিম মনীষীবৃন্দ ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। এ সকল মনীষীগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফা (র:) (৫০হি: - ১৪০ হি:), ইমাম মালিক (র:) (১৭৯হি:), ইমাম শাফি'ঈ (র:) (১৫০হি: - ২০৪হি:), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র:) (১৬৪হি: -২৪১হি:) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

৫. আব্বাসীয় ও ওসমানীয় যুগ

আব্বাসীয় ও ওসমানীয় যুগে হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস, ব্যাকরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় চর্চায় মুসলিম পন্ডিতগণ গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এ সময় দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে আলোচনা ও গবেষণা পরিচালিত হয়। তবে আধুনিক কালের মত সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে 'ইলমুত দা'ওয়াহ সে সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। মনীষীবৃন্দ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা অনুসঙ্গে "আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি 'আনিল মুনকার" "আল-হিসবাহ" "আদ-দা'ওয়াহ" প্রভৃতি শিরোনামে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র:)[৩৮] (১৯৪- ২৫৬ হি:), মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (র:) (২০৪ হি: -২৬১ হি:),[৩৯] মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী (র:) (২০৩-২৭১ হি:),[৪০] ইমাম নববী (র:) (মৃত: ৬৭৬ হি:)[৪১]

ইমাম গাযালী (র:) (৪৫০-৫০৫ হি:),[৪২] ইমাম ইবন তাইমিয়া (র:) (৬৬১-৭২৮ হি:),[৪৩] শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র:) (১৭০৩- ১৭৬২হি:),[৪৪] প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ইসলামী দা'ওয়াহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁদের এ আলোচনায় ইসলামী দা'ওয়াহর মূলতত্ত্ব ও মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়। দা'ওয়াহ বিষয়ক তাদের রচনা সম্ভারে এ বিষয়টি সুসমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের খলিফাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা আজও ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

৬. আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগ বলতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সময়কে বোঝানো হয়। এ সময় মুসলিম রাজশক্তির পতন শুরু হলে তারা কেবল প্রশাসনিক ভাবেই বিচ্যুত হয়নি, তাদের জ্ঞানচর্চা এবং তার অগ্রগতিও দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দা'ওয়াহ বিষয়ক চর্চাতেও ভাটা পড়ে। সময়ের ব্যবধানে এক পর্যায়ে মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। তারা পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। এ পর্যায়ে আধুনিক কালের মুসলিম মনীষীবৃন্দ কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী পন্ডিতদের রচনার উৎস থেকে 'ইলমুদ দা'ওয়াহ নামে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইসলামী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে হাসান আল-বান্না (মৃত: ১৯৪৯ খ্রী:), সাইয়্যেদ আবুল 'আলা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খ্রী:), সাইয়্যেদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬ খ্রী:), বাদশাহ ফয়সল (মৃত: ১৯৭৫ খ্রী:) ও 'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী (মৃত: ২০১৬ খ্রী:) প্রমুখ পন্ডিতদের চিন্তাধারা, রচনাবলী ও কার্য প্রচেষ্টা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমানে ইলমুত দা'ওয়াহ ব্যাপক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক দা'ওয়াহ বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে দা'ওয়াহ একাডেমী, ইনস্টিটিউট, রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী দা'ওয়াতী কাজ হচ্ছে সংস্থা ও সংগঠন কেন্দ্রিক। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণের জন্য 'আল্লামা জামাল উদ্দীন আফগানী প্যান ইসলামিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। অত:পর প্যান ইসলামিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শায়খ রশীদ রেজা (১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রী:) ১৯১১ সালে 'জামিয়্যাতুদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৫] এরই ধারাবাহিকতায় ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকাতেও ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারিত হয়। ১৯৬০ সালে মিশর সরকার দা'ওয়াতী কাজের জন্য 'আল-মাজালিসুল 'আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়া' নামে দা'ওয়াতী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সৌদি বাদশাহ ফয়সল দা'ওয়াতে দ্বীনের সম্প্রসানের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দা'য়ী তৈরীর জন্য ১৯৬১ সালের ২৪ অক্টোবর 'মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালের মে মাসে 'রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী' নামে একটি আন্তর্জাতিক দা'ওয়াতী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮২ সালে লিবিয়া সরকার 'আল-মাজলিসুল আলামি লিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। আশির দশকের শেষের দিকে কুয়েত সরকারও 'আল-হাইয়্যাতুল খাইরিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ' নামে আরেকটি দা'ওয়াতী সংগঠন কায়েম করে। বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছে তাবলীগ জামায়াত, মসজিদ ও মাদরাসাহ কেন্দ্রীক দা'ওয়াতী কাজ, পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজ প্রভৃতি। এ সকল সংস্থা ও সংগঠন বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা প্রচার, পুস্তক মুদ্রন ও বিতরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সাহায্য প্রদান, দূর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ তৎপরতা, মসজিদ, মাদরাসা এবং দা'ওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ গোটা বিশ্বব্যাপী ইসলামী দা'ওয়াতের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।[৪৬]

ইসলামী দা'ওয়াহ-এর প্রয়োগ

ইসলামী দা'ওয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাদ'উ বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেন তাকেই ইসলামী দা'ওয়াহ-এর প্রয়োগ বলা হয়। ইসলামী দা'ওয়াহ-এর প্রয়োগকে আমরা প্রথমত: দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা:

১. আল-ওয়াসা'ইলুল মা'নবিয়্যাহ (অস্পর্শ ও অনুভব্য মাধ্যম): আল-ওয়াসা'ইলুল মা'নবিয়্যাহ এর অর্থ ব্যক্তির অভ্যন্তরীন, মানসিক বা মনুষ্য মাধ্যম। দা'য়ীর বা দা'ওয়াত প্রদানকারীর যে সমস্ত সৎ গুনাবলী ও উত্তম চারিত্রিক আদর্শ মাদ'উর মনন ও চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে তাকে আল-ওয়াসাইলুল মা'নবিয়্যাহ বলা হয়। দা'ওয়াহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ মাধ্যম অস্পর্শ কিন্তু অনুভব্য ও খুবই শক্তিশালী। এর গুরুত্ব ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন:

ক. সালাম বিনিময় করা, খ. হাসিমুখে কথা বলা, গ. বিভিন্ন সময় যোগাযোগ রক্ষা করা, ঘ. সাক্ষাতে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা, ঙ. অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া, চ. ভাল কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, ছ. মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার না করে দরদ ভরা মনে সংশোধন করে দেওয়া ইত্যাদি।

২. আল-ওয়াসা'ইলুল মাদ্দিয়্যাহ (বস্তুগত মাধ্যম): ইসলামী দা'ওয়াহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বস্তুগত উপাদান গুলোকে আল-ওয়াসা'ইলুল মাদ্দিয়্যাহ বলা হয়। এটি আবার তিন প্রকার। যথা: ক. ফিতরিয়্যাহ. খ. ফান্নিয়্যাহ এবং গ. ত্বাবাকিয়্যাহ।[৪৭]

ক. **ফিতরিয়্যাহ (জন্মগত ও স্বভাবজাত মাধ্যম)**: মানুষের জন্মগত ও স্বভাবজাত ভাবে প্রাপ্ত উপাদান হচ্ছে তার বাকশক্তি। বাকশক্তিকে দা'ওয়াহ প্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে দা'য়ী ব্যক্তিগত কথোপকথন, পাঠদান, অভিভাষণ, সাধারণ বক্তৃতা ও ওয়াজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. **ফান্নিয়াহ (শিল্পকলা মাধ্যম)**: দা'য়ী শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যে উপকরণগুলো ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন সেগুলোকে দা'ওয়াতে ফান্নিয়াহ বলে। যেমন: পত্রিকা প্রকাশ, প্রবন্ধ লিখন, চিঠি লিখন, পত্রিকার চিঠি-পত্র কলামে লেখা, গ্রন্থ রচনা, গবেষণা প্রবন্ধ লিখা, নাটক ও উপন্যাস ইত্যাদি।

গ. **ত্বাবাকিয়্যাহ (প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম)**: দা'ওয়াহ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সংস্কারমূলক কাজকে দা'ওয়াতের ত্বাবাকিয়্যাহ মাধ্যম বলা হয়। যেমন: মসজিদ নির্মাণ, সংগঠন, সংস্থা, ফাউন্ডেশন ও ট্রাষ্ট প্রতিষ্টা, মাদ্রাসাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতিম খানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।[৪৮]

ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যম সমূহকে বাহ্যিকভাবে দেখা ও স্পর্শ করা বা না করার দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন: ১. ইসলামী দা'ওয়াতের অবস্তুগত মাধ্যম, ২. ইসলাসী দা'ওয়াতের বস্তুগত মাধ্যম।[৪৯]

১. ইসলামী দা'ওয়াতের অবস্তুগত মাধ্যম: দা'ওয়াতী কাজের যে সমস্ত উপাদান বাহ্যিকভাবে দেখা ও স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু যা দা'য়ী ও মাদ'উকে আত্মিকভাবে শক্তিশালী করে দা'ওয়াতী কাজে গতিশীলতা ও প্রাণ সঞ্চার করে তাই অবস্তুগত মাধ্যম। দা'ওয়াতী কাজের প্রধান অবস্তুগত মাধ্যম নিম্নরূপ: ক. আল্লাহ তা'য়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক, খ. তাকওয়া বা খোদাভীতি, গ. দা'য়ীর দা'ওয়াতী চরিত্র, ঘ. দা'ওয়াতী পরিকল্পনা।

আল্লাহ তা'য়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক: আল্লাহ তা'য়ালার সাথে দা'য়ী ও মাদ'উর গভীর সম্পর্ক ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দা'ওয়াতে দ্বীনের মত কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্রে আল্লাহ

তা'য়ালার সাথে যথাযথভাবে গভীর সম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান পাথেয়। দা'য়ীর সাথে আল্লাহ তা'য়ালার সম্পর্ক প্রত্যাশিত সর্বনিম্ন মানের নীচে নেমে গেলে তার সকল প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা আখিরাতমুখী না হয়ে দুনিয়ার রঙে রঙ্গীন হয়ে যায়। সমাজের কতৃত্বশালী এবং নেতৃতের গুনাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে নেওয়ার জন্য মহানবী (সা:) আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে গভীর রাতে ধরনা দিতেন। আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক গভীর করার জন্য কিছু মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যেমন : (১) মৌলিক 'ইবাদাতসমূহ যথাযত ভাবে পালন করা। (২) আল-কুরআন ও হাদীস নিয়মিত অধ্যয়ন (৩) নফল ইবাদাতসমূহ যথাযথ ভাবে পালন (৪) সার্বক্ষনিক দোয়া ও জিকির।[৫০]

তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করা

আরবী তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, সাবধান হওয়া, পরহেযগারী ও কোন অনিষ্ট হতে নিজেকে দূরে রাখা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে আল্লাহ ভীতিকে তাকওয়া বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ সকল প্রকার কথা, কাজ ও চিন্তা পরিহার করে আল-কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মত জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলা হয়। মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া ব্যতীত আকর্ষণীয় বক্তৃতা, মাধূর্যময় ও বলিষ্ঠ আলোচনা কোন কিছুই মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে না। তাকওয়া দা'য়ীর দাওয়াতে দ্বীনের প্রধান পাথেয়। তাই দা'ওয়াত দেয়ার পাশাপাশি নিজেও আমল করতে হবে, নিজেকে মুত্তাকীদের কাতারে শামিল করতে হবে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থাৎ "তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের উপদেশ দিচ্ছ আর নিজেদেরকে ভূলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না।"[৫১]

দা'য়ীর দা'ওয়াতী চরিত্রঃ

দা'য়ীর দা'ওয়াতী চরিত্র হলো দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজের অবস্তুগত মাধ্যম। দা'য়ীর ভূমিকার উপর দা'ওয়াতী কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। দা'ওয়াত দানকারীকে হতে হবে সম্পূর্ণ নি:স্বার্থ, আন্তরিক ও সত্যপরায়ন। তাকে হতে হবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী, ধৈয্যশীল, সত্যবাদী, দয়াশীল, অথিতিবৎসল, সাহসী এবং দুনিয়াবী বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন। দা'য়ী কম কথা বলবেন এবং অত্যধিক ধৈর্য্যের পরিচয় দিবেন। বেশী কথার পরিবর্তে চারিত্রিক মাধূর্য দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবেন। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা রাখবেন। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখে সময় নেবেন। গোজামিলের আশ্রয় নিবেন না। মাদ'উর সুখ-দু:খের অংশীদার হবেন। মনকে অহেতুক ধারণা থেকে মুক্ত রাখবেন। সম্পর্কের মজবুতির জন্য দা'য়ী টার্গেগকৃত ব্যক্তির সাথে একসঙ্গে ভ্রমণ, একত্রে নাস্তা ও খাওয়া, নিজ বাসায় নিয়ে যাওয়া এবং উপহার দেয়াসহ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করবেন। মোটকথা টার্গেটকৃত ব্যক্তির জাহেলিয়্যাতের রোগ দূর করার জন্য তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভুমিকা পালন করবেন। তার দূর্বলতার সমালোচনা না করে সৎ গুনাবলী বিকাশে সহযোগিতা করবেন।

দা'ওয়াতী পরিকল্পনা

দা'ওয়াতী কাজের পরিকল্পনা একটি অবস্তুগত মাধ্যম। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহন করলে সংশ্লিষ্ট কাজের অর্ধেক হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। টাগেটকৃত ব্যক্তিগণকে ইসলামী আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। দা'ওয়াতী দ্বীনের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে এটা নির্ধারণ করা যেমন পরিকল্পনা, তেমনি গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিভাবে অর্জিত হবে একেবারে নিম্ন

পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি করণীয় কাজ পূর্বেই নির্ধারণ করার নাম পরিকল্পনা। আমরা কোথায় আছি এবং দা'ওয়াতী দ্বীনের আহ্বানকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই, পরিকল্পনা প্রনয়ণে তা বিশেষ ভাবে বিবেচনায় আনা হয় বলে পরিকল্পনা হলো একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া, যা সচেতনতার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার আলোকে কর্মপন্থা গ্রহণের দিক নির্দেশ করে।

২. ইসলামী দা'ওয়াতের বস্তুগত মাধ্যম

ইসলামী দা'ওয়াতকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য দা'ওয়াতের বস্তুগত মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দা'ওয়াহ-এর বস্তুগত মাধ্যমকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়:

১. জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি।
২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দা'ওয়াহ উপস্থাপন।
৩. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, তাফসীর মাহফিল ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াহ উপস্থাপন।
৪. পরিবার ও সমাজে ইসলামের অনুশীলনের মাধ্যমে দা'ওয়াহ উপস্থাপন।
৫. মসজিদ, মাদ্রাসাহ, মক্তব ও অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দা'ওয়াহ-এর প্রচার ও প্রসার।
৬. দা'ওয়াতী সংস্থা গঠন,ইসলামী বই ও পত্রিকা প্রকাশ ও ইন্টারনেটে দা'ওয়াহ বিষয়ক আলোচনা করা ইত্যাদি।[৫২]

আল-কুরআনে বর্ণিত প্রায়োগিক পন্থা

আল-কুরআনে দা'ওয়াহ-এর প্রায়োগিক পন্থা খুবই আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরাহ আন-নাহলে বর্ণিত হয়েছে, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ অর্থাৎ "তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।"[৫৩]

উপরে বর্ণিত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নে আলোচিত পন্থাসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়:

১. আল-হিকমাহ বা প্রজ্ঞা (الحكمة)
২. আল-মাও'য়িযাতুল হাসানাহ বা সদুপদেশ (الموعظةالحسنة)
৩. আল-মুজাদালাহ বা বিতর্কমূলক (المجادلة)

আল-হিকমাহ

'হিকমাহ' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ, তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞান, দর্শন, পরিনাম, বিচক্ষণতা ইত্যাদি।[৫৪] এ শব্দটির মুলধাতু حكم এর অর্থ আদেশ করা, শাসন করা, নিষেধ করা, বিরত রাখা, বিধিসমূহ পরিচালনা করা, আদেশ প্রবর্তন করা, মীমাংসা করা।[৫৫] এ থেকেই حكيم শব্দটির ব্যবহার বাংলা ভাষাতেও রয়েছে। আরবী ভাষায় حكيم শব্দটি ফায়সালাকারী এবং চিকিৎসকের অর্থে ব্যবহার হয়। হিকমত শব্দটি কার্যকারণ ও রহস্য অর্থেও পাওয়া যায়। যেমন, حكمة التشريع অর্থাৎ শর'ঈ আইন প্রচলনের কার্যকারণ বা রহস্য। মূলত: 'হিকমাহ' এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক 'আরবী প্রত্যয়, অন্য ভাষায় যার কোন সঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না।[৫৬] ইসলামী দা'ওয়াহ প্রচারে হিকমাহ অবলম্বনের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ইসলামী দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি হিকমতের পরিধিও ব্যাপক। তবে

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের কয়েকটি মৌলিক দিক রয়েছে। যেমন: (ক) দা'ওয়াহ-এর প্রস্তুতি পর্বে হিকমাহ, (খ) দা'ওয়াহ-এর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমাহ, (গ) দা'ওয়াহ-এর সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমাহ, (ঘ) দা'ওয়াহ-এর স্থান ও পরিবেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমাহ, (ঙ) দা'ওয়াহ উপস্থাপন ও দা'য়ীর আচরনের ক্ষেত্রে হিকমাহ। [৫৭]

দা'ওয়াতের প্রস্তুতি পর্বে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা

দা'ওয়াহ দ্বীনের ক্ষেত্রে হিকমাহ-এর প্রথম কাজ হলো দা'ওয়াতের প্রস্তুতি গ্রহণ। হঠাৎ আবেগ বশত: অনেক কিছু করা যায়, বড় ধরনের কিছু ঘটানো যায় কিংবা আবেগের প্রেক্ষিতে তোড়পাড় করে দেওয়া যায় কিন্তু কাউকে দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে দা'য়ীকে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হয়। 'আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ:) কে ফেরেশতাদের মুখোমুখী করার পূর্বে তাকে প্রস্তুতি স্বরূপ সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজ করার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেছেন। হযরত মূসা (আ:) কে ফিরাউনের দরবারে দা'ওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করলে মূসা (আ:) দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি স্বরূপ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলেন, قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي অর্থাৎ "সে বললো, হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন। আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নির্ধারিত করে দিন। আমার ভাই হারুনকে।"[৫৮]

সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা:) কে দা'ওয়াতে দ্বীনের এ মহান কাজে নামার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে হেরা গুহায় দীর্ঘ ৪০ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। আবার ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ের যে সমস্ত আয়াত ও সুরাগুলো অবতীর্ণ হয়, তাতে ধৈর্য্য ধারণ করা, রাতের কিছু অংশে ইবাদাতে মশগুল থাকা, পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা দা'ওয়াতে দ্বীনের প্রস্তুতি পর্বের কাজ। মোটকথা দা'ওয়াতে দ্বীনের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করে কাজ করতে হবে।

দা'ওয়াতের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা

দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনের গুরুত্ব খুবই উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিষয়। আল-কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও ধরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যেমন তৎকালীন আরবের প্রধান সমস্যা ছিল শিরক। তাই প্রথম যুগে যে সমস্ত মাক্কী সূরাহ অবতীর্ণ হয় সেগুলোতে মানুষকে পৌত্তলিকতা ও শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্য আহ্বান জানান হয়। প্রথমেই 'ইবাদাতের জন্য বলা হয়নি। কারণ যারা আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বীকার করে না, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার 'ইবাদাতের দা'ওয়াত দেওয়া হিকমাত নয়। বরং তাদের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করাই হিকমাহ। মহানবী (সা:) তাঁর দা'ওয়াতী কাজে এভাবে হিকমাহ অবলম্বন করতেন। তাইতো দেখা যায় তিনি যখন হযরত মুয়াজ (রা:) কে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠালেন তখন তাকে দা'ওয়াতে দ্বীনের যে পদ্ধতি শিক্ষা দেন তা হলো: প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ মেনে নিতে আহ্বান জানাবে। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে যাকাত প্রদানের আহবান জানাবে।[৫৯] এভাবে আল্লাহর রাসূল (সা:) সাহাবীদেরকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দা'ওয়াতের বিষয় নির্বাচন করে দিতেন।

দা'ওয়াতের সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা

সময় নির্বাচন দা'ওয়াতে দ্বীনের হিকমাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। দা'য়ী যদি মাদ'উর মন-মানসিকতার দিকে নযর না দিয়ে যে কোন সময় দা'ওয়াত দেন তবে সে দা'ওয়াত অরণ্যে রোদন ছাড়া আর

কিছুই নয়। দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করার জন্য সময় নির্বাচন করে দা'য়ীকে দা'ওয়াতী কাজে আঞ্জাম দিতে হবে। সময় নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত হিকমতগুলো অনুসরন করা যেতে পারে।

১. যদি মাদ'উ কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকে তাহলে সে সময় দা'ওয়াত দেয়া যাবে না। মাদ'উ যাতে দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে পারে সে সময় দা'য়ীর নিজস্ব প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্দি করতে হবে।[৬০]

২. মাদ'উর নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শের দা'ওয়াত প্রদানের পূর্বে দা'য়ীর সাথে তার আন্তরিকতা ও পরিচিতি সৃষ্টি জরুরী। অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ করে দা'ওয়াত দিলে সে দা'ওয়াত মাদ'উ গ্রহণ করবেনা।

৩. মাদ'উর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রথমেই দা'ওয়াতের বিষয় উপস্থাপন না করা। সম্পর্ক গভীর এবং একে অপরের প্রতি আস্থার সম্পর্ক ও পরিবেশ সৃষ্টি হলে দা'ওয়াত পেশ করা।

৪. দা'ওয়াত দানের মত পরিবেশ ও সুযোগ আসলেই তার সদ্ব্যবহার করা। যেমন, হযরত মুসা (আ:) কে যখন ফেরাউন জনসমক্ষে খোলা ময়দানে যাদু প্রদর্শন করতে বলেন, তখন তিনি সুযোগ পেয়ে দা'ওয়াত দিয়ে বসেন।[৬১]

৫. দা'য়ীর তাড়াহুড়ার প্রবণতা পরিত্যাগ করা। এক্ষেত্রে হিকমত হলো অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে দা'ওয়াত উপস্থাপন করা।

৬. সমসাময়িক সমস্যা, উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং দা'ওয়াত দানের সময় তা তুলে ধরা।

দা'ওয়াতের স্থান ও পরিবেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা

দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজে স্থান ও পরিবেশ নির্বাচন হিকমাহর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্থান ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে অনেক সময় যেমন প্রকাশ্যে দা'ওয়াতী কাজ করতে হয়। তেমনি অনেক ক্ষেত্রে গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করা সময়ের অনিবার্য দাবী। যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে দা'য়ী প্রকাশ্যে ইসলামের সুমহান আদর্শের দা'ওয়াত দিলে প্রতিকুল পরিবেশের কারনে তা অংকুরেই শেষ হয়ে যাবে। এমনকি দা'য়ীর আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করাই হিকমত। এজন্য রাসূল (সা:) প্রথমে তিন বছর গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করেন। অত:পর পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অনূকুল অবস্থায় প্রকাশ্যে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন। অত:পর মহানবী (সা:) পর্যায়ক্রমে প্রথম দিকে তিনি পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের, তারপর নিজ গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোকদের, অত:পর নিজ শহর বা দেশ এবং তারপর সমগ্র মানবজাতিকে দা'ওয়াত দেন।[৬২]

দা'ওয়াহ উপস্থাপন ও দা'য়ীর আচরনের ক্ষেত্রে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা

হিকমাহ ব্যতীত দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা নিতান্তই নিবুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য দা'ওয়াহ উপস্থাপন ও দা'য়ীর আচরনের ক্ষেত্রেও হিকমাহ অবলম্বন করতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণাকে সন্মানের সাথে খন্ডন করা :

দা'ওয়াতে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত হলো প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণাকে সন্মানের সাথে খন্ডন করা। কেননা প্রত্যেকে তার বিশ্বাসকে সন্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তাই দা'য়ী যখন মাদ'উর বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সবচেয়ে বিশ্বাসের জায়গায় আঘাত করবে তখন স্বাভাবিক কারনেই যত মূল্যবান কথাই হউক না কেন মাদ'উ বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তা গ্রহন করবেনা। হযরত ইবরাহীম (আ:) স্বীয় পিতাকে দা'ওয়াত প্রদানের সময়

এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ অর্থাৎ "আর তুমি তাদের নিকট ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর। যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা কিসের 'ইবাদাত কর ?" তারা বললো: 'আমরা মূর্তি পূজা করি। অত:পর এগুলোয় পূজায় আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকি। সে বললো : যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায় ? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?"[৬৩]

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ:) তাদের পূজনীয় দেবতাদের কুৎসা ও নিন্দা না করেই কথা-বার্তার এক পর্যায়ে সুকৌশলে ভ্রান্ত ধারণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এ পর্যায়ে আরও কতিপয় পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো: যেমন,

ক. **সুযোগ বুঝে কাজ করা :** হযরত ইউসুফ (আ:) কারাগারে কয়েদীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনার এক পর্যায়ে তাদের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শের দা'ওয়াত তুলে ধরলেন।

খ. **প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো :** হযরত ইবরাহীম (আ:) তাঁর জাতির কাছে দা'ওয়াত প্রদানের সুযোগ খুজছিলেন। পরবর্তীতে যখনই সেই সুযোগটি আসলো তখনই তাদের কাছে দা'ওয়াত উপস্থাপন করলেন।

গ. **অনুসারীদের কথায় উত্তেজিত না হওয়া :** দা'ওয়াতী কাজের কোন পর্যায়ে অনুসারীদের কথায় উত্তেজিত না হয়ে ধৈয্যধারণ করতে হবে এবং সান্তনার স্বরে সম্ভাবনার কথা বলতে হবে।

ঘ. **কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহ তা'য়ালার উপর আস্থা অবিচল রাখা :** একজন দা'য়ীকে দাওয়াতী জিন্দেগীর কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহ তা'য়ালার উপর অবিচল আস্থার অধিকারী হতে হবে। নবী (আ:)-দের জীবনে এ ধরনের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঙ. **যোগ্য উত্তরাধিকার তৈরী করা :** দা'য়ীকে দা'ওয়াতের কাজ সচল রাখার জন্য যোগ্য উত্তরাধিকার তৈরী করতে হবে। কেননা দা'য়ীর মৃত্যুর পর দা'ওয়াতী কাজ যেন বন্ধ না হয় বরং তা যেন যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে।

চ. **প্রতিনিধির মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করা :** অনেক সময় দেখা যায় দা'য়ীর মাধ্যমে দা'ওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে নিজে না গিয়ে প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজ করলে বেশী ফলপ্রসূ হয়। এ জন্য দা'য়ীকে লোক তৈরীর মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ সচল রাখার জন্য যোগ্য প্রতিনিধি তৈরী করতে হবে।

ছ. **সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার :** সামাজিক রীতি-নীতি অস্বীকার করে দা'ওয়াত দিলে সে দাও'য়াত অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না। সেজন্য অনৈসলামিক না হলে সামাজিক রীতি-নীতি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দা'ওয়াত দিতে হবে। মহানবী (সা:)-এর জীবনে এ ধরনের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৪]

আল-মাও'য়িযাতুল হাসানাহ

মাউ'য়িযা শব্দটি 'আরবী (وعظ) থেকে উৎসারিত। এটা আভিধানিক দিক দিয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা : তাযকীর বা স্মরণ করানো,[৬৫] নসীহতের সুরে স্মরণ করিয়ে দেওয়া,[৬৬] নেক কাজের আদেশ দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন করা,[৬৭] মঙ্গলজনক বিষয়ে স্মরণ করানো,[৬৮] ইত্যাদি। আর 'আল-হাসানাহ' অর্থ ভাল, সুন্দর, মাধুর্যমন্ডিত। আল-মাউ'য়িযাতুল হাসানার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'আল্লামা বায়যাভী (র:) বলেন : الموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة অর্থাৎ "মাউ'য়িযাতুল হাসানা হলো, তুষ্টিব্যাঞ্জক বক্তৃতামালা ও উপকারী বা কার্যকরী শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক বিষয়সমূহ।"[৬৯] মাও'য়িযা বিষয়টি হাসানা হওয়ার জন্য তার বিষয়বস্তু

প্রয়োগের ধরনের সাথে সম্পর্কিত মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপঃ হিকমত অবলম্বন, দা'ঈর আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব, সৌহাদ্য ও ভালবাসা উদ্বেলিতকরণ, বন্ধুত্বপূর্ণ নরম ব্যবহার, সাবলীল ভাষা ব্যবহার, শান্ত-শিষ্ট ও ধীরস্থিরে মাউ'য়িযাহ উপস্থাপন, ওয়াজকে তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্তকরণ, কথা ও কাজে মিল থাকা, উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শন, ইহ-পারলৌকিক উভয় স্বার্থকে একত্রিত করে উপস্থাপন, আল-কুরআন ও রাসূল (সা:)-এর বাণী ব্যবহার, ওয়া'জের বিষয়বস্তুকে সমসাময়িক জীবন-যাত্রার সাথে সম্পৃত্তকরণ, সত্যাশ্রয়ী ও বাস্তববাদী হওয়া, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা, ভাব-ব্যঞ্জনশৈলিতে বৈচিত্র আনয়ন, শব্দ ও শরীর নিয়ন্ত্রণ, ওয়াজের মাত্রায় মিথ্যাচার বর্জন ইত্যাদি।[৭০]

আল্লামা আলুসী (র:)[৭১] এর মতে মাউ'য়িযাহ হলো, কোন ব্যক্তিকে পরকালে পাপের শাস্তি কিংবা পূণ্যের প্রতিদান সম্পর্কে এমন উপদেশ প্রদান করা যাতে তার হৃদয় বিগলিত হয়। মোটকথা মাও'য়িযাযে হাসানাহ বলতে বুঝায়, কাউকে সত্য ও কল্যাণমূলক এবং ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্চিত ও তিরস্কারযোগ্য বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা এবং নসীহত করা যাতে হৃদয় বিগলিত হয় এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ "আমি একে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছি, সে সময়ের এবং তৎপরবর্তী জনপদসমূহের জন্য এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ"।[৭২]

মাও'য়িযা হাসানাহ প্রয়োগের ক্ষেত্র সমূহ

মাও'য়িযা হাসানাহ কাদের ক্ষেত্রে করা যাবে, এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্য নিম্নরূপঃ প্রথমত: সমাজে যারা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, গাফেল-অমনোযোগী, তত্ত কথা তেমন বুঝে না, আর তর্কেও তেমন ঝোক নেই। তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এখনো স্বাভাবিক। বরং জীবন ও জগতে বিদ্যমান বস্তুতান্ত্রিক বিষয়গুলো তারা বেশী উপলদ্ধি করতে সক্ষম, এ শ্রেণীর লোকদেরকে মাও'য়িযা হাসানাহ দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। আর যারা তত্ত্বকথা বুঝে তথা যারা জ্ঞানী-গুণী, তাদেরকে তত্ত্বকথা দ্বারা এবং যারা তর্কপ্রিয় তাদেরকে উত্তম পন্থায় যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হবে। ইমাম রাযী, নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, আল্লামা আলুসী প্রমুখ মুফাসসির এ মতটিই পোষণ করেন।[৭৩] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ মতামতটি যথাযথ নয়। কারণ যারা জ্ঞানী-গুণী তাদের আবেগ অনুভূতি আছে। যারা তর্কে আগ্রহী তাদের ঐ মনস্তাত্ত্বিক দিক শুন্য নয়। মানুষের জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় জ্ঞান নয় বরং আবেগ। তাই জ্ঞানী ও তর্কে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেও মাও'য়িযা করতে হবে। এর দ্বারা তারা সংশোধিত হবেন। অনেক সময় যুক্তিতে হারলে মানুষ প্রতি পক্ষের মত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে চায় না। সে ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানাহ করা হলে সে তা গ্রহন করে নিতে পারে। এ জন্য 'উলামায়ে কেরাম বিতর্কের সময় অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে পরিশেষে ওয়ায করেন। অতএব মাউ'য়িযা একটি সর্বব্যাপী দা'ওয়াতী পন্থা।

দ্বিতীয়তঃ এ মাও'য়িযা হাসানাহ কি শুধু মুসলমানদের জন্য, না অমুসলিমদেরকেও তা করা যাবে, এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. প্রথম দলের মতে মাউ'য়িযা হাসানাহ শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ "এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা, আর মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ বাণী"।[৭৪] এখানে প্রথমে (اَلنَّاس) মানুষ বলে 'আম' (ব্যাপক) ধারণা দিয়ে মাউ'য়িযাকে মুত্তাকীদের জন্য খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়েছে। 'আল্লামা যাজ্জাজসহ অনেকেই এ মত পোষন করেন।

খ. জমহুর ওলামার মতে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে মাউ'য়িযা করা যাবে। আর উপরোক্ত আয়াতে মুত্তাকী বলতে জাতির মুত্তাকী (المتقون من كل امة) লোকদের বুঝানো হয়েছে। আসলে প্রতিটি মানুষের অন্তরে

সৃষ্টিকর্তার ভয় কোন না কোন ভাবে কিছু না কিছু বিদ্যমান। আর যে যত বেশী মুত্তাকী মাউ'য়িযা তার ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। এর অর্থ এ নয় যে, অমুসলিমদের জন্য মাউ'য়িযা করা যাবে না। বরং আল-কুরআনে এসেছে, পূর্বযুগের দা'য়ীগণ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপকভাবে মাও'য়িযা করেছেন। তারা ঈমান আনুক বা না আনুক। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালেহ (আ:)-এর কওম তাঁকে বলেছিল: তুমি আমাদের ওয়াজ কর আর না কর উভয়ই সমান।

বয়স ও পদ মর্যাদা বিবেচনার ক্ষেত্র

মাও'য়িযা হাসানাহ-এর ক্ষেত্রে বয়স ও পদ মর্যাদার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি মাও'য়িযা হাসানাহ করবেন তার বয়স ও পদ মর্যাদা এবং যাদের উদ্দেশ্যে মাউ'য়িযা করবেন, তাদের বয়স ও পদ মর্যাদার উপর ভিত্তি করে প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে। মাও'য়িযা হাসানাহর ক্ষেত্রে দা'য়ীর বয়স ও পদ মর্যাদা কম হলে দা'য়ীকে পরামর্শের সুরে মাউ'য়িযা হাসানাহ প্রয়োগ করতে হবে। আর মাউ'য়িযা হাসানাহ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, শ্রমিক, চাকরীজীবী, আইনজীবী, শাসক শ্রেণী সকলেই উপযোগী ও কার্যকর। ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাও'য়িযা হাসানাহ তথা হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা ও দরদ ভরা মন দিয়ে কিছু বললে মাদ'উর মনে তা আলোড়ন সৃষ্টি করে, অনুভূতিতে নাড়া দেয়। হৃদয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর যুক্তির পিছনে হৃদয়ে ঐ নাড়া দেওয়ার কাজটি করে মাউ'য়িযা। কোন ব্যক্তি যুক্তিতে হেরে গেলেও সহজে ইসলাম কবুল করে না। কিন্তু এর পাশা পাশি যদি মাও'য়িযা দ্বারা তার হৃদয়ে নাড়া দেওয়া যায়। তখন তার বোধির দরজা ভেঙ্গে যায়, খুলে যায় অন্তরের সুপ্ত কোঠর, বের হয়ে আসে অন্তরের গোপন কথা, জেগে উঠে তার ফিতরাত। আর এভাবেই সে সহজেই ইসলাম কবুল করে বসে। আর এ মাও'য়িযার দ্বারা দা'ঈ ও মাদ'উর মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তারা উভয়ে একে অপরকে আপন ভাবতে থাকে। সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। এভাবে যুগে যুগে ইসলাম দ্রুত ও বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাই আজও এ মাউ'য়িযা হাসানার পন্থা যথাযথ ভাবে অবলম্বন করলে দা'ঈ সফলকাম হতে পারেন বলে আশা করা যায়।[৭৫]

(গ) আল-মুজাদালাহ বা বিতর্কমূলক বিষয়

মুজাদালাহ অর্থ পারস্পরিক আলোচনা এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে বিতর্কমূলক মত বিনিময় করা। দা'ওয়াত প্রচারের এটি একটি উপাদেয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অবলম্বনে জন্য আল-কুরআনে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ "তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করবেনা।"[৭৬] আল-কুরআনের উপরোক্ত ভাষ্যানুযায়ী মুযাদালাহ হলো ইসলামী দা'ওয়াতের একটি অন্যতম পদ্ধতি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো: 'আরবী مجادلة শব্দটি جدل মূলশব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। جدل শব্দের অর্থ হলো, পাকানো, শক্ত হওয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা ও তর্ক-বিতর্কে জয়ী হওয়া ইত্যাদি। বুৎপত্তিগত অর্থে মুজাদালাহ হলো, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা, তর্কে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।[৭৭] তবে তর্ক শাস্ত্রের পরিভাষায় মুযাদালাহ শব্দটির অর্থ বর্ণনায় বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ক. বিশিষ্ট জাদল বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবন সিনার[৭৮] মতে, মুযাদালাহ হলো অধিকাংশের নিকট গ্রহনযোগ্য পরস্পর বিরোধীতার পদ্ধতি যার মধ্যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে।[৭৯]

খ. আল্লামা জুরজানীর[৮০] মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব মতবাদকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অযোগ্যতা ও অপারগতাকে প্রকাশ করা এবং প্রতিপক্ষের মতের অসারতা তুলে ধরা হয়।[৮১]

ইসলামী দা'ওয়াতে মুযাদালাহ (বিতর্কমূলক বিষয়) প্রয়োগের নীতিমালা

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই মুযাদালার সূত্রপাত। আদম (আ:) কে সৃষ্টি করার প্রারম্ভেই ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার মুযাদালাহ হয়। আদম (আ:) কে সেজদা করা নিয়েও ইবলিস আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মুযাদালাহ করে। মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। প্রত্যেক নবীর তাঁদের উম্মতেরও মুযাদালাহ হয়। নবী ও রাসূলগণ মুযাদালার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করতেন। মোটকথা দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে গেলে মুযাদালার প্রয়োজন হবেই। কিন্তু মুযাদালাহ থেকে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার জন্য দা'য়ীকে মুযাদালার মুলনীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:-

দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে মুযাদালাহ (বিতর্কমূলক বিষয়)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ অর্থাৎ "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"।[৮২] তাই দা'ওয়াতে দ্বীনের সামগ্রিক কাজ তথা মুযাদালার মূল লক্ষ্য হতে হবে ইসলামকে অন্যান্য সকল মত ও পথের উপর বিজয়ী করা। দা'য়ীকে মুযাদালাহ করার পূর্বে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হতে হবে এবং তদানুসারে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে হবে। এ জন্য দা'য়ী যদি সচেষ্ট থাকে তাহলে মুযাদালার মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করা অনেকটা সহজ হবে।

উপপাদ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দলীল প্রমাণসহ মুযাদালাহ (বিতর্ক) করা

যে বিষয়ে দা'য়ীর পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তার তর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ পর্যাপ্ত দলীল প্রমাণের অভাবে এমনও হতে পারে, চুড়ান্ত মুযাদালায় বাতিল পন্থীরা বিজয়ী হয়ে যেতে পারে। এতে ইসলামের যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে তাতে মুযাদালাহ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। এ কারনে দা'য়ীর জন্য উপপাদ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতীত বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ "সাবধান! তোমরা তো সেসব লোক, বিতর্ক করলে এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। তবে কেন তোমরা বিতর্ক করছো সে বিষয়ে যার জ্ঞান তোমাদের নেই ? আসলে আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৮৩]

কৌশলে প্রতিপক্ষের মুখ দিয়েই তার দূর্বল দিক বের করানো

কৌশল ব্যতীত মুযাদালায় জয়ী হওয়া কঠিন। দা'য়ীর মুযাদালায় দা'ওয়াতে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো যে কোন ভাবেই প্রতিপক্ষের মুখ দিয়েই তার দূর্বল দিক বের করাতে হবে। যেমন আল-কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি। হযরত ইবরাহীম (আ:) তাঁর জাতির লোকদের মুখ দিয়েই মূর্তি পূজার অসারতা স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُون أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ অর্থাৎ "যখন সে তাঁর পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা কিসের 'ইবাদাত কর। তারা বললো, আমরা মূর্তির পূজা করি। অত:পর এ গুলোয় পূজায় আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকি। সে বললো: যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায় ? অথবা তারা কি তোমাদের

উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? তারা বললো: বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপই করতে পেয়েছি।"[৮৪]

প্রতিপক্ষের বিশ্বাসে আঘাত না করা

মুযাদালাহ করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের বিশ্বাসে আঘাত করা যাবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার মতামতকে সঠিক বলে মনে করে। সুতরাং কেউ তার বিশ্বাসে আঘাাত করুক এটা তার কাছে অনেক পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর। এমতাবস্থায় তার ভূল সংশোধনের জন্য যত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন হোক না কেন? সে কিছুতেই দা'য়ীর মতকে সমর্থন করবে না। এজন্য কৌশল ও যুক্তিপূর্ণ ভাবে কাজ করতে হবে।

কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত না হওয়া

দা'য়ীকে দা'ওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। বাতিল যে কোনভাবে দা'য়ীকে উত্তেজিত করতে পারলেই সফল। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে যে সমস্ত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তারা বিদ্রোহী লোকদের চরম বিরোধিতা, অত্যাচার, উস্কানি সত্বেও উত্তেজিত হতেন না। মূসা (আ:)-এর দা'ওয়াত পেশের ঘটনায় ফিরাউন মুসা (আ:)-কে বারবার প্রশ্ন করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُون قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ "ফিরআউন বললো, সৃষ্টিকুলের রব কে? মুসা বললো, (আল্লাহ) আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিৎ বিশ্বাসী হয়ে থাক। ফির'আউন তার আশপাশে যারা ছিল তাদের বললো, তোমরা কি মনোযোগ সহকারে শুনছো না ? মূসা বললো, তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের রব। ফির'আউন বললো, 'তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এই রাসূল নিশ্চয়ই পাগল।' মূসা বললো, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা বুঝে থাক।"[৮৫]

উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে সঠিক চিন্তার বীজ বপন

দা'য়ীর অন্যতম লক্ষ্য হলো মাদ'উর মনে সঠিক চিন্তার বীজ বপন। একজন চৌকস দা'য়ী এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে পারে। সকল নবী (আ:) এবং হকের আহ্বান কারীদের যুক্তি-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা কেবল যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেই ক্ষ্যান্ত হতেন না। বরং মাদ'উর মনে দা'ওয়াতে দ্বীনের আহ্বান করে তা দলীল প্রমানসহ উপস্থাপনের যোগ্যতা সৃষ্টি করতেন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে যে সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে ইসলামের আগমন যতক্ষন মানুষের চিন্তাগত এবং মতাদর্শগত যোগ্যতাকে পূর্ণরূপে জাগ্রত করতে না পারবে, ততক্ষন এই আহ্বান স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রতিবাদমূলক পন্থা ও যুক্তিহীন বিতর্ক পরিত্যাগ

দা'ওয়াতে দ্বীনের আহ্বানকারীদের যুক্তি-পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে দা'য়ী যুক্তি ও জবাব দানের ক্ষেত্রে প্রতিবাদমূলক পন্থা কখনই গ্রহণ করবে না। যেখানে কোন ধর্মের লোক ইসলামের কোন বিষয়ের উপর আপত্তি উত্থাপন করে, সাথে সাথে আমাদের দা'য়ীগণ নিজ ধর্মের স্বপক্ষে উত্থাপিত আপত্তির প্রতিবাদ করেন। আমাদের তার্কিক এবং দার্শনিকগণ এ ধরণের পন্থা অবলম্বন করে মনে করেন, তারা ইসলামকে অভিযোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মুলতঃ এ ধরনের জবাব নীতিগতভাবে ভূল। অন্যের কোন ভ্রান্তির কারণে আমাদের কোন ভ্রান্তি সত্যে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা আমাদের কোন সত্যের সত্য হওয়াটা সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। এ পন্থায় যুক্তি পেশ করে যদি কোন ফায়দা পাওয়া যায়। তাহলে শুধু এতটুকু যে অভিযোগ বা প্রতিবাদকারীর মুখ বন্ধ করে দেওয়া যায় এবং এর দ্বারা আমাদের অহংকারী মন সান্তনা লাভ করে। দা'য়ীকে প্রতিবাদমূলক পন্থা বাদ দিয়ে নিজের মতের স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি তুলে

ধরতে হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সত্যান্বেষী হয় তাহলে তার সাথে মুযাদালাহ করে একটি ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার যদি বাতিলকে আকড়ে ধরার মনোবৃত্তি থাকে, বার বার বুঝেও না বুঝার ভান করে সত্যকে অস্বীকার করতে থাকে, কোন প্রতিষ্ঠিত যুক্তি না মানে, তবে তার সাথে মুযাদালাহ করা সম্পূর্ণ বৃথা। এরূপ মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মুযাদালাহ করা সম্পূর্ণ বৃথা। এজন্য দা'য়ীকে যুক্তিহীন বিতর্ক সর্বদা পরিত্যাগ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অর্থাৎ "আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে বিতর্ক করে তখন তারা বলে 'সালাম'।"[৮৬]

উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আত্মসম্মানে আঘাত না করা

উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আত্মসম্মান রক্ষা করা মুযাদালার (বিতর্কের) একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্তত:পক্ষে দা'ওয়াতে দ্বীনের দা'য়ীর ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্যই পালনীয়। অন্যথায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সর্বোত্তম পন্থায় মুযাদালাহ করার ব্যপারে শর্ত সাপেক্ষ্যে অনুমতি প্রদান করেছেন, তা পালন করা হলো না। প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, কটুক্তি করা, হেয় প্রতিপন্ন করা, হীন সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এসবের মাধ্যমে দা'য়ীর সাথে মাদ'উর সম্পর্কের অবনতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় দা'য়ী যত মূল্যবান কথাই বলুক না কেন, যত অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করুক না কেন মাদ'উ তা কখনও গ্রহণ করবে না। এমনি পরিস্থিতিতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ অর্থাৎ "আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, আর শত্রুতা পোষণ করবে অজ্ঞতাবশত:। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছি।"[৮৭]

ভারসাম্য রক্ষা ও স্ববিরোধী কথা না বলা

মুযাদালার (বিতর্কের) ক্ষেত্রে দা'য়ীর অন্যতম কর্তব্য হলো কথাবার্তায় ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন এবং দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা। এতে কথাবার্থা এলোমেলে হয়ে যেতে পারে। প্রতিপক্ষ ও শ্রোতার মাঝে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। আর কথা দীর্ঘ হলে তাতে ভূল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী। এমন কথা দা'য়ী কর্তৃক উচ্চারিত হতে পারে যদ্দারা মুযাদালায় প্রতিপক্ষ সুবিধা পেয়ে যাবে। আবার কথাবার্তায় অতি মাত্রায় সংক্ষিপ্ততাও পরিতাজ্য। এতে মূল বিষয়বস্তু প্রতিপক্ষ অনুধাবন করতে না পারার কারণে মুজাদালায় অবাঞ্চিত ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পেয়ে যেতে পারে। এতে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অবলম্বনই হিকমতপূর্ণ। আল-কুরআনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করে বর্ণিত হয়েছে : وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا অর্থাৎ "আর তুমি তোমার হাত কাঁধে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নি:স্ব হয়ে বসে পড়বে।"[৮৮]

চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করা

মুযাদালার (বিতর্কের) ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে দ্বীনের দা'য়ীকে অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী হতে হবে। মুযাদালায় (বিতর্কের) একটি ইতিবাচক ফলাফলই দা'য়ীর উদ্দেশ্য। অহেতুক বাক-বিতন্ডা বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় সময় ক্ষেপন করা দা'য়ীর উচিত নয়। মুযাদালার (বিতর্কের) সময় পক্ষে, বিপক্ষে বিভিন্ন আলোচনা ও পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও বিবেচনা করে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এটাই দা'য়ীর প্রকৃত সফলতা। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে শত আলোচনা করেও কোন ফলাফল পাওয়া যাবে না। সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষমতা দা'য়ীকে দা'ওয়াতে দ্বীনের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। আর দা'ওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য

প্রয়োজন এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান। এজন্য মুযাদালার (বিতর্কের) ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন একদল বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি যারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি

যুগে যুগে নবী (আ:) গণ তাদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমে যে রীতি-নীতি ও পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটাই ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি। আমাদের মহানবী ও (সা:) তাঁর অবলম্বিত যে পন্থার মাধ্যমে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছিয়েছেন সেটাই ইসলামের চিরায়ত দা'ওয়াতী পদ্ধতি। তবে নবী (আ:) গণ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দিলেও সকলের দা'ওয়াতের মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যুগ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ম হলো তিনি যখনই কোন সময়, কোন জনপদে, কোন নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাকে যুগোপযোগী করে তাদের ভাষা-ভাষী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য অনুধাবন ও মূল্যায়ন করে তাদের সামনে কথা বলতে পারেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত জীবন বিধান তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন। এ মর্মে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যেন তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাতে পারে।"[৮৯] মোটকথা প্রত্যেক নবী (আ:) তাদের স্বজাতির জীবন প্রণালী ও সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুধাবন করেই দা'ওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করতেন। আর সেভাবে দ্বীনে ইলাহীর আলোকে মানুষের জীবনে বিকৃত অবস্থাদির সংশোধনী আনতেন।

ইসলামী দা'ওয়াত আম (সর্বসাধারণের)

ইসলামী দা'ওয়াতের সার্বজনীন নীতি হলো, এ দা'ওয়াত বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মুলতঃ নবী-রাসূলগণ সাধারণভাবে সকল মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নে'য়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একত্ববাদের আহ্বান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ "হে মানব মন্ডলী, তোমরা তোমাদের রবের 'ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পুর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ, এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অত:পর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযক স্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।" [৯০]

সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বোধন

আল-কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি, নবী ও রাসূলগণ সর্বপ্রথম জাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একত্ববাদ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্বোধন করার কারণ হলো সমাজের সাধারণ মানুষ জ্ঞান, কর্ম, চরিত্র ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকে। সমাজ বা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ যদি দা'ওয়াতে দ্বীনের আহ্বান গ্রহণ করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে সমাজের সাধারণ লোকদের সংশোধনের পথ অনেকাংশে সহজ হয়ে যায়। আবার সমাজের কর্ণধার ব্যক্তিবর্গ যদি দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় তাহলে সাধারণ লোকেরা এ পথে অগ্রসর হতে ভয় পায়। এজন্য সকল নবী-রাসূল প্রথমেই সমাজের কতৃত্বশীল ব্যক্তিদের ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মূসা (আ:) কেও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন সমাজের

সর্বপ্রধান ব্যক্তি ফির'আউনের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত তুরে ধরেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى অর্থাৎ "ফির'আউনের কাছে যাও ; নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"[৯১]

দা'ওয়াতকে বাস্তবতার মাধ্যমে উপস্থাপন

মানব জাতির সার্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনই একজন দা'য়ীর যথার্থ কর্তব্য। মানুষ হলো সেই প্রাণী যাকে নাগালের মধ্যে আনা সবচেয়ে কঠিন। তার অতি মাত্রায় তর্কপ্রিয়তা, সহসা বিদ্রোহ করার প্রবণতা এবং অত্যধিক স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তার প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করা দা'য়ীর পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। কারণ একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক কদম সামনে এগুতে বলা অপেক্ষা একটি পাহাড়কে স্থানান্তরিত করা সহজ হতে পারে। কিন্তু এই মানুষই আবার নিজের মনের প্রতি বিস্ময়কর ভাবে আনুগত্যশীল। মন ভাল কিংবা মন্দ যে দিকেই ডাকুক না কেন সেদিকে তার আকর্ষণ দূর্নিবার। মনের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ও অর্থ ব্যয় তার নিকট অতীব সুস্বাদু ও সুন্দর বলে অনুভূত হয়। একজন পথভ্রান্ত ব্যক্তিকে সত্যের পথে নিয়ে আসার জন্য প্রথমেই তার মন যে পাপের পথে পরিচালিত তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে হবে। এজন্য একজন মননশীল ও প্রাজ্ঞ দা'য়ী উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মন জয় করার জন্য তার সমগ্র চেষ্টা-সাধনাকে নিয়োজিত করবেন। কিন্ত প্রশ্ন হলো, একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তির মনকে দা'য়ী কিভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারেন? তা কি নিরেট তাত্বিক জ্ঞান উপস্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব নাকি তার নিকট দ্বীনের দা'ওয়াতকে বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব? এ ব্যাপারে মানুষের সাথে কথা বলতে যেয়ে অবাস্তব ও কিতাবী পন্থা পরিহার করা উচিত। এভাবে সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করা যায় না। মুলতঃ একজন দা'য়ী বাস্তবতার আলোকে সহজ ও স্বাভাবিক পন্থায় হিকমতের মাধ্যমে পথভোলা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। [৯২]

মৌলিক বিষযের শিক্ষা প্রদান

যে সমস্ত ব্যক্তি হকের সাথে সংযুক্ত হতে এবং বাতিলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সত্যনিষ্ঠ মন নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তারা একটি স্বতন্ত্র দা'ওয়াতী সংগঠনে পরিণত হয়। বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেওয়ার পর প্রথমেই ইসলামের মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। নবী-রাসূলগণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহনকারীদের প্রাথমিক অবস্থায় এমন বিষয়ের শিক্ষা দেন, যার মাধ্যমে একদিকে সর্বোত্তম পন্তায় আল্লাহ তা'য়ালার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং অপরদিকে তারা নিজেরা সীসা ঢালা প্রাচীরের মত একতাবদ্ধ হয়ে দা'ওয়াতে দ্বীনের কাজে ভূমিকা রাখেন। একদল মানুষকে জাহিলিয়াতের অমানিশা থেকে মুক্ত করে ইসলামের অধীনে সংঘবদ্ধ করেই দা'ওয়াতে দ্বীনের কর্মীদের কাজ শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানেই তাদের কাজ শুরু। এরপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহনকারীদের ইসলামের তাত্বিক ও বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করে ঈমানের বলে বলীয়ান করে তুলতে হবে।

নিজেকে দা'ওয়াতের বাস্তব প্রতীকে পরিণতকরণ

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হলো, দা'ওয়াত সর্বপ্রথম দা'য়ীর ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু হবে। তারপর তার পরিবারবর্গ বন্ধুবান্ধব ও আত্নীয় স্বজন, তারপর দেশবাসী, তারপর বর্হিবিশ্ব। দা'ওয়াত প্রদানকারী প্রথমে তার নিজেকে দা'ওয়াত তথা আমলের বাস্তব প্রতীক বানাবে। এরপর তার পরিবার-পরিজনকে, বন্ধু-বান্ধবদেরকে নমূনা হিসাবে দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করবে। এমনিভাবে পূর্বের স্তর তার পরবর্তী স্তরের জন্য নমূনা হয়ে দাড়াবে। তাতে করে পরবর্তী স্তরের মধ্যে দা'ওয়াতী বিষয়বস্তুর প্রতি মানসিক প্রশ্নের জন্ম নিবে না কিংবা কষ্টকর কাজ হলেও দা'য়ীকে তার সাথে জড়িত দেখে সেটাকে অনেকটা স্বাভাবিক ও সাধারণ বলে মনে হবে। এজন্যই আল-কুরআনে রোযা রাখার নির্দেশের সাথে সাথে একথাও

উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। দা'ওয়াত প্রদানকারীর মধ্যে যদি আমল না থাকে, সে ক্ষেত্রে তার দা'ওয়াতের পশ্চাতে কোন অসদুদ্দেশ্য তথা উপদেশ প্রদানকারী হিসাবে সন্মান লাভ কিংবা পার্থিব কোন স্বার্থ রয়েছে বলে সন্দেহ হতে পারে। মানসিকভাবে তাই লোকেরা সাধারণত: ঐসব উপদেশকারীর কথাই মানতে উদ্বুদ্ধ হয়, যাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল বিদ্যমান থাকে। এজন্যই আল-কুরআনে উপদেশ প্রদানকারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমলকারী হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত বিষয়ে তাদের মৃদু ভৎসনা করা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন সে কথা বলো, যা তোমরা করো না? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়।"[৯৩]

দা'য়ীর নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখা

দা'য়ীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার কোন উক্তি, আচরণ বা কর্ম যেন তার প্রতি অন্যের মনে সন্দেহের সৃষ্টি না করে। সমাজের সামনে তার অবস্থানকে পরিস্কার রাখতে হবে। একবার রমযানের শেষ দশকে রাসূল (সা:) মসজিদে এ'তেকাফে রত ছিলেন। তখন রাসূল (সা:)-এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই রাতের বেলায় রাসূল (সা:)-এর কাছে এলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রাসূল (সা:)ও তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গে চললেন। তারা উভয়ে উম্মে সালামার ঘরের দ্বার সন্নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন, ইত্যবসরে দুজন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সাহাবীদ্বয় রাসূল (সা:) কে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। তখন রাসূল (সা:) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, থামো। এ হলো হুওয়াই তনয় স্যাফিয়া (অর্থাৎ আমার স্ত্রী)।[৯৪] এ হাদীসে সাহাবীদ্বয়কে ডেকে "এ আমার স্ত্রী সাফিয়্যা" কথাটি বলা ছিল একান্তভাবেই মন:স্তাত্তিক কারণে। কেননা শয়তানের প্ররোচনায় নবী (সা:) এর চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। তাই নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা:) তাদেরকে ডেকে সম্ভাব্য সন্দেহের অপনোদন করলেন। এমনিভাবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অহেতুক বিরূপ ধারণাকে প্রতিহত করা এবং নিজের অবস্থানকে নির্মল রাখার ব্যাপারে রাসূল (সা:) অধিক যত্নবান ছিলেন।

তাযকিয়াহ্ নাফস বা আত্মার পরিশুদ্ধকরণ

মানুষ যা কিছু কর্ম সম্পাদন করে তা তার হৃদয়ের বিশ্বাস থেকেই করে। পূর্বের কোন বিশ্বাস ত্যাগ করতে না পারলে সে নতুনভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। আর এ জন্যই প্রয়োজন তাযকিয়াহ নফস। এর মাধ্যমে দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদিম বানানো যায়। ব্যক্তির তাযকিয়াহ নাফসের মাধ্যমে আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সমাজ-সংস্কৃতি, রীতিনীতি সবকিছু শরী'আতের চাহিদা মোতাবেক সম্পন্ন করা সম্ভব। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعون অর্থাৎ "হে মানব মন্ডলী, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তর সমূহে যা আছে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়।"[৯৫]

পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে দা'ওয়াতী কাজ করা

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবন করে দা'ওয়াত প্রদান করা হিকমাতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দা'য়ী এটা যথাযতভাবে বুঝতে না পারলে দা'ওয়াত ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই দা'য়ীকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুধাবন করে পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। তা না হলে ইসলামী দা'ওয়াত অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনটি হলে দা'য়ীর পক্ষে আত্মরক্ষা করাই কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য দেখা যায়,

রাসূল (সা:) মক্কায় প্রথমে ৩ বছর গোপনে দা'ওয়াত দেন। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেন। এ মর্মে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ "সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যাপক ভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" [৯৬]

যুবকদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ

যে কোন সমাজ সেবা মূলক কাজে যুব সমাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ যুবকরা সাধারণত: নরম হৃদয়ের হয়ে থাকে। তারা প্রভূত কল্পনাবিলাসী, উদ্যমী, সাহসী, উচ্চাকাংখী ও অকুতোভয় হয়ে থাকে। যুবকরা ঝুকি নিতে বেশী পছন্দ করে। যে কোন কাজে বিশেষত: ভাঙ্গা-গড়ার কাজে যুবকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরদিকে বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধরা নতুনকে বরণ করতে দ্বিধাদ্বন্ধ সৃষ্টি করে এবং অনেকটা পশ্চাদমুখী হয়ে থাকে। তাই নতুন কোন দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যুবকদের প্রভাবিত করা এবং তাদেরকে অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত করাই দা'ওয়াতে দ্বীনের হেকমতের দাবী। মহানবী (সা:) প্রাথমিক পর্যায়ে যাদেরকে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল যুবক। আর এতে তিনি ব্যাপক সফলতা লাভ করেছিলেন। মহানবী (সা:) যে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এই যুবকদের দ্বারাই তার নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তি রচনা করেছিলেন। মহানবী (সা:) এর প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ সাহাবীর বয়স ছিল ৩০ বছরের নীচে। তাদের মধ্যে অনেকেই হাবশায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।[৯৭]

সামষ্টিক পর্যায়ে দা'ওয়াতী কাজ

দা'ওয়াতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী (আ:) গণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় পন্থায় দা'ওয়াতী কাজ পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেক নবীর জন্য হাওয়ারী তথা সাহায্যকারী ছিল। হযরত শুআয়ব (আ:), মূসা (আ:), ঈসা (আ:) ও মুহাম্মদ (সা:) প্রমুখের গঠিত দলের কথা কুরআনুল কারীমেই উল্লেখ আছে। সুতরাং দা'ওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামষ্টিক দা'ওয়াতের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

সংস্থা কেন্দ্রীক দা'ওয়াতী কাজ

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী দা'ওয়াতী কাজ হচ্ছে সংস্থা কেন্দ্রিক। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারা বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার দা'ওয়াতী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। আবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গঠিত সংস্থাসমূহ বিশ্বের আনাচে-কানাচে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা গঠন করে দা'ওয়াতী কাজ চালাচ্ছে। দা'ওয়াতী কাজের উল্লেখযোগ্য সংস্থা সমূহ হলো: 'জমিয়াতুদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ' ১৯১১ খৃ:, 'আল-মাজলিসুল 'আলা লিশশুউনিল ইসলামিয়্যাহ' ১৯৬০খৃ:, 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী' ১৯৬২ খৃ:, 'আন-নাওয়াতুল 'আলামিয়্যা লিশ শাবাবিল ইসলামী' ১৯৭২ খৃ:, 'আল-মাজলিসুল আলামি লিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' ১৯৮২ খৃ:, 'মাজমাউল বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ' ১৯৭৩ খৃ:, 'মুনাযযামাতে ইলামি ইসলামী' ১৯৮২ খৃ: প্রভৃতি।[৯৮]

সংগঠন কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ভাবে অনেক ইসলামী সংগঠন দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠন কেন্দ্রীক উল্লেখযোগ্য দা'ওয়াতী প্রতিষ্ঠান হলো: জামায়াতে তাবলীগ, আল-ইখওয়ানুল মুসলিমীন, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট আলজিরিয়া, জাষ্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) ও সালাফিয়া আন্দোলন প্রভৃতি।

প্রাতিষ্ঠানিক দা'ওয়াতী কাজ

সংস্থা ও সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও দা'ওয়াতী কাজে বিশেষ অবদান রাখছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে দা'ওয়াতের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন: দারুল ইফতা ওয়াদ দা'ওয়াতী ওয়ার ইরশাদ, আল-মাহাদু লি তাদরীবিল আয়েম্মাতি ওয়াদ দুআত এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দা'ওয়াতী কাজের জন্য অনেকগুলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন: আল-আযহার, নদওয়াতুল উলামা, দারুল উলুম দেওবন্দ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া ইত্যাদি।

প্রচার মাধ্যম ও ইন্টারনেট কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানগণ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেছে। ইসলামী আঙ্গিকে প্রচারিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টিভি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের অবদানে স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের সুবাদে সারা বিশ্বে দা'য়ীগন আরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট খুলে ইসলামী দা'ওয়াহ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছেন। এর মাধ্যমে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হচ্ছে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে।[৯৯]

উপসংহার

আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে তিনি দিয়েছেন দা'ওয়াতে দ্বীনের মাধ্যম, প্রয়োগ ও পদ্ধতির সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা। সে পদ্ধতির অনুসরণ করেই তাঁরা সফল হয়েছিলেন। মহানবী (সা:) তাঁর নবুওয়াতী জীবনের অধিকাংশ সময় দা'ওয়াতী কাজে ব্যয় করেছিলেন। অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের (সা:) জীবনের মূখ্য বিষয়ই ছিল বিশ্ব মানবতার কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শের দা'ওয়াত উপস্থাপন। মুলত: ইসলামী আদর্শ ও সমাজ বিনির্মানের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মানুষের কাছে দা'ওয়াত প্রদান এবং সে লক্ষ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন লোক তৈরী। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দা'ওয়াতে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক দিক-নির্দেশনা সম্বলিত বিধান আল-কুরআন প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী নবীগণের দা'ওয়াত দানের মাধ্যম ও কৌশল আলোচনা পূর্বক মহানবী (সা:) কে দা'ওয়াতের প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। মাধ্যম ও কৌশল হিসাবে আল-হিকমাহ বা প্রজ্ঞা, আল-মাউয়িযাতুল হাসানাহ বা সদুপদেশ ও আল-মুজাদালাহ বা বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। মুলত: আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত এ নির্দেশনা অনুসরনের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে এসেছিল সফলতা, ঘটেছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর বিপ্লব। আজ গোটা বিশ্বব্যাপী খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইয়াহুদীরা তাদের একক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তির আধুনিক যুগে পশ্চিমা ও অনৈসলামী সংস্কৃতির মোহে আজ গোটা মুসলিম সমাজ তমসাচ্ছন্ন। অপসংস্কৃতির সয়লাবে মুসলিম উম্মাহ আজ পথহারা। মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে প্রয়োজন নবী ও রাসূলগণের কর্মপন্থার আলোকে ইসলামের প্রকৃত দা'ওয়াত। এ লক্ষে অত্র প্রবন্ধে ইসলামী দা'ওয়াতের প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিষয়টি যত আলোচিত ও পর্যালোচিত হবে মুসলিম উম্মাহ এ থেকে তত সুফল লাভে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত : ৬৫।

[২] ইবন মানযুর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরব*, ১৪শ খন্ড (বৈরুত : দারু বৈরুত লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশরি, ১৯৫৬ খ্রী.), পৃ. ২৫৮; সা'দী আবু জায়ব, *আল-কামুসূল ফিকহ* (করাচী : ইদারাতুল কুরআন, ১৯৮৮ খ্রীঃ), পৃ. ১৩০; মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, *বাংলা একাডেমী-আরবী বাংলা অভিধান*, ২য় খন্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃ. ১৩০০ ; ড. তাওফীক আল-ওয়া'য়ী, *আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহি* (মিশরঃ দারুল ইয়াকীন, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃ. ১৫-১৬।

[৩] সূরাহ আন-নূহ, আয়াত : ৫-৬।

[৪] সূরাহ আল- বাকারাহ, আয়াত : ২৩।

[৫] সূরাহ ইউনুস, আয়াত : ৮৯।

[৬] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত : ১৮৬।

[৭] সূরাহ ইউসূফ, আয়াত : ৩৩।

[৮] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খন্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীঃ), পৃ. ৭৫-৭৬।

[৯] J.Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Aribic* (New York: Spoken language service, third edition, 1976 A. D), p. 283.

[১০] ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃ. ৪৮ ।

[১১] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ : স্বরূপ ও প্রয়োগ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খ্রীঃ), পৃ. ৩।

[১২] ড. আব্দুল খালেক পীরযাদাহ, *আহমিয়্যাতুদ দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃ. ৬।

[১৩] A.N.M Abdur Rahman, *Dawah Activities Through out of the World: Problem and Prospects* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1986 A. D), p.101.

[১৪] সূরাহ আল-মুমিন, আয়াত : ৪১।

[১৫] *ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃ.৪১।

[১৬] ড. আব্দুল খালেক পীরযাদাহ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থ প্রণেতা। তার অমর গ্রন্থ আহমিয়্যাতুদ দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তার এ গ্রন্থটি মিশরের 'মাকতাবাতুল ঈমান' থেকে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ ড. আব্দুল খালেক পীরযাদাহ, *আহমিয়্যাতুদ দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম* (কায়রো : মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃ. ভূমিকা।

[১৭] *আহমিয়্যাতুদ দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ ।

[১৮] ড. আহমদ গালুশ, *আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়া* (কায়রো : দারুল কিতাবিল মিসরী, ১৯৭৮ খ্রীঃ), পৃ. ৯।

[১৯] **দা'য়ী** : দা'য়ী আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে আহ্বানকারী। মুলতঃ ইসলামের দিকে আহ্বানকারীকে দা'য়ী বলা হয়। দ্রষ্টব্যঃ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী দা'ওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রীঃ), পৃ. ২৫।

[২০] বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ড. এ.এন.এম আব্দুর রহমান মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১৯৮১ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে Dawah Activities Through out of the World: Problem and

Prospects শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ প্রবন্ধে তিনি সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর অবস্থা ও দা'ওয়াহ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি তুলে ধরেন এবং তাতে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। দ্রষ্টব্য : A.N.M Abdur Rahman, *Dawah Activities Through out of the World: Problem and Prospects* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1986 A. D) ভূমিকা।

২১ *Dawah Activities Through out of the World: Problem and Prospects*, p. 204.

২২ আল্লামা বাহী আল-খাওলী বিশিষ্ট লেখক ও মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলামী পূনর্জাগরণে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইখওয়ানুল মুসলীমীনের নেতৃবৃন্দ দা'ওয়াতে দ্বীনের পাশাপাশি ইকামাতে দ্বীনের উদাত্ত আহ্বান, মানব রচিত মতবাদের আগ্রাসন প্রতিরোধ ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুসলিম উম্মাহর মুক্তির পথনির্দেশ সম্বলিত আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিপুল সাহিত্য ভান্ডার রচনা করেন। এক্ষেত্রে শহীদ সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুব, হামিদা কুতুব, জয়নব আল-গাজালী, শহীদ আব্দুর কাদের আওদাহর পাশাপাশি আল্লামা বাহী আল-খাওলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রষ্টব্য : আল্লামা বাহী আল-খাওলী, *তাজকিরাতুদ দুয়াত*, অনুবাদ: হাফেজ আকরম ফারুক, *ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী:), পৃ.৫৩।

২৩ প্রাগুক্ত।

২৪ ড. রউফ শালাবী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থ প্রণেতা। তার অমর গ্রন্থ 'সাইক্লোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ' একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। গ্রন্থটি বৈরুতের দারুল 'উলূম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ড. রউফ শালাবী, *সাইক্লোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ*, (বৈরুত : দারুল উলূম, ১৯৮২ খ্রী:) ভূমিকা।

২৫ ড. রউফ শালাবী, *সাইক্লোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ*, (বৈরুত : দারুল উলূম, ১৯৮২ খ্রী:), পৃ. ৪৯।

২৬ শায়খ আলোরী বর্ণিত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ : صرف إنظار الناس و عقولهم إلى عقيدة تفيدهم او مصلحة تنفعهم و هي و أيضا ندبة **لإنقاذ الناس من** ضلالة كادوا يقعون فيها أو من معصية كادت تحدق بهم দ্রষ্টব্য : আহমদ আবদুল্লাহ আল-আলোরী, *তারিখুদ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বাইনাল আমসে ওয়াল ইয়াউম* (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াবাহা ১৩৯৯ হি:/১৯৭৯ খ্রী:), পৃ. ১৭।

২৭ খলীফা হুসাইন আল-আসসাল বলেন : هي قيام ذوي البصائر بحث الناس على كل خير و نهيهم عن كل شر وقفا لما جاء به الإسلام تحقيقا لمنفعتم فى عاجلهم و أجلهم দ্রষ্টব্য : ড. খলীফা হুসাইন আল-আসসাল, *মা'আলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ফি আহদিহাল মাককী*, ১ম খন্ড (কায়রো : দারুত তাবা'আতিল মোহাম্মদিয়া, ১৯৮৮ খ্রী;), পৃ. ১৯।

২৮ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৩ খ্রী:), পৃ. ১৩।

২৯ মুহাম্মদ আব্দুল ফাত্তাহ, *আল-মাদখালু ইলা 'ইলমিত দা'ওয়াহ* (বৈরুত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১ খ্রী:), পৃ. ১৯।

৩০ সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত : ৩৮-৩৯।

৩১ পূর্ববর্তী যুগের আম্বিয়া-ই-কিরামের দা'ওয়াতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন **لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ** "নিশ্চয়আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই।" সূরাহ আ'রাফ, আয়াত: ৫৯। অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ "আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, হে আমার জাতি, আল্লাহ তা'য়ালার বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই।" সূরাহ আ'রাফ, আয়াত : ৭২। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে আরও বর্ণিত হয়েছে : وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ "আমি মাদায়েনের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার 'ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। সূরাহ আ'রাফ, আয়াত : ৮৫।

৩২ মহানবীর (সা:) আগমন কালীন অবস্থা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু (حبل -এর প্রাথমিক অর্থ রজ্জু। এ স্থলে আল্লাহর রজ্জু অর্থে আল-কুরআন ও ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকান্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।" সূরাহ আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৩।

৩৩ সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদ : *ইসলামের মর্মবাণী*, মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রী), পৃ. ২।

৩৪ সূরাহ আল-হিজর, আয়াত : ৯৪।

৩৫ মহানবী (সা:)-এর উপর সর্বপ্রথম সূরাহ 'আলাকের কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়। এর পর তিন বছর আল-কুরআনের অবতরণ বন্ধ থাকে। বিরতির পর সর্বপ্রতম তাঁর উপর নাযিল হয় সূরাহ আল-মুদাচ্ছির। তাতে তাঁকে ইসলামী দা'ওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলা হয় : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ অর্থাৎ "হে চাদরাবৃত ! উঠুন, সতর্ক করুন। সূরাহ আল-মুদাচ্ছির, আয়াত : ১-২। দ্রষ্টব্যঃ জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকানু ফি 'উলূমিল কুরআন*, ১ম খন্ড (দিল্লীঃ মাকতাবাতু 'এশায়াতে ইসলাম, তা. বি), পৃ. ৩১ ; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন* ১ম খন্ড (রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফি 'ঈয়্যাহ, মার্চ-২০০১ খ্রীঃ), পৃ. ৫৯; জামীল আবদুল্লাহ মিসরী, *মিন শারহি দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাতি ফী মক্কা*, Journal of the Islamic University of madinah monawwarah- Rabe thani-Jumba Ihani, 1404 H. 6th Year, vpl-62, p. 218-232.

৩৬ আদম 'আব্দুল্লাহ আল-তালুরী, *তারীখুদ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ* (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহবা, ১৯৭৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১৭৯-১৯৮।

৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৮ তাঁর পুরা নাম মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা আল-জুফী আল-কুফী। তিনি মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি বুখারা নগরী-তে ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছর বয়স থেকে তিনি হাদীস চর্চা শুরু করেন। তার জীবনের অমর কীর্তি সহীহুল বুখারী হাদীস গ্রন্থ সংকলন। ২৫৬ হিজরী ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য : মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খন্ড (দিল্লী : কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, ১৪০৫ হিঃ), পৃ. ৯৩২-৯৪১ ; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃ. ৩৬৫-৩৭২।

৩৯ ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী। তিনি ২০৪ হিজরী খুরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে জন্ম গ্রহন করেন। শৈশব থেকেই তিনি হাদীস চর্চা শুরু করেন এবং মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে হাদীস অর্জন করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, সহীহ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কবীর ও আল-জামেউল কবীর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস-সহীহ লি মুসলিম*, ১ম খন্ড (দিল্লীঃ আল-মাতবা'আ ইলমী, ১৩৪৮ হিঃ), পৃ. ৫০; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

৪০ ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ নাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ইসা ইবন সাওরাতা ইবন মূসা ইবন জাহাকুস সুলামী আত-তিরমিযী। তিনি জীহুন নদীর তীরে তিরমীয নামক শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম তিরমিযী বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। আল-জামেউত তিরমিযী, কিতাবুল আসমা, শামায়েলুত তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য : মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামেউত তিরমিযী*, ২য় খন্ড লেবাননঃ দারুল মামূন লিত-তুরাছ, ১৯৮০খ্রীঃ), পৃ. ১০২; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬।

৪১ আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন মারফ আন-নদভী, *রিয়াদুস সালেহীন* (দামেশকঃ দারুল মামূন লিত তুরাছ, ১৯৮০ খ্রীঃ), পৃ. ১০২।

[৪২] আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবন আল-গাযালী, *ইহাইয়াউ উলুমিদ-দ্বীন*, ২য় খন্ড লেবানন : দারুল কলম তা.বি), পৃ. ২৮০-৩২৫; আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, *মজমু'য়াহ ফাতওয়া*, ২৮শ খন্ড (কায়রো : ইদারাতুল মাসসাহা আসকারিয়া, ১৪০৪ হি:), পৃ. ৬০-১৭৯ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্*, ২য় খন্ড (দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৭৩ হি:), পৃ. ৭৪-২০৭।

[৪৩] আহমদ ইবন তাইমিয়া, *মাজমু' আহ ফাতওয়া*, ২৮শ খন্ড (কায়রো: ইদারাতুল মাসসাহা আসকারিয়া, ১৪০৪ হি:), পৃ. ৬০-১৭৯।

[৪৪] শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্* , ২য় খন্ড (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৭৩ হি:), পৃ. ৭৪-২০৭।

[৪৫] *ইসলামী দা' ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, পৃ. ২৯৮।

[৪৬] প্রাগুক্ত।

[৪৭] ড. রউফ শালাবী, *সাইক্লোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা' ওয়াহ*, পৃ. ২৫২-২৫৭; ড. মহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী দা' ওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পৃ; ৩৫।

[৪৮] প্রাগুক্ত ; ড. রউফ শালাবী, *সাইক্লোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা' ওয়াহ*, পৃ. ২৫২-২৫৭।

[৪৯] *ইসলামী দা' ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, পৃ. ৯১ ।

[৫০] নঈম সিদ্দিকী, *চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান* (ঢাকা : আই সি এস প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রী:), পৃ. ৯ ।

[৫১] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৪।

[৫২] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা' ওয়াহ স্বরূপ ও প্রয়োগ* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খ্রী:), পৃ. ২০৪-২০৬।

[৫৩] সূরাহ আন-নাহল, আয়াত : ১২৫।

[৫৪] মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আযহারী, '*আরবী বাংলা অভিধান*, ২য় খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ: ১২০৫।

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

[৫৬] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, ان الحكمة الكلمة البليغة العربية التي خاءت في الاية – لا اعتقد انها من الممكن ترجعتها و نقلها الي اللغة الاخري আয়াতে উল্লেখিত 'হিকমত' শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 'আরবী শব্দ, যা অন্য ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা সম্ভব বলে আমি মনে করিনা। দ্রষ্টব্য: *রাওয়াইদ মিন আদাবিদ দা' ওয়াহ*, পৃ. ১৫।

[৫৭] *ইসলামী দা' ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, পৃ. ১৩০-১৩৭।

[৫৮] সূরাহ ত্বাহা, আয়াত : ২৫-২৮।

[৫৯] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ রি মুসলিম*, ১ম খন্ড (দিল্লি: আল-মাতবা'আ 'ইলমী, ১৩৪৮ হি:), পৃ: ২৫৬।

[৬০] এ সম্পকৃে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ অর্থাৎ "উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়" দ্রষ্টব্য : সূরাহ আল-'আলা,আয়াত : ৯।

[৬১] আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى অর্থাৎ " ফির'আউন বললো, 'হে মুসা, কে তোমাদের রব ? " মুসা (আ:) বললো : 'আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অত:পর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন"। দ্রষ্টব্য : সূরাহ ত্বাহা, আয়াত : ৪৯-৫০।

[৬২] এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ" আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।" দ্রষ্টব্য : সূরাহ আশ-শুয়ারা, আয়াত : ২১৪।

[৬৩] সূরাহ আশ-শুয়ারা : ৬৯-৭৩ ।

[৬৪] এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য : সূরাহ ইউসুফ, আয়াত : ৩৬-৪১ ; ষুরাহ আল-আরাফ, আয়াত : ১২৯ ; সুরাহ আশ-শুয়ারা, আয়াত ; ৬১-৬২; সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১২৯ ; সূরাহ আল-মুমিন, আয়াত : ২৮-২৯।

[৬৫] যেমন আরবরা যখন কাউকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেয় তখন বলে : وعظت الرجل وعظا موعظة দ্রষ্টব্য : *ইবন জারীর আত-তাবারী*, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৬।

[৬৬] ইবন মানযুর আল-আফরিকী, *লিসানুল 'আরব*, ১ম খন্ড (বৈরুত : দারুল মা'আরেফা, ১৯৮৬ খ্রী;), পৃ. ২৬৬।

[৬৭] সৈয়দ কুতুব বলেন, (الوعظ التخويف) ওয়াজ অর্থ : ভয় দেখানো। দ্রষ্টব্য : আবূ আব্দুল্লাহ কুতুব, *আল-জামি'-লি আহকামিল কুরআন* (বৈরুতঃ দারুল এহইয়্যা-উত তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৬৫ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৪৪।

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪ ।

[৬৯] কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাভী, *আন-ওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল* (দামেস্ক : দারুল ফিকহ, তা. বি), পৃ. ৩৬৯ ।

[৭০] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মাউ'য়িযা হাসানা : স্বরূপ ও প্রয়োগ*, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, পার্ট-এ, পৃ. ৪৭।

[৭১] 'আল্লামা আলুসী (লঃ) এর নাম : শিহাবুদ্দীন আস-সাইয়িদ মাহমুদ আফিন্দী আল-আলুসী ১৮০২ খ্রীঃ বাগদাদের পার্শ্ববর্তী ফারসের আলূস নামক স্থানে জন্মগ্রগণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং মাত্র ১৩ বছর বয়সে শিক্ষাকতায় নিয়োজিত হন। তিনি সমকালীন যুগে একজন প্রখ্যাত ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও তার্কিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ১২৪৮ হিজরীতে তাকে বাগদাদের কাযী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ মহা মনীষী ১২৭০ হিজরীতে ইরাকের কারখ নগরীতে ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য : ইমাম সামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খন্ড (বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ৩৬২।

[৭২] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত : ৬৬।

[৭৩] ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রাগুক্ত, ১৯ খন্ড. পৃ. ১৩৮ : 'আল্লামা আলুসী, প্রাগুক্ত, ১৩ খন্ড, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

[৭৪] ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১ম কন্ড, পৃ. ৪৪৪।

[৭৫] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মাউ'যিযা হাসানাহ : স্বরূপ ও প্রকৃতি*, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৮ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর- ১৯৯৯ খ্রীঃ।

[৭৬] সূরাহ আল-আনকাবুত, আয়াত : ৪৬।

[৭৭] ইবন মানযুর আল-ইফরিকী, *লিসানুল 'আরব*, ১১শ খন্ড (বৈরূতঃ দারু বৈরুত লিত-তাবায়াতি ওয়ান নাশরি, ১৯৫৬ খ্রীঃ), পৃঃ ১০৩ ।

[৭৮] আবু আলী আল-হুসাইন ইবন আবদুল্লাহ ইবন সীনা ৯৮০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যে তিনি Avicena নামে পরিচিত। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বুখারার সামানীয় সুলতান নূহ ইবন মানসুরের (৯৭৬-৯৯৭ খ্রীঃ) ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ২১ বছর বয়সে তিনি ভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। চিকিৎসা বিষয়ে তার যুগশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "আল-কানূন ফিত তিব"। এছাড়া আরও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ১৫ টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ১০৩৭ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেসন্স, ২০০৬ খ্রীঃ), পৃঃ ৭৬।

[৭৯] ইবন সিনা, *আস-সিফা*, *কিতাবুল জাদল*, ১ম খন্ড (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুল আমেরিকা, ১৩৮৬ হিঃ), পৃঃ ২৩।

[৮০] তিনি আবূবকর আবদুল কাহির ইবন আবদির রহমান। তিনি জুরজানে জন্মগ্রহণ করেণ এবং তথায় ৪৭১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। দ্রষ্টব্যঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খন্ড, পৃ. ৬৮১।

[৮১] আলী ইবন মুহাম্মদ আল-জুরজানী, *কিতাবুত তা'রীফাত* (বৈরুতঃ দারুদ দায়ান লিত তারিছ, ১৪০৩ হিঃ), পৃঃ ১০১-১০২।

[৮২] সূরাহ আস-সফ, আয়াত : ৯।

[৮৩] সূরাহ আল-ইমরান, আয়াত : ৬৫-৬৬।

[৮৪] সূরাহ আশ-শুয়ারা, আয়াত : ৭০-৭৪।

[৮৫] সূরাহ আশ-শুয়ারা, আয়াত : ২৩-২৮।

[৮৬] সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত : ৬৩।

[৮৭] সূরাহ আল-আনয়াম, আয়াত : ৫৩।

[৮৮] সূরাহ বনী-ইসরাইল, আয়াত : ২৯।

[৮৯] সূরাহ ইবরাহীম, আয়াত : ৪।

[৯০] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত : ২১-২২।

[৯১] সূরাহ ত্বাহা, আয়াত : ২৪।

[৯২] *ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি*, পৃঃ ৬১।

[৯৩] সূরাহ আস-সফ, আয়াত : ২-৩।

[৯৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৪র্থ খন্ড (দিমাশ্‌ক : দারু তাওকিন নাজাহ ১৪২২ হিঃ), পৃ. ৮২ ; হাদীস নং- ৩১০১।

[৯৫] সূরাহ ইউনুস, আয়াত : ৫৭-৫৮।

[৯৬] সূরাহ আল-হিজর, আয়াত : ৯৪।

[৯৭] *মহানবী (সা:)-এর দা'ওয়াত: পর্যায়ক্রমিক কৌশল ও মাধ্যম*, পৃ. ১৭৬।

[৯৮] *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, পৃ. ২৯৭-৩০০।

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০-৩০১।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

হাফিয ইউসুফ আল-মিয্যী (র): ‘ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: Yusuf al-Mizzi (R) was a famus Muhaddis and Rizal composer. He was Hafez, Imam, Muhaddis and rizal scholar in row. He memorized the Quran as his first deed then, he gained knowledge in Fiqh and Hadith. His number of teachers were many. He taught in Damascus's famous institution 'Darul Ashrafiyyah' after completing of his teaching career. Besides teaching, he dedicated himself towards Hadith recitation, composition, interpretation and also composition of Rizal. His narration 'Tahzibul Kamal Fi Asmayer Rizal' was the most famous in all ages and for all time. It was widely spread all around the world for its fame. No excellent, resourceful and oriented production on that field was created before its narration. Afterwards, many summarized works were produced in regard to his works. In my Article, Zamaluddin al-Mizzi (R) has been introduced briefly and also his contribution in Rizal has also been discussed, here in a logical reasoning.

ভূমিকা

ইউসুফ আল-মিয্যী (র) ছিলেন একাধারে হাফিয, ইমাম, মুহাদ্দিছ ও ‘ইলমুর-রিজাল বিশারদ। শিক্ষাজীবনে তিনি সর্বপ্রথম আল-কুর’আনুল কারীম মুখস্থ করেন। ফিক্হ ও হাদীছ বিষয়ে সমসাময়িক বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ্ ও ‘আলিমগণের নিকট গমন করে শিক্ষার্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যাও অনেক। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর দিমাশকের বিখ্যাত ‘দারুল আশরাফিয়্যাহ্’ নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীছের দার্স প্রদান করেন। তাঁর নিকট শিক্ষার্জন করে ছাত্ররাও বড় বড় হাফিয, মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ্ ও রিজাল শাস্ত্রবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি হাদীছ পঠন-পাঠন, গ্রন্থ সংকলন, হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন এবং রিজাল বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত রিজাল বিষয়ক ‘তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল’ গ্রন্থটি সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ের উপর এর চেয়ে উত্তম, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। পরবর্তীতে তাঁর এ গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে বহুসংখ্যক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচয়

আল-মিয্যী (র)-এর প্রকৃত নাম ইউসুফ। পিতার নাম যাক্কী। তাঁর বংশপরিক্রমা হলো, ইউসুফ ইব্ন আয্-যাক্কী ‘আব্দুর রহমান ইব্ন ইউসুফ[১] ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘আব্দিল মালিক ইব্ন ‘আলী ইব্ন আবী যাহ্র আল-কালবী আল-কুযা‘ঈ আল-মিয্যী[২] আশ্-শাফি‘ঈ। উপনাম আবুল হাজ্জাজ, উপাধি জামালুদ্দীন।[৩] ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) বলেন,

يُوسُف بن الزكي عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف بن عبد الْملك بن يُوسُف ابْن عَليّ بن أبي الزهر الْحلَبِي الأَصْل الْمزي أَبُو الْحجَّاج جمال الدّين الْحَافِظ.[৪]

-‘ইউসুফ ইব্ন আয্-যাক্কী ‘আব্দির রহমান ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ‘আব্দিল মালিক ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ‘আলী ইব্ন আবীয্-যাহ্র আল-হালাবী আল-আস্ল ‘আল-মিয্যী’ আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন আল-হাফিয।’

ইব্ন তাগরী বারদী (র) বলেন,

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

الحافظ الحجّة جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بن الزّكى عبد الرحمن بن يوسف بن علىّ بن عبد الملك بن أبى الزّهر القضاعىّ الكلبى المزّى الحلبى.[৫]

-'আল-হাফিয আল-হুজ্জাহ্ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন আয্-যাক্কী 'আব্দির রহমান ইব্ন ইউসুফ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দিল মালিক ইব্ন আবীয্-যাহ্র আল-কুযা'ঈ আল-কালবী আল-মিয্যী আল-হালাবী।'

জন্ম ও জন্মস্থান

আল-মিয্যী (র) ১০ রবীউল আখির ৬৫৪ হিজরী মোতাবেক ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিমাশ্কের হাল্ব[৬] শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে কাল্ব আল-কুদারিয়্যাহ্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] নু'মান (র) 'রাওযাহ্' গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ৬৫০ হিজরী বলে উল্লেখ করেন।[৮]

শিক্ষাজীবন

তিনি দিমাশ্কের হাল্ব থেকে 'আল-মিয্যাহ' নামক স্থানে গমন করে সেখানে বসবাস শুরু করেন।[৯] এখানেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি সর্বপ্রথম আল-কুর'আনুল কারীম হিফ্য করেন। এরপর ফিক্হ শাস্ত্রে শিক্ষার্জন করেন। তিনি ছোটবেলা থেকে উপযুক্ত অভিভাবক এবং যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবে পড়াশুনায় অগ্রগামী হতে না পারলেও পরবর্তীতে জ্ঞানানুশীলনে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেন এবং শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন।[১০]

আল-মিয্যী (র) জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা, কায়রো, মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া, বার্লীন, কুদ্স, হিমস্, হামাত, বা'লাবাকসহ প্রভৃতি শহরে গমন করে বহু সংখ্যক শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

আল-মিয্যী (র) প্রথমত আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন আবুল খায়র আদ্-দিমাশকী আল-হাম্বলী (র) (মৃত ৬৭৮ হি.)-এর নিকট থেকে আবূ নু'আয়ম (র)-এর রচিত 'কিতাবুল হিলয়াহ্' গ্রন্থটি শ্রবণ করেন। এরপর বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ্ ও 'আলিমগণের নিকট থেকে শিক্ষার্জন করেন। এ সম্পর্কে 'মুকাদ্দামাহ্ তাহ্যীবিল কামাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

اتجهت همة المزي إلى سماع الحديث، فسمع من الجم الغفير، سمع عليهم الكتب الكبار الامهات مثل: الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، والمعجم الكبير لابي القاسم الطبراني، وتاريخ مدينة السلام بغداد للخطيب البغدادي، وكتاب النسب للزبير بن بكار، والسيرة لابن هشام، وموطأ الإمام مالك، والسنن الكبير، ودلائل النبوة كلاهما للبيهقي.

-'আল-মিয্যী (র) অসংখ্য ব্যক্তি ও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট থেকে হাদীছ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যয়ন করেন। যেমন, সিহাহ্ সিত্তাহ্, ইমাম আহমদ (র.)-এর মুসনাদু আহমাদ, আবুল কাসিম আত্-তিবরানীর মু'জামুল কাবীর, খতীব আল-বাগদাদীর তারীখু মাদীনাতিস্-সালাম, যুবায়র ইব্ন বাক্কারের কিতাবুন্-নাসাব, ইব্ন হিশামের সীরাহ্, ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ও দালাইলুন্-নুবুওয়্যাহ্।'

তিনি যে সব শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবনুল হিরসতানী, ইবনুল মুলাইব, আর-রাহাভী, ইবনুল বিনা', ইব্ন আবী লুকমাহ্, ইবনুল বান্না, ইবনুল মুকার্‌রাম, আল-কাযভীনী, ইবনুল-লাতী, ইব্ন সাব্বাহ্, ইবনুয্-যুবায়দী, আবুল 'আব্বাস আস্-সালামাহ্, ইব্ন আবী 'উমার, ইব্ন 'আলান, শায়খ মুহীউদ্দীন আন্-নাবাভী, কামাল 'আব্দুর রহীম, 'ইয্যুল হার্‌রানী, ইবনুদ্-দারাজী, কাসিম আল-ইরবিলী, ইবনুস্ সাবূনী, রশীদ আল-হামিরী, মুহাম্মাদ ইবনুল কাওয়াস, ফাখ্র আল-বুখারী, যায়নাব, ইব্ন শায়বান, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ নাক্কিব, ইসমা'ঈল ইবনুল 'আসকালানী, আল-মাজ্দ

ইবনুল খলীলী, আল-'ইমাদ ইবনুশ্‌-শিরাজী, আল-মুহিব্বী ইব্‌ন আসরূন, আবূ বকর ইব্‌নুল আনমাতী, সাফী খলীল, গাযিয়া আল-হালাবী, কুতুব ইব্‌নুল কুসতাল্লানী এবং একটি জামা'আত থেকে। শারফুদ্দীন আদ্‌-দিময়াতী, আল-ফারওয়াছী, আল-ইউনীনী, ইব্‌ন বালবান, আর্‌-রীশী, ইব্‌ন দাকীকুল 'ঈদ, আয্‌-যাহিরী, আত্‌-তাকী আল-আসআরদী, সা'দুদ্দীন আল-হার্‌রাছী, ইব্‌ন নাফীস প্রমুখ ও তাঁদের একটি জামা'আত থেকে তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শ্রবণ ও শিক্ষাগ্রহণ করেন।[১১]

কর্মজীবন

হাফিয আল-মিয্‌যী (র) তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে শিক্ষকতার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সর্বপ্রথম তিনি দিমাশকের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'দারুল হাদীছিল আশরাফিয়্যাহ্‌'র শায়খ মনোনীত হন। ৭১৮ থেকে ৭৩৮ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর এ প্রতিষ্ঠানে তিনি হাদীছের দার্‌স প্রদান করেন।[১২] ৭৩৯ হিজরীতে 'দারুল হাদীছ আন্‌-নূরিয়্যাহ্‌'র শায়খ মনোনীত হন এবং সেখানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। এছাড়া দারুল হাদীছ আল-হিমসিয়্যাহ্‌তেও তিনি শিক্ষকতা করেন।[১৩]

এ সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার ফলে তাঁর নিকট থেকে বহুসংখ্যক ছাত্র শিক্ষার্জন করেন; যারা পরবর্তীতে সারা বিশ্বে বড় বড় বিদ্যান ও পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কারণ এমন একজন প্রথিতযশা শিক্ষকের নিকট শিক্ষাগ্রহণ, তত্ত্বাবধান, সঠিক নির্দেশনা, নৈতিক সাহচার্য ও অনুপম শিক্ষাগ্রহণের ফলে তাঁদের অনুরূপ বিদ্যার্জন সহজ হয়।

ছাত্রবৃন্দ

শিক্ষকতা ছিল আল-মিয্‌যীর (র)-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। নিজে যেমন শিক্ষা অর্জন করেছিলেন স্বনামধন্য 'আলিমগণের নিকট থেকে তদনুরূপ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভের ফলে তার ছাত্ররাও বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন,

শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাহ্‌ (মৃত ৭২৮ হি.), ফাতহুদ্‌-দীন ইব্‌ন সায়্যিদিন্‌-নাস আল-'উমারী (মৃত ৭৩৪ হি.), ইমামুল মুহাদ্দিছীন শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (৭৪৮ হি.), তাকী উদ্দীন আস্‌-সুবকী (৭৩৯ হি.), ইলমুদ্দীন বিরযালী (মৃত ৭৩৯ হি.), শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আব্দুল হাদী (মৃত ৭৪৪ হি.), সালাহ্‌ উদ্দীন আল-আলাঈ (মৃত ৭৬১ হি.), আলাউদ্দীন মুগলতাই আল-হানাফী (মৃত ৭৬২ হি.), তাকী উদ্দীন ইব্‌ন রাফি আস্‌-সালামী (মৃত ৭৭৪ হি.), 'ইমামুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হি.) (র) প্রমুখ।[১৪]

রচনাবলী

আল-মিয্‌যী (র) একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইব্‌ন তাগরী বারদী (র) বলেন,[১৫] **سمع الكثير ورحل وكتب وصنّف.** -'তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করে শ্রবণ করেন এবং লেখনীর মাধ্যমে গ্রন্থ রচনা করেন।'

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ,

১. তুহ্‌ফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ (تُحْفَةُ الأَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الأَطْرَافْ)

২. তাহ্‌যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (تَهْذِيْبُ الْكَمَال فِيْ أَسْمَاءِ الرِّجَال)

৩. আল-মুনতাকা মিনাল আহাদীছ (اَلْمُنْتَقَى مِن الأَحَادِيْث)

৪. আল-কুনা, আল-মুখতাসার মিন তাহ্‌যীবুল কামাল (اَلْكُنَى، اَلْمُخْتَصَرْ مِنْ تَهْذِيْبِ الْكَمَالْ)

তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

হাফিয আল-মিয্যী (র) ছিলেন শায়খুল ইমাম, 'আল্লামাহ্, হাফিয, মুহাদ্দিছ, ফকীহ্, গবেষক ও গ্রন্থাকার। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বিশেষ করে হাদীছ ও রিজাল শাস্ত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর সম্পর্কে রিজালবিদগণ ভূয়সী প্রশংসা করে বহু মন্তব্য করেছেন। নিম্নে কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো,

১. সালাহুদ্দীন আস্-সাফাদী (র) বলেন,

هُوَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَلاَمَةْ الْحَافِظُ الْفَرِيْد الرَّحْلَةِ، إِمَامُ الْمُحَدِّثِيْن، خَاتِمَةُ الْحُفَّاظِ، نَاقِدُ الأَسَانِيْدُ وَالاَلْفَاظ.[১৬]

-'তিনি ছিলেন শায়খুল ইমাম, 'আল্লামাহ্, হাফিয, ভ্রমণকারী, মুহাদ্দিছগণের ইমাম, সর্বশেষ হাফিয, সনদ ও শব্দসমূহের সমালোচক।'

২. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে বলেন,

الإمام العالم الحبر الحافظ الاوحد محدث الشام .وأما معرفة الرجال، فهو حامل لوائها، والقائم بأعبائها، لم تر العيون مثله.
[১৭]

-'আমার দৃষ্টিতে তাঁর ন্যায় ইমাম, বিদ্বান, জ্ঞানের সমুদ্র, হাফিয, একক ব্যক্তিত্ব, শামের মুহাদ্দিছ, রিজাল শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও অগ্রদূত আর কাউকে দেখেনি।'

৩. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,

أوضح مشكلات ومعضلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله. وكان ثقة حجة، كثير العلم، حسن الاخلاق، كثير السكوت، قليل الكلام جدا.[১৮]

-'তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, কর্তব্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী, কর্মপরায়ণ, উত্তম ও নৈতিক আচরণের অধিকারী, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। এছাড়া 'ইলমুল হাদীছ ও রিজাল শাস্ত্রের সমস্যা ও জটিলতার দক্ষ সমাধানকারী।'

৪. আল-কাত্তানী (র) বলেন,

أفرده الحافظ أبو سعيد العلائي بمؤلف سماه سلوان التعزي بالحافظ أبي الحجاج المزي.

-'আবূ সা'ঈদ আল-আলায়ী হাফিয আবিল হাজ্জাজ আল-মিয্যীকে একটি গ্রন্থ রচনার কারণে একক ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।'

৫. ইব্ন নাসিরুদ্দীন (র) বলেন,

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد، والدمياطي، وابن تيمية، والمزي فابن دقيق العيد أفقههم في الحديث، والدمياطي أعرفهم بالأنساب، وابن تيمية أحفظهم للمتون، والمزي أعرفهم بالرجال.[১৯]

-'হাফিয আবূ 'আব্দুল্লাহ্ আয্-যাহাবী বলেন, 'হাদীছের হাফিয হিসেবে আমি চারজনকে দেখেছি, তাঁদের মধ্যে ইব্ন দাকীকুল 'ঈদ, আদ্ দিময়াতী, ইব্ন তায়মিয়্যাহ্ এবং আল-মিয্যী। তাঁদের মধ্যে ইব্ন দাকীকুল 'ঈদ হাদীছ বিষয়ে বেশি পণ্ডিত। আদ্ দিময়াতী হলেন বংশনামা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। ইব্ন তায়মিয়্যাহ্ ছিলেন সর্বাধিক মতন মুখস্তকারী আর আল-মিয্যী ছিলেন রিজাল শাস্ত্রে সর্বাধিক অভিজ্ঞ।'

৬. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) 'মু'জামুশ্-শুয়ূখ' গ্রন্থে বলেন,

العلامة الحافظ البارع أستاذ الجماعة جمال الدين أبو الحجاج، محدث الاسلام.[২০]

-'জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ছিলেন 'আল্লামাহ্, হাফিয, পণ্ডিত, ইসলামের মুহাদ্দিছ ও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।'

৭. শামসুদ্দীন আবুল মাহাসিন হুসায়নী (র) বলেন,

كان شيخنا الحجة جمال الدين أبو الحجاج شيخ الزمان، وحافظ العصر، وناقد الاوان.[২১]

-'আমাদের শায়খ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ছিলেন সময়ের সমালোচক, যুগের হাফিয, সমকালের শায়খ ও হাদীছের হুজ্জাহ।'

৮. তাজুদ্দীন আস্-সুবকী (র) বলেন,

شيخنا وأستاذنا وقدوتنا الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي، حافظ زماننا، حامل راية السنة والجماعة والقائم بأعباء هذه الصناعة.[২২]

-'শায়খ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী ছিলেন আমাদের শায়খ, উস্তাদ ও আমাদের আদর্শ। আমাদের যুগের হাফিয, সুন্নাত্ ও জামা'আতের রিওয়াতের রক্ষক।'

৯. ইব্ন তাগরী বারদী (র) বলেন,

كان إمام عصره أحد الحفّاظ المشهورين[২৩]

-'তিনি তার সময়ের ইমাম ছিলেন এবং সুপরিচিত হাফিযদের অন্যতম ছিলেন।'

ইন্তিকাল

হাফিয আল-মিয্যী (র) ৭৪২ হিজরী সালের ১২ সফর মোতাবেক ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দের শনিবারের দিন যুহ্র ও 'আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দিমাশ্কে ইন্তিকাল করেন।[২৪] সিদ্দীক ইব্ন হাসান আল-কুনূজী (র) বলেন, 'তিনি ৭৪৪ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।'[২৫] ইন্তিকালের সময় তিনি আয়াতুল কুরসী পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। ঐ দিন তাঁকে সমাহিত করা সম্ভব হয়নি। পরের দিন রবিবার দিমাশকের গভর্নর আলাউদ্দীন তুনবুগার উপস্থিতিতে কাযী তাকী উদ্দীন আস্-সুবকীর ইমামতিতে তাঁর জানাযাহ্ সমাপ্ত হয়। তাঁর জানাযার নামাযে দেশের রাজন্যবর্গ, 'উলামা সম্প্রদায়, বিচারকমণ্ডলী, বুদ্ধিজীবীসমাজ ও অগনিত জনসাধারণ উপস্থিত হন।[২৬] এরপর ঐতিহাসিক সূফীয়া কবরস্থানে শায়খ ইব্ন তায়মিয়্যার (র)-এর পার্শে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৭]

'ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান

হাফিয আল-মিয্যী (র) রিজাল শাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল' গ্রন্থটি রিজাল শাস্ত্রে এক মাইলফলক হিসেবে পরবর্তী রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে স্থান লাভ করে রয়েছে। এ গ্রন্থটি রচনার কারণেই তিনি রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন। এ পর্যন্ত রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক যতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এটি বৃহৎ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ের উপর এর চেয়ে উত্তম, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। বিশেষত তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) ও আহমাদ

ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) তাঁরই পথ নির্দেশক। তাঁর অনুকরণ, অনুসরণ ও গ্রন্থটি দ্বারা রিজাল শাস্ত্রে গ্রন্থ প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র)-এর ‘তাহ্‌যীবুত্‌-তাহযীব’ গ্রন্থটি মূলত আল-মিয্‌যী (র)-এর ‘তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল’ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। পরবর্তীতে ‘তাহযীবুত্‌-তাহযীব’ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করে ‘তাকরীবুত্‌-তাহ্‌যীব’ নামে আরো একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। শাফী উদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন ‘আব্দিল্লাহ্‌ আল-খাযরাজী (র) (মৃত ৯২৩ হি.) ‘খুলাসাতুত্‌-তাযহীবিল কামাল’ নামে একটি সুন্দর সংস্করণ রচনা করেছেন। নিম্নে রিজাল শাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো,

১. তুহ্‌ফাতুল আশরাফ বি মা‘রিফাতিল আতরাফ (تُحْفَةُ الأَشْرَاف بِمَعْرِفَةِ الأَطْرَافْ)

হাফিয আল-মিয্‌যী (র)-এর এ গ্রন্থটি হাদীছ শাস্ত্রের উপর সংকলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী। এতে সিহাহ্‌ সিত্তার সকল হাদীছ নকল করা ছাড়াও সহীহ মুসলিম-এর মুকাদ্দামাহ্‌, সুলায়মান ইব্‌ন আশ‘আস আবূ দাউদ (র)-এর ‘কিতাবুল মারাসীল’, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা আত্‌-তিরমিযী (র)-এর ‘কিতাবুল ‘ইলাল’, কিতাবুশ্‌-শামাইল’ এবং আহমাদ ইব্‌ন শু‘আয়ব আন্‌-নাসাঈ (র)-এর ‘কিতাবু আমালি ইয়াওমিন ওয়া লায়লাতিন’ সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবি‘ঈন (র) এবং কোনো কোনো তাবি‘-তাবি‘ঈনের নামানুসারে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি গ্রন্থটির একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন এবং তার নামকরণ করেন ‘তুহ্‌ফাতুল আতরাফ’।[২৮]

উল্লিখিত গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বহু সংখ্যক মনীষী এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল-মিয্‌যী (র)-এর ছাত্র মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اختصره تلميذه ورفيقه مؤرخ الاسلام الذهبي في مجلدين.[২৯]

-‘আয্‌-যাহাবী দুখণ্ডে এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেছেন।’

আবুল ‘আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন সা‘দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-আনদারশী (র) (মৃত ৭৫০ হি.) ‘আল-‘উমদাতু ফী মুখতাসারিল আতরাফ’ নামে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন। ‘আল্লামা ‘আলাউদ্দীন মুগলতাঈ আল-হানাফী (র) (মৃত ৭৬২ হি.) ‘মুসতাদরাক ‘আলা তুহফাতুল আশরাফ’, হাফিয যায়নুদ্দীন ‘আব্দুর রহীম ইবনুল হুসায়ন আল-‘ইরাক (র) (মৃত ৮০৬ হি.) এবং তাঁর পুত্র ওয়ালী উদ্দীন আল-‘ইরাকী (র) (মৃত ৮২৬ হি.)-এর পরিশিষ্ট স্বরূপ ‘আল-মুসতাদরাক’ রচনা করেন। সর্বশেষে এ সব সংকলনের সমষ্টির আলোকে হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) ‘আন্‌-নুকাতু আয্‌-যারিফ’ নামে এবং হাফিয ইবনুল ফাহ্‌দ আল-মাক্কী (র) (মৃত ৮৭১ হি.) ‘আল-আশরাফ ‘আলা আল-জাম‘ বায়নান্‌-নুকাত আয্‌-যার্‌রাফ ওয়া তুহ্‌ফাতিল আশরাফ’ নামে সমৃদ্ধ সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

২. তাহ্‌যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (تَهْذِيْبُ الْكَمَال فِيْ أَسْمَاءِ الرِّجَال)

এটি হাফিয আল-মিয্‌যী (র) রিজাল বিষয়ক সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি রচনার কারণেই তিনি রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন। এ পর্যন্ত রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক যতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এটি বৃহৎ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি রচিত

হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ের উপর এর চেয়ে উত্তম, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি।[৩০] গ্রন্থটি বার খণ্ডে বিভক্ত।[৩১]

পাণ্ডুলিপি

তাহ্যীবুল কামাল গ্রন্থটির যে সব পাণ্ডুলিপি রয়েছে তার মধ্যে দুটি হস্তলিখিত নুস্খা ও একটি প্রকাশিত নুস্খার উপর নির্ভর করেছেন পরবর্তী প্রকাশকরা।

প্রথম হস্তলিখিত নুস্খা। এটি ড. সুহাইল যাকার-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত। তিনি স্বয়ং নুস্খাটি আমাদের নিকট পোঁছে দেন। এ নুস্খাটি বৃহদাকারের নয় খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতিটি খণ্ডের দৈর্য় ৩৬, প্রস্ত ২৫ এবং শেষ খণ্ড ব্যতিত প্রতিটি খণ্ডে ২০০টি করে পৃষ্ঠা রয়েছে। শেষ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০টি। প্রতিটি পৃষ্ঠায় পঁঞ্চাশটি লাইন করে লেখা রয়েছে। পৃষ্ঠাগুলো পৃথক পৃথক। গ্রন্থটি গুরু হলো, الحمد لله الذي أنار طريق الحق، وأبان سبيل الهدى، وأزاح العلة، وأزال الشبهة، وبعث النبيين مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وصلى الله على خيرته من خلقه، وصفوته من بريته: إمام المتقين، وخاتم النبيين; সমাপ্ত হয়েছে এ কথার মাধ্যমে, هذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه من هذا الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على خاتم أنبيائه.[৩২]

এ গ্রন্থটি সংকলন শুরু হয় ৭০৫ হিজরী সালে এবং সমাপ্ত হয়েছে ৭১২ হিজরী সালের যিলহাজ্জ মাসে। এ হস্তলিখিত নুস্খাটির কভার পৃষ্ঠায় তামাল্লাকাত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'তায্কিরাতুল হুফ্ফায' থেকে নেয়া ইমাম হাফিয আল-মিয্যী (র)-এর জীবনী এবং নুস্খাটির প্রস্তুতকারক বা লেখক ইবরাহীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ শারফুদ্দীন ইবনুল হাসান (র)-এর জীবনী সংকলিত আছে। পাশাপাশি নুস্খাটির প্রস্তুতকাল ৭১২ হিজরী উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় হস্তলিখিত গ্রন্থ এটি প্রথম হস্তলিখিত গ্রন্থের অনুরূপ। উভয় নুস্খাটি একটি হস্তলিখিত নুস্খা থেকে নেয়া যা 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

উভয় হস্তলিখিত নুস্খা এমন এক নুস্খা থেকে নেয়া যেটি আমিরুল মু'মিনীন মানসূর বিল্লাহ্ কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (৯৬৭-১০২৯ হি.)-এর অনুরোধে ইবরাহীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন শারফুদ্দীন ইবনুল হাসান লেখা আরম্ভ করেছিলেন। আর সমাপ্ত করেছিলেন সারিম উদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আমীর (র)। তিনি নুস্খাটির লেখা সমাপ্ত করেছিলেন ৮ রবীউছ-ছানী ১১০৫ হিজরীতে।

আমরা এ গ্রন্থটি তাহ্কীক ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যেভাবে উপরোক্ত নুস্খা দুটিকে মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়েছি। এমনিভাবে, মুহাক্কিক ড. 'আওয়াদ বাশার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির উপরও ভরসা করেছি। এ নুস্খা দুটির মাঝে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় নুস্খাটির প্রকাশকগণ প্রকাশ করেছেন, কেননা এটি তার মীমকৃত এবং সজ্জিত।[৩৩]

এ গ্রন্থটি বৈরূতের দারুল ফিক্র থেকে ২৪ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি লাল-কালো দুই রঙ্গের কালি দ্বারা সুন্দর বিন্যাসে ছাপানো হয়।

পরবর্তীতে তাঁর এ গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে এবং এর উপর নির্ভর করেই মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হি.) 'তায্হীবুত্-তাহ্যীব' নামে একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন রচনা করেন।[৩৪] এরপর ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' শিরোনামে একটি বৃহৎ সংকলন ও 'তাকরীবুত্-তাহ্যীব' নামে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন।[৩৫] শফী 'উদ্দীন আহমাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্

আল-খাযরাজী (র) (মৃত ৯২৩ হি.) 'খুলাসাতুত্-তাযহীবিল কামাল' নামে একটি সুন্দর সংস্করণ রচনা করেছেন।[৩৬]

তাহ্কীক

তাহ্যীবুল কামাল গ্রন্থটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহ্কীক ও সম্পাদনা করেছেন। আমাদের হাতে তাহ্কীক ও সম্পাদনাকৃত যে নুস্খাটি এসে পৌঁছেছে তা করেছেন তিন জন ব্যক্তি। তাহ্কীক করেছেন, শায়খ আহমাদ 'আলী 'আবীদ ও হাসান আহমাদ আগা। সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর ড. সুহায়ল যাকার। গ্রন্থটি বৈরূতের 'দারুল ফিক্র' থেকে ২৪ খণ্ডে ১৯৯৪ হি./১৪১৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের তাহ্কীককারীদ্বয় বলেন, "আমরা গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছি যা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো,

১. হস্ত লিখিত নুস্খাসমূহের মূল দুটি নুস্খা ও প্রকাশিত গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখা, গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ও কম-বেশিগুলো উল্লেখ করা। আসল বা হস্তলিখিত মূল নুস্খার প্রতি ইঙ্গিত করেছি 'খা' (خَاء) অক্ষর দ্বারা এবং প্রকাশিত গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছি মীম (مِيم) অক্ষর দ্বারা।

২. প্রয়োজনানুসারে রিজাল বা রাবীগণের নামের বানান সংরক্ষণ তথা হারাকাত প্রদান ও তাদের কারো কারো জীবনীতে কিছু সংযোজন করা হয়েছে।

৩. আল-কুতুবুস্ সিত্তাহ্, মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ ও মুসনাদু আহ্মাদ থেকে হাদীছসমূহের তাখরীজ করা হয়েছে।

৪. আল-কালিমাতুল গারীবাহ্ তথা কঠিন শব্দের ও বাক্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৫. হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) তাঁর 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' গ্রন্থে যে সকল তারাজিমে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন ও ইঙ্গিত করেছেন সে সব তা'লীকাত (تَعْلِيْقَات) এ প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কুলতু (قُلْتُ) শিরোনামে।

৬. পরিপূর্ণ উপকার লাভের জন্য এ গ্রন্থের শেষে الإكمال فمن له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال. নামক গ্রন্থটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি আল-ইকমাল (الإِكْمَالْ) এ তারাজিমসমূহ এ গ্রন্থের মধ্যেই তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বাক্যটির মধ্যখানে একটি তারকাচিহ্ন দ্বারা পৃথক করে সন্নিবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এতেও ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রতি খণ্ডের শেষে সে খণ্ড সংশ্লিষ্ট সংযুক্তিসমূহ সংযুক্ত করেছি। সে সাথে তাদের প্রত্যেকের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

৭. এছাড়াও এ প্রকাশনাটিকে পরিপূর্ণতা প্রদানের আশায় আল-ইকমাল (الإِكْمَالْ) গ্রন্থের উপর হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) কর্তৃক সংযোজনসমূহও যাদের আলোচনা নামসহ ইমাম আল-হুসায়নী (র) স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেননি আমরা এ গ্রন্থে তা সংযোজন করেছি।

৮. হাফিয আল-মিয্যী (র) যে সকল নামের উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ নামের আলোচনা পূর্বে হয়েছে বা সামনে আসবে অথবা অমুক ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে সে সকল নামের পূর্বে একটি করে কালো গোলবৃত্ত প্রদান করেছি এবং সে নামে কোনো নাম্বার (ক্রমিক নং বা সিরিয়াল নাম্বার) দেইনি। তবে সে নামটি পূর্বে যে নাম্বারে এসেছে বা পরবর্তীতে যে নাম্বারে আসবে সে নাম্বার জীবনীর শেষে ব্রাকেটের মধ্যে লাল কালি দিয়ে লিখে দিয়েছি এভাবে [......: ر]।

৯. প্রতি খণ্ডের শেষে সে খণ্ড সংশ্লিষ্ট তারাজীম, আওহাম ও তাম'ঈয প্রত্যেকের নাম্বারসহ উল্লেখ করেছি। গবেষকগণের সুবিধার্থে এবং যাতে খুব সহজে তারা উদ্দিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌছতে পারেন সেজন্য পৃষ্ঠার নাম্বারও প্রদান করা হয়েছে।

১০. একটি পৃথকখণ্ডে যাদের জীবনী মূল গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ও আল-ইকমাল (الإِكْمَالُ) গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তাদের নামসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও এ গ্রন্থের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ 'ইলমী সূচিপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।

ক. আল-কুর'আনের আয়াতসমূহের সূচি প্রদান করা হয়েছে।

খ. আল-হাদীছ ও আছারসমূহের সূচি প্রদান করা হয়েছে।

গ. ব্যক্তি, দল ও স্থানসমূহের নামের সূচিসমূহ প্রদান করা হয়েছে।

এসব প্রদান করার কারণে এ গ্রন্থটি একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে তার মর্যাদা ও গুরুত্বে পৌছতে সক্ষম হয়েছে।[৩৭]

তাহ্যীবুল কামাল গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তকরণ

হাফিয আল-মিয্যী (র)-এর গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পরবর্তী মনীষীগণ এ গ্রন্থটির কিছু সংক্ষিপ্তকরণ তথা 'আল-মুখতাছার' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো,

ক. হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হি.) তাঁর ওস্তাদ আল-মিয্যী (র) প্রণীত 'তাহ্যীবুল কামাল' গ্রন্থের দুটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এক. তায্হীবুত্-তাহ্যীব (تَذْهِيْبُ التَّهْذِيْبِ)। এটি বড় ধরণের একটি সংক্ষিপ্তকরণ। দুই. আল-কাশিফ (اَلْكَاشِفُ)। এটি সংক্ষিপ্ত বা ছোট ধরণের গ্রন্থ।

খ. আল-ইমাম আবুল 'আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল-'আসকারী আল-আনদারশী (র) (মৃত ৭৫০ হি.) মুখতাসারুত্-তাহ্যীব (مُخْتَصَرُ التَّهْذِيْبِ) শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গ. আল-ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আদ্-দিমাশকী আল-হাফিয (র) (মৃত ৭৬৫ হি.) আত্-তাযকিরাহ্ ফী রিজালিল 'আশার (اَلتَّذْكِرَةُ فِيْ رِجَالِ الْعَشَرْ) শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ঘ. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) তাহ্যীবুল-কামাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তকরণ করে নামকরণ করেন 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' (تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْبِ)। গ্রন্থটি পাঠকমহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।[৩৮]

ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'হাফিয আল-যিম্যীর 'তাহ্যীবুল-কামাল' গ্রন্থটি অতি মূল্যবান; তবে গ্রন্থটি দীর্ঘ হওয়ার কারনে পাঠকবর্গ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এজন্য এটি সংক্ষিপ্ত করণের প্রয়োজন হলে এর সংক্ষিপ্তকরণে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপ 'আল-কাশিফ' নামক গ্রন্থটির বর্ণনাগুলো শিরোনাম আকারে রয়ে গেছে, যার ফলে আরও কিছু জানার আগ্রহ অতৃপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। আবার আয্-যাহাবী (র) কর্তৃক সংক্ষিপ্তকৃত গ্রন্থ 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' গ্রন্থে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখলাম যে, এতে বর্ণনাভঙ্গি বেশ দীর্ঘ আর তাহ্যীবের অধিকাংশ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বর্ধিত অংশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে অথবা

সহীহ ও য'ঈফ নির্ণয়ের মূল ভিত্তি নির্ভরযোগ্যতা ও সমালোচনামূলক মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া 'তাহ্যীব' গ্রন্থে এমন কতিপয় নাম রয়েছে যাদের কোনো অবস্থা সম্পর্কে গ্রন্থকার আলোকপাত করেননি। শুধু অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেন তাতে অমুক বর্ণনা করেন এর বেশি কিছুই বলা হয়নি; এতে কারও জ্ঞান পিপাসা নিবারণ হয় না, কোনো সন্দেহ দূরিভূত হয় না। এসব কারণে আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিখারা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, তাহ্যীব গ্রন্থের এমন এক পদ্ধতিতে সংক্ষেপ করব, যাতে সম্পূর্ণ মনপূত হয়, আল-জার্হ ও আত্-তা'দীলের উপকারী বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হবে এবং অন্যান্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করা হবে।[৩৯]

'আব্দুস সাত্তার আশ্-শায়খ বলেন,

وقيمة الكتاب أشهر من أن تذكر، واوصح من ان تشهر، فقد أقبل عليه طلاب الحديث وجملة، وورد مناهله العذبة الزاخرة رجال العلم وأئمته. وهو أحد أهشر كتب الجرح والتعديل. ومن مفاخر هذا الإمام الجليل.[৪০]

-'এ গ্রন্থটি এত মূল্যবান যার প্রসিদ্ধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, এবং যা প্রচার করার পূর্বেই অধিক সুস্পষ্ট। এর প্রতি হাদীছের বাহক ও শিক্ষার্থীগণ মনোনিবেশ করেছেন। সুধীজন, মনীষী ও ইমামগণ এর বহুল সুমিষ্ট পানির ঘাটে অবতরণ করেছেন। এটি জারহ্ ও তা'দীলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং এ মহান ইমামের অন্যতম গৌরবের বিষয়।'

'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' গ্রন্থটি দিল্লীর 'হাজার' নামক প্রকাশনা থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হায়দারাবাদের নিজামিয়া প্রেস থেকে ১৩২৫ হিজরী সালে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি ৮০৭ হিজরী/১৪০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে আংশিকভাবে পরিষ্কার অনুলিপিকৃত হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। বৈরূতের 'দারুল ফিক্র' থেকে ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে লাল-কালো রঙ্গের লেখার সমন্বয়ে ১০ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণটির জাব্ত ও মারাজি'আহ্ করেন সিদ্কী জামীল আল-'আত্তার। এ সংস্করণটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুন্দর। যা থেকে সহজেই পাঠক ব্যক্তিগণের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

ঙ. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) তাঁর রচিত 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' (تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْب) গ্রন্থটিকে আবার সংক্ষেপ করে আরো একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটির নামকরণ করেন, 'তাক্রীবুত্-তাহ্যীব' (تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْب)। এর শুরু হচ্ছে, .اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ رَفَعَ بَعْضَ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتِ। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমি হাফিয আল-মিয্যী (র) (মৃত ৭৪২ হি./১৩৪১ খ্রি.) কর্তৃক রচিত 'তাহ্যীবুল কামাল' গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করে 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' (تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْب) গ্রন্থ রচনা করি। এতে 'তাহ্যীব' গ্রন্থের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছি অর্থাৎ তাতে উল্লিখিত রাবীগণের জীবনী পৃথক করেছি।

গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌ হাজার প্রেস থেকে ৪৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে দুখণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দিল্লী থেকে ১৩০৮-১৩২০ খ্রিস্টাব্দে ২৯৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'আল-মুগনী' নামে পাটদীকাসহ 'তাকরীবুত্-তাহ্যীব' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির আল-বাত্নী। দিল্লীর 'হাজার' লাইব্রেরী ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৮ ছিল। দিল্লী থেকে ১৩২০ হিজরী সালে প্রকাশিত অপর নুস্খার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮। যা ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'আল-মুগনী' 'তাক্রীবুত্-তাহ্যীব'-এর অনুকরণে পুনঃপ্রকাশিত হয়। বৈরূতের 'দারুল ফিক্র' থেকে ১৪২৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

তাহ্যীবুল কামাল গ্রন্থটির সংস্করণ

হাফিয আল-মিয্যী (র) রচিত 'তাহ্যীবুল কামাল' গ্রন্থটি বিভিন্ন সংস্থা থেকে বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে কয়েকটি সংস্করণ এর উল্লেখ করলাম।

ক. এ গ্রন্থটি দিল্লীর 'হাজার' নামক প্রকাশনা থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। হায়দারাবাদের নিজামিয়া প্রেস থেকে ১৩২৫ হিজরী সালে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি ৮০৭ হিজরী/১৪০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে আংশিকভাবে পরিষ্কার অনুলিপিকৃত হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

খ. ড. বাশ্শার 'আওয়াদ মা'রূফ-এর তাহ্কীককৃত বৈরূতের মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্ থেকে ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ৩৫ খণ্ডে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

গ. বৈরূতের 'দারুল ফিক্র' থেকে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ খণ্ডে লাল-কালো রংগের কালিম দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি তাহ্কীক করেন শায়খ আহ্মাদ 'আলী আবীদ ও হাসান আহ্মাদ আ'আ। তথ্য সংযোজন করেন প্রফেসর ড. সুহায়ল যাকার।

উপসংহার

পরিশেষে এ কথা বলা যায়, ইউসুফ আল-মিয্যী (র) ছিলেন এক প্রথিতযশা হাদীছবিদ, হাদীছের রাবীর সমালোচক ও 'ইলমুর-রিজালে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি বহু দেশ ও জনপদ ভ্রমণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনায় জগতজোড়া খ্যাতী লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীগুলোর মধ্যে 'ইলমুর-রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ 'তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল' সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি 'ইলমুর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যা পরবর্তী যুগের মনীষীগণের পথ প্রদর্শক। তাঁর রচিত গ্রন্থটির ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) 'তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব' ও 'তাক্রীবুত্-তাহ্যীব' গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র)-এর একটি মুখতার রচনা করে নামকরণ করেন 'মুখতাসারু তাহযীবিল কামাল'। তাই বলা যায় ইউসুফ আল-মিয্যী (র) ছিলেন 'ইলমুর রিজালে পথ প্রদর্শক, দক্ষ, প্রসিদ্ধ। তাঁর এ অবদান মানবসমাজে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায* (বৈরূতঃ দারুল 'ইলমিল মালাঈন, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫২১।

[২] **আল-মিয্যী** (اَلْمِزِّيْ): দিমাশকের মিয্যাহ্ শহরের প্রতি নিসবাত করে তাঁকে 'আল-মিয্যী' বলা হয়ে থাকে।

[৩] ইব্ন তাগরী বারদী, *আল-মানহালুস্ সাফী* (বৈরূতঃ তা. বি.), পৃ. ৮৫৭; ইব্ন তুলূন, *আল-কালাইদিল জাওহারিয়্যাহ্* (প্রকাশনা সংস্থা উল্লেখ বিহীন, তা. বি.), পৃ. ৩২৯; 'আব্দুল কাদির আন্-নুয়ায়মী, *আদ্-দারিস ফী তারীখিল মাদারিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫; হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১১৬; ড. বাশ্শার আওয়াদ মা'রূফ, *মুকাদ্দামাতু তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৩; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী (র) বলেন, الحافظ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي مُحَمَّد القضاعي الكلبي المزي. দ্র. *আল-আ'লাম*, ৮ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল 'ইলমিল মালাঈন, ১৫শ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৩৬।

[৪] ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *আদ্-দুরারুল কামিনাহ্*, ৫ম খণ্ড (হায়দারাবাদঃ দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৮ হি.), পৃ. ২৩৩।

[৫] ইব্ন তাগরী বারদী, আন্-নজূমুয্-যাহিরাহ্, ১০ম খণ্ড (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিশরিয়্যাহ্, ১৩৫০ হি.), পৃ. ৭৬।

---

[৬] ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী, *আদ্-দুরারুল কামিনাহ্*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; ইবনুল ‘ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (মিশর: মাকতাবাতুল কুদ্সী, ১৩৫০ হি.), পৃ. ১৩৬; মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী, *আল-বাদরুত্-তালী‘*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাতবা‘আতুস্-সা‘দাহ্, ১৩৪৮ হি.), পৃ. ৩৫৩; তাশ্ কুবরা যাদাহ্, *মিফতাহুস্ সা‘আদাহ্*, ২য় খণ্ড (হায়দারাবাদ: ১৩৫৬ হি.), পৃ. ৩৬৭; ইব্ন শাকির, *ফাওয়াত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; ইউসুফ আল-ইয়ান সাকীস, *মু‘জামুল মাতবু‘আতিল ‘আরাবিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড (কুম: মানশূরাত সাক্তাবাহ্ আয়াতিল্লাহ্ আল-আ‘যামী, তা. বি.), পৃ. ৩০০; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১; ইব্ন তাগরী বারদী (র) বলেন, ولد بظاهر حلب فى عاشر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة. দ্র. ইব্ন তাগরী বারদী, আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ্, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

[৭] ইবনুল ‘ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী, *আল-বাদরুত্-তালী‘*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; তাশ্ কুবরা যাদাহ্, *মিফতাহুস্ সা‘আদাহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৭; ইউসুফ আল-ইয়ান সাকীস, *মু‘জামুল মাতবু‘আতিল ‘আরাবিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; ড. বাশ্শার আওয়াদ মা‘রূফ বলেন, عائلة عربية الاصل ترجع إلى قبيلة كلب القضاعية التي استوطنت البلاد الشامية منذ فترة مبكرة. দ্র. *মুকাদ্দামাতু তাহযীবুল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

[৮] ‘আরবী ভাষ্য, قَالَ نعمان فش الروضة الغناء سنة ৬৫০هـ. দ্র. *আত্-তাজ আল-মুকাম্মাল*, পৃ. ৪৮০।

[৯] ‘আরবী ভাষ্য, ونشأ بالمزة (من ضواحي دمشق) দ্র.*আল-আ‘লাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

[১০] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ১৪৯৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মু‘জামুশ শুয়ূখ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ৯০; ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী, *আদ্-দুরারুল কামিনাহ্*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; তাঁর পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধশালী ছিল না। যার কারণে তিনি ২১ বছর বয়সে প্রথম হাদীছের দারসে বসার সুযোগ লাভ করেন। যার কারণে তিনি ইব্ন ‘আব্দিদ্-দায়িম, ‘আল্লামা কারমানী, ইব্ন আবুল ইউসুফ (র) প্রমুখের ন্যায় বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছের নিকট দারস শ্রবণ করতে পারেননি।

দ্র. *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; *আয়ানুল আসর*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৩; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১।

[১১] *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; ইব্ন রাজাব, যায়লু *তাবাকাতিল হানাবিলাহ্*, ২য় খণ্ড (মিশর: মাকতাবাতুস্-সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ্, ১২৭২ হি.), পৃ. ৩৫১; ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী, *আদ্-দুরারুল কামিনাহ্*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্*, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ্, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৯১; ইবনুল ‘ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; ইব্ন নাসির, *আর-রাদ্দুল ওয়াফির* (মিশর: মাতবা‘আহ্ কুর্দিস্তান আল-ইসলামিয়্যাহ্, ১৩২৯ হি.), পৃ. ১২৮; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্-শাফিয়্যাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (মিশর: মাতবা‘আতুল হুসায়নিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ২৫১; মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী, *আল-বাদরুত্-তালী‘*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯৮; হাজী খলীফা, কাশফুয্ যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; ইসমা‘ঈল বাশা, *হাদিয়াতুল ‘আরিফীন*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৫৫৬; *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; কার্ল ব্রুক্যালম্যান, *তারীখুত্-তুরাছিল ‘আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

[১২] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১; *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন, خرج لنفسه وأملى مجالس وأوضح مشكلات ومعضلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله، وولي المشيخة بأماكن منها الدار الأشرفية.

দ্র. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯৯; ‘উমার রিযা কাহ্হালাহ (র) বলেন, وولي دار الحديث الاشرفية ثلاثا وعشرين سنة ونصفا.

দ্র. *মু‘জামুল মুআল্লিফীন*, ১২শ খণ্ড (বৈরূত: মু’আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২০৮।

[১৩] আস্-সাফাদী, *আল-ওয়াফী*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৮; আন্-নুয়াইমী, *দারিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯; *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯।

[১৪] ‘তাহযীবুল কামাল’ গ্রন্থের মুকাদ্দামায় বর্ণিত আছে,

شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني (ت 728)، وفتح الدين ابن سيد الناس اليعُمَري (ت 734)، وإما المؤرخين والمحدثين شمس الدين الذهبي (ت 748) سمع منه سنة (694)، وأخذ عنه صحيح البخاري غير مرة، والإمام العلامة تقي الدين السبكي (ت 756) وغيرهم. وبه تخرج أعاظم الرواة والمحدثين والمؤرخين من أعلامهم: علم الدين البرزالي (ت 739)، وشمس الدين أبو عَبْد اللَّه بْن عَبْد الهادي (ت 744)، وصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت 761)، وعلاء الدين مغلطاي الحنفي (ت 762) ، وتقي الدين ابن رافع السلامي (ت 774)، والشيخ عماد الدين ابن كثير صهره (ت 774)، وخلق يطول ذكرهم.

দ্র. *তাহযীবুল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১৫ ইব্ন তাগরী বারদী, *আন-নুযূমুয্-যাহিরাহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

১৬ আস্-সাফাদী, *আল-ওয়াফী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

১৭ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯৭; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১।

১৮ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯৭; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১।

১৯ খায়রুদ্দীন যিরাকলী, *আল-আ‘লাম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

২০ *মু‘জামুশ্-শুয়ূখ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০।

২১ শামসুদ্দীন আবুল মাহাসীন হুসায়নী, *যায়লু তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ২২৯।

২২ তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ্ শাফিয়্যাহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

২৩ *আন-নুজূমুয্-যাহিরাহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

২৪ *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০৪; ইব্ন তাগরী বারদী (র) বলেন, .ومات بدمشق فى ثانى عشر صفر

দ্র. *আন-নুজূমুয্-যাহিরাহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, مَاتَ يَوْم السبت ثانى عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة.

দ্র. *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১।

২৫ *আত্-তাজ আল-মুকাম্মাল*, পৃ. ৪৮১।

২৬ *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; ইব্ন কাছীর (র) তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে বলেন,

قُبِضَتْ رُوحُهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ السَّبْتِ ثَانِيَ عَشَرَ صَفَرٍ، فَلَمْ يُمْكِنْ تَجْهِيزُهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغد يوم الأحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم، غسل وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، وَحَضَرَ الْقُضَاةُ وَالْأَعْيَانُ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً، وَخُرِجَ بِجَنَازَتِهِ مِنْ بَابِ النَّصْرِ، وَخَرَجَ نَائِبُ السَّلْطَنَةِ الْأَمِيرُ علاء الدين طنبغا وَمَعَهُ دِيوَانُ السُّلْطَانِ، وَالصَّاحِبُ وَكَاتِبُ السِّرِّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ، أَمَّهُمْ عَلَيْهِ الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ.

দ্র. *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০৪।

২৭ ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০৪; ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী, *আদ্-দুরারুল কামিনাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৫; ইব্ন শাকির কুতবী, *আল-ফাওয়াত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; ইব্ন কাযী শাহবা, *তাবাকাত*, পৃ. ১১৯-১২০; ইব্ন তাগরী বারদী, *আল-মানহালুস্-সাফী*, পৃ. ৮৫৭-৮৫৮; ইবনুল ‘ইমাদ, *শাযারাতুয্-যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৭; আস্-সাফাদী, *আয়ানুল আসার*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্ফায*, পৃ. ৫২১; মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী, *আল-বাদরুত্-তালী‘*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩-২৫৪; ইউসুফ আল-ইয়ান সাকীস, *মু‘জামুল মাতবূ‘আতিল ‘আরাবিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; *আত্-তাজ আল-মুকাম্মাল*, পৃ. ৪৮০; উমার রিযা কাহ্হালাহ (র) বলেন,

وتوفي بدمشق في 12 صفر، ودفن بمقابر الصوفية غربي قبر صاحبه ابن تيمية.

দ্র. *মু‘জামুল মুআল্লিফীন*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২০৮।

[২৮] ইব্‌ন শাকির কুতবী, *আল-ফাওয়াত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী, *আল-বাদরুত্-তালী'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফ্‌ফায*, পৃ. ৫২১; ড. বাশ্‌শার মা'রূফ বলেন,

يضاف إلى ذلك أن المزي لم يقتصر فيه على الكتب الستة كما ذكرنا، بل أضاف إليها من لواحق ومؤلفات أصحاب الستة: (أ) مقدمة صحيح مسلم. (ب) كتاب المراسيل لابي داود. (ج) كتاب العلل للترمذي، وهو الذي في آخر كتاب الجامع له. (د) كتاب الشمائل للترمذي أيضا. (هـ) كتاب عمل يوم وليلة للنسائي.

দ্র. *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯।

[২৯] আস্-সাফাদী, *আল-ওয়াফী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফ'ঈয়্যাহ্*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; ইব্‌ন শাকির, *উয়ূনুত্-তাওয়ারীখ*, পৃ. ৮৬; যারকাশী, *উকূদুজ্-জিমান*, পৃ. ৭৯; *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮।

[৩০] *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬; ইব্‌ন শাকির কুতবী, *ফাওয়াতুল ওয়াফইয়াত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

[৩১] *আল-আ'লাম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

[৩২] *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

[৩৩] *তদেব*

[৩৪] হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

[৩৫] হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭; ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহ্‌যীবুত্-তাহ্‌যীব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস বলেন,

لخس منه ابن حجر العسقلاني وزاد عليه شيئًا كثيراً وسمّاء تهذيب التهذيب ثم اختصره وسمّاه تقريب التهذيب.

দ্র. *মু'জামুল মাতবু'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

[৩৬] হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; ড. বাশ্‌শার আওআদ মা'রূফ বলেন, قام صفي الدين أَحْمَد بْن عَبد اللهِ بْن أَبِي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأَنْصارِيّ سنة 923 بتلخيصه بكتابه المعروف"خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال، وفائدته أنه قيد بعض الأَسماء بالحروف.

দ্র. *মুকাদ্দামাহ্ তাহযীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

[৩৭] *মুকাদ্দামাহ্ তাহ্‌যীবিল কামাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৮।

[৩৮] *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

[৩৯] ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহ্‌যীবুত্-তাহ্‌যীব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭।

[৪০] 'আবদুস্-সাত্তার আশ্-শায়খ, *আল-হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী আমীরুল-মু'মিনীন ফিল-হাদীছ* (দিমাশ্‌ক: দারুল-কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৪৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্রের সমাজবাস্তবতা

ড. মো. আমিরুজ্জামান*

Abstract: The renowned playwright Selim Al Deen has dramatically represented a patriarchal social system. From an ancient time in this land of Bengal a woman's life has been controlled by the doctrines of patriarchy within the frame of her family and society. The socio-economic conditions of women could never strengthen It's position within this dominant power of control and along with these various dimensions of social violence towards women can be observed. The type of women's society has been depicted in Selim Al Deen's plays also contains extreme violence and intimidation towards women. Women from different classes and occupations are characterised in drama scripts of Selim Al Deen. These characters of women in his plays from different classes and occupations of life are the representatives of women of this land. By obtaining the socio-geographic realities these characters of women are immaculately sketched by the playwright in his plays. These plays inherently represent the diversified conditions of women in the society - where social problems and conflicts reveal overall conditions and existences of these women characters. Objective of this essay is to analyse the social manner and problems within the reflected social realities of these women characters of Selim Al Deen's plays.

ভূমিকা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের দৃষ্টিভঙ্গিও মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা এমন এক ক্ষমতাকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রবণতা যেখানে একের ক্ষমতা চর্চা অন্যের উপর অধীনতা স্থাপন করে রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতায়ণের কেন্দ্রে পুরুষের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকায় নারী এখানে পরনির্ভরশীল দ্বিতীয় লিঙ্গ, অধস্তন বা সাবওরডিনেট। এ কারণে লৈঙ্গিক দিক থেকে এই পিতৃতান্ত্রিক ভূখণ্ডের নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে প্রায় সকল স্তরে। আর এই সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে নাট্যকার সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) নাটকের নারী চরিত্র প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করেছে। আর্থসামাজিকভাবে তাঁর নাটকের নারী চরিত্রেরা যেমন বিত্তহীন তেমনি মর্যাদাহীন দ্বিতীয় লিঙ্গ। সামাজিকভাবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের আগ্রাসন এবং তাদের অস্তিত্বহীনতা ও অধীনতা নানা সংকট-সংকুল পরিস্থিতিতে নাটকে যেভাবে উঠে এসেছে তাতে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির ফলে নারীর প্রতি সামাজিকভাবে নানারূপ শোষণ-নির্যাতন, বৈষম্যমূলক আচরণ, পরাধীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক সেলিম আল দীনের নারীর সামাজিক জীবনকে বিশ্লিষ্ট করেছে। তাঁর নাটকের নারীর প্রতি সামাজিক আচরণে যে নির্মমতা ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করা যায় তার একটি বড়ো সূত্র নিহিত নারীর আর্থসামাজিক দুর্বল অবস্থান এবং ক্ষমতায়ণে নারীর প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে। এ কারণে নারীর প্রতি সামাজিক শোষণ ও সংঘাত একটি ভয়াবহ মাত্রা পেয়েছে সেলিম আল দীনের নাটকে। এই শোষণ বঞ্চনার ভেতর দিয়ে নারী স্বাধীনতার একটি সহজাত তীব্র আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে নারী চরিত্রের আচার-আচরণে। নারী চরিত্রের আর্থসামাজিক পরিচয়ের সূত্র ধরে নারীর প্রতি বিভিন্ন সামাজিক

---

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আচরণ, সংঘাত ও শোষণের ধরণ চিহ্নিতকরণ এবং বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্রের সমাজবাস্তবতা অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের প্রধান বিবেচ্য।

নারী চরিত্রের আর্থসামাজিক পরিচয়

আর্থসামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সেলিম আল দীনের নারী চরিত্রগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে: ১. গৃহস্থ বা গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী; ২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী এবং ৩. পেশাজীবী নারী।

সেলিম আল দীনের নাটকে গৃহবধূ ও গৃহকন্যা শ্রেণির নারীর সংখ্যা অপ্রতুল নয়। গৃহস্থ এই নারীদের প্রধান কাজ ঘরসংসার সামলানো যা মূলত বিনা পারিশ্রমিকের কাজ। জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজনকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: Productive, Re-productive এবং Community Role।[১] Productive কাজ হচ্ছে ঘরের বাহিরের শ্রম যার মূল্য আছে বা এই শ্রমে মজুরি পাওয়া যায়। অন্যদিকে Re-productive কাজ হচ্ছে গৃহকর্ম বা ঘরের অভ্যন্তরের কাজ যে কাজের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ নারী Re-productive কাজের সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে পুরুষেরা সাধারণত Productive ও Community Role বা কমিউনিটির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে গৃহস্থ বা গৃহকর্মে নিয়েজিত নারীর আর্থসামাজিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। সেলিম আল দীনের নাটকের ফর্হাদ সাহেবের স্ত্রী, মুহম্মদ বিন তুঘলকের বেগম, পাবদা, হামিদ সাহেবের স্ত্রী, নতু, মিসেস মুনতাসির, শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, নূরজাহান, নওশাদীর মা, ফুলমতি, বেগমী, হাস্না, কালিন্দী, পরী, মালতি, কমলা, সোনামুখি, নোলক, অধ্যাপকের স্ত্রী ও কন্যা, সাঁঝমালা, খলিশার স্ত্রী, হিজুলি, আবছা এবং সুবতী প্রমুখ গৃহস্থ নারী তাই অর্থনৈতিকভাবে বিত্তহীন। আর্থসামাজিকভাবে এসকল নারী স্বামী, পিতা অথবা পুত্রের পরিচয় ও নির্ভশীলতায় পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। মূলত, নারীদের অধীনতার মূল কারণ এই আর্থিক পরনির্ভরতা।[২] অথনৈতিকভাবে এই পরজীবী নারী চরিত্রদের সামাজিকভাবে বিশেষ কোনো গ্রহণযোগ্যতা যেমন নেই – তেমনি তাদের চিন্তা-চেতনা, মতামত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্বও অত্যন্ত নগণ্য হিসাবে নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ, 'যেহেতু নারী কিছুর মালিক নয়, সে মানুষের মর্যাদাও পায় না; সে নিজেই হয়ে ওঠে পুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তির অংশ : প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর।'[৩]

সেলিম আল দীনের নাটকে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী গৌতমী, নওশাদী, শমলা, কৈতরী, মনিরা বেগম, আঙ্কুরী, চুক্কুনী, সুকি এবং তিসি। এই নারীরা আর্থসামাজিক দিক থেকে গৃহবধূ ও অবিবাহিত কন্যাসন্তানদের তুলনায় আরো পিছিয়ে রয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটকের স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা নারীরা অধিকাংশই নিম্নবিত্তের নারী – যাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব নাটকে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার কাছে যেমন এই নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ তেমনি সামাজিকভাবে তাদের অবস্থানও অত্যন্ত দুর্বল।

সেলিম আল দীনের নাটকের পেশাজীবী নারী বনশ্রীবালা, ডালিমন, মালকা, চুক্কুনী, পরী, অঞ্জলি, মিঠু, রঞ্জনা, মিনাকুমারী, মঙ্গলি – প্রায় প্রত্যেকের পেশা নিম্নশ্রেণির যা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ও নেতিবাচক হিসেবে স্বীকৃত। বনশ্রীবালা, পরী, মিঠু, রঞ্জনা যাত্রাভিনেত্রী; ডালিমন ও মালকা বেদেনি; মিনাকুমারী ও অঞ্জলী পুতুল নাচের দলে নৃত্যপরিবেশনকারী। আর চুক্কুনী ও মঙ্গলি ভাসমান যৌনকর্মী। যাত্রাপালা ও পুতুল নাচের নারীদের যেমন সামাজিকভাবে কোনো মর্যাদা নেই – তেমনি যৌনকর্মী নারীরাও অস্পৃশ্য ও সমাজচ্যুত নারী। *কিত্তনখোলা* নাটকের বেদেনি ডালিমন ও মালকার অবস্থানও অনুরূপ। মালকা-ডালিমনদের সংসারে কেউ নেই। উপরন্তু নৌকায় বাস করা লাউয়ারা সাধারণত ভূমিহীন। ফলে উত্তরাধিকারসূত্রেও এসকল নারী সম্পদহীন। অন্যদিকে *যৈবতী কন্যার মন* নাটকের মিঠু রঞ্জনা পরিবার-পরিজনহীন নারী। পিতৃমাতৃহীন অঞ্জলি শৈশবে বিক্রি হয়েছিলো তারপর থেকে পুতুল নাচের তাবুতে সে নৃত্য পরিবেশন করে। *হাত হদাই* নাটকের

চুক্কুনী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে গিয়ে যৌনবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর *বনপাংশুল* নাটকের বিধবা মঙ্গলি অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে যৌনপেশা বেছে নেয়। মূলত, সেলিম আল দীনের নাটকে পেশাজীবী যে নারীদের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর নাটকের নারী চরিত্রদের ক্ষমতায়ণ যেমন নেই তেমনি এই নারীরা সামাজিকভাবে নানা সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেলিম আল দীনের নাটকে সামাজিক বন্টন ও ক্ষমতার অসাম্য বারবার উঠে এসেছে।[৪] আর নারীর এই আর্থসামাজিক পরিচয়ের ভেতর দিয়ে ধরা পড়েছে সমাজে নারীর অস্তিত্বের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত। ফলে তাঁর নাটকের নারী চরিত্রের উপর বিভিন্ন ধরণের সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। এই সামাজিক শোষণ বৈষম্যমূলক সংকট ও সংঘাতকেই উচ্চকিত করেছে।

নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ ও সংঘাত

ব্যক্তির প্রতি সামাজিক আচরণের ধরন তৈরি হয় মূলত সামাজিক বিশ্বাস, ধর্মীয় বোধ, রীতি-নীতি, সংস্কার, আচার ইত্যাদির ভিত্তিতে। আর সামাজিক আচরণের ভিত্তিতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান অনুমান করা যায়। সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যভিত্তিক সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। ফলে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই নির্মম। সেলিম আল দীনের নাটকে একই চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই সেলিম আল দীনের অধিকাংশ নারী চরিত্রের পরিণতি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও করুণ। অধিকাংশ নারীকে বিয়োগাত্মক পরিণতি বা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটকে সমাজের কাছ থেকে নারী চরিত্রগুলো মূলত সহিংস আচরণ লাভ করেছে। নারীর প্রতি যেসকল সহিংস আচরণ বা সংঘাত ও সমাজবাস্তবতা সেলিম আল দীনের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে তার ধরনকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমনঃ সতীদাহ, যৌতুক ও পণপ্রথা, বহুবিবাহ, যৌনবৃত্তি, অপহরণ ও যৌন নিপীড়ন, নারী ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক সংস্কার ও মিথ্যা অপবাদ, জোরপূর্বক বিবাহ ও বাল্যবিবাহ, অস্বীকৃত মাতৃত্ব ও ভ্রূণ হত্যা, সম্পদ-সম্পত্তি দখল, একপাক্ষিক গ্রামীণ-বিচার ইত্যাদি। তাঁর নাটকে নারীর প্রতি সমাজের এসকল আচরণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমাজবাস্তবতারই প্রতিফলন। এসকল সামাজিক সংস্কার, রীতি-নীতি ও আচরণ বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান অনুধাবন করা যায়।

ক. সতীদাহ

প্রাচীন ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিলো। আঠারো শতকের ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এতই ভয়াবহরূপ লাভ করে যে এসময়ে অধিকাংশ হিন্দু নারীকেই সহমরণ বরণ করতে হতো। অর্থাৎ স্বামী মৃত্যু বরণ করলে স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায় জীবন্ত প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো। ইহলোক এবং পরলোকে পতিই সব – সনাতন ধর্মের এই ধারণা সতীদাহ প্রথার পেছনে কার্যকর ছিলো। এছাড়া পুরুষের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হওয়ার জন্যও সামাজে এই প্রথা চালু হয়।[৫] সেলিম আল দীনের *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে সতীদাহের একটি লোমহর্ষক চিত্র পাওয়া যায়। বামন পাড়ার ইন্দুঠাকুরের বৌমা ভবানীর স্বামী মারা গেলে ভবানীকে চিতায় ওঠানো হয়। চিতা থেকে অর্ধপোড়া শরীর নিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইলে তাকে ধরে এনে জোর করে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। নাটকটিতে সতীদাহের নামে নারীর প্রতি সহিংসতার বীভৎস বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

> ভবানীর কাপড়ে আগুন ধরে যায়, এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সহসা আগুন থেকে বেড়িয়ে আসে। বলে, না না আমি পারবো না গো আমি চিতার আগুনে পুড়তে পারমু না। ঠাকুর চীৎকার করে, ধরো অরে ধরো। ... অসতীর বাচ্চা, চিতা থেকে তুই পালাবি না আমার বংশ মজাবি। ওই যা সাধু, ধইরা আন ধইরা আন।[৬]

যৈবতী কন্যার মন নাটকের কথাপুচ্ছে নাট্যকার উল্লেখ করেন, এই কথানাট্যের প্রথম খণ্ডের প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতক। এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সতীদাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিলো জানা যায়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ নিষিদ্ধ আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত প্রায় ৭০০০০ সতীদাহ হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭] আরো জানা যায় যে, সেসময়ে কোনো কোনো নারী স্বেচ্ছায় সতী হতো বা চিতার আগুনে ঝাঁপ দিতো – কিন্তু অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নতুবা অন্যকোনো উপায়ে একবার রাজি করিয়ে তারপর সে মরতে না চাইলেও জোর করে পুড়িয়ে মারা হতো।[৮] ভবানীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। এধরনের নিষ্ঠুর প্রথার মধ্যে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি সহিংস আচরণের নির্মম প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

খ. যৌতুক ও পণপ্রথা

যৌতুক ও পণপ্রথা এতদ্‌অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যৌতুক ও পণের কারণে বহু নারী নির্যাতিত ও নির্মমভাবে নিগৃহীত হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শুধু যৌতুকের জন্যই ২৯% নারী নির্যাতনের শিকার হন।[৯] সেলিম আল দীনের অনেক নাটকে যৌতুকের পাশবিকতা ও পণপ্রথার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। *বাসন* নাটকের কৈতরীর জীবনের করুণ পরিণতির অন্যতম কারণ যৌতুক। কৈতরী চরিত্রটি বাঙালি সমাজের মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নির্যাতিত গৃহবধূর প্রতিচ্ছবি। যৌতুকের টাকা দিতে অপারগতার কারণে সংসার পরিত্যক্ত এই নারী আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জীবনের মুক্তি খোঁজে। নারী চরিত্র অঙ্কনে এই নাটকটিতে নাট্যকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের অবমূল্যায়নের নির্মম রূপটিই তুলে ধরেছেন।

হাত হদাই নাটকের লেদন চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায় যৌতুকের লোভ রয়েছে। কেবল টাকার কারণে সে বিয়ে করতে রাজি হয়। লেদনের কথোপকথনে বিষয়টি সুস্পষ্ট:

> বিয়া করতে আপত্তি নাই, যদি সত্যই কিছু টেঁয়া মিলে– আর শেষে যদি বিয়া করি দেখি যে, শীপে মাস্তর অইন; তা অইলে– ?[১০]

লেদনের টাকার প্রয়োজন আর বিয়ে করলে টাকা পাওয়া যায় প্রচলিত সামাজিক প্রেক্ষাপটের এমন মানসিকতাই তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একই নাটকে চুক্কুনীর ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। চুক্কুনীকে বিয়ে করতে চুক্কনীর পিতাকেই পাঁচশত টাকা পণ দেয় খেলাধন। খেলাধনের সংসারে আরো দুটি বউ আছে – এ কারণে তার সাথে মমিন মাঝি কন্যাকে বিয়ে দিতে রাজি নাও হতে পারে ধারণা করে চুক্কুনীর পিতাকে পাঁচশত টাকার লোভ দেখায় সে। আগের পক্ষের দুটি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে টাকার লোভে মমিন মাঝি মেয়েকে পণ্যের মতো একপ্রকার বিক্রি করে। প্রভাবশালী কিংবা ধূর্ত বিয়ে পাগল ব্যক্তির একাধিক বিয়ের সময় দরিদ্র মেয়ের বাবাকে টাকা পণ দেওয়ার এমন অসঙ্গত দৃশ্য সমাজে বিরল নয় ।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের সখিপুর অঞ্চলে অখ্যাত লুপ্তপ্রায় নৃ-গোষ্ঠী মান্দাইদের বসবাস। মান্দাইদের সামাজিক প্রথাতে বিয়ে করতে হলে মেয়ের পরিবার নয় বরং ছেলেকে পণ দিতে হয়। সেলিম আল দীনের *বনপাংশুল* নাটকে এমন সামাজিক প্রথা দেখা যায়। এ নাটকে মেঘলাল মালতিকে বিয়ে করার জন্য তিনশত টাকা পণ দেয়। অন্যদিকে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধের সাথে সুকির বিয়েতেও হাজার টাকা পণ নির্ধারণ করা হয়েছিলো। যে কারণে অকাল বৈধব্য ও শারীরিক-মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থা সুকির জীবনের নির্ধারিত ফলাফল। এখানে পণের বিনিময়ে সংগঠিত হয়েছে এক অসম বিবাহ এবং এর ফলস্বরূপ সুকির জীবনে নেমে এসেছে নির্মম বঞ্চনা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও পণপ্রথা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় নারী অনেক ক্ষেত্রেই নিগৃহীত। সেলিম আল দীনের নাটকে এসকল ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও অঞ্চলের নারীর সমাজ জীবনের সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ লক্ষ করা যায়।

গ. বহুবিবাহ

নারীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের একটি বড়ো সমস্যা হলো পুরুষের বহুবিবাহ। হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহুবিবাহের রেওয়াজ ধর্ম ও সমাজ সম্মত। ইসলাম ধর্মে একসঙ্গে চার বিয়ে অনুমোদন করা হয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের বিধান মতে কুলীনে কন্যা সম্প্রদানের বিধান ছিলো। একারণে বয়স যেমনই হোক এক ব্রাহ্মণ শত শত নারী বিয়ে করতে পারতো। দুধর্মেই বহুবিবাহের বিধান থাকায় বাঙালি সমাজে বহুবিবাহ একটি স্বাভাবিক সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।[১১] বহুবিবাহের চল এখন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল। সেলিম আল দীনের নাটকেও অসংখ্য বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হাতহদাই নাটকে মাজুদ জোতদারের দুই স্ত্রীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ নাটকের তৈয়বুল্লারও দুই স্ত্রী যাদের মধ্যে একজনকে সাম্পান থেকে লুট করে জোরপূর্বক বিয়ে করেছিল সে। এছাড়া চুক্কুনী ছিলো খেলাধনের তৃতীয় স্ত্রী। চুক্কুনীর জীবনের নির্মম পরিণতির মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এমন অসঙ্গত বিয়ে। স্বামী সতীনের অমানবিক নির্যাতনের কারণে চুক্কুনীর সংসার বিনষ্ট হলে তার মধ্যে বিষয়টি যে প্রভাব তৈরি করে তা তাকে অস্বাভাবিক ও বিকৃত পথে টেনে নিয়ে গেছে। যার ফলাফল হিসেবে অকাল মৃত্যু তার জীবনের করুণ পরিণতি বয়ে এনেছিলো। *বনপাংশুল* নাটকের লুৎফর মাস্টারের জোতদার দাদার দুই বউ-এর কথা জানা যায়। *কেরামতমঙ্গল* নাটকের মির্জারও দুই স্ত্রী এবং *ধাবমান* নাটকের ইমাম সাহেবের তিন স্ত্রীর প্রসঙ্গ নাটকে উল্লেখ রয়েছে। সামাজিক এসকল বিভিন্ন প্রথা ও রেওয়াজের কারণে নারীর পারিবারিক ও সামজিক জীবন অত্যন্ত শোচণীয়। বহুবিবাহ মূলত নারীর প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদাকে খর্ব করে। একই সাথে নারীর প্রতি সহিংসতার পথকেও উন্মোচিত করে। চুক্কুনী চরিত্রটি যার অন্যতম উদাহরণ।

ঘ. যৌনবৃত্তি

বাংলার নগর জীবনের অপসংস্কৃতি ও পুরুষের উশৃঙ্খল জীবনের ভোগ-লালসার জন্যে নারীকে যৌনকর্মী বানানোর চেষ্টা সমাজে প্রাচীনকাল থেকে অব্যবহিতভাবে চলে এসেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে উনিশ শতকে কোলকাতা নতুন রাজধানী-নগর হিসেবে সমৃদ্ধ হতে শুরু করলে এই শহরে নারী পাচার ও অপহরণ করে বারবনিতা বানানোর অপচেষ্টা বেড়ে যায়।[১২] বিশ শতক এবং এই একুশ শতকেও বাংলাদেশে নানাকৌশলে নারীকে যৌনকর্মে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমকালীন বাংলাদেশে ২৭% নারী দারিদ্র্যের কারণে, ৪২% নারী বিক্রি হয়ে, ৭% নারী স্বেচ্ছায়, ১১% নারী পতিতালয়ে জন্ম নেয়ার কারণে এবং ৮% নারী অন্যান্য সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে পতিতাবৃত্তিতে আসছেন।[১৩] অর্থাৎ, দারিদ্র্য নতুবা প্রতারিত হয়ে বিক্রি হবার কারণে একটি বড়ো সংখ্যক নারী যৌনকর্মে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। এমন সমাজ বাস্তবতায় সেলিম আল দীনের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকে নারীর যৌনবৃত্তি এবং এর পেছনের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

চুক্কুনী *হাত হদাই* নাটকের এক ভাগ্য বিড়ম্বিত অবহেলিত নারী। একাধিক বিবাহ আর নিপীড়নের মধ্যেও চুক্কুনী সংসার জীবনের মধ্যে স্থিত হতে চেয়েছে। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে প্রতিনিয়ত তার আশাভঙ্গ হয়। তাই সংসার জীবনের বঞ্চনায় সে ক্রোধ ও ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে অসাম্যভিত্তিক সামাজিক কাঠামো। মূলত প্রথাগত জড় দর্শনের বিরুদ্ধে এক বিপর্যস্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে স্থাপন করেছে কেন্দ্রাভিমুখ মানবিক সত্যকে। চুক্কুনী তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক স্মরণীয় প্রতিবাদ।[১৪] চুক্কুনীর প্রথম সংসার টেকেনি। দ্বিতীয়বার তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে যে খেলাধনের কাছে পাঁচশত টাকায় পিতা তাকে বিক্রি করে দেয় সে সংসারেও চুক্কুনী নিগৃহীত হয়। তার প্রতি শুরু হয় অমানবিক শারীরিক নির্যাতন। এমন বীভৎস অভিজ্ঞতা তার মধ্যে সমাজ সংসারের উপর তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছে। আনার ভাণ্ডারি তাকে ঘর-সংসার ভাঙার প্রসঙ্গে কথা বললে চুক্কুনী বলে– 'ঘর? থুক থুক ঘরের মাইধে!'[১৫] খেলাধনের সংসারে নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে পিতার গৃহে

ফিরে এলে সেখানেও তার স্থিতাবস্থা তৈরি হয়নি। নির্যাতক খেলাধনের সংসারে ফিরে যাবার জন্য পশুর মতো চুক্কুনীর হাতপা বেঁধে রাখা হয়। সে বাঁধন কেটে পালিয়ে যায় কিন্তু পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে আরেক নির্মম বাস্তবতার সামনে দাঁড়াতে হয় চুক্কুনীকে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে সমাজের কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ তাকে ভাসমান যৌনকর্মীতে পরিণত করে। মৃত্যুর পূর্বে মায়ের কাছে চুক্কুনী বর্ণনা করে:

> জোয়ারে ভাসি যে দেশে গেছি, সে দেশে খালি রাইক্ষস, আগুনের 'লুয়া' 'ধোয়া– গেলাসে রক্ত খায়। আখাউড়ার শামসু, বিছরা বাজারের হাইঙ্গু কয়, থাক থাক রাজরাণী করি রাখুম তোরে।[১৬]

জীবন সম্পর্কে তার এই অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বঞ্চনা তাকে দুর্বিনীত করেছে। মৃত্যুর মুহূর্তে তাই তাকে স্মৃতি, বেদনা ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু সে সাহসী হয়েও জীবনযুদ্ধে পরাজিত নারী। তথাপি তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক উল্লেখ করেছেন:

> মৃত্যু পথযাত্রী চুক্কুনীর জীবন যন্ত্রণা শুধু বিবর্ণ সমাজের রুগ্ন দশাকেই তুলে ধরেনি, সেই সঙ্গে প্রতিবাদের ভাষাকেও তুলে ধরেছে। ... যেখানে ধর্মের নামে নারীরা নির্যাতিত হয়, সেখানেও নারীদের ওপরে চাপিয়ে দেয়া হয় কল্পিত পাপের বোঝা। নারী শুধু নারী হবার অপরাধেই সামাজিক নির্যাতনের শিকার। নারীকে বলা হয়, অব্যক্ত ও অস্ফুট। কিন্তু চুক্কুনী অস্ফুট ও অব্যক্ত নয়। এ ধরনের চরিত্র বাংলা নাটকে বিরল।[১৭]

যে ভাসমান জীবন চুক্কুনীকে বিনাশ করেছিল সেই পথের জীবন *যৈবতী কন্যার মন* নাটকের কালিন্দীকেও পথভ্রষ্ট করে – রূপান্তরিত করে ভাসমান যৌনকর্মীতে। কালিন্দী শুরুতে পিতার গৃহচ্যুত এবং শেষে আলালের প্রবঞ্চিত সংসার পরিত্যাগ করে নৌকায় দস্যুদের হাতে লুট হয়। তারপর হাতবদলে হাতবদলে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয় বিভিন্ন ভূ-স্বামীদের যৌনদাসীতে। ফলে এ নাটকে একজন নারীকে সামাজের আচার-আচরণের নানা স্তরে বারবার পঙ্কিলতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মূলত, নারীর পারিবারিক-সামাজিক অবস্থান অস্থিতিশীল এবং ধর্মান্ধতার নিয়ম-নীতিতে বাঁধা। তবুও কালিন্দীর জীবনের নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা দৃঢ়চেতা মনোভঙ্গি এবং আত্মহননের মাধ্যমে তার প্রথম জন্মের সরব প্রস্থান প্রচলিত সমাজ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে নারীর এক স্মরণীয় সংঘাত।

বনপাংশুল নাটকের মঙ্গলি চরিত্রটি অভাবের কারণে যৌনবৃত্তি বেছে নেয়। সমাজের সকলে তাকে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে চললেও মঙ্গলির অর্থাগমনের অন্য কোনো পথ নেই। মঙ্গলির স্বামী ভিটা দখলের লড়াইয়ে নিরুদ্দেশ হবার পর সে বাঙালি মহাজনদের আনুকূল্য পায় শরীর বিক্রি করে। এই পেশা তার স্বেচ্ছাকৃত নয় অনিচ্ছাকৃত। জাত, ধর্ম, সমাজ, সংসার এসবের তাই কোনো অর্থ নেই মঙ্গলির কাছে। জীবনের এমন দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে উপোস মঙ্গলি সুকিকে বলে:

> ...গতরের দিক চায় শরম করে। উপাস কাপাস মানে না। বৈধব্যের ছায়া পড়ে না। মর মর মর। ... না। আমি ভিক্ষা উধার কিছুই নিমু না দিদি। রূপ আছে গতর বেইচা খামু। এই জাতটারে থু। তমাগরে থু। গতর বেচুম। হ হ। হ দিদি ॥[১৮]

কেবল অভাবের কারণে যে মঙ্গলি যৌনতা বিক্রি করে সে সমাজের কাছে অচ্ছুৎ নষ্ট নারী হিসাবে স্বীকৃত। মান্দাইদের পুষুরিয়া উৎসবের আনন্দে তাই তার অংশগ্রহণ সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। এই সামাজিক ব্যবস্থাদি মঙ্গলিদের সুস্থ নতুন জীবনে পুনর্বাসনও যেমন করতে পারে না আবার এক পঙ্ক্তিতে আসনও দিতে পারে না। উভয়মুখী এক সংকটের ভেতরে মঙ্গলি চরিত্রের সামাজিক অবস্থানের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা যায়।

কিত্তনখোলা নাটকের বনশ্রী যৌনবৃত্তির কুৎসিত জীবন ছেড়ে যাত্রাদলে যোগ দেয়। কিন্তু সেখানেও তাকে জোর করে সমাজের কতিপয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের শরীরীসঙ্গ দিতে বাধ্য করা হয়। যাত্রাদলের মালিক সুবোধ ঘোষের হুকুমে অভিনেত্রী ননীবালাকেও রাত কাটাতে হয় শফিক চেয়ারম্যানের সঙ্গে। মূলত,

যাত্রাভিনয়পেশার মধ্যেও যৌনবৃত্তির অনুরূপ জীবনই ফিরে এসেছে বনশ্রীর কাছে। *হাত হদাই* নাটকে শ্যালিকা আক্কুরীকে দেখতে যাবার পথে হার্মাদের ঘাটে আনার ভাণ্ডারির সাথে জলবেশ্যাদের সাক্ষাৎ ঘটে। হার্মাদের ঘাটের সখিনা খদ্দের আনারকে বলে– 'ঠিক আছে দেখি লন একবার– দেখি লন। নিরোগ শরীর, মাত্র নাইমছি গেল বোছরের রাটে (দুর্ভিক্ষে)।'[১৯] মূলত অভাবের সুযোগ নিয়ে এ নারীকে যৌনকর্মের পথে প্ররোচিত করা হয়েছে। এভাবে কখনো কখনো কাউকে জোর করে তুলে নিয়ে অথবা প্রতারণার মাধ্যমে বিক্রি করে যৌনকাজে বাধ্য করা হয়েছে নতুবা অভাবের সুযোগ নিয়ে সমাজের ক্ষমতাশালীরা নারীকে যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। ক্রমে সমাজ-সংসার চ্যুত এ সকল নারী স্থায়ীভাবে পরিণত হয়েছে ভাসমান যৌনকর্মীতে।

ঙ. অপহরণ ও যৌন নিপীড়ন

সেলিম আল দীনের নাটকে নারীর প্রতি অসংখ্য যৌন নিপীড়নের চিত্র লক্ষ করা যায়। মৌখিক কটূক্তি, প্রলোভন, প্রতারণা, অপহরণ বা লুণ্ঠন নানাভাবে এই যৌনহয়রানি সংগঠিত হয়েছে। উপরন্তু ধর্ষণের মতো বর্বর সামাজিক শোষণের অসংখ্য চিত্রও উঠে এসেছে সেলিম আল দীনের নাটকে। বাংলাদেশে প্রতিদিন নানা-বয়সী নানা পেশার অসংখ্য নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে গড়ে প্রায় প্রতিদিন কমপক্ষে দুইজন নারী ধর্ষণের শিকার হন।[২০] অপহরণ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ নারীর মানবিক অস্তিত্বের সংকটকে আরো ভয়াবহরূপ দিয়েছে। এই নির্মম সামাজিক সত্যের প্রতিফলন নানাভাবে সেলিম আল দীনের নাটকে প্রতিফলিত।

স্বর্ণবোয়াল নাটকের তিসি জেলে পাড়ার মেয়ে। তিসির স্বামী মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হলে বাবুল মহাজন সেই সুযোগ নেয়। স্বামীর খোঁজ এনে দেবে বলে ট্রলারে তুলে নিয়ে যায়। সমুদ্র মোহনার তীরে এক গোপন ঘরে একমাস আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয় তিসিকে। মাসাধিককাল মানবেতর জীবন যাপনের পর পালিয়ে আসে সে কিন্তু এই যৌন নিপীড়ন তিসির মধ্যে স্থায়ীভাবে একটি বিরূপ ছাপ রেখে যায়। নাট্যকারের বর্ণনায় তিসির অসহায়ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব:

> সমুদ্রের কথা শুনলেই তিসির চোখ বড়ো হয়ে যেত। বাবুল মহাজন স্বামীর শোক মানে নাই– তার অসহায়ত্ব মানে নাই। রাতভর মদ্যপান– রাতভর ধর্ষণ। ...সবাই জানে কি ঘটেছিল। তিসির গোপন গর্ভপাতের খবর রটতে দেয়নি বিধবা মা।[২১]

সমাজে দরিদ্র বিধবা হিসেবে তার শক্ত কোনো ভিত্তি নেই – উপরন্তু এমন সামাজিক শোষণ তার জীবনকে আরো বিপন্ন করেছে। এভাবে ধর্ষিত, প্রতারিত তিসি সামাজিক বঞ্চনার স্মারক হয়ে উঠেছে *স্বর্ণবোয়াল* নাটকে। এ নাটকে যৌন হয়রানির আরো একটি চিত্র বিধৃত হয়েছে সাঁঝমালার প্রতি বৃদ্ধ সিঙড়া মাঝির কাম-লালসা বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। সাঝাঁমালাকে দেখে সিঙরা মাঝি কাম-লালসায় বিকৃত আচরণ করে, মদ খেয়ে সাঁঝমালার বাড়িতে এসে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। এ ঘটনার প্রতিফলও সাঁঝমালাকেই বহন করতে হয়। কারণ এধরণের সামাজিক অনাচারের কারণে সামাজিক অনুশাসনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে নারীর স্বাধীনতা। সাঁঝমালার প্রতিও বহির্জগতের স্বাধীন চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। নাটকে দেখা যায় এধরনের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে সাঁঝমালার চাচী হিজুলি সাঁঝমালাকে বলে– 'মাও কইছিনা তরে। বয়স হইছে না তর। সাবালক হইলে হুড়মুড় কইরা যেখানে সেখানে যখন তখন যাইতে হয় না।'[২২] সাধারণত পুরুষের এরূপ কৃতকর্মের দায় হিসেবে নারীর প্রতি নানারকম পারিবারিক-সামাজিক বিধি নিষেধ আরোপের চেষ্টা দীর্ঘকাল থেকে। কিন্তু এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট নারীর সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পথে বড়ো অন্তরায় – যা পরবর্তীতে গৃহবন্দী সাঁঝমালার জীবনের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়।

কিত্তনখোলা নাটকের ঘটনাবৃত্তে দেখা যায়, ডালিমন একরাতে হুকুম সর্দার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। সম্ভ্রম বাঁচাতে ডালিমন চিৎকার করলেও প্রতিবেশি বেদেরা সর্দারের ভয়ে তাকে উদ্ধার করতে আসেনি। আশ্রয়হীন

বনশ্রীকে জীবিকার তাগিদে ক্ষমতাশালীদের ভোগবিলাসের দাসত্ব করতে হয়েছিলো কিন্তু ডালিমনকে জাত-ধর্ম, পেশা ও বেদে সমাজের একনায়কতন্ত্রের শোষণে হুকুম সর্দারের কাছে সমর্পিত হতে হয়েছে। কারণ,

> দণ্ড মুণ্ডের কর্তা হুকুম সর্দার ডালিমনদের মতো নারীদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে– গোত্রের বা গোষ্ঠীর সকলের এবং সব কিছুর ওপর যেমন তার অধিকার বিদ্যমান তেমনি নারীদের শাসন করবার, ভোগ করবার অধিকারও তার রয়েছে।[২৩]

কিত্তনখোলা নাটকে বনশ্রীর প্রতি সংগঠিত যৌন নির্যাতনের প্রেক্ষাপট ও ধরন ডালিমনের থেকে ভিন্ন। বনশ্রীও সমাজ সংসারে একজন প্রবঞ্চিত নারী। প্রথম জীবনে যৌনপল্লীর মেয়ে হিসাবে তার কোনো সামাজিক পরিচয় ছিলো না – আবার যাত্রাভিনেত্রী পেশায়ও একই অবস্থা-অবস্থান প্রত্যক্ষ করা যায়। বনশ্রীর বিভিন্ন সংলাপে বোঝা যায় যাত্রাদলের মেয়েরা সামাজিকভাবে যেমন নিগৃহীত তেমনি সমাজের কতিপয় কামলিপ্সু মানুষেরা সুযোগ সন্ধানে রত। একারণেই শফিক চেয়ারম্যানের ঘরে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয় ননীবালাকে – নাগরপুরের মেম্বরদের কাছে বনশ্রীকেও দুদিন থাকতে হয় – এছাড়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ খেয়ে নাচতে হয় ইদু কন্ট্রাক্টরের সামনে। এসকল যৌননিপীড়ন বনশ্রীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সুবল ঘোষের নির্দেশে ননীবালাকে কারো সাথে রাত কাটানো এবং বনশ্রীকে ইদুর সামনে মদ্যপ অবস্থায় নৃত্য পরিবেশনে রবিদাশের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে বনশ্রীর ক্ষোভের মধ্যে তা সহজে অনুধাবন করা যায়:

> ...যখন দুই পায়ে ঘুঙুর নাচে আর হাজার মানুষ তোমারে দেখে– খুশি হয়– খারাপ কথা কয়– শিস্ মারে– তখন পুণ্যি। আর যখন আসরের বাইরে একজনেরে দেবতা সাজাও– হাসো– কথা কও– তখন পাপ।– ননীবালাও যাবে– আমিও নাচবো।[২৪]

যৌনবৃত্তির জীবন ছেড়ে সুন্দর জীবনের খোঁজে বনশ্রী যাত্রাভিনয়ের পেশা বেছে নিয়েছিলো। চেয়েছিলো অভিনয় করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে। কিন্তু যাত্রাদলে যৌনদাসত্ব থেকে সে মুক্তি পায়নি। তার উপায়হীন জীবন ও সামাজিক কলুষতা তাকে পীড়িত করে। ফলে আত্মগ্লানি ও ক্ষোভে সে ফেটে পড়ে। বনশ্রীর আত্মহত্যার মতো নির্মম সিদ্ধান্তের ভেতর দিয়ে প্রান্তিক নারীর প্রতি প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রাসনের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। জীবিকার তাগিদে বনশ্রী কিংবা ননীবালা মূলত সুবল ঘোষের আজ্ঞাবহ নির্যাতিত নারী। বনশ্রীকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হয়েছে জীবন ও জীবিকাকে। তার কোথাও ফিরবার কোনো পথ নেই জেনে দলের অধিকারী সুবল ঘোষ তাকে ব্যবহার করেছে নানাভাবে। কারণ সুবোল ঘোষের কাছে যাত্রা নেশা নয়, এটা ব্যবসা। এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজের প্রভাবশালীদের খুশি রাখতে হয় সুবল ঘোষকেও। কিন্তু এই খুশির বলী হয় বনশ্রীর মতো যাত্রাভিনেত্রী নারীরা। মূলত, *কিত্তনখোলা* নাটকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ফলে পেশাগত রূপান্তরের চিত্রে যে সমাজ ব্যবস্থা উঠে এসেছে তা এমনই নিপীড়ন যন্ত্র হিসেবে অধিষ্ঠিত যে, একজন বেশ্যাও পেশা বদলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে শেষরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে।[২৫] বনশ্রীর করুণ মৃত্যু সামাজিক অবক্ষয়ের একটি নির্মম দৃষ্টান্ত।

যৈবতী কন্যার মন নাটকে কালিন্দী এবং মিনাকুমারী চরিত্রের যৌন হয়রানির দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোনো এক গীতিকার আসরে প্রভাবশালী এক ভূ-স্বামী কালিন্দীকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চায়। ভিন্ন ধর্মালম্বী যুবককে বিয়ে করায় এবং আসরে আসরে গীত পরিবেশনের জন্যে কালিন্দীকে সামাজিকভাবে কুলটা নারী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হলে সেই ভূস্বামী তার সুযোগ নেয়। আলাল ও কালিন্দীকে তারা আটকে রেখে কালিন্দীকে যৌনদাসী করতে চায়। কালিন্দী সে যাত্রায় কৌশলে মুক্তি পায় বটে কিন্তু নারীকে এমন যৌনসম্ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার প্রয়াসের মধ্যে যে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র উঠে এসেছে তা নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাকে প্রকটিত করে।

নিম্নশ্রেণির একজন ভাসমান নারী যে পুরুষের তুলনায় বেশি পরাধীন ও প্রবঞ্চিত – এই নাটকের মীনাকুমারী চরিত্রটি তার দৃষ্টান্ত। মীনাকুমারীর অসুস্থ পিতার অচলাবস্থা তাকে ভিন্ন ধরনের জীবিকার পথে নিয়ে গেছে। কারণ তার এই অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে রাজ্জাকের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষেরা। মিনাকুমারী আসরে আসরে নাচ দেখায় – খাদ্য খরচ বাদে তিরিশ টাকা পায় প্রতিদিন। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে দালাল রাজ্জাককে শরীরের সঙ্গ দিতে হয়। রাজ্জাক তাকে নেশা করিয়ে ধর্ষণ করে প্রায়শ। এমনকি কোনো কাজে রাজ্জাকের অবাধ্য হলে রাজ্জাক তাকে শারীরিকভাবে প্রহারও করে। এভাবে ক্রমে দালাল রাজ্জাকের অধীনস্ত যৌনদাসীতে পরিণত হয়েছে মিনাকুমারী।

বনপাংশুল নাটকের ঘটনাবৃত্তে দেখা যায়, মহাজনরা খাস জমি দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে মান্দাইদের জমি পত্তনি নিয়ে যখন দখল করতে আসে – তখন দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় ভীষণ লড়াই। সেই দাঙ্গায় গণধর্ষণের শিকার হয় সুকি। এই সামাজিক পাশবিকতা নির্লজ্জ ছাপ রেখে যায় – ধর্ষিতা সুকির উদরে জন্ম নেয় অনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রূণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ হলো:

> প্রায় আদিম অনগ্রসর সমাজের একজন নারীকে সম্ভ্রম বিকাতে হয় ভিন্ন জাতের মানুষের হিংস্র থাবাতলে। পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সুকিরা প্রিয় মানুষকে নিজের করে পায় যখন, তখন তাদের নারীত্বের সকল ঐশ্বর্য লুণ্ঠিত নিজে সে হতমান।[২৬]

বনপাংশুল নাটকের শুরুতেই পুরাকালে কোনো এক দাঙ্গায় তাদের বহুনারী লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত হয়েছে এমন ইতিহাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে দাঙ্গাতে সাত-আটজন মিলে ধর্ষণ করে মান্দাইকন্যা লক্ষ্মীকে। এছাড়া গণধর্ষণের শিকার হয় আরো অসংখ্য মান্দাই নারী। যাদের মধ্যে অধিকাংশ নারী সম্ভ্রম হারিয়ে পালিয়ে যায় দূর দেশে। এছাড়া *বনপাংশুল* নাটকে সোনামুখি চরিত্রের ভিতর দিয়ে নাট্যকার আরেক নির্মম সামাজিক চিত্র উন্মোচিত করেছেন। সোনামুখি চরিত্রটি নানা সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত পাড়ি দিয়ে বিকশিত হয়েছে। বহেরাতৈল গ্রামে বাঙালিরা পুরো একটি মান্দাইপাড়া অগ্নি-লুণ্ঠনে মানব শূন্য করে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুড়ে মারা যায় সোনামুখির স্বজন কিন্তু সে পালিয়ে আসে সুকিদের গ্রামে। এই গৃহহীন নারীকে সুযোগসন্ধানী ফরেস্টার হাসান যৌন সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়। ফরেস্টারের মুখে থুথু ছিটিয়ে সোনামুখি বলে:

> এই মুখের পুড়া ঘা শুকাই নাই। সব নিছ তুমরা এখন বাকিটাও নুট করতে চাও। ক্যান হে ভগবান ক্যান সোনামুখির এমন হল। বাপ পুড়ল ভাই পুড়ল বুইনটা পুড়ল মানসের আগুনে পরশুরামের দল।[২৭]

স্বজনহারা সোনামুখির বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় ফরেস্টার হাসানের যৌননিপীড়ন তার সামগ্রিক অবস্থাকে ভিষণভাবে আহত করেছে। সেই সাথে ভাসমান নারীর জীবন যাপনের নানা প্রতিবন্ধকতাও উঠে এসেছে। *বনপাংশুল* নাটকের ফরেস্টার হাসানের কথা থেকেও ধর্ষণের একটি বীভৎস গল্প জানা যায়। ফরেস্টার হাসান বান্দরবানে থাকাকালীন চিং নামে একজন মারমা নারীর প্রেমে পড়ে। মেয়েটি আর্মিদের দ্বারা ধর্ষিত ও নিখোঁজ হয়। নারীকে পরাভূত করার অন্যতম অস্ত্র হিসেবে যৌনপীড়নের পাশবিক প্রবণতা কর্তৃত্বশীল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান পরিষ্কার করে।

কেরামতমঙ্গল নাটকে চশমা ডাকাত জেলে বসে একে একে তার বিভিন্ন ধর্ষণের গল্প বলে। ডাকাতি করতে গিয়ে সে তালুকদারের স্ত্রী এবং তার বড়ো ছেলের স্ত্রীকে একসঙ্গে ধর্ষণ করে। সাঁই-বাবার মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে এক বোষ্টমিকে। এছাড়া *কেরামতমঙ্গল* নাটকে যুদ্ধকালীন নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার কিছু চিত্রও নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রায় আড়াই লক্ষ নারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো।[২৮] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যসহ এ দেশিয় বিশ্বাসঘাতকগণ অসংখ্য নারীকে মাসের পর মাস আটকে রেখে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। *কেরামত মঙ্গল* নাটকে একই বাস্তবতার চিত্র

লক্ষ করা যায়। এ নাটকের নূরজাহানকে প্রথমে পাকিস্তানী ক্যাম্পে বন্দী করে আনা হয়। গ্রামের মুয়াজ্জিনের মেয়ে নূরজাহানকে সেখানে একমাস পাশবিক যৌন নির্যাতন করে একহাজার টাকায় রাজাকার কমান্ডারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। তারপর হাত বদল হয়ে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান – সেখান থেকে আরেক রাজাকার সোনামিয়ার হাতে। হাতবদলের ভেতর দিয়ে নূরজাহান ক্রমাগত লালসার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। উপরন্তু গর্ভাবস্থায় ধর্ষণের পাশবিকতায় তার যে জীবনসঙ্কট দেখা দেয় তাও অত্যন্ত অমানবিক। এই নির্মম নির্যাতন যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস হলেও এর প্রভাব তৈরি হয়েছে নারীর যুদ্ধপরবর্তী সামাজিক জীবনে।

সেলিম আল দীনের *ধাবমান* নাটকেও পাক-হানাদার বাহিনীর বীভৎস ধর্ষণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে:

> এক ভোরে ছিছি নামের এক দীর্ঘকায় মান্দি যুবতী উরুত নিয়ে গাছতলাতে মৃত পড়ে রইলো। গর্জে উঠলো মান্দি গারোগণ আর আশ্রয় প্রার্থী উদ্বাস্তুরা ধর্ষণকারীতে আড়াল করে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়ে আশ্রয়দাতাদের আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। মান্দি পাড়ায় প্রবেশ করলো পাকিস্তানের ইপিআর বাহিনী। ... মুসলমান নগদিদের সামনে এগিয়ে দিয়ে তারা রইল পেছনে। আর শুরু হলো পুরো মান্দি এলাকা জুড়ে হত্যা ধর্ষণ লুণ্ঠন ও আগুন।[২৯]

এ নাটকের আরো একটি গণধর্ষণের চিত্র পাওয়া যায়। বেদে সর্দারের কন্যা রূপা একরাতে গণধর্ষণের শিকার হয় একদল উশৃঙ্খল যুবকের দ্বারা। ধর্ষিত এই নারীর ধর্ষণ পরবর্তী সামাজিক নির্যাতন আরো ভয়াবহভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রূপার নির্মম হত্যাকাণ্ড বেদে সমাজের নারীর জীবন ব্যবচ্ছেদের একটি নির্মম দৃষ্টান্ত।

সেলিম আল দীনের *নিমজ্জন* নাটকে অসংখ্য ধর্ষণের বর্ণনা দেখা যায়। যেমন– 'আগন্তুক গীতপদে জলবঙ্গের কাঞ্চন কন্যাকে দেখে। ... একে হত্যাকারীরা ধর্ষণ করেছে ★ পেট চিরে দিয়েছে।'[৩০] নাটকের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে– 'আগন্তুক আবার ভয়ঙ্কর অপচয়ের সুড়ঙ্গে ঢুকতে থাকে যখন শুনতে পায় ★ যুবতীটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল।'[৩১] এ নাটকে সাহিত্যের অধ্যাপকের স্ত্রী ও কন্যাও গণধর্ষণের শিকার হয়। অধ্যাপকের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে মোট এগারজন – আর মেয়েটিকে আটজন। অধ্যাপকের মেয়েকে শুধু ধর্ষণই নয় জিভও কেটে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তেরা। 'সভ্যতার সাথে ধর্ষণের একটা সমঝোতা হওয়া দরকার'[৩২]– নাটকে এই সংলাপের মধ্যে সমাজে নারীর অনিরাপদ পৃথিবীর রূঢ়রূপ বিধৃত হয়েছে। এ নাটকে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের রূঢ় আগ্রাসনে অধ্যাপকের স্ত্রী ও তার কন্যার সম্ভ্রম ও জীবন বিনষ্টের চিত্রে নারীর বিপন্ন অস্তিত্বের করুণ গল্প বর্ণিত হয়েছে। *নিমজ্জন* নাটকে আরো অসংখ্য ধর্ষণের বর্ণনা মূলত নারীর প্রতি সামাজিক-রাষ্ট্রিক পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃত প্রতিফলন – যার ভিতর দিয়ে নারী হয়ে উঠেছে যৌন-পণ্যের মতো। *নিমজ্জন* নাটকে সেই বিপর্যস্ত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবী জুড়ে নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নির্মম ঘটনার মধ্যে অস্তিত্বের সংকটে পড়া নারীদের চিত্রে উঠে এসেছে নারীর নিরাপত্তাহীন শোষিত জীবন।

চ. নারী ক্রয়-বিক্রয়

প্রাচীনকাল থেকেই নারী দাস হিসেবে বিক্রির ইতিহাস পাওয়া যায়। আঠারো উনিশ শতকের কোলকাতায়ও প্রকাশ্যে দাসদাসী কেনা-বেচা হতো। নির্ধারিত স্থানে হাতে পায়ে শিকলে বেঁধে রাখা সারি করে দাঁড়ানো দাসদাসীদের ক্রেতারা তাদের পছন্দ করে কিনে নিতো।[৩৩] *যৈবতী কন্যার মন* নাটকের ঘটনাও প্রায় তৎকালীন। এ নাটকে দেখা যায় চৌদ্দ বছরের অঞ্জলি দাসীকে একহাজার পঁচাত্তর টাকায় দয়াল কিনে এনে পুতুল নাচের দলের খদ্দের জোটাবার জন্যে নৃত্যশিল্পীর কাজে নিযুক্ত করে। পরীর বর্ণনায় তথ্য পাওয়া যায়– 'অঞ্জলিদি'র কেউ নেই। বাবা মা'র পরিচয়ও কেউ জানে না। চৌদ্দ বছর বয়সে দয়াল কাকা তাকে কোত্থেকে কিনে এনেছিলেন। ইসমাইল চাচা বলেছিল, হাজার পঁচাত্তর টাকায়।'[৩৪] পরী কেনা-বেচার মূল্য

হিসেবে হাজার টাকা অর্থ বুঝতে পারে কিন্তু কেনো তার সাথে পঁচাত্তর টাকা যোগ হয়েছে বুঝতে পারে না। অঞ্জলি দরদাম করে বিক্রি বলেই হাজারের সঙ্গে আরো পঁচাত্তর টাকা যোগ হয়েছে এমন জীবনাভিজ্ঞতা পরীর বোধগম্য হয়নি কিন্তু অঞ্জলির জীবনের এই নির্মম পরিহাস পাঠক-দর্শকদের বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ছ. সামাজিক সংস্কার ও মিথ্যা অপবাদ

আধুনিক বাঙালি সমাজেও নানা ধরনের সামাজিক সংস্কারের প্রচলন রয়েছে। বিশেষত প্রান্তিক অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এসব সংস্কার বেশি। নারীর চলাফেরা, উঠা-বসা, কাজ কর্ম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অসংখ্য সংস্কার এখনো মানুষ আস্থার সাথে বিশ্বাস করে। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিকে পোক্ত করার জন্যে সাধারণত ব্যবহার করা হয় ধর্মকে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের ফলে প্রধাণত নারীর জীবনে রটে নানা অপবাদ, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। সেলিম আল দীনের নাটকেও নারীর প্রতি একপেশে সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা ও নানা অপবাদ দেয়ার বিভিন্ন প্রসঙ্গ দেখা যায়।

বনপাংশুল নাটকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত নারী সোনামুখির শোকাবহ অসংলগ্ন কথা-বার্তার কারণে মান্দাই সমাজের কতিপয় ব্যক্তি তাকে ভূত হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর সুকিকে বলে– 'এই ছেমরিডারে বন থিকা খেদা। অয়তে ভূত॥'[৩৫] ক্রমে বিশ্বেশ্বরের কথায় সকলে বিশ্বাস করতে শুরু করে সোনামুখি আগুনে পুড়ে ভূত সেজে এসেছে। একারণে বিশ্বেশ্বরের সাথে অন্যরাও সোনামুখিকে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে নারীদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় ডাইনি নামে প্রায় ষাট লক্ষ নারীকে হত্যা করা হয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া এটিই সবচাইতে বড়ো গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃত।[৩৬] মধ্যযুগীয় সেই বর্বরতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় মান্দাই নৃগোষ্ঠীর সামাজিক সংস্কারে। ডাইনি বা ভূত আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারতে সোনামুখির উদ্দেশ্যে সমবেত সকলে বলে– 'অরে ফির আগুনে পুড়ায়া মার।'[৩৭] এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সুকি, লুৎফর মাস্টার, অনিল সোনামুখির পাশে দাঁড়ালে সোনামুখিকে নিয়ে তৈরি হয় উভয়মুখি সামাজিক সংঘাত।

আতর আলীদের নীলাভ পাট নাটকে নারীর প্রতি সামজিক শোষণের আরেকরূপ পরিলক্ষিত হয়। নাটকে নতু চরিত্রটি পারিবারিক এবং সামাজিক উভয়ভাবে সহিংস আচরণের শিকার হয়েছে। নাটকের শুরুতে প্রতিবেশী দুই বৃদ্ধের কথোপকথনের মধ্যে প্রান্তিক গ্রামীণ সমাজে একজন নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যায়। নতুকে উদ্দেশ্য করে প্রথম বৃদ্ধ বলে– 'সাঁঝের বেলা খোলা চুলে জ্বিনের আছর করে।'[৩৮] এ সংলাপের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, সামাজিক সংস্কার একমাত্র নারীর উপর চাপানো হচ্ছে – গণ্ডিবদ্ধ করা হচ্ছে তার চলাফেরা ও স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে। ধর্মীয় সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ের মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে দমন-পীড়ন ও পুরুষের সুবিধা মতো নারীকে ব্যবহারের প্রধান অস্ত্র। মূলত, ধর্মীয় সংস্কৃতি দিয়ে প্রথমত নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজে অনেকক্ষেত্রে ব্যবধান তৈরি হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে নাটকের আরো একটি সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতরের স্ত্রী নতু প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বৃদ্ধ প্রথম বৃদ্ধকে বলে– 'কও দেখি কেমুন বিটি ছেলে।... কেমুন বদ কিসিমের বিটি ছেলে। মৌলভী কয়–জেনানা হতিছে জমিন–আবাদ নাইতো আগাছা।'[৩৯] নারীকে আবাদি জমির সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে এবং উল্লিখিত সংলাপে গর্ভধারণ না হলে এই জমি আগাছা পরিপূর্ণ পরিত্যক্ত ও অপ্রয়োজনীয় এমন ধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এরূপ সংস্কারের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, নারীর প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট ও জীবনের ব্যাখ্যা সামাজিক সংস্কার দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ, যার একচ্ছত্র অধিকার পুরুষের। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক সংস্কার কর্তৃক নারীকে ইচ্ছে মতো ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা মূলত নারীকে নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল। মৌলবাদী বিধি-ব্যবস্থার নিষ্পেষণ দ্বারা সমাজে নারীর প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পায় সেখানে একজন নারীর সামাজিক সম্মান ও আত্মমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। তাই নতুর প্রতি ধর্মীয় আগ্রাসনকে সামাজিক সংস্কারাচ্ছন্ন আচরণের সাথে একীভূত

হতে দেখা যায় এ নাটকে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত নতুর অসংলগ্ন আচরণকে জ্বিনের আছর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। গ্রামের মৌলভি এসে মানসিকভাবে অসুস্থ নতুকে শারীরকিভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করে:

> বিদেশি জেনানা। জাত কূল নাই। উ আসছে আর কাঁধে নিয়া আইছে এক খবিশ।– কিন্তুক জাইনো– ই বেত–
> *সে বেত উঁচু করে বাতাস কাটে।*– আমার পীরের বেত।[৪০]

এরপর নতুর উপর শুরু হয় অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতন। সমবেত সকলে মনে করে নতুর গায়ে ভর করা জ্বিন তার স্বামী বৃদ্ধ আতরের অসুখের কারণ। ফলে নতুর উপর শারীরিক নির্যাতন সকলে উপভোগ করে। সামাজিক সংস্কার অথবা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মৌলভি কিংবা কবিরাজী চিকিৎসার মাধ্যমে নারীর উপর সহিংস আচরণ এখনো অনেক গ্রাম গঞ্জে দেখা যায়। সামাজিক সংস্কার আর ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে নারীর প্রতি এমন নির্মম সহিংস আচরণ *আতর আলীদের নীলাভ পাট* নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

যৈবতী কন্যার মন দুইখণ্ডে সমাপ্য নারীর বিয়োগান্ত জীবনের আখ্যান। এ নাটকে দুইজন্মে এক নারী জীবনের অতৃপ্ততায়, প্রবঞ্চনায় দুবারই স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথম খণ্ডের নারী চরচন্দ্রানীর শ্রীকর গায়েনের কন্যা কালিন্দী। কালো মেয়ে বলে যার বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিলো – সেই কালো মেয়ের সাথে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আলাল গায়েনের প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হলে সংকট ঘনীভূত হয়। কারণ আলালের সঙ্গে প্রেম বা সংসার সবই সমাজ বিরুদ্ধ – ধর্ম বিরুদ্ধ। মূলত, বাঙালি সমাজ ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরিব ইত্যাদি ভেদে বহু ভাগে বিভক্ত। একারণে অসমবর্ণ বিবাহ অথবা এক ধর্মের পাত্রের সঙ্গে অন্য ধর্মের পাত্রীর বিবাহে বাঙালি সমাজে প্রবল বাধা রয়েছে।[৪১] অথচ কালিন্দী আলালের সাথে সংসার স্থাপন করে সাহসের সাথে প্রত্যাখান করেছে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। অষ্টাদশ শতকের এই নারীর মধ্যে সেক্যুলার চেতনার বীজ লক্ষ করা যায়। কারণ তার কাছে ধর্মের অনুশাসনের চেয়ে মানুষ ও মানুষের সংস্কৃতি বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু আলাল গায়েনের সাথে ঘর পালানো সেই সাহসী কালিন্দী পরাজিত হয় ধর্মেরই আগ্রাসনে। মানুষ বন্দনার গীতস্রষ্টা আলাল গায়েন গাজী পীরের মুরিদ হয়ে গীতিকা ছেড়ে দিলে প্রথম জন্মে কালিন্দী পরাজয়ের গ্লানিতে নত হয়। কালিন্দী জীবনের কাছে পরাজিত কিন্তু সে একজন সাহসী নারী। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মানববাদীতার সত্যে গীতিকার ধারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে। সাহসী বলেই শিল্প ও প্রেমের টানে কালিন্দী ঘর ছাড়ে – জাত ধর্ম বিসর্জন দেয় – ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে স্বাধীন শিল্পসত্তা নিয়ে দাঁড়ায়। এ নাটকের নারীর সামাজিক জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে ধর্ম ও সামাজিক মতাদর্শের সাথে শিল্প ও শিল্পীর দ্বন্দ্ব – সাম্প্রদায়িক সহিংস আরচণের চিত্র।

বনপাংশুল নাটকে সুকির অকাল বৈধব্যের পর মান্দাই সমাজের ধর্মীয় সংস্কারের নামে শিবের কুচুনীরূপে তাকে উৎসর্গিত করা হয়। কিন্তু যৌবন বৈধব্য মানে না – অলৌকিক অদৃশ্য দেবতার ভোগে তৃপ্ত হয় না মানুষের শরীর। ফলে যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের কাছে অলৌকিকতা নির্ভর ধর্মের পরাজয় ঘটে যখন সুকি অনিলকে ভালোবাসে এবং তার শারীরিক সংস্পর্শ পেতে চায়। কিন্তু সামাজিক সংস্কারবশত অনিল দ্বিধা বিভক্ত মানুষ। সেও সুকির প্রেমে পড়ে বটে কিন্তু শিবের কুচুনীকে পেতে চাওয়ার অর্থ শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা – এই বিশ্বাস তাকে বিচলিত করে। এভাবে নারী সুকির যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম ও স্বপ্ন নস্যাত হয় মান্দাই সমাজের রীতি-নীতির অনুশাসনে। এসব সত্ত্বেও সুকি অনিলের সম্পর্ক কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলে সতী-অসতীর প্রশ্ন ওঠে তার প্রতি। নাটকে দেখা যায়, সুকি সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মানসে স্বেচ্ছায় লাল পিঁপড়ার কামড়ে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। মানুষের সহজাত আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পরিমাপ যখন সামাজিক সৃষ্ট প্রথা ও সতী-অসতী ব্যাখায় মাপা হয়, তখন নারীর সহজাত স্বাভাবিক জীবন ও মর্যাদা

নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন হয়। তাই সামাজিক রীতি-নীতির কাছে বিধবা সুকির যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম পরাজিত হয়েছে। সেই অব্যক্ত বেদনা ধরা পড়েছে সুকির পুঞ্জীভূত ক্ষুব্ধ সংলাপে:

> নেশা ধরছে রক্তের ভিতরে অদেখা শিবের নিগা। বাইশ বছর হল নাই বিয়ার বিধবা হয়েছে সুকি। তার কি মাতাল হয়ে নিশিভর শিবের খোঁজ করন উচিত না। বুকে ধুতরা ফুল ফুইটা বইসা থাকি। আমি নষ্ট নারী। ঐ মঙ্গলির নাগাল বেশ্যা বেশ্যা। শিবের বেশ্যা।[৪২]

সুকির জীবনের এমন দ্বান্দ্বিক পরিণতির ভিতর বাঁধা পড়েছে কৃত্যনির্ভর কোচ সমাজের বিশ্বাস সংস্কার সবকিছুই – যে বিশ্বাস আর সংস্কারের সাথে একসূত্রে বাঁধা সুকির জীবন। তাই বলা যায় লিঙ্গীয় বিবেচনায় সামাজিক আচারে ঢাকা পড়েছে সুকির নারীসত্তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। সমালোচকের মতে:

> সুকির অস্তিত্বে তার পূর্বতন সমাজের সকল দ্বিধা সংকোচ সংস্কার কুসংস্কার এবং বিশ্বাস অবিশ্বাস সমপরিমাণে বিদ্যমান। সেলিম আল দীন অসংখ্য ভঙ্গুর রেখায় নানা প্রতিকূল অভিজ্ঞতার দহন দগ্ধ সুকির চরিত্র অঙ্কন করেছেন।[৪৩]

সাঁঝমালা চরিত্রটির ক্ষেত্রেও বড়ো সংঘাত তৈরি হয় সামাজিক সংস্কারের কারণে। তিরমন এবং সাঁঝমালার প্রেম প্রত্যাখাত হবার কারণ সাঁঝমালার চাচা ছলিমের ভ্রান্ত বিশ্বাস। সমাজের অন্যদের মতো সেও মনে করে তিরমনের পরিবারে স্বর্ণবোয়াল শিকারের অপঘাত রয়েছে। এই সামাজিক সংস্কার সাঁঝমালার জীবনকে পিষ্ট করেছে। কিন্তু চাচীর দুশ্চিন্তা তৈরি হয় তিরমনের সাথে সাঁঝমালার শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে। তিনি ভাবেন– 'বাসর ঘরে তিরমনই তো জানবে সাঁঝমালার কৌমার্যের সত্য। ভিন থানে ভিন মানুষ– বাসর ঘরেই ঘনাবে সন্দেহ। রক্ত ঝরে নাই তো কিসের সতী।'[৪৪] পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজবাস্তবতায় সতী-অসতীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয় কেবল একান্ত নারীর জন্যে। তিরমনকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে না কখনো। একারণে *স্বর্ণবোয়াল* নাটকে দেখা যায়, নারী-পুরুষের সামাজিক একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির দায় মোচন করতে হয়েছে সাঁঝমালাকেই। তাকে জীবন বিসর্জন দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এভাবে নারী-পুরুষের জীবনের সামগ্রিক সত্য বিপন্ন হয় সামাজিক বিশ্বাসের কাছে যা সাঁঝমালাকে করে তুলেছে ঊণ-মানুষ।

বহুকাল থেকে চলে আসা নানা সামাজিক সংস্কার একটি নারীর জীবন চিত্রকে কতো বিচিত্রভাবে চিত্রিত করে *পুত্র* নাটকের আবছা চরিত্রটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছোট বেলায় আবছার পিতা মাতার মৃত্যু, পরপর তার দুটি আশ্রিত পরিবারের বসতভিটায় নদীর ভাঙ্গন ইত্যাকার বাস্তবতাকে অপয়া নারীর লক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নারীকে এভাবে ভাগ্যের অলীক ধারণা দিয়ে পরিমাপের বিষয়টি সমাজে নতুন নয়। সামাজিক এসকল অসংখ্য সংস্কার নারীর মানবিক মর্যাদা ও ব্যক্তিসত্তার পরিপন্থি হিসেবে চিত্রিত হতে দেখা যায় সেলিম আল দীনের নাটকে।

জ. জোরপূর্বক বিবাহ ও বাল্যবিবাহ

সমকালীন সমাজেও নারীকে জোরপূর্বক বিবাহের ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। পারিবারিক নির্যাতনে এবং সমাজে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অবশেষে বাধ্য হয়ে এসব নারীকে সংসার করতে হয়। এমন সামাজিক বাস্তবতা সেলিম আল দীনের নাটকেও লক্ষ করা যায়। *হাত হদাই* নাটকের হাস্নাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় – বাড়ি থেকে পালিয়েও রক্ষা হয় না তার। একজন ব্যক্তি হাস্নার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই সমাজ-সংসারে। চুক্কুনীর মতো সেও সমাজের প্রচলিত মতাদর্শের বেড়াজাল ছিঁড়ে বের হতে পারে না। মালু হাবজ তাই হাস্না প্রসঙ্গে বলে– 'ঐ চুক্কুনী, চুক্কুনীর ভূতে ধইরছে এতিরে।'[৪৫] এ নাটকের চুক্কুনীকেও তার অমতে খেলাধনের তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় টাকার লোভে। অন্যদিকে *বনপাংশুল* নাটকে লুৎফর মাস্টারের বর্ণনা থেকে উঠে এসেছে, তার দাদী ছিলো মান্দাই নারী। পূর্বের একটা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার প্রভাবশালী বাঙালি জোতদার দাদা জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করেছিলো সেই নারীকে। এছাড়া

স্বর্ণবোয়াল নাটকের সাঁঝমালাকে পরপর দুবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কিন্তু মত না থাকায় দুবারই বিয়ের দিন সে পালিয়ে বাঁচে। বস্তুত, পরিবার ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই নারীর মতামতের খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সেলিম আল দীনের নাটকে বাল্য বিয়ের একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। *বনপাংশুল* নাটকে শিশু সুকিকে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়া হয় পণ দিয়ে। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, উনিশ শতকে অকুলীন অভিভাবক টাকার বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রি করতেন। সমাজে কুলীনদের বহুবিবাহ বেড়ে যাওয়ায় বিবাহযোগ্য কন্যার অভাব ঘটতে থাকে। সেসময়ে অনেক ক্ষেত্রে পাত্র-অপাত্র বিবেচনা না করেই অভিভাবক অর্থের লোভে কন্যাকে বাল্যবয়সেই বিয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে *আমি নারী : তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* গ্রন্থে গবেষক উল্লেখ করেছেন– ''মেয়ের বাবা মনের মতো অর্থ পেলে পাত্রের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স প্রভৃতি কিছুই বিবেচনা করতেন না।''[৪৬] সুকির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। হাজার টাকা পণের বিনিময়ে শিশুকন্যা সুকির সাথে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধের বিয়ের মতো অসামঞ্জস্য ঘটনা ঘটে। বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক এমন অসঙ্গতির চিত্রও সেলিম আল দীনের নাটকে উঠে এসেছে।

ঝ. অস্বীকৃত মাতৃত্ব ও ভ্রূণ হত্যা

সমাজের অবহেলিত প্রবঞ্চিত নারী যেমন সেলিম আল দীনের নাটকে অবলীলায় উঠে আসে – তেমনি তাদের অকাল ভ্রূণ বিনষ্টের আর্তনাদও তাঁর বিভিন্ন নাটকে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নেয়। সেলিম আল দীনের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকে অস্বীকৃত মাতৃত্ব ও ভ্রূণ-হত্যার প্রসঙ্গ লক্ষণীয়। নারীর অনিচ্ছায় গর্ভপাত ঘটানো সামাজিক অনাচারের আরেকটিরূপ। এছাড়া কখনো কখনো নারীকে স্বেচ্ছায় গর্ভপাত ঘটাতে হয় সামাজিক মূল্যবোধের কারণে। সেলিম আল দীনের নাটকে এসকল প্রসঙ্গ নারীর সমাজ বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিফলন হিসেবে উঠে এসেছে।

যৈবতী কন্যার মন নাটকে কালিন্দী এবং পরী উভয়ের গর্ভপাত ঘটানোর প্রসঙ্গ রয়েছে। পরী তার অভিনেত্রী জীবনে নানা কারণে যেমন পথভ্রষ্ট হয় তেমনি নষ্ট করতে হয় তার অস্বীকৃত ভ্রূণ। কিন্তু পরী সামাজিক চাপে গর্ভপাত ঘটায়নি – তার নিঃসঙ্গ জীবনের মানসিক চাপ এর অন্যতম কারণ। সহায় সম্বলহীন জীবনের এই দুর্বহ বেদনা লক্ষ করা যায় পরীর আত্মকথনে:

> আসরের ফাঁকে ফাঁকে, কোন কোন দিন নির্জন দুপুরে, সন্ধ্যায় কি চাঁদের রাতে নৌকায় ভাসা, হুলা বিড়াল, বাবার মুখ, সকিনা, অসহায় অঞ্জলিদি, করুণ মীনাকুমারী, আমার উদর থেকে খসে যাওয়া নষ্ট ভ্রূণ, বুকের পাঁজর ছিঁড়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। সে শ্বাসে আমার প্রসাধনের আয়না ঘোলাটে হয়ে উঠে। কিন্তু আমি লোকলজ্জায় ভ্রূণ হত্যা করি নি। আমার মনে হয়েছিল আসরের পথে পথে একজন পরীর কোন স্বামী নাই, জনকজননী নাই, পুত্রকন্যা নাই।[৪৭]

মূলত, বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতাই পরীর শিল্প ও ব্যক্তি জীবনে তীব্র ছায়াপাত করেছে। মাজেদুল হকের শান্ত কন্যার বদলে যাবার ইতিবৃত্তে যোগ হয়েছে যাত্রাভিনেত্রীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ।

স্বর্ণবোয়াল নাটকের তিসির ভ্রূণ বিনষ্ট করতে হয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। *কেরামতমঙ্গল* নাটকে পাকিস্তানী মিলিটারী ক্যাম্পে নির্যাতিতা নূরজাহানের ভ্রূণ নষ্ট হয় গর্ভাবস্থায় ধর্ষণের ফলে। এছাড়া এ নাটকের অন্যদুটি নারী চরিত্র শমলা ও নওশাদীকে জোর করে ভ্রূণ হত্যা করানো হয় প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের কারণে। অস্বীকৃত সম্পর্কের ফলে গর্ভধারণের একক দায় নিতে হয় মানসিক ভারসম্যহীন শমলাকে। মৃত্যুর ঝুঁকি সত্ত্বেও শমলার গর্ভপাত ঘটানোর মতো নির্মম সিদ্ধান্ত নেয় তার পিতা। ফলে 'ইজ্জতের চায়া জনম বড়'[৪৮]– কেরামতের এই গভীর উপলব্ধি সমাজের রীতি-নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আবদ্ধ শমলার পিতা বা সমাজ কোথাও কোনো মূল্য বহন করে না। অন্যদিকে নওশাদী বাধ্য হয়ে তালুকদার

বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজে নিযুক্ত হলে সেখানে সমাজ সংসারের আরেক অসভ্যরূপ পরিলক্ষিত হয়। তালুকদারের ভোগ-লালসার কাছে নওশাদী হয়ে ওঠে যৌনসামগ্রী। নওশাদীর দারিদ্র ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী তালুকদার শারীরিকভাবে নওশাদীকে ব্যবহার করে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তালুকদার কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে পড়লে সামাজিকভাবে তিরস্কৃত হয় একমাত্র নওশাদী। এতোদিন বাঁজা মেয়ে বলে যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার সকল দায়ও সে একাই বহন করেছে। সমাজ কেবল নওশাদীকে পরিত্যাগ করে না – নিষ্পাপ ভ্রূণকেও পরিত্যাগ করে। সামাজিক মূল্যবোধ আর প্রভাবশালী সমাজপতিদের কারণে অকাল গর্ভপাত ঘটানোর কঠিন পরিণতির স্বাক্ষর হতে হয় নওশাদীকে। রাতের অনুজ্জ্বল আলোয় হলুদ রক্তাক্ত শাড়ি পরিহিত যন্ত্রণায় বিকৃত নওশাদী বিলাপ করে :

> ...না না মাগো– মরণ অয় না ক্যা। মরণ অয় না ক্যা। আমি ক্যা ওষুধ খাইলাম। আমি তো খাবার চাই নাই। আমারে জোর কইরা পেট খমানের ওষুধ খাওয়াইছে। না– ওহ না ওহ না ওহ। আমার আতুর ঘর কোই তুষের মালসা কোই– সুর ভরা আযান ক্যা উডে না– ওইয্যা চন্দ্রকোনার হগল আতুর ঘরে দাইবুড়ি আহে নাচে গান গায় পোলা হইলে আযান দেয়।[৪৯]

এই সংলাপে তীব্র অভিমান ও ক্ষোভের পাশাপাশি নওশাদীর অতৃপ্ত নারীসত্তা জেগে উঠেছে। কিন্তু সমাজে অস্বীকৃত মাতৃত্বের লজ্জার পরিণাম অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত যৌথকর্ম হলেও এ কর্মফলের দায়ভার প্রথমত ও প্রধানত নিতে হয় নারীকে। নওশাদীকে তাই সেই দায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াতে হয়েছে। এভাবে সমাজে নওশাদী, শমলার মতো নারী যেমন তাদের সুদৃঢ় ভূমিকা তৈরি করতে পারে না – তেমনি বিপরীত লিঙ্গের তুলনায় নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ক্ষেত্রে আরো বেশি পার্থক্য সূচিত হতে দেখা যায়।

ঞ. সম্পদ-সম্পত্তি দখল

সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক সংঘাত অহরহ ঘটতে দেখা যায়। সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় আইনগতভাবে নারীর অংশ খুবই সামান্য কিংবা কোথাও কোথাও সে সুযোগও নেই। তবুও উত্তরাধিকার বা অন্য যেকোনো সূত্রে নারী যে সামান্য সম্পত্তি ভোগ করবার সুযোগ পায় সেটিও ক্ষমতার জোর খাটিয়ে হস্তগত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। একারণে বিধবা নারীদের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে হিন্দু বিধবা নারী উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামীর সম্পত্তি থেকে কিছু পাওয়ার অধিকার লাভ করেন না। ফলে স্বামীর মৃত্যু পরপর অনেক হিন্দু বিধবাদের ক্ষেত্রে স্বামীর ভিটা থেকে উচ্ছেদ করার জন্যেও নানা প্রক্রিয়া চলে। সেলিম আল দীনের অনেক নাটকে এমন সামাজিক বাস্তবতার ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। *হাত হদাই* নাটকের সুনীলের বিধবা স্ত্রী সীতার স্বামীর সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্য তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে স্থানীয় প্রভাবশালী নিতাই সর্দার। প্রাণ ভয়ে সীতা পালিয়ে গেলে সীতার স্বামীর ভিটেমাটি দখল করে নিতাই। অন্যদিকে *বনপাংশুল* নাটকে মালতির পিতা জীবিতাবস্থায় তার সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করেছিলো এমন তথ্য প্রতিষ্ঠা করে মান্দাই কন্যা মালতি ও তার বিধবা মায়ের বসত-ভিটা থেকে বিতাড়িত করে বাঙালি এক মহাজন। জোর করে অসহায় নারীর সম্পদ-সম্পত্তি দখল ও দখলের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে নিপীড়নমূলক সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে সেলিম আল দীনের নাটকে।

ট. একপাক্ষিক গ্রামীণ-বিচার

সামাজিক বা পারিবারিক কোনো সমস্যা সমাধানে গ্রাম্য-সালিশের রেওয়াজ এই জনপদে বহুকাল থেকে চলে আসছে। সবক্ষেত্রে আইনগত ভিত্তি না থাকলেও এখনো কোথাও কোথাও কোনো স্থানীয় ও পারিবারিক সমস্যা গ্রাম, গোষ্ঠী বা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সালিশের মাধ্যমে সমাধান করে থাকেন। সাধারণত বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী নিজেদের সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে গ্রাম্য-সালিশ আয়োজন ও পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু সমাজে নারীর মতের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়ন না থাকায় এই

সামাজিক বিচারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে একপেশে ও সহিংস। বিশেষত এই ধরনের সালিশে অভিযুক্ত নারীই চরমভাবে নিগ্রহের শিকার হয় – বঞ্চিত হয় ন্যায় বিচার থেকে। অনেক ক্ষেত্রে একই অপরাধে অভিযুক্ত নারী ও পুরুষের শাস্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। সেলিম আল দীনের নাটকে দুইটি সামাজিক বিচারের কাহিনি রয়েছে। এখানেও দেখা যায় নারী চরমভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে।

ধাবমান নাটকে রূপা নামে একটি নারীর জীবনের করুণ গল্পের ভেতরে নারীর প্রতি সামাজিক বিচার ও নির্দয় সিদ্ধান্তের অমানবিক নানা দিক উঠে এসেছে। সাধুটিয়ার মেলায় কোনো এক মধ্যরাতে বেদে সর্দারের কন্যা রূপাকে কয়েকজন বর্বর পুরুষ ঘরের বেড়া কেটে তুলে নিয়ে নদী তীরে রাতভর ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়। রাতে মেলা ভাঙার আগেই বিষয়টি নিয়ে গোপনে বেদের দল বিচার শুরু করে। সর্দার হিসাবে বিচারের ভার বর্তায় পিতার উপর। সালিশে নির্যাতিত এই নারীর করুণ পরিস্থিতি ধর্ষণের চেয়েও পাশবিক। বিচারে ধর্ষিতা রূপাকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। শাস্তি হিসেবে নিষ্ঠুর পিতা কন্যাকে হত্যার সিদ্ধান্ত জানায়। কারণ–

> অর গর্ভে ছাওয়াল হলে তবে কে নেবে অরে। শাস্তি হবো অরই। রূপার। অর শাস্তি মরণ। হ হ– মরণ। খুন কর। ... তার শরীর ঘিরা জন্মের পাপ। সুন্দরী হওনের পাপ। হারামির বাচ্চাগো দৃষ্টির পাপ। ব্যাভিচারের পাপ। আমি অরে না– অর শরীরটারে দণ্ড দিবার চাই।[৫০]

পাশবিকভাবে হত্যা করা হয় রূপাকে। প্রহসনের এক বিচার পরিচালিত হয় এভাবে অন্ধ ও খোঁড়া যুক্তির আলোকে। বিনা দোষে সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধের কারণে এভাবে একজন নারী চরম শাস্তি লাভ করে। এমন বিচার নাটকের বেদে সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের সুস্পষ্ট চিত্র উন্মোচিত করেছে। সমকালে হত্যার মতো এমন সিদ্ধান্ত না হলেও গ্রামীণ বা সাম্প্রদায়িক বিচার-সালিশে নারীর প্রতি অমানবিক সহিংস আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সম্প্রতি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হলেও ফতোয়ার নামে গ্রাম্য-সালিশে নারীকে অমানবিকভাবে নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে মুসলমান সমাজে।

কিত্তনখোলা নাটকেও একটি সামাজিক বিচারের প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। নাটকের ঘটনাবৃত্তে দেখা যায়, এক সন্ধ্যায় বেদেনি ডালিমনের নৌকায় গিয়ে মৃগরোগী সোনাই দাওয়াই হিসেবে ভল্লুকের নখ আনতে যায়। এ সুযোগে বেদে কবিরল তার প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে ডালিমনের নামে অপবাদ রটায়। বেদে সমাজের রীতি অনুযায়ী সন্ধ্যায় বা রাতে ভিন্ন পুরুষের সাথে কোনো লাউয়া নারীর মেলামেশার শাস্তি পঞ্চাশ ঘা বেতের আঘাত। ডালিমনের জন্যেও এই শাস্তি নির্ধারিত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সোনাইয়ের সাক্ষীতে ডালিমন শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেও লক্ষণীয় যে, লাউয়া নারী কার সঙ্গে কোথায় কথা বলবে কি বলবে না সেটাও তার সমাজ নির্ধারিত। ফলে ডালিমনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীনতা চাপা পড়েছে বেদে সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি-নীতির অনুশাসনে। একারণে সমালোচকের মতে, ''পুরুষশাসিত দুই ভিন্ন সমাজের অত্যাচারিতা নারীর প্রতিনিধি বনশ্রী বালা এবং ডালিমন সমান্তরাল নারী চরিত্র।''[৫১]

সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আন্তঃসম্পর্ক, ঘটমান বাস্তবতা সেলিম আল দীনের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে রক্ষণশীল সমাজে নারীর জীবন-সত্য ও সংগ্রামের বিষয়েও সেলিম আল দীন অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তা স্পষ্ট হয় তাঁর নাটকের সমাজ-বাস্তবতায় নারীর প্রতি বিভিন্ন সামাজিক সহিংস আচরণ ও সংঘাত পর্যালোচনার মাধ্যমে। সতীদাহ প্রথায় নারীর রূঢ় জীবন-বাস্তবতা, বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহের মধ্যে নারীর বিপন্ন অস্তিত্বের হাহাকার, যৌনবৃত্তি ও দাসত্বের ভেতর নারী জীবনের বঞ্চনা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা ও যৌন নির্যাতন, পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক সংস্কারে নারীসত্তাকে একপেশে অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি, মিথ্যা অপবাদ ও পক্ষপাতদুষ্ট বিচার-সালিশে নারীর মানবিক মর্যাদার ভূলুণ্ঠন, অস্বীকৃত মাতৃত্বের একক দায়ভারে নারীর অসহায়ত্ব ও ভ্রূণ হত্যার পাশবিক বাস্তবতা প্রভৃতি দিক সেলিম আল দীনের নাটকে নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের নির্মমরূপ নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করে। এরূপ সংকটাপন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর নাটকের নারী চরিত্রগুলোর প্রকাশ ও বিকাশের ভেতর যে জীবনসংগ্রাম ও মানবিক মূল্যবোধের ইঙ্গিত বিধৃত তাতে নাট্যকারের সমাজচেতনা ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার

সেলিম আল দীনের নাটকে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একজন নারীর স্বাভাবিক মানবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে – তেমনি নানাবিধ সামাজিক শোষণ হরণ করেছে নারীর জীবন, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা। ফলে সেলিম আল দীনের নাটকের অধিকাংশ নারী চরিত্র সামাজিকভাবে অসহায়, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। সমাজে তাদের সুদৃঢ় কোনো অবস্থান নেই। বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় ও সহিংসতার বিরুদ্ধে কোনো কোনো চরিত্রকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা যায় কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তারাও কঠোর ও কঠিন সামাজিক অনুশাসন ও ব্যবস্থার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কালিন্দী, বনশ্রী, হাস্না, চুক্কুনী, নতু, সুকি প্রমুখ নারী চরিত্রের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রতিবাদে জ্বলে উঠলেও রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার সামনে টিকতে পারেনি। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীর অধস্তন অবস্থা-অবস্থানই সেলিম আল দীনের নারী চরিত্রের অন্যতম পরিণাম।

মূলত, সেলিম আল দীনের প্রায় অধিকাংশ নাটকে নাগরিক জীবন থেকে দূরবর্তী সমাজ ও জীবন উঠে এসেছে – আর এর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে সমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান, যৌনতার প্রসঙ্গ, ঈপ্সার প্রসঙ্গ। লক্ষণীয় যে, সামাজিকভাবে সেলিম আল দীনের নাটকের অধিকাংশ নারী অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ক্ষমতায়ণ – সকল ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়া মানুষ। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহিংস। আর তাই এইসকল শ্রেণির নারীর জীবনের ভেতরে উঠে এসেছে নানা সামাজিক অনাচার, সংস্কার ও নির্মম বাস্তবতা। একজন পরী, কালিন্দী, শকুন্তলা, বনশ্রী, ডালিমন, কৈতরী, চুক্কুনী, সাঁঝমালা, আবছা কিংবা সুকির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত সমাজবাস্তবতা নারীর অধিকারবঞ্চিত মর্যাদাহীন অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করে। পরিবারিকভাবে যেমন সামাজিকভাবেও তেমনি নারীর অধস্তন অবস্থা ও সামাজিক সহিংস আচরণ তাদের জীবনাচরণের উপর তীব্র প্রভাব ফেলেছে। ফলে সেলিম আল দীনের অধিকাংশ নারী চরিত্র সমাজ-সংসার কিংবা জাত-ধর্ম থেকে ক্রমশ বিযুক্ত হয়েছে। নাটকে লক্ষণীয় অধিকাংশ নারী চরিত্র সমাজ-সংসারচ্যুত নতুবা আত্মহত্যা ও মৃত্যুর মতো নির্মম পরিণতিতে উপনীত। সেলিম আল দীনের নাটকের নারী চরিত্র এভাবে হয়ে উঠেছে এই জনপদের পরিচিত নারীর প্রতিনিধি। আর এই চেনা নারীদের গল্পের ভেতর ধরা পড়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর নির্মম সমাজবাস্তবতা।

তথ্যনির্দেশ

১ Kamla Bhasin, *Understanding Gender* (New Delhi, India: Women Unlimited, 2003), 33.

২ হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১২), ৩৩।

৩ সিমোন দ্য বোভোয়ার, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, সম্পা. হুমায়ুন আজাদ (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১২), ৮৫।

৪ অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়, ''সেলিম আল দীনের নাটক : সংস্কৃতি বনাম আধুনিক জাতি রাষ্ট্র'', *সাত সওদা*, সম্পা. মফিদুল হক ও অরুণ সেন (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), ২০।

৫ মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), ৩।

৬ সেলিম আল দীন, *যৈবতী কন্যার মন* (ঢাকা: গ্রন্থিক, ১৯৯২), ১৮।

৭ বেগম ও হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ৪।

৮ বিনয়ভূষণ রায়, *বাংলায় সতীদাহ: সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন* (কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৯৮৬), ৪।

[৯] মোজাম্মেল হক, ''নারীর প্রতি সহিংসতার স্বরূপ'', *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, সম্পা. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫), ১৬১।

[১০] সেলিম আল দীন, *হাত হদাই* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), ৫৬।

[১১] বেগম ও হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ৭।

[১২] তদেব, ৫৬।

[১৩] হক, ''নারীর প্রতি সহিংসতার স্বরূপ'', *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ১৬৪।

[১৪] আহমাদুল বারী, ''হাত হদাই অস্তিত্বের সমুদ্রপুরাণ'', *বর্তমান নাটক* (ঢাকা : বর্তমান নাটক প্রকাশনা, ১৯৯৬), ২৩।

[১৫] সেলিম আল দীন, *হাত হদাই*, ২৭

[১৬] তদেব, ১২১।

[১৭] মাহমুদ শফিক, ''হাত হদাই : ঢাকা থিয়েটারের তাত্ত্বিক কাঠামোর সফল প্রয়োগ'', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৩১ আগস্ট ১৯৯০।

[১৮] সেলিম আল দীন, *বনপাংশুল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০১), ৫৫।

[১৯] সেলিম আল দীন, *হাত হদাই*, ১০২।

[২০] হক, ''নারীর প্রতি সহিংসতার স্বরূপ'', *বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ১৫৯।

[২১] সেলিম আল দীন, *স্বর্ণবোয়াল* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৭), ৯১।

[২২] তদেব, ৬৮।

[২৩] লুৎফর রহমান, ''সেলিম আল দীন, কীত্তনখোলা: ঐতিহ্য ও সৃজন'', *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক* (ঢাকা: নান্দনিক, ২০১২), ১৪৪।

[২৪] তদেব, ১৫৪।

[২৫] রহমান, ''অভিন্ন তীর্থের তীর্থঙ্কর'', *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, ১২৬।

[২৬] লুৎফর রহমান, *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন* (ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯), ১৬৮।

[২৭] সেলিম আল দীন, *বনপাংশুল*, ১৯৪।

[২৮] মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা : প্রতীতি, ২০০৮), ২১।

[২৯] সেলিম আল দীন, *ধাবমান* (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৮), ৩৭।

[৩০] সেলিম আল দীন, *নিমজ্জন* (ঢাকা : ক্রান্তিক, ২০০৪), ৩৬।

[৩১] তদেব, ১১০।

[৩২] তদেব, ১১৬।

[৩৩] বেগম ও হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ৮৬।

[৩৪] সেলিম আল দীন, *যৈবতী কন্যার মন*, ৭৪।

[৩৫] সেলিম আল দীন, *বনপাংশুল*, ১৮৬।

[৩৬] আনু মুহাম্মদ, *নারী পুরুষ ও সমাজ* (ঢাকা : সন্দেশ ২০০৫), ২০।

[৩৭] সেলিম আল দীন, *বনপাংশুল*, ২১২।

[৩৮] সেলিম আল দীন, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-১*, সম্পা. সাইমন জাকারিয়া (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), ২৮১।

[৩৯] তদেব।

[৪০] তদেব, ২৯০।

[৪১] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা : অবসর, ২০১২), ২২৪।

[৪২] সেলিম আল দীন, *বনপাংশুল*, ৪০-৪১।

[৪৩] রহমান, *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন*, ১৬৮।

[৪৪] সেলিম আল দীন, *স্বর্ণবোয়াল*, ৯৬।

[৪৫] সেলিম আল দীন, *হাত হদাই*, ১১৩।

[৪৬] বেগম ও হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ৮৫।

[৪৭] সেলিম আল দীন, *যৈবতী কন্যার মন*, ১৩৬।

[৪৮] তদেব, ৩০৪।

[৪৯] তদেব, ২৪৩।

[৫০] তদেব, ১২৩।

[৫১] রহমান, ‘‘সেলিম আল দীন, কীত্তনখোলা : ঐতিহ্য ও সৃজন’’, *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, ১৪৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

দেশাত্মবোধক বাংলা নাটকের ধারায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা: পটভূমি

মুহম্মদ আলমগীর পিএইচডি*

Abstract: In the second half of the nineteenth century, patriotic plays were widely written in the creative literature, especially in the form of Bangla drama, due to the development of homogeneity and nationalism in the middle-class society of Bengal. The British government, frightened by the response of the staged patriotic drama, is trying to block the trend of patriotic Bangla drama through British Law (AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES, 1876). This situation of the Bangla drama inevitably took place in the stage of Nawab Siraj-ud-Daula and the war of Palashi. In this article, the context and causality of the presence of Nawab Siraj-ud-Daula and the war of Palashi were discussed in terms of patriotic Bangla drama.

ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের সূচনা হওয়ার পর মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) ‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’ (১৮৬১) প্রথম স্বদেশপ্রেম অনুভব করা যায়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের বাংলায় রেনেসাঁসের ফলে জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় এবং অনিবার্যরূপে তা সৃজনশীল সাহিত্যে স্থান করে নেয়। মধুসূদন পরবর্তী বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম এমনভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তা কেবল শাসক ইংরেজদের ভীত করেই ক্ষান্ত হয় না, এক পর্যায়ে শাসক সম্প্রদায় ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন-১৮৭৬’ আরোপ করে নাট্য রচনা ও তার অভিনয়কে রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকের উক্ত পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধিৎসু মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন- বাংলা রেনেসাঁসে কীভাবে স্বদেশপ্রেম যুক্ত হলো? কোন প্রেক্ষিতে বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে? বাংলা নাটকে প্রতিফলিত স্বদেশপ্রেমের প্রকৃতি কেমন? বাংলা নাটক মঞ্চায়নের কোন পর্যায়ে ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬’ প্রবর্তিত হয়েছে? স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকের ধারায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার উপস্থিতি কখন ও কীভাবে অনিবার্য হয়ে উঠলো? সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ কেন্দ্রিক বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎই বা কী? ইত্যাদি। বাংলা নাটকের গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সার্বিক কোনো পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সংগত কারণে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং বাংলা নাটকের নিবিড় পঠন-পাঠন ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বাংলার রেনেসাঁস ও স্বদেশচেতনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালিমানসে স্বদেশচেতনার তেমন কোনো উন্মেষ লক্ষ করা যায় না। মধ্যযুগে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কোনো সুযোগ ছিল না বলেই বাঙালিমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সম্ভব ছিল না। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরের (?-১৭৬৫) সিংহাসন আরোহণের দৃশ্য দেখার জন্য সহস্র কৌতূহলী জনতা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হয়। পরবর্তীকালে পার্লামেন্ট কমিটির নিকট রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-৭৪) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নবাব হিসেবে মীর জাফরের অভিষেকের দিন সমবেত জনতা ইচ্ছা করলে কোনো অস্ত্র ব্যবহার না করেই কেবল লাঠি ও পাথরের টুকরার সাহায্যে ইংরেজদের হত্যা করে ফেলতে পারত।[১] অথচ সমবেত জনতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলেনি।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এ থেকেই সমকালীন বাঙালিমানসের স্বদেশচেতনার বিষয়টি উদঘাটিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সখারাম গণেশ দেউস্করের (১৮৬৯-১৯১২) মতো অনেক ভারতীয়ই মনে করেন মধ্যযুগে ভারত মুসলমানদের অধীনে থাকলেও ভারতীয়রা পরাধীন ছিলো না। ইংরেজ আমল হতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে।[২]

বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পর বাঙালি সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় রেনেসাঁসের বিকাশ শুরু হয়।[৩] এই রেনেসাঁসের প্রথম পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনি ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা টাউন হলে এক বক্তৃতায় আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতীয়গণ ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হতে পারবেন।[৪]

অল্প সময়ের মধ্যেই রাজা রামমোহন রায়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। বুদ্ধিজীবী মহল (খুবই সামান্য অংশ) এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বুঝতে পেরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ শুরু করে। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাংলার সাধারণ মানুষ ও কৃষকশ্রেণি বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ বিরোধিতা করে আসছিল। 'ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬০-১৮০০), 'বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের প্রজা বিদ্রোহ' (১৭৮০), 'তাঁতি ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম' (১৭৯৪), 'চোয়ার বিদ্রোহে'র (১৭৯৯) মাধ্যমে আঠারো শতকের শেষার্ধে যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে 'তিতুমীরের বিদ্রোহ' (১৮৩১), 'গঙ্গা নারায়ণ হাঙ্গামা' (১৮৩২), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮৫৫), 'সিপাহী বিদ্রোহ' (১৮৫৭) ও 'নীল বিদ্রোহে'র (১৮৬০) মাধ্যমে তা অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে, এসব বিদ্রোহে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির তেমন কোনো যোগ ছিল না। এ অবস্থায় ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা জার্নাল' ব্যাপকভাবে ইংরেজ বিদ্বেষ শুরু করলে অস্থায়ী গভর্নর মি. জন অ্যাডাম (১৭৭৯-১৮২৫) তাঁর সময়ে (জানুয়ারি-আগস্ট, ১৮২৩) বিলাতে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনাতে শৃঙ্খল পরিয়ে দেন।[৫] এ প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেন। এই আপিলে অন্যান্যের সঙ্গে স্বাক্ষর করেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪), গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (?), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৬৮), চন্দ্রকুমার ঠাকুর (?) প্রমুখ সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান। এই প্রতিবাদপত্রে প্রমাণিত হয় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বঙ্গদেশে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'মীরাৎ-উল-আখবার'[৬] পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা করে বলেন- 'যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।'[৭] বস্তুত বাংলায় তথা ভারতে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী প্লাটফর্মে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' (১৮৩৬), 'ভূমধ্যিকারী বা জমিদার সভা' (১৮৩৮), 'বেঙ্গঁল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন বা দেশ হিতৈষণী সভা' (১৮৫১)', 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা' (১৮৫১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা ছিল না। তথাপি এসব প্রতিষ্ঠান দেশের বিদ্যা-বুদ্ধি চর্চার দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে দাবি আদায়ের প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রেখেছে। উক্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য সমকালে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে উল্লাস প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।[৯]

উক্ত পটভূমিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকায় 'স্বাদেশিকতার সাংবাদিকতা' শুরু করেন এবং তাঁর পত্রিকা 'স্বদেশী শিক্ষার পাঠশালায়' পরিণত হয়।[১০] রঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) প্রমুখ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পাঠশালাতেই স্বদেশী শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্বাদেশিকতার বীজ বপন করেন।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে বাঙালির মানসিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটতে থাকে এবং বাঙালির স্বদেশ চিন্তার প্রতিফলনও বাংলা কবিতায় প্রথম লক্ষ করা যায়।[১১] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'ভারতভূমির দুর্দ্দশা', 'মাতৃভাষা', 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্য বিপ্লব' ইত্যাদি কবিতাকে বলা যায় 'বাঙ্গলাদেশে প্রথম উদ্বোধনী স্বাদেশিক সঙ্গীত।'[১২] 'স্বদেশ' কবিতায় তিনি দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা জানালেন এভাবে-

> ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
> প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
> কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
> বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥[১৩]

পরবর্তী পর্যায়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতাহীনতাকে মৃত্যু এবং একদিনের স্বাধীনতাকে স্বর্গসুখের নামান্তর মনে করেন-

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
> কে বাঁচিতে চায়।
> ...
> দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে,
> স্বর্গসুখ তায়।[১৪]

বাংলা কবিতার এই স্বদেশচিন্তায় স্বদেশের প্রতি মমতা ও পরাধীনতার জন্য আত্মগ্লানি থাকলেও জাতির অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র কোথাও দেখা যায় না এবং তা ব্যাপক জনসংযোগে সক্ষম ছিল না। কারণ কবিতার পাঠক ও বোদ্ধা ছিল সীমিত এবং সাধারণ মানুষ কবিতার রসাস্বাদন থেকে ছিল বঞ্চিত।

স্বদেশ চেতনা ও বাংলা নাটক

বাংলার স্বদেশচেতনার এই পরিস্থিতিতে স্বদেশচেতনা জনারণ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রয়োজন হয় নাটকের। দৃশ্যকাব্য হওয়ায় নাটকের রস জনসাধারণ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। নাটকের সঙ্গে মঞ্চও সরাসরি জড়িত এবং নাট্যকার নাটক রচনাকালে মঞ্চ সাফল্যের দিকে লক্ষ রাখেন। তাই নাটকের বিষয়বস্তু ও মঞ্চায়ন সম্পর্কে বলা হয়-

> যে ঘটনা ও ভাব সমকালে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। যে জীবন সমস্যা মানুষের জীবনকে বাস্তব ক্ষেত্রে আলোড়িত করে তার একটি রস রূপায়ণ মানুষ দেখতে চায়।[১৫]

তাই সমকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নাটকে উজ্জ্বল হয়ে ফুঠে উঠে। এই কারণে নাটককে 'জাতির জীবনচিন্তার ব্যারোমিটার' বলা হয়ে থাকে।[১৬]

বাংলা নাটকের উন্মেষ পর্বেই স্বদেশচেতনার প্রভাব দেখা যায় না। প্রথম দিকের বাংলা নাটকে বাঙালি সমাজের নানা কুসংস্কার ও কদাচার এবং অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এই সময়ে নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬) মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন-

> তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।[১৭]

'হিন্দু পেট্রিয়ট' এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১) কলকাতার ধনীদের বুলবুলি পাখির লড়াই, নাচের জলসা ইত্যাদির মতো 'ইতর তামাশা' ছেড়ে নাটকের প্রতি গুরুত্ব দেবার জন্য আহবান জানান এবং কলকাতাতে বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' (১৮৫৩) কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৮]

পরাধীন ভারতের এই দুঃসময়ে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান ঘটে (১৮৫৭) এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অসহযোগিতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বাংলাদেশের ভূস্বামীগণ, বাণিজ্যিক স্বার্থে বণিক শ্রেণি এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[১৯]

জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে দ্বিধা বিভক্ত বাঙালি মানসকে একসূত্রে গ্রথিত করে নীল বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত 'নীলদর্পণ নাটক' (১৮৬০)। ইতোপূর্বে লক্ষ করা যায় নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় কখনো একাত্মতাবোধ করেননি। এই প্রথম নির্যাতিত কৃষক শ্রেণির প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি প্রকাশ পায় এবং এর মূলে রয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি- 'নীলদর্পণনাটক।' এই দর্পণেই প্রথম প্রতিফলিত হল বিদেশি বণিকদের নিষ্ঠুর শোষণ ও লাম্পট্য, অনাহারে অর্ধাহারে বেঁচে থাকা খেটে খাওয়া মানুষের আহাজারি ও তাদের সম্ভ্রম হারানোর লজ্জা এবং একই সঙ্গে তোরাপের মতো যুবকের সাক্ষাৎও এখানে পাওয়া গেল যে অনায়াসে নীলকরদের বুকে পদাঘাত করতে পারে। 'নীলদর্পণের' অনুকরণে বহু দর্পণ লিখিত হয়। এ সব দর্পণের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) এবং দক্ষিণা রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (?) 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য। প্রথম নাটকে সাধারণ কৃষকের উপর জমিদারদের অত্যাচার ও ব্যভিচারের সঙ্গে বিচারের নামে প্রহসন এবং দ্বিতীয় নাটকে চা-বাগানের কুলিদের দুঃখ দুর্দশার পাশাপাশি চা-করদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (১৮৭২) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' যাত্রা শুরু করে।[২০] 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' 'নীলদর্পণে'র অভিনয় নাটকের মাধ্যমে স্বদেশ চিন্তার বিকাশে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।

উপর্যুক্ত কারণে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এবং স্বদেশী চিন্তা বিস্তারে 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। তাই এ নাটকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রথম চিত্রটি সর্বাগ্রে দীনবন্ধুর আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে 'নীলদর্পণ' নাটকেই হয়েছিল রূপায়িত। 'নীলদর্পণ' নাটকে বাঙ্গালীর স্বাধিকারবোধ প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটেছে। ...দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙ্গালীর নবজাগ্রত সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতার দৃশ্যভাষ্য।[২১]

মাইকেল মধুসুদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' দিয়ে উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা শুরু হলো। এই নাটকে বলেন্দ্র সিংহের কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'মহারাজের কিংবা স্বদেশের হিত সাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।'[২২] বস্তুত-

> ...স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমের সার্থক রূপায়ণ আমরা পাই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে বাংলার প্রথম দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয়।[২৩]

দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে ইতিহাস চেতনার প্রভাব অপরিসীম। এই প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে- মানব অস্তিত্ব মানুষের ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা ও অবসর নিয়েই ব্যাখ্যাত হয়। উক্ত কার্যাবলির প্রতিক্ষেত্রে চিন্তা ও আবেগকে পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে একেবারে গোড়া থেকেই মানব অস্তিত্ব ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে। মানবচিন্তা সবসময় সত্যকে প্রাধান্য দেয় বলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই ইতিহাসের সত্য মানব মনে সর্বদা পূর্বগামী। প্রতিটি বিপ্লবই শুরুতে একজন মানুষের একক চিন্তা প্রসূত এবং যখন একই ধারণা অন্য মানুষের চেতনাতে সংক্রমিত হয়ে মানুষকে একতাবদ্ধ করে তখন তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। প্রতিটি পরিবর্তনের ধারণা একসময় শুধুই একক মতামত, আবার উক্ত একক মতামত যখন জনগণের সম্মিলিত মতামত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা যুগ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়।[২৪] ইতিহাস চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে মানবিক অনুভূতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উদার সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, সমালোচক এখানে তার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাতির চিত্তে ইতিহাস চেতনার অভাব ঘটলে জাতির অধঃপতন শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই বাংলার ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়নের আহ্বান জানিয়ে বলেন- 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। ...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।'[২৫]

দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার সচেতন প্রয়াস নিয়েই অতঃপর নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরা ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়কে পুনর্বিন্যস্ত করে কাহিনি রচনা করেন এবং জাতীয়তাবাদ প্রচারে প্রয়াসী হন। এই প্রসঙ্গে মধুসুদন পরবর্তী বাংলা দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) বলেন-

> 'হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত- কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।[২৬]

উদ্দেশ্যমূলক বলেই তৎকালীন নাটকের মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সংগত কারণেই বলা হয়েছে দেশাত্মবোধক নাটকের উক্ত প্রবল জোয়ারে-

> ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাসন, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা রক্ষণ, এ সকল ভাব ঐতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশ সরিয়া গিয়াছে। sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূলমন্ত্র হইয়া নাট্য সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার নাট্যশালা উদর পূরণ করিয়াছে। কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।[২৭]

নাটকে প্রতিফলিত দেশাত্মবোধের প্রকৃতি

দেশাত্মবোধক নাটকের এ বাধাধরা প্যার্টানের ছায়ায় অনেকেই কোনোরূপ আন্তরিকতা ছাড়াই স্রেফ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের জন্য নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) বলেন- 'আজকাল নাটক লিখি না, কতকগুলি উত্তেজনা পূর্ণ দৃশ্য লিখিয়া দিই, নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ যাহা ইচ্ছা রাখেন, যাহা তাহাদের মনঃপুত না হয় তা ফেলিয়া দেন।'[২৮] প্রকৃতপক্ষে প্রেক্ষাগৃহের করতালি এবং ব্যবসায়িক সাফল্যকে প্রাধান্য দেবার ফলে অধিকাংশ নাটকই হয়ে উঠলো উদ্দেশ্যমূলক নাটক, ইতিহাসের বিশ্লেষণও হলো উদ্দেশ্যমূলক, আতিশয্য ঘটলো উত্তেজনা ও ভাবালুতার।[২৯]

দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটকের এই প্রচলিত ধারার শুরুতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বাদেশিকতার আদর্শ বিচিন্তাতে এক সমন্বয়ী মনোভাব গ্রহণ করলেও

তাঁর নাটকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রদর্শিত ধারা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী (?), উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮২৮-৯৫), প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৬-৮৩), উমেশচন্দ্র গুপ্ত (?) প্রমুখের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল।[৩০] নাটকে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের জন্য অবশ্য দেশের রাজনৈতিক মেরুকরণ দায়ী। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ইংরেজ শাসিত ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), 'ইন্ডিয়ান লীগ' (১৮৭৫), 'ছাত্রসভা বা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৫-৭৬), 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' (১৮৭৬), 'ভারত সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬), 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮৭৮) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায় যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে তখন মুসলমান সম্প্রদায় 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশন্যাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) প্রভৃতি দু'একটা সংগঠনের উদ্যোগে মাত্রই তাদের তৎপরতা শুরু করেছে। এ পরিস্থিতিতে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি কর্তৃক প্রচারিত জাতীয়তাবাদী চেতনা মূলত ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং এদের অঘোষিত নেতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা চেতনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় বলেন-

> বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', দেবী চৌধুরানী' প্রভৃতি উপন্যাস ও 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত হইতে প্রথম যুগের সন্ত্রাসী বিপ্লবীগণ অসাধারণ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'নব হিন্দুবাদ' অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ধ্বনি তাঁহাদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়া ছিল। এইভাবে বঙ্কিমের নিকট হইতে তাহারা লাভ করিয়াছিল উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা।[৩১]

উক্ত চিন্তা চেতনার ধারক বাহক হয়েই হিন্দু নাট্যকারগণ বাংলা নাটকে ইংরেজ বিদ্বেষের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটাতে শুরু করেন। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য বাংলা নাটকে স্বদেশচেতনার এই পর্বের নামকরণ করেছেন 'বয়ঃসন্ধি পর্ব।'[৩২]

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (?), হরলালরায় (?) প্রমুখের নাটক পর্যালোচনা করলে প্রাগুক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত মাতা' (১৮৭৩) এবং 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) নামে দুটি নাট্য মাস্ক বা নাটিকা রচনা করেন। 'ভারতে যবন' নাটিকার বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন-

> এই মাস্কখানি ইংরাজ বাহাদুরের রাজত্বের দুই, তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে প্রজাপীড়ক যবনদিগের রাজত্বকালের ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। যনবগণের উপর আর্য্য সন্তানদিগের যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ আশা করি এই মাস্ক পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।[৩৩]

বিজ্ঞাপনে সাম্প্রদায়িকতার যে ইন্ধন আছে সংলাপে তা বিস্তারিত হয়েছে-

> ম্লেচ্ছাসুর: সৈন্যগণ, আজ আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা অবিলম্বে এই মন্দির লুণ্ঠন আরম্ভ কর, কোন আশঙ্কা কোরো না, আবালবৃদ্ধবনিতা, কাহারো প্রতি দয়া প্রকাশ কোরো না, যে যাহা লুণ্ঠন কোরবে সে সমুদায়ই তার নিজের ধন হবে। এই মন্দিরই কাফেরগণের সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় স্থান, এই মন্দিরস্থ হিন্দু দেবতার মস্তকে যে অমূল্য অত্যাশ্চর্য্য হীরক আছে, আমার নিকট প্রেরণ কোরো, অবশিষ্ট সমুদায় তোমাদের।
>
> যবনগণ : আল্লা, আল্লা হো (লুণ্ঠন আরম্ভ)
> এবং অন্যদিকে: "হর হর বোম হর হর হর
> যবন বিনাশে হও অগ্রসর।"[৩৪]

নাট্যকারের এই উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সংগতকারণেই পরবর্তীকালে নিন্দিত হয়েছে-

> 'ভারতে যবন' নাট্য মাস্কে স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্থির লক্ষবাণী উচ্চারিত হলেও উগ্র জাতীয়তার বিষবাষ্প নাট্যকারের স্বদেশ চিন্তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছে। জাতীয় ঐক্যের ভেঁরী তিনি সুউচ্চে নিনাদিত করলেও সাম্প্রদায়িকতার মোহঘরে সম্মোহিত হয়েছেন এবং এরই ফলে 'ভারতে যবনে' ধর্মবৈষম্যজনিত বৈরিতার কথাই প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধ দূর করে যে জাতীয় মিলন স্বদেশপ্রেমকে নিটোল করে তোলে, নাট্যকার কিরণচন্দ্র তার কোন পরিচয় এই নাট্য মাস্কে রাখেননি। তিনি যেন আধুনিক যুগের রাষ্ট্রচিন্তাতে মধ্যযুগীয় সংস্কারাবদ্ধ কলুষ পল্বলবারি নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন।[৩৫]

হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৮৭৩) ও 'বঙ্গের সুখাবসান নাটক' (১৮৭৪) নাটকেও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।[৩৬] 'হেমলতা' নাটকের সংলাপে উক্ত বোধই ক্রিয়াশীল-

> ...সৈনিকগণ, দেবগণ তোমাদিগকে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করতে বলছেন। স্বাধীনতা তোমাদের বল, স্বদেশানুরাগ তোমাদের বল, হিন্দুধর্ম্ম আমাদের বল, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের বল। নিশ্চয় আমাদেরই জয় হবে। ভয় কি? ভয় কি? চল যুদ্ধে, জয় কিম্বা পতন। ...পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়। হর হর মহাদেব।[৩৭]

দেশাত্মবোধক নাটক ও অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী নাটক' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক' (১৮৭৫) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নীলদর্পণে'র পর উক্ত নাটক দুটিতে সরাসরি ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারিত হয় এবং মানুষের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী চেতনা নবরূপ লাভ করে। সংগত কারণে 'শরৎ সরোজিনী নাটক' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক' নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "'নীলদর্পণ' যে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করিয়াছিল, উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' তাহাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত করিয়া তোলে।"[৩৮] এইভাবে বাংলা নাটকে স্বদেশচেতনা ক্রমাগত বিকশিত হয় এবং শাসক সম্প্রদায়কে ভীত করে তোলে।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' (পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত পর্যটনে আসলে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বিশেষ করে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮২১-৯২) নামক জনৈক বাঙালি হিন্দু প্রথামত পুরনারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রিন্সকে বরণ করলে হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উক্ত অভ্যর্থনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বলা হয়েছে হিন্দু জাতির পরম শত্রু, হিন্দু সমাজের কলঙ্ক; এমন কথাও বলা হয় যে, যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের সমাজচ্যুত করা যাবে এবং বিশেষভাবে বলা হয় যে সকল মহিলা প্রিন্সকে অভ্যর্থনা করেছিলেন যদি তাদের স্বামীগণ তাদের না নেয় তবে তা দোষের হবে না। ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এ প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যুবরাজের সম্মান রক্ষার্থে বাবু (জগদানন্দ) যে মূল্য দিয়েছে তাতে জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[৩৯]

জগদানন্দের অর্ভ্যথনাকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাঁর 'বাজিমাৎ' কবিতায় ব্যঙ্গ করেন।[৪০] পরবর্তী পর্যায়ে জগদানন্দকে ব্যঙ্গ করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসন রচিত হয় এবং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' তা অভিনীত হয়। 'গজদানন্দ ও যুবরাজের' লেখক নিয়ে মতভেদ আছে এবং প্রহসনটির কোনো মুদ্রিত পাঠ পাওয়া যায় না। তবে এর গান লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তা পরিচালনা করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। উক্ত প্রহসনে জগদানন্দকে হনুমান রূপে চিত্রিত করা হয়। ফলে শাসক সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বড়লাট (১৮৭২-৭৬) নর্থব্রুক (১৮২৬-১৯০৪) অর্ডিন্যান্স জারি করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' এর অভিনয় বন্ধ করেন এবং অশ্লীলতার অভিযোগে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র অভিনয় বন্ধ করে ব্যবস্থাপক অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) ও পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাসকে বন্দি করেন।[৪১] দেশের মানুষের আহবানে সাড়া না দিয়ে বিচারক মি. ডিকেন্স অশ্লীতার অভিযোগে 'সুরেন্দ্র

বিনোদিনীকে' বাজেয়াপ্ত করেন এবং উপেনন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসু কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[৪২]

বাঙালিমানসে এই ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল এটা মেনে না নিয়ে হাইকোর্টে আপিল করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য ০১.০৩.১৮৭৬ তারিখে 'শরৎ-সরোজিনী' মঞ্চস্থ করে। অধিকন্তু অতিরিক্ত সহযোগিতার জন্য ১১.০৩.১৮৭৬ তারিখে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হয়- পৃষ্ঠপোষক ও জনগণ এখনই আমাদেরকে সহযোগিতা করার শ্রেষ্ঠ সময়।[৪৩] এ পর্যায়ে আসামিদের পক্ষে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬) হাইকোর্টে মামলা পরিচালনা করেন। বিচারে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'তে অশ্লীলতা খুঁজে না পেয়ে ২০.০৩.১৮৭৬ তারিখে ফিয়ার (?) ও মার্কনী (?) বিচারপতিদ্বয় পূর্বের দণ্ডাজ্ঞা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করেন।[৪৪] ফলে অমৃতলাল বসু ও উপেন্দ্রনাথ দাস কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পান।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র মামলাটি হাইকোর্টে চলমান অবস্থায় তৎকালীন আইন সচিব হব হাউস ১৫.০৩.১৮৭৬ তারিখে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' উত্থাপন করেন এবং ২০.০৩.১৮৭৬ তারিখে তা লেজিস লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করা হলে কমিটি বিলটিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানায়। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বড়লাট লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) বিলটিতে স্বাক্ষর করে ১৬.১২.১৮৭৬ তারিখের এক আদেশে এটিকে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'-এ পরিণত করেন।[৪৫]

দেশাত্মবোধক নাটক ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

উক্ত পটভূমিতে বাংলা নাটকের ধারায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যের নাট্যরূপ মঞ্চায়িত হয় এবং রচিত হয় নাটক। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য রচনা করেন এবং তা কয়েকবার অভিনীত হয়। যতদূর যানা যায় 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের নাট্যরূপ দান করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'পলাশীর যুদ্ধে' অতি ক্ষীণভাবে হলেও দেশের বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে- 'নিবিল তখন ভারতের শেষ আশা।' পর বছর লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নবাব সেরাজুদ্দৌলা' (১৮৭৬) প্রকাশিত হয় যা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কেন্দ্রিক প্রথম বাংলা নাটক। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নবাব সেরাজুদ্দৌলা' রাজরোষে পতিত না হওয়ায় এটা নিশ্চিত যে, তার নাটকে আর যাই থাক না কেন দেশপ্রীতি বা ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল না।

'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন-১৮৭৬' প্রমাণ করে যে, নাটক বাঙালিসমাজমানসে দেশপ্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে রাজনৈতিক তৎপরতা বেগবান করেছে। বাংলার দুই রাজনৈতিক নেতা আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) এর রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পেছনে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ভূমিকা পরবর্তীকালে স্মরণ করেছেন স্বাদেশিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিন পাল (১৮৫৮-১৯৩২)।[৪৬]

'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন-১৮৭৬' এর ফলে দেশাত্মবোধক নাটকের জোয়ারে সাময়িক বিরতি দেখা যায় এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে পুনরায় তা প্রবল রূপ ধারণ করে। অবশ্য এর মধ্যবর্তী ৩০ বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) ইত্যাদি উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় এবং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্তরায়ের' (১৮৮৩) মঞ্চায়ন স্বদেশী নাট্যাভিনয়ে নতুন মাত্রা যোগ করে।[৪৭] লক্ষণীয় যে, তৎকালীন বাঙালি নাট্যকারদের অনেকেই স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে রাজস্থানের কাহিনি তুলে ধরেছেন, মোঘলদের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বলে মনে করেছেন, কেউ কেউ মোঘলদের বিরুদ্ধে

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দাঁড় করিয়েছেন। উক্ত প্রবণতার কারণে স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গটি নানাভাবে চলে আসে যা হিন্দু মেলা যুগের নাটকের প্রেরণা জাত।[৪৮]

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গভঙ্গকে পূর্ববাংলার অধিকাংশ মানুষ স্বাগত জানায় এবং পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মানুষ এর বিরোধিতা করে। এই প্রথম মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের দলে টানতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-

> বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই। আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।[৪৯]

ভারতের রাজনীতিতে এই সময়ে নতুন মেরুকরণ শুরু হয় এবং 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬) গঠিত হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ প্রমাণিত হলে ভারতীয় মুসলমান মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হয়ে তাদের দাবি আদায়ে সচেষ্ট হয় এবং পরবর্তীকালে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করে ও ১৯৪০ সালে শের-এ- বাংলা এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে পশ্চাদপদ মুসলমানরা সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং এক পর্যায়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা শুরু করে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক আনিসুজ্জামানের (১৯৩৭-) মন্তব্য স্মরণীয়-

> হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা এবং পরাধীনতার জন্যে গ্লানিবোধ অনেক লেখকের রচনায় খুব স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এই পশ্চাশ বছরের (১৮৭০-১৯১৮) মুসলিম সৃষ্ট রচনাবলী সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে, এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। তার একটা কারণ এই যে, যে সময়ে বাঙালী মুসলমান লেখকেরা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, সেটা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের যুগ। হিন্দু ঐতিহ্য গর্বের একটা ফল দেখা দিয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবের উদ্বোধনে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছিল মুসলমান সমাজে। হিন্দু লেখকদের রচনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ স্মৃতির চর্চা করা হয়েছিল, মুসলমান লেখকেরাও তার জবাব দিয়েছিলেন।[৫০]

বাংলার এই সাংস্কৃতিক সংকটের সময়েও কতিপয় নাট্যকার হিন্দু মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেন এবং এ ক্ষেত্রে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কেন্দ্রিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৫) এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-১৯৬১) 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯৩৮) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদ্দৌলা উচ্চারণ করেছে '...হিন্দু মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ...' এবং '... যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হয়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার! মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত ॥[৫১] গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজ-উদ-দৌলার কাহিনি আশ্রয় করে নাটক লেখায় স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকের ধারায় কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই বিষয়ে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন- গিরিশ ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের যে প্রত্যক্ষ সংঘাত প্রতিফলিত হয়েছে তা স্পষ্টতই রাজনৈতিক। সংঘাত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইংরেজদের রাজনৈতিক শক্তির কাছেই বঙ্গদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছে। এখনো স্বাধীনতার শত্রু সেই ইংরেজ এবং বাঙালির করণীয় সম্পর্কে গিরিশ ঘোষের বক্তব্য প্রায় নির্ভীক। অন্যদিকে রূপকাশ্রয়ী স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকে যে দেশপ্রেম প্রচারিত হয়েছে তা ছিল সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ যা 'পরোক্ষত ও অংশত সাম্রাজ্যবাদের নীতির বাহক।' রূপকত্বের পূর্বোক্ত বিপদ থেকে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম বাংলা স্বদেশী নাটককে উদ্ধার করল।[৫২] নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২), কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (?) প্রমুখ ঐতিহাসিকের ইতিহাস থেকে 'রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল' সিরাজ চিত্রিত করেছেন।[৫৩] তাঁর 'রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল' সিরাজের দেশপ্রীতি ও ইংরেজ বিদ্বেষ একই সঙ্গে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে জাগ্রত করেছে এবং ইংরেজদের ভীত করে তুলেছে।[৫৪] এই

কারণে তৎকালীন সরকার ১৯১১ সালের ৮ই জানুয়ারি নাটকটির প্রচার ও অভিনয় বন্ধ করে দেন।[৫৫] উল্লেখ্য যে, প্রথম মঞ্চায়নের সময়েও নাটকটিতে রাজ পীড়নে কিছুটা রদবদল করতে হয়েছিল।[৫৬]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ভূমিকায় সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন- 'সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হোলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হোলো পতিত।' তাঁর নাটকের গোলাম হোসেনের মুখ দিয়েও উচ্চারিত হয়- '...সমগ্র জাতির ললাটে লেপে দিয়েছে কলঙ্কের মসি, পলাশী।' সিরাজের চেতনায় 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়- মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি...।' আর পরাজয়ের পর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'নিজের সব দুঃখ-দুর্দ্দশা ছাপিয়েও বাংলার কথা সিরাজের মনে হয়েছে।' তাই সম্ভব নয় জেনেও তিনি তার চারপাশের মানুষদের কাছে পলাশীর প্রান্তরে হেলায় হারিয়ে ফেলা স্বাধীনতা পুনরায় 'বঙ্গজননীর কনক কিরীটে' পরিয়ে দেবার জন্য আকুতি জানিয়েছেন এবং মৃত্যুকালীন তাঁর শেষ সংলাপ ছিলো 'বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক।'[৫৭]

ভারতের রাজনীতিতে মেরুকরণের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। 'পাকিস্তান' আবার 'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পশ্চিম পাকিস্তান' এই দুইভাগে বিভক্ত ছিলো। এই বিভক্তিকরণের পর পাকিস্তানের পূর্বাংশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ নাট্যকারগণ সিরাজ-উদ-দৌলাকে মুসলিম সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত করেন।[৫৮] বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্যায়ে (১৯৪৭-৭১) 'পূর্ব পাকিস্তান' তথা পূর্ববঙ্গের স্বাধীকার আন্দোলনের সংকটকালে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সামগ্রিক সংকটের সময়েও সিরাজ-উদ-দৌলা কেন্দ্রিক নাটক রচিত হয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) তাঁর 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' (১৯৬৫) নাটকে সিরাজের 'আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই' উপস্থাপন করেছেন। এই উপস্থাপনায় পূর্বসূরি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন সেনগুপ্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নাটকে সিরাজ চরিত্রের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন- 'জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনে উদ্দীপনার প্রেরণা হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলা আজ সর্বজনপ্রিয় চরিত্র। এই সাফল্যের পথ প্রসারিত হয়েছে জাতীয় নাট্যোন্দোলনের মাধ্যমে।' সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজ দেশের বোঝা একাই বহনে প্রস্তুত। তিনি মনে করেন- 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না।' তাই সকলে তাকে ছেড়ে গেলেও তাকে বলতে শুনি- 'শুধু আমি রইলাম- নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে।' সিরাজ একাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন- 'ভবিষ্যতে বছরের পর বছর দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশী দস্যুর হাতে যেভাবে উৎপীড়িত হবে' তা তিনি বেঁচে থেকে সহ্য করতে পারবেন না। তাই 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে' নীতিতে বিশ্বাসী এই অকুতোভয় বীর দেশের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। এই নাটকে রবার্ট ক্লাইভের উক্তিটিও স্মরণযোগ্য '...নবাবের কোন ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাস ঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমীর ওমরাহ সবাই প্রতারক, তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।'[৫৯]

সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) 'শেষ নবাব' (১৯৮৯) নাটকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া মীর মর্দান নবাবকে জানিয়েছে- 'তরুণ নবাব, এ দেশের রাজনীতির রূপ যে কত বীভৎস তা এখনও আপনার চোখে ধরা পড়েনি।'[৬০] অন্যদিকে এদেশের মানুষ সম্পর্কে রবার্ট ক্লাইভের উপলব্ধি-

> এদেশের প্রতিবাদ কেবল তখনই শোনা যায় যখন নিজের স্বার্থে আঘাত লাগে। নিজে নিরাপদ থাকলে অন্যের কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো এদের স্বভাবে নেই। এ দেশের কি হবে, এ জাতের কি হবে তা নিয়ে কারো কোন চিন্তা নেই। দল পাকাতে এরা ওস্তাদ। চক্রান্ত করতে এরা সিদ্ধহস্ত।[৬১]

সাঈদ আহমেদের সিরাজ বাংলার মানুষ সম্পর্কে উপর্যুক্ত বিষয়াদি জেনেও নিজের বিষ নিজে হজম করেছেন। বাংলার মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই তিনি বাঁচতে চেয়েছেন-

> খোদার কসম যদি আর জন্মে আবার পলাশীতে আসার সুযোগ হয় তাহলে আবার আমি মীর জাফরকে বিশ্বাস করবো। সাঁফে জবাব দাও এ দেশের শাসনকর্তা এ দেশের সিপাহসালারকে বিশ্বাস করবে নাকি আর কাউকে করবে? বিদেশী আগন্তুককে করবে?[৬২]

নাটকে উপস্থাপিত সিরাজের চিরন্তনতা সম্পর্কে সজাগ সাঈদ আহমদ আশাবাদী যে- 'সিরাজ পলাশীতে হেরে গেছে বলে দেশ হেরে যায় নি। এ যুদ্ধ অনন্তকালের। এ দেশে অনেক সিরাজ জন্ম নেবে প্রতিশোধ নেবার জন্য।'[৬৩] সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' নাটকের সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের অন্তরালে সংগত কারণে শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) অতিকায় ছায়া লক্ষ করেছেন।[৬৪]

উপসংহার

স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার উপস্থিতি ও চরিত্রায়ণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রেনেসাঁসের পথ ধরে বাংলায় স্বদেশপ্রেম বিকশিত হলেও তা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রসূত এবং খণ্ডিত। সংগত কারণেই স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা স্থান লাভ করেছে এবং অতি উৎসাহের কারণে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই সব নাটকে যে দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে তাতে কোনো না কোনোভাবে অধিকাংশ নাট্যকার হিন্দুদের ভারতীয় মুসলমান শাসকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে ইংরেজদের জয়গান গেয়েছে। উদ্দশ্যমূলক এইসব নাটকের অন্যতম লক্ষ ছিল উপার্জন। তাই অধিকাংশ নাটকই শিল্প সাফল্য পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, শিল্প সাফল্য বাদ দিলেও জনমানসকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ সফল হয়েছেন- যার ফলশ্রুতি 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন-১৮৭৬।' গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা'য় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের ইংরেজদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যা পরবর্তী পর্যায়ের দেশপ্রেমমূলক নাটকে অব্যাহত ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চায়নের প্রথমদিকে সংশোধন করা হলেও পরে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা'য় স্বদেশপ্রেম ব্যাপকভাবেই অনুভূত হয়েছে। অবশ্য শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' তৎকালীন বাংলা সরকারের আনুকূল্য লাভ করায় মঞ্চায়নে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' থেকে সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' পর্যন্ত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কেন্দ্রিক বাংলা নাটকে সিরাজ-উদ-দৌলার চরিত্রায়ণে যে স্বদেশানুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে তা ভবিষ্যৎ বাংলার গণনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইকন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ বাংলার যে কোনো সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শক্তিমান কোনো নাট্যকার সিরাজ-উদ-দৌলা কেন্দ্রিক নাটক রচনা করতেই পারেন। সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে রবার্ট ক্লাইভের উক্তিতে বাঙালি চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে আজও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা পরিবর্তনের আশা দূরাশামাত্র। সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' নাটকের বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও আমলা সম্পর্কীত মন্তব্যও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও আমলা সম্পর্কে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১ The inhabitants who were spectators upon that occasion must have amounted to some hundred thousands; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might havedone it with sticks and stones. *Clive's evidence before Parliamentary Committe.* উদ্ধৃত: মৃণাল চক্রবর্তী, *সিরাজ-উদ-দৌলা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১), পৃ. ৩৪৮

[২] মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্রাধীন হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজ আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক* (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৭৮), পৃ. ৩৪

[৩] ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নব যুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* (প্রথম বিশ্ববাণী সংস্করণ; কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ৭১

[৪] From personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs; ... নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্র* (২য় সংস্করণ; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৪), পৃ. ২২৬।

[৫] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), (কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯), পৃ. ২০

[৬] ফারসি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক, প্রথম সংখ্যা ১১ই এপ্রিল, ১৮২২ এবং শেষ সংখ্যা ০৪ঠা এপ্রিল, ১৮২৩

[৭] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়', *সাহিত্য সাধক চরিত মালা*, ১ম খণ্ড (৫ম সংস্করণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৬), পৃ. ৫৬

[৮] As a whole, the Press in India is conducted with singular ability; and it is astonishing to mark the gaint strides with which it has advanced within last few year. Jhon Bruce Norton, *The Rebellion in India*, p. 197 উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩৪

[৯] These middle classof inhabitants of Bengal offered the most checring indication of any that exists at the present moment. Bengal Herald: June 13, 1829 উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ১৪

[১০] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৪৭

[১১] ড. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ; কলকাতা: বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২), পৃ. ১১

[১২] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৪৭

[১৩] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'স্বদেশ', *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*, মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা. (২য় সংস্করণ; ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪), পৃ. ২৪৫

[১৪] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মিনী উপাখ্যান', *রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী* (নূতন সংস্করণ; কলকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, সাল নেই), পৃ. ৮৫

[১৫] অজিতকুমার ঘোষ, *নাটকের কথা* (৫ম সংস্করণ; কলকাতা: সাহিত্য লোক, ২০০৩), পৃ. ১০১

[১৬] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ১

[১৭] রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সন্ধ্যা বকশী সম্পা. (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯১), পৃ. ৬৭৫

[১৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ৩১

[১৯] বর্তমান ও ভবিষ্যতের লাভজনক পরিস্থিতি অনুধাবন করে বাংলাদেশের ভূস্বামী, ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানীকে সহযোগিতা করেছে সচেতনভাবে। রতনলাল চক্রবর্তী, *সিপাহীযুদ্ধ ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১৬২

[২০] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*, পৃ. ৯৮

[২১] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৮-৯

[২২] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *'কৃষ্ণকুমারী নাটক', মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পা. (সংশোধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ; কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯), পৃ. ৩৩১

[২৩] মন্মথ রায়, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা* (কলিকাতা: ১৯৬৫), পৃ. ৬। উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পৃ. ৬০

[২৪] Man is explicable by nothing less than all his history. Without hurry, without rest, the human spirit goes forht from the beginning to embody every faculty, every thought, every emotion which belongs to it, in appropriate events. But the thought is always priorto the facti all the acts of history preexist in the mind as laws. ...Every revolution was first a thought in one man's mind, and when the same thought occurs to another men, it is the key to that era. Every reform was once a private opinion, and when it shall be a private opinion again it will solve the problem of the age... Essays: Ralph Waldo Emerson (First Series) উদ্ধৃত: ড. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩-৪

[২৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্কিম রচনাবলী* (সাহিত্য সমগ্র) (প্রথম তুলিকলম সংস্করণ; কলকাতা: তুলিকলম, কবিপক্ষ ১৯৩৯), পৃ. ৩৩৬-৩৭

[২৬] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি*, পৃ. ১৪১। উদ্ধৃত: অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (৮ম সংস্করণ; কলিকাতা: জেনারেল, ১৯৯৯), পৃ. ১৩৪

[২৭] প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পৃ. ৩৪-৩৫

[২৮] অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর*, পৃ. ৯৪। উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পৃ. ৩৬

[২৯] প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পৃ. ৩৬

[৩০] অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, পৃ. ১৩২

[৩১] সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: ডি.এম.বি.এ ব্রাদার্স, ১৯৭০), পৃ. ১২৬

[৩২] একদিকে ইংরেজদের অত্যাচার নগ্নরূপে প্রকাশ করা ও অপরদিকে রাজানুগত্য প্রদর্শন, এই দুই পরস্পর বিরোধী মনোভাবই হচ্ছে স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধি পর্বের বৈশিষ্ট্য। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ২৭৯

[৩৩] কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতে যবন* (বিজ্ঞাপন) উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ২৮১

[৩৪] উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ২৮৬

[৩৫] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ২৮৫-৮৬

[৩৬] তদেব, পৃ. ৩১০

[৩৭] উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩১২

[৩৮] বিপিনচন্দ্র পাল, *নবযুগের বাংলা*, পৃ. ২৫৫। উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), ৩২৬

[৩৯] That the national feeling had been outrages at the price the babu paid for his honour. হিন্দু প্রেট্রিয়ট-০৫.০১.১৮৭৬, উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩৩২

[৪০] বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে। তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে ॥ "ফিক্র" দানে, এক তাড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ। মাছ, কাতুরে ভেকো হলো- কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *গ্রন্থাবলী* (কলকাতা: ক্যানিং লাইব্রেরী, ১৮৮৪), পৃ. ৩০১

[৪১] হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় রঙ্গঁমঞ্চ, পৃ. ৮০। উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩৪২

[৪২] H.N. Dasgupta, Indian stage, Vol. II. p. 284-85 উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩৪৫

[৪৩] Patrons and and countrymen, now or never is the opportunity to help us. H.N. Das Gupta. Ibid, P. 283 উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩৪৭

[৪৪] প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, *বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* (১৮০০-১৯১৪), পৃ. ৩৪৭-৫০

[৪৫] তদেব, পৃ. ৩৫০-৫১

[৪৬] It was the Bengalee stage which found expression to the new spirit of patriolism among our rising generation of educated intellectuals... when Surendra Nath and Ananda Mohan returned from England in 1875-76, ...they contributed as much as the 'Banga darashan' and the new Bengalee stage to the birth and early development of our new mationalism. Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life Times in the days of My Youth* (1857-1884), P. 251-58

[৪৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবনী*, ১ম খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮; কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পু.মু., ২০১৩), পৃ. ১৫৭

[৪৮] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *সিরাজদ্দৌলা*, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পা. (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬; কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় মুর্দ্রণ, ১৯৯৮), পৃ. ভূমিকা পাঁচ

[৪৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "লোকসাহিত্য", 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড; (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭০), পৃ. ২৬২

[৫০] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকাঃ লেখক সংখ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪), পৃ. অবতরণিকা এগার/বারো

[৫১] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *সিরাজদ্দৌলা*, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পা., পৃ. ২৫ ও ৩৬

[৫২] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *সিরাজদ্দৌলা*, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পা., পৃ. ভূমিকা ছয়

[৫৩] তদেব, পৃ. নাট্যকারের ভূমিকা তিন

[৫৪] সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, *বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা* (কলকাতাঃ বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, ১৯৮১), পৃ. ২৩২

[৫৫] প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য* (কলকাতাঃ সাহিত্য শ্রী, ১৯৭৬), পৃ. ৩৮৯

[৫৬] অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর* উদ্ধৃতঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য*, পৃ. ৩৮৯

[৫৭] শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, *সিরাজদ্দৌলা*, পুষ্পেন্দু শেখর গিরি সম্পা., (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ. ১৩৯, ১৮৪, ২১৮, ২২৪

[৫৮] (ক) পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির (১৯৪২) মূল কথা ছিলঃ "জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে প্রতিহত করা। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কার্য্যবিবরণী, মাসিক মোহাম্মদী, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১, পৃ. ৫২৭-২৮। উদ্ধৃতঃ সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৬৭ (খ) 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২), 'তমদ্দুন মজলিশ' (১৯৪৭) ইত্যাদি সংগঠনও অনুরূপমনোভাব পোষণ করতেন। সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, পৃ. ৬৭-৬৮

[৫৯] সিকান্দার আবু জাফর, *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী ২, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৬৭, ৭৫, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৩৯৬-৯৭

[৬০] সাঈদ আহমদ, *শেষ নবাব* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৯৫

[৬১] তদেব, পৃ. ৪৩

[৬২] তদেব, পৃ. ১০১

[৬৩] তদেব, পৃ. ১০২

[৬৪] তদেব, পৃ. পূর্বলেখ

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

আধুনিক ফারসি কাব্যে প্রেম

ড. তাহমিনা বেগম*

Abstract : The modern Persian literature is the reflection of life of the contemporary Iranian people. Poetry is the most important part of Persian literature. Love is an indivisible part of poetry as well. Especially, modern Persian poets expressed their emotional feelings regarding love that is associated to all walks of life. Passionate love inspired modern Persian poets to compose some of their profound and lasting poetry whether for the Divine beloved or the earthly counterparts. This article attempts to describe the diversity in interpretation of love as found in modern Persian poetry.

সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই প্রেম অতি পরিচিত এক নাম। বলা হয়ে থাকে প্রেম চিরন্তন। প্রেম অবিনশ্বর। জগতে প্রেম বিভিন্নরূপে মানুষের জীবনে স্থান করে নিয়েছে। কখনো প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের মনে প্রেমের অনুভূতি তৈরী করে, আবার কখনো বা দেখা যায় মানুষেরই তৈরী সৃষ্টিকর্মের প্রতি মানুষের মন আসক্ত হয়। তাই প্রেমকে বিভিন্ন নামে সঙ্গায়িত করা হয়ে থাকে। একটি জাগতিক প্রেম, অপরটি ঐশ্বরিক প্রেম। প্রেমের অন্যতম একটি স্বরূপ নারী-পুরুষের মধ্যকার মিলন। এ এক অন্তর্নিহিত অনুভূতির নাম- যা যুগ যুগ ধরে কবি-সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যকর্মে তুলে এনেছেন এবং সাহিত্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন। সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে কবিতা। সাহিত্য যেমন মানব জীবনের দর্পন তেমনি কবিতা হলো এর প্রাণ। যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিক নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীর কাছে অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের ন্যায় ফারসি সাহিত্যেও অগণিত কবি-সাহিত্যিক তাদের রচনাবলিতে প্রেমের আবহ বর্ণনা করেছেন।

প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস। মানব সৃষ্টির মূলেও রয়েছে সেই প্রেম রহস্য। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকেও প্রেম সম্পর্কে নানা অভিমত রয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে প্রেম শুধু নর-নারীতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রেম সংঘটিত হয় মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যেও। যে আকর্ষণে মানবাত্মা তার উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় সেই আকর্ষণই ঐশী প্রেম। 'মানুষকে ভালো না বাসলে স্রষ্টাকেও ভালোবাসা যায় না' এ চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবীয় প্রেম বা মানবপ্রীতি। পার্থিব প্রেম ঐশী প্রেমেরই সোপান। জীবন কিংবা প্রেম কোনোটাই বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। এ প্রেমই হলো রক্ত মাংসের নর নারীর হৃদয় নিংড়ানো বিশুদ্ধ মানবিক প্রেম। প্রেমের জন্যই মানুষ তুচ্ছ করেছে মৃত্যুকে আর অতিক্রম করেছে ভয়কে। মানবজীবনে প্রেমের মাহাত্ম ও অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য।

ফারসি সাহিত্যাকাশে ক্লাসিক ও আধুনিক উভয় ধারার কবিতায় প্রেমের বৈচত্র্যময় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ক্লাসিক যেসব কবি তাদের রচনায় প্রেমের আধিক্য বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আবুল কাসেম ফেরদৌসি, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদি শিরাজি, হাফিজ শিরাজি, আব্দুর রহমান জামি, নিজামি গাঞ্জুবি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে আধুনিক ফারসি সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে এক একজন শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক চিত্তাকর্ষক রচনাবলির মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যের উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখেন। আধুনিক ধারার কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিক সনাতনী ভাবধারা থেকে ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্যতিক্রম। বিষয় ও অবয়ব উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় কবিতার নতুনত্ব লক্ষ্যণীয়।

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম, নারী, পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং প্রেম এ যুগের কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

আধুনিক কবিতার সূচনা ঘটে মূলত তাকি রাফআতের কাব্যের মাধ্যমেই। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সাংবিধানিক বিপ্লবের পটভূমিতে আধুনিক কবিতা ইরানি জনগণের মধ্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়। এরই পথ ধরে তাকি রাফআত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাব্যরচনার সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করে আজারবাইজানের স্বাধিকার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কবিতার পুরাতন রীতিনীতিকে পিছনে ফেলে নতুনদের চাহিদার আলোকে কবিতা রচনা করায় কবি রাফআতকে 'মাকতাবে রাফআত' নামে অভিহিত করা হয়। নব দিগন্তের সূচনাকারী এই কবি মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।[১] এর পরপরই ভ্রমণ-বিলাসী নারী কবি শামস কাসমায়িকে সনাতন পদ্ধতির বিপরীতে নতুনত্বের যাত্রায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এই নারী কবি বহির্বিশ্বে ইরানি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২] ফারসি কাব্যে আধুনিকতার সূচনাকারী কবিদের অপর আরেকজন প্রতিভাধর কবি হলেন জাফর খামেনি। এদের কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতায় আধুনিক ফারসি কবিতা বিকাশ লাভ করে। কবিতা গঠনের ক্ষেত্রে নিমা ইউশিজ এক নবধারা সৃষ্টি করেছেন এবং এরই পথ ধরে যারা কবিতা রচনায় কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন তাদের মধ্যে মাহদি আখাভানে সালেস, ফোরুগে ফাররোখযাদ, সোহরাব সেপেহরি, আহমদ শামলু ও মনুচেহের আতাশির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি আধুনিক ভাবধারাকে হৃদয়ে ধারণ করে যারা সনাতন পদ্ধতিকে অনুসরণের চেষ্টা চালিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মনুচেহের শিবানি, সিয়াউশ কাসরায়ি, ইয়াদুল্লাহ রুইয়ায়ি, মনুচেহের আতাশি, ইসমাঈল শাহরুদি। নুসরাত রাহমানি, ফরিদুন মাশিরি পূর্ববর্তী কবিদের গজল কাব্যরচনার বিপরীতে সামাজিক বিষয়াবলিকে ধারণ করে কাব্য রচনা করেন।[৩]

ক্লাসিক ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস সকলেরই কম-বেশি জানা। সনাতন পদ্ধতিতে যে সকল রচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা হলো অধ্যাত্মবাদ, নৈতিকতা, স্তুতিমূলক বন্দনা, প্রেম-ভালোবাসা ও বীরত্বগাথা । আধুনিক যুগের কবিরা জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরে সনাতন ধারার বিষয়াবলিকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু প্রেম তো অবিনশ্বর; যুগে যুগে প্রেমের স্বরূপ একই। আবহমানকাল থেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে নারী-পুরুষে, প্রকৃতিতে, সৃষ্টিকর্তার অপার সৌন্দর্যময় সৃষ্টিকর্মে। যা উপেক্ষা করে কিছুতেই সাহিত্যে সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। তাই আধুনিক কবিদের কবিতায় মানবপ্রেম বা মানবপ্রীতি সমভাবে দৃশ্যমান। এখানে আধুনিক কবিদের রচনায় প্রেম সম্পর্কিত অভিমত তুলে ধরার প্রয়াস হলো।

সনাতন পদ্ধতিকে ভেঙ্গে তদস্থলে নতুন রীতি তৈরী করে ফারসি কবিতার জনক হিসেবে খ্যাত নিমা ইউশিজ (১৮৯৫-১৯৫৯)। ক্লাসিক কবিদের রচনায় প্রেমমূলক মাসনাভি রচনার ক্ষেত্রে যেমন জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আধুনিক ধারার কবিরা তাদের মাসনাভি রচনার ক্ষেত্রে এ দুটো বিষয়কে সমানভাবে প্রাধান্য না দিয়ে বৈষয়িক প্রেমমূলক বিষয়কে অধিকতর গুরুত্বসহ উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক ফারসি কবিতার জনক নিমা ইউশিজ প্রেমমূলক মাসনাভি রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এ প্রেমনির্ভর কাহিনী-কাব্য রচনার সময় নিমা ছিলেন তেইশ বছরের যুবক। কবি প্রেমকে তার শ্রোতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে তার সাথে মনের অনুভূতিগুলো এভাবেই ব্যক্ত করেছেন:

گفتمش: ای نازنین یار نکو همرها! تو چه کسی! آخر بگو!

کیستی؟ چه نام داری؟ گفت : عشق چیستی که بی قراری؟ گفت: عشق [4]

[তাকে বললাম: ওহে প্রেয়সি, এ লাবণ্যময় কল্যাণেষু

সহযাত্রী! তুমি কে হও! অবশেষে বলবে কি (আমায়)!
তুমি কে? কী ই বা তোমার নাম? বলল: প্রেম
কেন তুমি এত অস্থির? বলল: প্রেম ।]

ঐতিহাসিক রেযা খান ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে ইরানের ইতিহাসে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময় আধুনিকতাপন্থী ও ঐতিহ্যপন্থীদের দ্বন্দ যখন প্রকট আকার ধারণ করে ঠিক তখনই নিমা পাঁচশ পংক্তি সম্বলিত প্রথম কাহিনী-কাব্য *ক্বেস্সেয়ে রাঙ পারিদে* (বিবর্ণ কাহিনী) প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে বিশ্বকে কবি তার চোখে যেমনটি দেখেছেন তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেন। এর প্রথম কয়েকটি পংক্তির প্রতি লক্ষ্য করলেই এ বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে:

من ندانم با که گویم شرح درد	قصه رنگ پریده، خون سرد!
هرکه با من همره و پیمانه شد	عاقبت شیدا دل و دیوانه شد
قصه ام عشاق را دلخون کند	عاقبت خواننده را مجنون کند
آتش عشق است و گیرد در کسی	کاو ز سوز عشق می سوزد بسی
قصه ای دارم من از یاران خویش	قصه ای از بخت و از دوران خویش:
یاد می آید مرا، کز کودکی	همره من بوده همواره یکی
قصه ای دارم ازین همراه خود	همره خوش ظاهر بدخواه خود [৫]

[জানি না আমি আমার মনের ব্যথা বলবো কার সাথে
বিবর্ণ কাহিনী, যে নিস্পৃহ !
যে হবে আমার সহযাত্রী এবং পরিমাপক
শেষাবধি হয় সে প্রেমাকুল-উন্মাদ
আমার কাহিনীতে প্রেমিক হৃদয় হয় মর্মাহত
শেষাবধি পাঠকদের করে উন্মাদ
প্রেমের আগুনে হয় যদি কেউ দাহ্য
প্রেমের দহনে জ্বলে সে অধিক
আমার বন্ধুদের নিয়ে আমার আছে একটা কাহিনী
কাহিনীটা আমার ভাগ্য আর যুগের:
মনে পড়ে সেই শৈশবের কথা
সর্বদাই আমার সাথে ছিল এক সহযাত্রী
আমার সেই সহযাত্রীকে নিয়ে আছে একটা কাহিনী
বাহ্যত আমার শুভ সহযাত্রী নিজে পরশ্রীকাতর ।]

প্রেম এমন একটি শব্দ যার ভিতরে রাগ-অনুরাগ, অভিমান, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া সবই একাকার হয়ে মিশে আছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয় যে তার চলার পথকে সহজ-সাবলীল করবে। এ কবিতায় নিমা ইউশিজ সামাজিক কলহ ও দ্বন্ধের চিত্র তুলে না এনে, ভালোবাসার ব্যর্থতা ও অস্থিরতার চিত্র তুলে এনেছেন। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমি কবি। বিভিন্ন কবিতায় তার স্বদেশের প্রতি মমতাবোধ লক্ষ্য করা যায়। তবুও ইরানের সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি কবিকে দুরে কোথাও চলে যেতে বাধ্য করে। পিছনের ফেলে আসা জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা কবির কাব্যিক গতিকে আরও বেগবান করে তোলে। শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি এ

অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। অপরিচিত এক নতুন সুর তার অন্তরকে অনুরণিত করে। যার ফলে কবি এক দীর্ঘ কবিতা *আফসানে* রচনা করেন। নিমার *আফসানে* সমকালীন কবিতার সূচনার প্রতীক নিমায়ী কাব্যরূপে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এ বিখ্যাত কবিতা সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। নিমা তার এই *আফসানে* রচনায় এক সুন্দর পরিণতির আশাবাদী ছিলেন। যার অনুপ্রেরণা কবিকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করে। কবি বলেন,

ای دل من، دل من دل من
بی نوا مضطرا قابل من
با همه خوبی و قدر و دعوی
از تو آخر چه شد حاصل من
جز سرشکی به رخساره غم؟
می توانستی ای دل رهیدن
گر نخوردی فریب زمانه
آنچه دیدی ز خود دیدی و بس
هردم از یک ره و یک بهانه
تا تو ای مست با من ستیزی[৬]

[হে আমার হৃদয়, আমার হৃদয়, আমার হৃদয়
নিঃস্ব-অসহায় অস্থিরতা আমার প্রাপ্য
সব শুভ, নিয়তি আর অধিকারের সাথে
অবশেষে কীইবা আমার অর্জন তোমার কাছ থেকে
অশ্রুহীন আমার বিষন্ন চেহারায়?
তুমি পারতে মুক্তি পেতে হে আমার হৃদয়
যদি সময়ের প্রবঞ্চনায় না পড়তে
যা কিছু দেখেছ আমার নিজেকেই দেখেছে এবং তা যথেষ্ঠ
প্রতিটি মুহূর্ত একই পথ একই বাহানা,
যতক্ষণ তুমি ওহে মাতাল আমার সাথে কর বিবাদ।]

আধুনিক ধারার আরেকজন কবি হলেন ইরাজ মির্জা (১৮৭৪-১৯২৫)। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। তিনি মাসনাভি রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইরাজের কবিতার ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সাধারণ মানুষের কথোপকথনের খুব কাছাকাছি। তাকে আধুনিকতা এবং নতুনত্বের সমন্বয়কও বলা যায়। এমনকি তার কাব্যে রয়েছে মৌলিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার। মানবিক ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখায় তেহরানের নারী সংগঠন তাকে উষ্ণ সংবর্ধনায় ভূষিত করে। জীবন সায়াহ্নে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা এবং নিদারুণ অর্থকষ্টে জর্জরিত হয়ে পড়েন কবি। জীবনের মূল্যবান ত্রিশটি বছর রাষ্ট্রীয় সেবায় বিলিয়ে দিয়ে কোনো প্রতিদান না পেলেও স্বাধীনতার আনন্দকে বুকে ধারণ করেন। অবশেষে সবাইকে কাঁদিয়ে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সন্ধ্যায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

'মা' শব্দটিকে কবি ইরাজ তার হৃদয় গহীনে এমনভাবে স্থান দিয়েছেন যার একদিকে প্রেমিকার ভালোবাসা অপরদিকে পুত্রের প্রতি মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, স্নেহপরায়ণ এ দুয়ের মধ্যে যেন কবি হৃদয়ে চরম ব্যথা অনুভব করেন। তাইতো কবি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

داد مشعوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ
هر کجا بیندم از دور کند چهره پر چین و جبین پر آژنگ
با نگاه غضب آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ[7]

[প্রেমিকা তার প্রেমিকের কাছে পাঠায় পয়গাম
তোমার মা আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।
যেখানেই আমাকে দেখে দুরে সরিয়ে দেয়
কুঞ্চিত চেহারা ও অসন্তুষ্ট অভিব্যক্তি।
অকল্যাণকর দৃষ্টি যেন দূষিত করে দিচ্ছে
যেন আমায় দুর্বল হৃদয়ে তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।]

বিংশ শতাব্দীতে ইরানি নারী মুক্তির পক্ষে সর্বপ্রথম যে কণ্ঠটি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তা ছিল পারভিন এতেসামির (১৯০৭-১৯৪১) কণ্ঠ। পারভিন ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ভালোবাসার পূজারী, বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীনচেতা কবি। নারী এবং নারীর অবদানবিহীন বিশ্বসভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা পুরুষ জাতিকে নারী জাতির উপর প্রাধান্য দিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরকে সম্মান, মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ কারণে নারী হলো পুরুষের শক্তি, উৎস, ইচ্ছা এবং কর্মের প্রেরণা। জগৎ সংসারের সকল মায়া, মমতা ও ভালোবাসার এক বিস্ময়কর নাম নারী। আধুনিক ফারসি কবি পারভিন এতেসামি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাই মায়ের প্রতি ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো তার *ফেরেশতায়ে উনস* বা ভালোবাসার ফেরেশতাতুল্য কবিতাটি। কবি বলেন,

در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست در آن وجود که دل مرده، مرده است روان
بهیچ مبحث و دیباچه‌ای، قضا ننوشت برای مرد کمال و برای زن نقصان[৮]

[যে ঘরে নারী নেই, সেখানে প্রেম-মায়ার চিহ্ন নেই
যে দেহে মনের মৃত্যু হয়েছে, সেতো নিসাড় নিস্প্রাণ।
কোথাও, কোনো ভূমিকায় ভাগ্যলিপি এমন কথা লিখেনি
পুরুষের জন্য পূর্ণতা আর নারীর ভাগ্যে ত্রুটি-অপূর্ণতা।]

সৃষ্টিলগ্ন থেকে সমাজের এক অন্যতম অংশের নাম পরিবার। কারণ, পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রকৃতিকে করেছে জীবন্ত আর সমাজকে দিয়েছে পূর্ণতা। আবহমানকাল হতে পুরুষ সমাজ নারী সমাজের উপর যে আধিপত্য এবং নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে আসছে আধুনিক কবি-সাহিত্যিকেরা এর প্রতিবাদ করেছেন। নারী হচ্ছে ভালোবাসার প্রতীক। সেই নারীদের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে কবি মিরজাদে এশকির *কাফনে সিয়াহ* উঁচু পর্যায়ের একটি কবিতা। এতে নারী স্বাধীনতা, নারীদের অধিকার, নারীদের দুরাবস্থার প্রকৃত চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। যারা এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন সেই কবরস্থানে কবি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কাফনের কাপড়ে আবৃত নারীত্ব নিদর্শন দেখতে পান। কবি ইরানি নারীদের সম্পর্কে বলেন,

مر مرا هیچ گنه نیست بجز آنکه زنم زین گناه است که تا زنده ام اندر کفنم

من سیه پوشم و تا این سیه از تن نکنم تو سیه بختی و بدبخت چو بخت تو منم
شاعر از زن می پرسد که کیست و پاسخ می شنود:
من به ویرانه ز ویران شدن ایرانم من ملک زاده این مملکت ویرانم
دختر خسرو شاهنشه دیرین بودم ناز پرورده در دامن شیرین بودم [৯]

[নারী হওয়া ব্যতীত আমার আর কোনো অপরাধ নেই
এই অপরাধে আমি যেন কাফনের মাঝে জীবন্ত রয়েছি।
আমি কালো পোশাক পরি, এ পোশাক পরিহার করব না
তুমি দুর্ভাগা, তুমি অভাগা, তোমার এ অবস্থা আমারই জন্য।
কবি নারীকে জিজ্ঞেস করেন, কে? তার উত্তর শুনবে:
আমি মরুভূমিতে এবং বিরান ভূমি থেকে জন্ম নেওয়া ইরানি
আমি এ বিরান দেশের বংশোদ্ভূত।
প্রাচীন সম্রাট খসরুর কন্যা ছিলাম আমি
শিরিনের কোলে আদরে যত্নে বড় হয়েছিলাম।]

নিমায়ী ধারার কবিতা রচনায় যারা নিরীক্ষা চালান তাদের মধ্যে মেহেরদাদ আভেস্তা (১৯২৯-১৯৯১) হলেন অন্যতম। তার মূল নাম মোহাম্মদ রেযা রাহমানি। এই কবি কাব্য রচনায় ক্লাসিক ফারসি কবি আব্দুর রহমান জামির অনুসারী ও অনুরাগী ছিলেন। তার রচনায় গজল, মাসনাভি, কেতআ প্রভৃতি আঙ্গিকের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। আভেস্তার সাহিত্য রচনার পাশাপাশি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাবলি রচনা ও প্রকাশ করতে দেখা যায়। তিনি আধুনিক কবি পারভিন এতেসামি এবং বাহারের কবিতার দ্বারাও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। কাসিদা রচনার ক্ষেত্রে তিনি খোরাসানি রচনাশৈলী অনুসরণ করেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে আভেস্তা ছিলেন খোরাসানি কাব্যশৈলীর অগ্রপথিক। তার একটি গজলের কয়েকটি পংক্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دید شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم
اگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ندامت کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم
مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم
چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاه چو بخت، جلوه نکردی مگر به موی سپیدم [১০]

[তুমি কথা রাখনি আমি রেখেছি, দোষ তুমি দেখনি আমি দেখেছি
ভেঙ্গেছ তুমি আমি ভাঙ্গিনি, (সম্পর্ক) ছিন্ন করেছ তুমি আমি করিনি।
যদি সৃষ্টির ভর্ৎসনা আর অনুতাপের কিছু থেকে থাকে
তবে তা তোমার কাছেই করেছি, তোমার জন্যই শুনেছি।
পৃথিবীর সব আনন্দে আমার ভাগ্যে কেবল বেদনাই আসে
কারণ জগতের সবখানেই খুঁজেছি তোমার ভালোবাসা।
যদিও আনন্দ করনি আলোকিত কিন্ত দিনকে করেছ অন্ধকার
যদিও আমার ভাগ্য, করেনি আমায় উজ্জ্বল তবে চুলকে করেছে সাদা।]

এছাড়াও মেহেরদাদ আভেস্তা ভাঙ্গা হৃদয়কে শরাবের পাত্রের সাথে তুলনা করেছেন। ভালোবাসায় কষ্টের অনুভূতি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, যেখানে আশেক তার মাশুকের ভালোবাসার বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেও অনুশোচনার হৃদয় নিয়ে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেরাচ্ছে। যেমন *অইনেহয়ে এশক* কবিতায় কবি বলেন,

اگر چه آینهٔ دل چو جام لعل، شکستم
زخون دیده به هر قطره نقش روی تو بستم
از آشیان ندامت چو مرغ آه، پریدم
بر آستان ملامت چوگرد راه، نشستم
که را شناسم اگر زین سپس ترا نشناسم؟
که را پرستم اگر بعد ازین ترا نپرستم؟[১১]

[যদিও শরাবের পাত্রের ন্যায় এ হৃদয়-দর্পণ ভেঙ্গে ফেলেছি
চোখের প্রতি ফোঁটা রক্ত দিয়ে তোমার সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছি
আহ! গভীর অনুশোচনা নিয়ে পাখির ন্যায় উড়ে বেড়াচ্ছি
হৃদয়ে ভর্ৎসনা ধারণ করে পথের পাড়ে বসে আছি
কাকে চিনব, যদি তোমাকেই চিনতে না পারি?
কার কাছে নিজেকে সমর্পণ করব? যদি তোমাকেই না করতে পারি।]

এ সময়ে যারা সুরের ঝংকারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তাদের কাব্যপ্রতিভাধর হলেন হোশাঙ্গ এবতেহাজ। যিনি জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথ চলায় প্রেমের সুরকেই সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও তিনি নিমার কাব্যশৈলীর অনুসারী ছিলেন তদুপরি বিষয়বস্তুগতভাবে তার নিজস্ব চিন্তাশৈলীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয় তার কবিতায়। যেমন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রেমের সুরঝঙ্কার তুলেছেন তার *তারানে* কবিতায়,

تا تو با منی زمانه با منست
بخت و کام جاودانه بامنست
تو بهار دلکشی و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با منست
یاد دلنشینت ای امید جان
هر کجا روم، روانه با منست
ناز نوشخند صبح اگر تراست
شور گریه شبانه با منست[১২]

[যদি তুমি আমার সাথে থাক তাহলে সৌভাগ্য আমার সাথে
কল্যাণ ও চিরন্তন সবই আমার
তুমি হৃদয়গ্রাহী বসন্ত, আমি পুষ্পকানন
উৎসাহ-উদ্দীপনা শত আনন্দ সবই আমার
হে হৃদয়ের প্রত্যাশা, তোমার স্মরণে
যেখানেই যাই, সবই আমার
তুমি থাকলে প্রভাত আনন্দময়
রাতের ক্রন্দনময় ব্যকুলতা শুধুই আমার।]

পাজমান বাখতিারি (১৯০০-১৯৭৭) এমন একজন আধুনিক কবি যিনি একাধারে তার রচনায় কাসিদা, তারকিববান্দ, চারপারে ও গজল সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি যৌবনে

প্রেমের গভীরতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন সুনিপুনভাবে। তার কাব্যে রোমান্টিকতার ছাপ পুরোপুরি বিদ্যমান। তিনি বলেন,

در کنج دلم عشق خانه ندارم کس جای در این کلبه ویرانه ندارم [13]

[হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেমের নেই কোনো জন্মভূমি
কারও এখানে নেই কোনো কুটির, নেই কোনো বিরাণভূমি।]

আমিরি ফিরুজকুহি (১৯০৯-১৯৮৪) ইরাকি ও হিন্দি রচনাশৈলীতে গজল রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই কবির মূল নাম কারিম ও পারিবারিক নাম আমিরি। তার রচিত দিওয়ান দু'খণ্ডে সমাপ্ত। এতে তিনি কাসিদা, গজল, মসনবি এবং কেতআ জাতীয় কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেন। তার কাব্যের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে হিন্দি কাব্যরীতির প্রভাব। তিনি এতে প্রেম, অনুরাগ ও অনুযোগমূলক গজল রচনার পাশাপাশি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও একাকিত্বের কষ্টের চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার কবিতার ছত্রে ছত্রে। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ব্যক্ত করেন,

غمگین نیم اگر دل من نا شکفته ماند   آن به که هیچ وانشود خون بسته ای [১৪]

[যদি আমার হৃদয় দুঃখের ভারে হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত
কেউ পাশে নেই যে যে রক্তের সম্পর্কিত।]

সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য এবং এর অভ্যন্তরীণ রহস্য হৃদয়রাজ্যকে আলোড়িত করে। কবিরা কলমের আঁচড়ে পৃথিবীর রহস্য অনুসন্ধানে ব্রতী হন। আধুনিক ফারসি সাহিত্যের এমনই এক প্রতিভদ্বীপ্ত কবি রাদি অজারাখশি। অনুভূতির বৈচিত্র্য, রহস্যের গভীরতা এতদুভয়ের সার্থক সমাহার ঘটেছে তার কাব্যে। কবি পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যে গভীরভাবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার উৎসাহ জুগিয়েছেন। এভাবেই কবি তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন,

من ندانم به نگه تو چه رازیست نهان   که مر آن راز، توان دیدن و گفتن نتوان
که شنیده است نهانی که در آید در چن   یا که دیده است پدیدی که نیاید بزبان؟
یک جهان راز، در آمیخته داری به نگاه   در دو چشم تو فروخته مگر راز جهان؟
چو بسویم نگری لرزم و با خود گویم   که جهانی است پر از راز بسویم نگران
بسکه در راز جهان خیره فرو ماندستم   شوم از دیدن همراز جهان سرگردان[১৫]

[আমি জানি না তোমার হৃদয়ে কি রহস্য লুক্কায়িত
যে রহস্য দেখা যায়, প্রকাশ করা যায় না।
কে শুনেছে যে গোপন বিষয় অবলোকন করা যায়?
অথবা কে তা দেখেছে যা বর্ণনা করা যায় না?
এক বিশ্ব গোপন রহস্য, যা দৃষ্টিতে মিশে আছে
দুটি চক্ষু তোমার বিক্রি করে দিয়েছে পৃথিবীর রহস্য?
পৃথিবীর রহস্যে যখন আমার দিকে তাকাও
নিজেকে বলি পূর্ণ যা দৃষ্টির প্রতি ধাবমান।
পৃথিবীর রহস্যের মাঝে লুকিয়ে থাকাই যথেষ্ট মনে করি
পৃথিবীর রহস্য অবলোকনে দিশেহারা হয়ে যাব।]

পুরাতন রীতিনীতি পরিহার করে সামাজিক বিষয়াবলির আলোকে কবিতা রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন আবুল কাসেম লাহুতি (১৮৮৮-১৯৫৭)। যদিও সমাজের বিভিন্ন ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সমাজের প্রকৃত চিত্রের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হতে দেখা যায় তার কাব্যে, কিন্তু তার গজলকাব্যে নিজস্ব অনুভূতির বাইরে সামাজিক সমস্যাবলীর প্রাধান্য তেমনটি পরিলক্ষিত হয় না। তিনি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন তার বক্তব্য। এ ধরণীতে আমরা খুব অল্প সময়ের অতিথি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এভাবেই লাহুতি অধ্যাত্ম প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন তার কাব্যে,

عاشق شده ام گواهم اینست   درد دل بی پناهم اینست
جز درد نروید از گل من   من باغ غمم گیاهم اینست
شد موی سرم برنگ کافور   پایان شب سیاهم اینست
با مرگ، همیشه در ستیزم   در زنده دلی گواهم اینست
بارد بره وفا اگر تیر   واپس نروم که راهم اینست[১৬]

[আমি আশেক এটাই আমার পরিচয়
আশ্রয়হীণ হৃদয়ের এটাই বেদনা।
আমার পুষ্প থেকে বেদনা ছাড়া কিছুই পাবে না
আমি দুঃখের বাগান, এটাই আমার পত্র-গুল্ম।
আমার মাথার চুল কর্পূর বর্ণের
রাতের শেষে এটাই আমার অন্ধকার।
মৃত্যুর সাথে সর্বদা আমি সংঘাতে লিপ্ত
জাগ্রত হৃদয়ে এটাই আমার পরিচয়।
তীর যদি হরিণ শাবকের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেয়
ভদ্রতার অনুসরণ এটাই আমার পথ।]

প্রতিটি জীবনের অনিবার্য পরিণতি মরণ। জীবন এক মহামূল্যবান নিয়ামত। দুনিয়ার আলোকচ্ছটায় গা ভাসিয়ে দেয়া জীবনে না আছে মাধুর্য না আছে কল্যাণ। ভারসাম্যহীন, লক্ষ্যহীন জীবন যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জীবন চলার যে পথ দেখিয়েছেন, সে পথে চলার মাঝেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ। এ রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ ব্যক্তিরা মিষ্টতার মাঝে তিক্ত আর তিক্ততার মাঝে মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে অল্পে তুষ্টির মাঝেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। বাহ্যিক চাকচিক্যময় বিষয়াবলি পরিহার করে আত্মিক অনুভূতিকে জাগ্রত করার মাধ্যমেই মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। আধুনিক ফারসি কবি রাহি মোআইয়্যেরি তার *হাদিসে জাওয়ানি* কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেম কাহিনী অবতারণায় বলেন,

اشکم، ولی بپای عزیزان چکیده ام   خارم، ولی بسایه گل آرمیده ام
چون خاک، در هوای تو از پا فتاده ام چون اشک، در قنای تو با سر دویده ام
من جلوهٔ شباب ندیدم بعمر خویش   از دیگران حدیث جوانی شنیده ام   .[১৭]

[স্বীয় অশ্রু, কিন্তু প্রিয়জনের পায় বিসর্জন দিয়েছি
আমি কাঁটা, তবু পুষ্পের ছায়ায় নিয়েছি আশ্রয়।
মৃত্তিকার ন্যায় বাতাসের মাঝে বেড়িয়েছি

অশ্রুর মতো তোমারই তরে সবকিছু নিয়ে ধাবিত হয়েছি
যৌবনের সৌন্দর্য আমি দেখিনি।
অন্যদের কাছে শুধু শুনেছি যৌবনের গল্প।]

আধুনিক কবিতা মূলত সামাজিক বিষয়াবলিকে অবলম্বন করে নতুনত্বের জন্ম দিয়েছে। সামাজিক জীবন বহুমুখী এবং বিচিত্র। আধুনিক কাব্যসাহিত্যে সমাজের বিভিন্ন চিত্র যেমন শাসকদের অত্যাচার, নারীর মর্যাদা, বঞ্চিতদের আহাজারি, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, স্বদেশপ্রেম ও মানবতার জয়গানের পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে প্রেমময় অনুভূতি। মিলন-বিরহের আবেদন ভিন্ন হলেও প্রেমের বাণী যেন আজো অম্লান। প্রেম হৃদয়গ্রাহী এক অনুভূতির নাম, যা সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ করা যায় না। প্রণয়কাহিনী যেভাবে সনাতন কবিতাকে আলোড়িত করেছে তেমনি আধুনিক যুগেও প্রেম-ভালোবাসার চিত্র দৃশ্যমান হয়েছে নব নব আঙ্গিকে, অবয়বে বিচিত্র অনুভূতিতে ফারসি কাব্যসাহিত্যে।

তথ্যনির্দেশ

[১] শামস লাঙ্গরুদি, *তারিখে তাহলিলে শেরে নোও*, ১ম খণ্ড (তেহরান: নাশরে মারকায, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

[২] *তদেব*, পৃ. ৮৭।

[৩] মোহাম্মদ হোকুকি, *আদাবিয়াতে এমরোযে ইরান* (তেহরান: নাশরে ক্বাতরে, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৪৪৯।

[৪] ড. মোহাম্মদ জাফর ইয়াহাকি, *চুন সাবুয়ে তেশনে* (তেহরান: এন্তেশারাতে জামি, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৮৮।

[৫] *তদেব*, পৃ. ৮৭।

[৬] *তদেব*, পৃ. ৯৩।

[৭] *তদেব*, পৃ. ৪৭।

[৮] পারভিন এতেসামি, *দিওয়ানে পারভিন এতেসামি* (তেহরান: নাশরে ক্বাতরে, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৭১।

[৯] বোযোর্গ আলাভি, *তারিখ ও তাহাভ্ভোল আদাবিয়াতে মোয়াসেরে ফারসি*, ড. সাঈদ ফিরোজ আবাদি (অনু.), (তেহরান: এন্তেশারাতে জামি, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১২৪।

[১০] *চুন সাবুয়ে তেশনে*, ১৮৫।

[১১] গোরুহে ফারহাঙ্গ ওয়া আদাবে পাযাঙ্গ, ড. সাইয়্যেদ নিয়ায কেরমানি *শে'রি কে যেন্দেগি আস্ত* (তেহরান: এন্তেশারাতে পাযাঙ্গ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৪৬১।

[১২] ড. ইসমাঈল হাকিমি, *আদাবিয়াতে মোআসেরে ইরান* (তেহরান: এন্তেশারাতে আসাতির, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৫৫-৬।

[১৩] *আদাবিয়াতে এমরোযে ইরান*, পৃ. ৫১৭।

[১৪] *তদেব*।

[১৫] *শে'রি কে যেন্দেগি আস্ত*, পৃ. ২৪২।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ১০৯।

[১৭] *তদেব*, পৃ. ২৬৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

ফারসি কাব্য সাহিত্যে হাফিজ শিরাজির অবদান

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম*

Abstract: Hafiz is a great Poet of Persian literature. He is an outstanding literary genus in the arena of Persian literature. He was one of the famous mystical poets of Iran. He is wellknown as a sufi and bright star of Persian mystic literature. Hafiz was born in Siraj; a holy famous city of Iran in the early decade of fourteenth century. The massacre of Iran made by the Chengis Khan and Halaku Khan hampered the remarkable advancement of Persian literary works at that time. But Persian education and literature got a revolutionary resurgence with the patronage of Taimurlong and the subsequent rulers. Poet Hafiz was one of the successful figures of that resurgence. Dewan-e-Hafiz is his master piece. Religious song, Kassida, Masnovi, Robayee etc, have been placed in this famous book. In this article, a short glimpse into the life and works of this great poet has been given.

ভূমিকা

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে কবি হাফিজ শিরাজি এক অনন্য প্রতিভা। তিনি ছিলেন ইরানের একজন বিখ্যাত মরমী কবি, অতিন্দ্রীয়বাদী, সুফি এবং প্রেম-জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইরানের প্রসিদ্ধ শহর শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। চেঙ্গিস খান ও হালাকুখানের হাতে ইরানের যে হত্যাযজ্ঞ সাধিত হয় তাতে ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে অনেকটা স্থবিরতা দেখা দেয়। তবে তৈমূর লং (শাসনকাল ১৩৬৯-১৪০৫ খ্রি.) ও তার পরবর্তী শাসকগণের শিক্ষা ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিত্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। আর এই জাগরণের প্রাণপুরুষ ছিলেন কবি হাফিজ শিরাজি। তাঁর বিখ্যাত কাব্য সংকলন 'দিওয়ানে হাফিজ'। এ কাব্যে গজল, কাসিদা, মাসনাভি, রোবাঈ সাকিনামে ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। অত্র প্রবন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ফারসি কাব্যে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হাফিজ শিরাজির সংক্ষিপ্ত জীবনী

ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি হাফিজের পুরা নাম খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিজ শিরাজি। হাফিজের আসল নাম মুহাম্মাদ। শামসুদ্দিন তাঁর উপাধি। 'হাফিজ' তাঁর উপনাম।[১] আর এ উপনামেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইরানের শিরাজ শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে শিরাজি বলা হয়।[২] তাই প্রায়শ তাঁকে একসাথে 'হাফিজ শিরাজি' বলা হয়। তবে গজল রচয়িতা হিসেবে তিনি ফারসি কাব্যজগতে 'লিসানুল গায়েব' (অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর) এবং 'তারজমানুল আসরার' (রহস্যের উন্মোচক) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।[৩]

ফারসি কাব্যের খ্যাতনামা কবি খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ হাফিজ শিরাজি ৭২৬ হিজরি মোতাবেক ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে শিরাজে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর দাদার নাম শায়খ গিয়াস উদ্দিন। পিতার নাম বাহাউদ্দিন, যিনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। হাফিজের মাতার নাম জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে তিনি 'কাযেরুন' এর অধিবাসী ছিলেন।[৫]

কবি হাফিজের পিতা বাহাউদ্দিন সুলগারি ইস্পাহানের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান এবং আর্থিক অনটনের কারণে রুটির দোকানে কাজ নেন। একই সাথে এলাকার মক্তবে ভর্তি

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যান।[৬] ধীরে ধীরে ইসলামের বিবিধজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। একই সাথে যুগের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আল্লামা যামাখশারির *তাফসিরে কাশশাফ*, বায়যাভির *মাতালেউল আনওয়ার* ও সাক্কাকির *মিফতাহুল উলুম* প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ক্রমান্বয়ে হাফিজ শরিয়ত ও সাহিত্য উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কাওয়ামুদ্দিন আবুল বাকায়ে শিরাজি যেহেতু ইলমুল কেরাআত তথা কুরআন মজিদের তেলাওয়াত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন সেই সুযোগে হাফিজ তাঁর তত্ত্বাবধানে কোরআন মজিদ মুখস্ত করেন। এ কারণেই হাফিজ শব্দটিকে কবিনাম হিসেবে গ্রহণ করেন। হাফিজ শুধু পবিত্র কুরআন মুখস্তই করেননি, বরং পবিত্র কুরআনের তেলোয়াতের ১৪টি কিরআত তথা রীতিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।[৭]

যৌবনে কবি ‘শাখে নাবাত’ নামক এক রমণীর প্রেমে পড়েছিলেন। কিছু দিন পর তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই রমণীর গর্ভে কয়েক জন সন্তানও জন্ম লাভ করে। হাফিজের গজল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সন্তানগণ শৈশবকালেই মারা যায়। একমাত্র পুত্র শাহ নোমানই জীবিত ছিলেন।[৮]

ফারসি সাহিত্যে হাফিজ শিরাজি এক অমর প্রতিভা। কবির এ কাব্য প্রতিভা ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ইরাক, আরব হিন্দুস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁকে সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিশেষ করে বাগদাদ, ভারতবর্ষ, বাংলার সুলতানগণ কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও আসতে পারেননি। তবে তাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। কিছু কিছু জীবনী লেখক উল্লেখ করেছেন যে, হাফিজ তাবরিয, আরদাবিল, বোস্তাম, খোরাসান, কারবালা, নাজাফ ও মক্কা সফর করেছেন।[৯]

হাফিজের শেষ জীবন শিরাজ নগরীতেই অতিবাহিত হয়েছে এবং এ নগরীতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ড. রেযা যাদেহ শাফাকসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে কবি হাফিজ শিরাজি ৭৯১ হিজরি মোতাবেক ১০ই ডিসেম্বর ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১০]

ফারসি কাব্য সাহিত্যে হাফিজ শিরাজি

হাফিজ বাল্যকাল থেকেই কাব্য রচনা শুরু করেন। তাঁর কাব্য প্রতিভা নিয়ে বহু গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। হাফিজের বাড়ী সংলগ্ন এক দোকানী খুব ভাল কবিতা লিখতো ও আবৃত্তি করতো। যৌবনের প্রারম্ভে হাফিজ তার কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনিও কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁর কবিতা তেমন মানসম্মত ছিল না বলে সবাই তাঁকে উপহাস করতো। অবশেষে একদিন তিনি মনোকষ্টে শিরাজ নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ‘বাবাকুহি’ নামক প্রখ্যাত দরবেশের মাযারে গিয়ে দোয়া-দরুদ পাঠ ও কান্না-কাটি করতে থাকেন। একদিন বিগলিতভাবে কান্না করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে স্বপ্নে দেখেন এক নূরানি চেহারার লোক মুখ থেকে এক লোকমা খাদ্য বের করে তাঁকে খাইয়ে দেন এবং বলেন, ‘তোমার জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে দেওয়া হলো। তোমার কাব্যগাথা পৃথিবীর সর্বত্র অমর হয়ে থাকবে।[১১] সকালে উঠে হাফিজ নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন-

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
من اگر کام روا گشتم و خوش دل چه عجب
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند
هاتف آن روز به من مژدهٔ این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند.[১২]

অর্থ: 'গত রাতের শেষ প্রহর আমাকে মনোবেদনা থেকে মুক্তি দিয়েছে
রাতের সেই অন্ধকার আমাকে অমৃত সুধা (কবি প্রতিভা) দান করেছে।
কি বরকতময় প্রভাত ছিল আর কতই না সৌভাগ্যময় রজনী
ঐ রাতই ভাগ্য রজনী যা এ রূপ মর্যাদা দান করেছে।
যদি আমার কামনা-বাসনা বৈধ এবং হৃদয় খুশিতে ভরা এতে আশ্চর্যের কি আছে?
কাঙাল ছিলাম আর এগুলো আমাকে যাকাত হিসাবে দান করেছে।
ঐ দিনের আহবানকারী আমাকে এ সম্পদের সুসংবাদ দান করেছে
জেনে রেখ, জুলুম অত্যাচার থেকে আমাকে স্থিরতা দান করেছে।'

ঘুম থেকে জেগে যখন তিনি শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে ঠাট্টা করে তাঁর কবিতা ও গজল শোনার প্রস্তাব দেয়। হাফিজ গজল পাঠ করতে থাকলে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়। এরপর থেকে তাঁর কাব্য খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[১৩]

হাফিজের কবিতাগুলো সংকলন করে একটি দিওয়ান রচনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসির লিখেছিলেন, কিন্তু এ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর কাব্য প্রতিভার একমাত্র নিদর্শন হলো দিওয়ান কাব্যগ্রন্থ।[১৪]

দিওয়ানে হাফিজ

কবি হাফিজ শিরাজির একমাত্র কাব্য গ্রন্থ দিওয়ানে হাফিজ। তাঁর কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে দিওয়ানে হাফিজ নামে প্রকাশ করা হয়। হাফিজের জীবদ্দশায় তাঁর গজলগুলো সংকলন করা হয়নি। শুধু জনপ্রিয় গজল হিসাবে লোকমুখে গীত হয়েছিল। হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু গুলান্দাম সেগুলো সংগ্রহ ও সংকলন করেন। তার সংগৃহীত গজলের সংখ্যা ছিল পাঁচ শতের একটু বেশী। তবে এই সংকলনটি দুষ্প্রাপ্য। অপর দিকে হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর জনৈক ভক্ত সাইয়্যেদ করিম আনোয়ার তাঁর সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করে 'দিওয়ানে হাফিজ' নামে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। এ কাব্য সংকলনে ৫৯৯টি কবিতা রয়েছে। এ কবিতাগুলোর অধিকাংশই আধ্যাত্মিক ভাব-ধারায় পূর্ণ। বর্তমানে সাইয়্যেদ আব্দুর রহিম খালখালির সম্পাদনায় প্রকাশিত *দিওয়ানে* ৪৯৬টি গজল, ৪২টি রোবাঈ ও একটি মাসনাভি কবিতা রয়েছে। সবচেয়ে প্রবীণ হাফিজ গবেষক হাশেম রাযি সংকলিত *দিওয়ান* গ্রন্থে ৪৯৫টি গজল, ৩টি কাসিদা, ১টি মাসনাভি, ৩৫টি কেতয়া, ৪২টি রোবাঈ এবং ১টি সাকিনামে রয়েছে। হাফিজের কবিতার ওজন 'বাহরে রমল' এর মনমুগ্ধকর ছন্দরীতি। *দিওয়ানে হাফিজের* ১৩৫টি গজলই এ ওজনে রচিত।[১৫] মোট কথা হাফিজের গজলের সংখ্যা যাই হোক না কেন- তিনি ছিলেন ইরানের শ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতা। তাকে গজল কাব্যের ওস্তাদ বলা হয়।[১৬]

গজল রচনায় হাফিজ

কবি হাফিজ শিরাজির কাব্য সাহিত্য তাঁর রচিত গজল, কাসিদা, মাসনাভি, সাকিনামে, কেতয়া এবং রোবাঈ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো গজলকাব্য (গীতি কবিতা)। বলা হয়ে থাকে হাফিজ ইরানের গজল রচয়িতা কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি তাঁর গজলে প্রেমাস্পদের রূপ ও সৌন্দর্য, তার প্রতি আদর-অনাদর, বিরহ-বিচ্ছেদ, দুঃখ-কষ্টের বিবরণ প্রদান করেছেন। কখনো ফুল ও বুলবুল, শরৎ ও বসন্তকাল, আবার কখনো তাসাউফের গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য প্রকাশসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী তুলে ধরেছেন।[১৭]

গজল শব্দের আভিধানিক অর্থ নারীদের সাথে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন এবং নারীদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের রূপগুণের বর্ণনা।[১৮] পারিভাষিক অর্থে গজল হচ্ছে কবিতার সুনির্দিষ্ট রীতি। এতে একই ছন্দের কয়েকটি পঙক্তি (সাধারণত সাতটি পঙক্তি) থাকে, পঙক্তিসমূহের সবগুলো দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনের অর্থাৎ কলির সাথে একই অন্তমিল হয়ে থাকে। গজলের শেষ লাইনকে 'মাকতা' বলা হয়। এতে কবি সাধারণত তাঁর নিজের সাহিত্য নাম উল্লেখ করে থাকেন। পরিভাষায় একে 'তাখাল্লুস' বলা হয়।[১৯]

প্রেমের আলোচনা হাফিজের গজল কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। হাফিজ শিরাজি তাঁর কাব্যে দু'ধরনের প্রেমের উল্লেখ করেছেন। তাহলো এশকে মাজাযি (عشق مجازی) বা রূপক প্রেম এবং এশকে এলাহী (عشق الهی) বা আল্লাহ প্রেম।

প্রেম যখন শুধুমাত্র বাহ্যিক বিষয়াবলী তুলে ধরে এবং প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয় না তখন তা হয় এশকে মাজাযি বা রূপক প্রেম। হাফিজের গজলে রূপক প্রেমের লক্ষ্য করা যায়। এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, কবির যে কবিতাগুলোতে মদ্যপান, প্রেমোন্মাদনা আর উচ্ছৃঙ্খলায় ভরপুর সেগুলো সবই সঠিক ও সত্য। তবে এ কবিতাগুলো মূলত কবির যৌবনকালের।[২০] যেমন তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন-

دل بدان رود گرامی چه کنم گرندهم
مادر دهر ندارد پسری بهتر ازین[২১]

'আমি ঐ সুন্দর সুদর্শন যুবকের প্রতি আসক্ত না হয়ে কি করি
জগত এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বালক আর জন্ম দেয়নি।'

কবি অপর একটি গজলে বলেছেন-

خط عذار یار که بگرفت ماه ازو
خوش خلقه ای است لیک بدر نیست راه ازو[২২]

'প্রেয়সীর মুখে নতুন গজানো লোমসমূহ যা তার চন্দ্রমুখকে চন্দ্রগ্রহণ কবলিত করেছে
যা ভাল একটি কড়া (যাকে আকড়ে ধরা যায়) আর এছাড়া অন্য কিছু করারও নেই।'

উল্লেখ্য যে, প্রেমের বিচিত্র রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি অত্যন্ত সংযত ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রেমের অবস্থাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর গজলসমূহের কোথাও অসংলগ্ন কথামালার লেশমাত্র নেই।

আর এশকে এলাহী হলো যে প্রেম আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হবার দিক নির্দেশনা প্রদান করে তখন তাকে বলা হয় আল্লাহ প্রেম। কবি এ প্রেমের আবেশেরই প্রতীকী নাম দিয়েছেন শরাব। আর যিনি কবির হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন সেই মুর্শিদ হলো তাঁর সাকি বা শরাব পরিবেশনকারী। কবি তাঁর দিওয়ানের প্রথম গজলে বলেছেন-

الا یا ایها الساقی ادر کاسًا و ناولها
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها
ببوی نافهٔ کاخر صبا زان طرّه بگشاید
زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها[২৩]

'হে সাকি শরাব পেয়ালায় ঢাল এবং সবাইকে বিলিয়ে দাও

প্রেমের পথটি প্রথমে সহজ মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন দেখছি তা মুশকিলে পরিপূর্ণ।

অবশেষে প্রভাত সমীরণে প্রিয়ার কেশ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধি ভেসে আসতেছে

তার কেশের সুগন্ধির আকর্ষণ হৃদয়কে রক্তস্নাত করে দিয়েছে।'

এশক বা প্রেমের পথ বিপজ্জনক এ কথা হাফিজ তাঁর কাব্যে বারংবার আলোচনা করেছেন। অপর একটি কবিতায় তিনি বলেছেন-

طریق عشق طریقی عجب خطرناك است

نعوذ بالله اگر ره به مقصودی نبری

به یمن همت حافظ امید هست که باز

اری اسامر لیلای لیلة القمر[২৪]

'প্রেমের পথ সে তো অদ্ভুত বিপজ্জনক পথ

আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই যদি গন্তব্যে না পৌঁছায়।

হাফিজ স্বীয় চেষ্টা ও হিম্মতের আশা করে যে ফের

চাঁদনী রাতে লায়লীর সাথে হবে নিশিযাপন।'

প্রেম মানবজীবনের একটি শাশ্বত প্রত্যয়। জীবন কিংবা প্রেম কোনটিই বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে অবয়ব, আকার, আকৃতি ও স্বভাবের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আরেফ তথা আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের ভাষায় মানুষ হলো আল্লাহর পরিপূর্ণ প্রকাশস্থল। আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদর্শনকারী দর্পণ। তার রূপ ও সৌন্দর্যই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।[২৫] জগতে মানব সৃষ্টির সূচনাই হয়েছে প্রেমের মাধ্যমে। এদিকে ইঙ্গিত করে কবি হাফিজ লিখেছেন-

طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش

که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری[২৬]

'প্রেমের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ ও জিন-পরী

একটা ইচ্ছা কর, যাতে সৌভাগ্য লাভ করতে পারো

হাফিজ চেষ্টা কর, প্রেম হতে যেন বঞ্চিত না হও

কারণ অদক্ষতার দোষ পেলে কেউ গোলাম খরিদ করে না।'

কবি হাফিজ ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক প্রেমের কবি। তাঁর দিওয়ান কাব্যে প্রতিটি গজলের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিস্ফুটন দেখা যায়। যে সকল কবিতাগুলোতে পাকপবিত্রতা, তাকওয়া পরহেজগারী, ফানা ফিল্লাহ, সাধনার পরিভ্রমণ, মোরাকাবা, মোহাসাবা, শেষ রাত্রে ক্রন্দন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলো সঠিক ও সত্য। এ কবিতাগুলো কবির শেষ জীবনের। তবে লোক দেখানো, ভণ্ডামি, মিথ্যা, লোভ, প্রতারণা, চাটুকারিতাকে তিনি চরমভাবে ঘৃণা করেছেন। কবি ছিলেন আল্লাহর আশেক, আর তাঁর মাশুক হলেন মহান আল্লাহ। তাই তিনি মাশুক তথা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সর্বদা ব্যাকুল ছিলেন।

তবে আল্লাহকে পেতে হলে পার্থিব জগতের সবকিছুকে ছেড়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে নিজেকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন-

حضوری گرهمی خواهی از و غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها.[২৭]

'হে হাফিজ প্রিয়ার (আল্লাহর) সান্নিধ্য পেতে হলে তাঁর থেকে মুহূর্তও দুরে থেক না
কাঙ্খিত প্রিয়ার সান্নিধ্য পেতে হলে পৃথিবী ও এর সবকিছু পরিহার কর ও ভুলে যাও।'

কাসিদা রচনায় হাফিজ

ফারসি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে কাসিদা। হাফিজের দিওয়ান কাব্যে ৩টি কাসিদা রয়েছে। কবি গজল রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও, কাসিদা রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। কাসিদা শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইচ্ছা বা অনুরাগ। পারিভাষিক অর্থে ঐ কবিতাকে কাসিদা বলা হয়, যার দ্বারা সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রশংসা করা হয়।[২৮] কবি হাফিজ শাহ শাইখ আবু ইসহাক, শাহ শুজা এবং তাঁর মন্ত্রী কাওয়াম উদ্দিন মোহাম্মাদ সাহেবে ইয়ার প্রমুখ রাজা-বাদশাহদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় তাদের প্রশংসায় কাসিদা রচনা করেছেন। যেমন বাদশাহ শাহ শুজার প্রশংসায় একটি কাসিদায় লিখেছেন-

دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک   خاقان کامگار و شهنشه نوجوان
ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین   شاهی که شد به همتش افروخته زمان
سیرمغ وهم را نبود قوت عروج   آن جا که باز همت او سازد آشیان
گر در خیال چرخ فقد عکس تیغ او   از یک دگر جدا شود اجزای تو أمان
حکمتش روان چو باد در اطراف برو بحر   مهرش نهاد چو روح در اعضاي انس و جان[২৯]

'যুগের অধিকারী রাজ্যের সূর্যরত্ন শাহশুজা
কর্মঠ নওজোয়ান খাকানের রাজাধিরাজ।
ধরনীতে তার অভ্যুদয় যেন পূর্ণচন্দ্রের আলোর প্রভা
তিনি হলেন যুগশ্রেষ্ঠ উদীয়মান শাহানশাহ।
সিমোরগ ও হুমা যেথায় আরোহণ করতে অক্ষম
উদ্যমতা দিয়ে গড়তে প্রাসাদ তথায় তিনি সক্ষম।
তিনি হলেন তীক্ষ্ণ-চেতনার মূর্ত প্রতিচ্ছবি
একটি অপরটি থেকে পৃথক তবে ফলাফল একই।
তার প্রজ্ঞা সাগরের প্রবাহমান বায়ুর ন্যায় গতিশীল

তার বদান্যতার ভিত্তি, যেমন ঘনিষ্ঠ আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্ক।’

মাসনাভি রচনায় হাফিজ

মাসনাভি শব্দের শাব্দিক অর্থ দ্বিপদী কবিতা। পারিভাষিক অর্থে মাসনাভি ঐ কবিতাকে বলা হয়, যার প্রতিটি লাইনের ছন্দমাত্রা সমান। তবে প্রত্যেক পঙক্তির ছন্দমিল পৃথক। এ কারণে একে দুই লাইনের অন্তমিলের সুবাদে মাসনাভি কাব্য নামে অভিহিত করা হয়। মাসনাভির বেইতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। এ কারণে মাসনাভির বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন কাহিনী, গল্প, ইতিহাস ও রূপকথা বর্ণিত হয়ে থাকে।[৩০] কখনো কখনো এতে ধর্মীয় কাহিনী, দার্শনিক, সামাজিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীও বর্ণিত হয়।[৩১] মাসনাভি কাব্যের ওজন ‘বাহরে মোতাকারেব’ ফাউলুন, ফাউলুন, ফাউলুন, ফাউল। রূমির *মাসনাভি*, ফেরদৌসির *শাহনামা*, সাদির *বুস্তান*, হাকিম সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকা* ইত্যাদি ফারসি ভাষার বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ *মাসনাভি* গ্রন্থ।[৩২] কবি হাফিজ শিরাজিও কিছু মাসনাভি বা দ্বিপদী কবিতা লিখেছেন। এতে সর্বমোট ৪৮টি বেইত রয়েছে। তাঁর দিওয়ানে উল্লিখিত মাসনাভি কবিতা থেকে কয়েকটি বেইত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

الا ای آهوی وحشی کجایی — مرا باتست چندین آشنایی
دو تنها و دو سر گردان دوبی کس — و دو دامت کمین از پیش و از پس
بیا تاحال یک دیگر به دانیم — مراد هم به جوییم از توانیم
که می بینم که این دشت مشوش — چرا گاهی ندارد خرم و خوش[৩৩]

‘সাবধান, ওহে দুষ্ট হিংস্র হরিণ তুমি কোথায়,
তোমার নিজের পরিচয় আমাকে দাও।
দুটি বিচ্ছিন্ন ও শিংবিশিষ্ট অসহায় অহিংস্র হরিণ
শিকারের জন্য আগেপিছে ওঁৎপেতে বসে আছে।
এসো আমরা একে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই
সক্ষমতা দিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুও অনুসন্ধান করি।
আমি দেখেছি যেন এই চরাচরে তুমি বিড়ম্বিত অবসাদগ্রস্ত
কেন তোমার মাঝে এক মুহূর্ত খুশি ও আনন্দ নেই।’

কেতয়া বা খণ্ড কবিতা

কেতয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ টুকরো বা কোন কিছুর কর্তিত অংশ। পারিভাষিক অর্থে কোন একটি বিষয়ের উপর দুই বা ততোধিক কবিতাকে কেতয়া বলা হয়।[৩৪] কবি হাফিজ শিরাজিও কেতয়া রচনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি প্রায় ৩৫টি কেতয়া বা খণ্ড কবিতা রচনা করেছেন। কেতয়া বা খণ্ড কবিতায় নৈতিক শিক্ষা, দর্শন, আবার কখনো কখনো প্রশংসা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অভিনন্দন, সমবেদনা, দুটি জিনিসের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন।[৩৫] যেমন কবি তাঁর বড় ভাই খলিল আদেলের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি কেতয়া রচনা করেছেন। তা হলো-

برادر خواجه عادل طلب مثواه — پس از پنجاه و نه سال از حیاتش
به سوی روضهٔ رضوان سفر — خدا راضی زفعال و صفاتش

کرد وزانجا فهم کن سال
خلیل عادلش پیوسته وفاتش[৩৬]
برخوان

‘ভাই খাজা আদেল তিনি সুখময় স্থানে শান্তি লাভ করুন
অতঃপর তিনি ৫৯ বৎসর বেঁচে ছিলেন।
তিনি বেহেশতের বাগানের দিকে যাত্রা করেছেন
আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজ ও গুণাবলীর উপর সন্তুষ্ট আছেন।
খলিলের ন্যায়নীতি অব্যাহতভাবে জান
আর সেখান থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ বুঝে নাও।’

মুযাফফারি বংশের (১৩১৩-১৩৬৩ খ্রি.) প্রথম শাসক ছিলেন মুবারিজুদ্দিন মোহাম্মাদ, যিনি ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি রাজ্য জয়ের নেশায় মেতে উঠেন। তিনি ইয়াযদ, কিরমান এবং শিরাজসহ ফারস শহর দখল করেন। ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইসফাহান অধিকার করেন এবং শাসক আবু ইসহাক ইনজুকে বন্দি করে শিরাজে এনে মৃত্যুদণ্ড দেন। দুঃখের বিষয় হলো, তার আচরণ রুঢ় হওয়ায় পুত্র জালালুদ্দিন শাহ শুজা এবং কুতুবুদ্দিন মাহমুদ একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে অন্ধ ও বন্দী করে সিংহাসনচ্যুত করেন।[৩৭] কবি হাফিজ তার অন্ধ হওয়া নিয়ে একটি কেতয়া রচনা করেছেন। তার কিয়দাংশ হলো-

دل منه بر دنیی و اسباب او
زانکه ازوی کس وفاداری ندید
آنکه بُد روشن جهان‌بینش بدو
میل در چشم جهان‌بینش کشید.[৩৮]

‘তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার উপর কোন মন দিয়ে
যেহেতু তাঁর নিকট কেউ বিশ্বস্ততার কিছু দেখেনি।
যার বিশ্বজ্ঞান ছিল আলোকিত,
সে তার প্রতি তাকিয়েছে দুনিয়া দেখার চোখে।’

রোবাঈ বা চতুষ্পদী কবিতা

ফারসি কাব্য সাহিত্যের অপর একটি প্রসিদ্ধ শাখা হলো রোবাঈ বা চতুষ্পদী কবিতা। কবি হাফিজ অন্যান্য কবিতার ন্যায় রোবাঈ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। রোবাঈ শব্দটি রোব হতে উদ্ভূত। রোব অর্থ চার লাইন বিশিষ্ট। পরিভাষায় রোবাঈ ঐ কবিতাকে বলা হয় যার মধ্যে শুধুমাত্র চারটি মেসরা বা পঙক্তি থাকে। প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনায় একে দো-বেইতি বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৯] কবি হাফিজ শিরাজি প্রায় ৪২টি রোবাঈ বা চতুষ্পদী কবিতা লিখেছেন। তিনি অধিকাংশ রোবাঈতে সৃষ্টিরহস্য, সুফিতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রেম, শরাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন একটি রোবাঈর মধ্যে এভাবে প্রেমের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন-

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب از چه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را[৪০]

বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় এর অর্থ হলো-

‘তোমার ছবির ধ্যানে প্রিয়
দৃষ্টি আমার পলক হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে পথ
পা চলে না সে পথ ছাড়া।
হায়! দুনিয়ার সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম
দগ্ধ হলো নয়ন তারা।’[৪১]

সাকিনামে

সাকিনামে গজলের একটি প্রকার, যা বাহরে মুতাকারেব ছন্দে রচনা করা হয়। এ ধরনের গজল কবিতা আরবি খামারিয়্যাত কবিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। রোদাকি সমরকন্দির যুগে ফারসিতে আরবির অনুকরণে এ ধরনের কবিতার প্রচলন শুরু হয়। খামার (خمر) অর্থ শরাব। খামারিয়্যাতে শরাব সংক্রান্ত আলোচনা করা হতো। রোদাকি নিজেও এ ধরনের কবিতা রচনা করেছেন এবং তিনি তার কবিতায় শরাব সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। যিনি শরাব পান করান তাকে সাকি বলা হয়। তাই আরবির খামারিয়্যাত ফারসিতে এসে সাকিনামে নামে আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে সাকিনামেতে বাস্তবিকভাবে শরাবকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হতো, কিন্তু পরবর্তীতে তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শরাব সংক্রান্ত শব্দ দিয়ে তাসাওউফের বিভিন্ন বিষয় বোঝানো হয়ে থাকে। এরফানি বিষয়ে ভরপুর সাকিনামে রচনা করেছেন নিযামি গাঞ্জুবি। এরপর এ বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেন কবি আমির খসরু দেহলাভি ও খাজু কেরমানি। তৈমুরি যুগে এসে এক ভিন্ন স্বাদে ভিন্নরূপে সাকিনামে রচনা করেন খাজা শামসুদ্দিন হাফিজ শিরাজি। তাঁর সাকিনামে মনকাড়া সুরে গাওয়া হয়ে থাকে।[৪২] নিম্নে সাকিনামের কিয়দংশ তুলে ধরা হলো-

بیا ساقی آن می که حال آورد
کرامت فزاید کمال آورد
به من ده که بس بیدل افتاده ام
وزین هر دو بی حاصل افتاده ام
بیا ساقی آن می که عکسش زجام
به کیخسرو و جم فرستد پیام
بده تا بگویم به آواز نی

که جمشید کی بود و کاووس کی[৪৩]

‘সাকি, নিয়ে এসো এমন সুরা, যা ভাব নিয়ে আসে
কারামত বৃদ্ধি করে, কামালিয়াত নিয়ে আসে।
আমাকে দাও, যা প্রেমাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট
এ দুটির কোনটিই যেন অনর্জিত না থাকে।
সাকি নিয়ে এসো এমন সুরা যার প্রতিচ্ছবি পানপাত্র হতে
কায়খসরু ও জামের নিকট সংবাদ পৌঁছায়।
আমাকেই দাও, যা বাঁশীর সুরে বলি
কে ছিল জামশিদ, আর কে বা বাদশা কায়কাউস।’

উপসংহার

ফারসি সাহিত্যে হাফিজ তাঁর কাব্য দিয়ে পারস্য ছাড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গণে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভা ও দর্শনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এখনও অমর হয়ে রয়েছেন। যতদিন তার কাব্য থাকবে ততদিন তিনি মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে তাকবেন। সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, তাঁর কাব্যে যে বিষয় ভাব ও দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, তা মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। বিশেষ করে হাফিজের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

[১]. পারভিন শাকিবা, *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরূয* (তেহরান: এনতেশারাতে হেরমান্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ১৬১।

[২]. মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাবনামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, তা.বি.), পৃ. ৫৫৫।

[৩]. Edward G. Browne, *A Literary History of Persia*, Vol-III (London: New York: Melbourne: Cambridge University Press, 1951), P. 271.

[৪]. ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: চাপখানেয়ে আরমান, ১৩৬৯ হি.শা.), পৃ. ৩০৭; A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: George Allen & Unwin LTD. 1958), P. 330.

[৫]. মির হাসান ভালাভি, *তারহি আয হাফিজ* (তেহরান: এনতেশারাতে যাভভার, ১৩৯৫ হি.শা.), পৃ. ৪৭।

[৬]. মাওলানা শিবলি নোমানি, *শেরুল আজম*, দ্বিতীয় খণ্ড (লাহোর: মালেক নাজির আহমদ, তাজ বুক ডিপো, উর্দু বাজার, তা.বি.), পৃ. ১৩৫।

[৭]. বাহাউদ্দিন খুররম শাহি, *হাফিজনামে*, প্রথম খণ্ড (তেহরান: এনতেশারাতে এলমি ওয়া ফারহাঙ্গি ওয়া এনতেশারাতে সারূশ, ১৩৬৬ হি.শা.), পৃ. ২৮; হাশেম রাযি (সম্পাদিত), *দিওয়ানে হাফিজ* (তেহরান: এনতেশারাতে কাভেহ, ১৩৪১ হি.শা.), পৃ. পৃ. ৪৩।

[৮]. *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।

[৯]. *দিওয়ানে হাফিজ*, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

[১০]. *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১; *A Literary History of Persia*, Vol-III, opcit, P. 283.

[১১]. *শেরুল আজম*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

[১২]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

[১৩]. মো. ঈশা শাহেদী, *ইরানের বুলবুল হাফিজ শিরাজী* (ঢাকা: ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৬।

[১৪]. ড. আবদুল হুসাইন যাররিনকূব, *বা কারওয়ানে হুল্লে* (তেহরান: এনতেশারাতে এলমি, নবম মুদ্রণ, ১৩৭৪ হি.শা.), পৃ. ২৭০।

[১৫]. *ইরানের বুলবুল হাফিজ শিরাজী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

[১৬]. জন রিপকা ও অন্যান্য, অনু. কায়খসরূ কেশাওয়ারযি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: চাপখানেয়ে হায়দারি, ১ম সংস্করণ, ১৩৭০ হি.শা.), পৃ. ৩১২।

[১৭]. প্রফেসর মো. মুইজুদ্দিন, *রাহনুমায়ে সুখান* (ঢাকা: আরেফিন প্রেস মুত্তাসেলে আঞ্জুমানে আসলুক, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৫১।

[১৮]. ড. মানসূর রাসতগার ফাসায়ি, *আনওয়ায়ে শেরে ফারসি* (শিরাজ: এনতেশারাতে নোভিদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৭২ হি.শা.), পৃ. ৫৬৪।

[১৯]. Dr. A. Shakoor Ahsan, *Studies In Persian Language And Literature* (Lahore: Bazm-E-Iqbal, First edn., 1992), P. 59.

[২০]. উস্তাদ মুর্তাজা মোতাহহারি, *এরফানে হাফিজ* (তেহরান: এনতেশারাতে সদরা, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৫৯-৬০।

[২১]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।

[২২]. তদেব, পৃ. ১৯২।

[২৩]. তদেব, পৃ. ১৫।

[২৪]. তদেব, পৃ. ২২৩।

[২৫]. *এরফানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

[২৬]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩।

[২৭]. তদেব, পৃ. ১৫।

[২৮]. *রাহনুমায়ে সুখান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

[২৯]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

[৩০]. ড. আহমদ তামীমদারী, তারিক জিয়াউর রহমান শিরাজী ও মুহাম্মদ ঈশা শাহেদী অনূদিত, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* (তেহরান: আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৯৫।

[৩১]. *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরূয*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

[৩২]. ড. নাসের নিকুবাখত, *তাহলিলে শেরে ফারসি* (তেহরান: এনতেশারাতে সাজেমানে মোতালিয়া উলুমে ইনসানি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৭ হি.শা.), পৃ. ৭১

[৩৩]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।

[৩৪]. *রাহনুমায়ে সুখান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

[৩৫]. *তাহলিলে শেরে ফারসি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

[৩৬]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০।

[৩৭]. বাহাউদ্দিন খুররম শাহি, *হাফিজ* (তেহরান: এনতেশারাতে তারহে নো, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৮৭ হি.শা.), পৃ.৭।

[৩৮]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।

[৩৯]. *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

[৪০]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

[৪১]. আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৩১।

[৪২]. ড. যাবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (তেহরান: চাপখানেয়ে রামিন, এগারতম মুদ্রণ, তৃতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ, ১৩৮৩ হি.শা.), পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

[৪৩]. *দিওয়ানে হাফিজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

নিযামী গাঞ্জুবীর দার্শনিক চিন্তাধারা: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আতাউল্যাহ*

Abstract: Nizami Ganjavi (1141-1203) is one of the greatest epic poet and philosopher of Persian literature in 12th century. He started his creation with lyric poems. His lyrics stand out with high professionalism, worldly attitude to love and humanist thoughts about a human's destiny. Nizami entered the world literature with *Khamsa* a set of five poems: *Treasury of Mysteries, Khasrow and Shirin, Laili and Majnun, Seven Beauties,* and *Iskander-name* written in masnavi form. His poems greatly enriched the philosophical theme which was widely spread in oriental literature. He brought the highest humane ideals and new professional achievements into the literature and opened a new direction in literature. He always aspired to link the literature with the real life. Being a great poet of humanity he sang of a man's dignity. The ideas of philosophers and cultural heritage of humankind was skillfully introduced by Nizami as a model to make the dreams of people for the perfect life true. This article attempts to describe the philosophical thoughts of Nizami Ganjavi.

ভূমিকা

খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইরানে এমন কিছু কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে যাঁরা নিজেদের সুপ্ত মেধা বিকাশের মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য দরবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনই একজন মহাপণ্ডিত হলেন ফারসি কাব্যের প্রাণপুরুষ ও প্রখ্যাত কবি নিযামী গাঞ্জুবী। তাঁর রচিত কাব্যসাহিত্য ফারসি সাহিত্যভাণ্ডারকে করেছে অলংকৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। ফারসি কাব্যসাহিত্যে তাঁর কাব্যের তুলনা বিরল। তাঁর মোট পাঁচটি মাসনবী গ্রন্থ রয়েছে, যা একত্রে *পাঞ্জগাঞ্জে নিযামী* বা নিযামীর *পঞ্চরত্ন* নামে খ্যাত। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হলো *মাখযানুল আসরার, খসরু ওয়া শিরিন*, *লাইলী ওয়া মাজনূন*, *হাফত পেইকার*, *এস্কেন্দার নামা ও দীওয়ানে নিযামী*। তাঁর রচিত এ কাব্যগ্রন্থসমূহ প্রেম, দার্শনিক চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিকতাসহ নানাবিধ বিষয়বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। যা তাঁর কাব্যসাহিত্যকে করেছে আরও মর্যাদাসম্পন্ন ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। এ সকল বিষয়বৈচিত্রের মাঝে যে বিষয়টি আরও গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে তা হলো দার্শনিক চিন্তাধারা।

নিযামী গাঞ্জুবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নিযামী গাঞ্জুবী ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ১১৪১ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের গাঞ্জ নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর প্রকৃত নাম ইলইয়াস। উপাধি নিযাম উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ ও ছদ্মনাম নিযামী। তাঁর পিতার নাম ইউসূফ, মাতার নাম রাঈসা এবং দাদার নাম যাকী।[২] শৈশবেই তাঁর পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেন। আর পিতা-মাতার এ বিয়োগ বেদনা কবিকে ছোটবেলা থেকে ভাবুক ও সূক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী হয়ে গড়ে উঠতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

নিযামী তাঁর পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবেই তিনি আরবী ও ফারসিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পাশাপাশি কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর পিতাও মূলতঃ একজন কবি ছিলেন। আর এজন্যই তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে কবিতা রচনা শুরু করেন। পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণের ফলে প্রাথমিক জীবনের কবিতাগুলো

* প্রফেসর ও সভাপতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকেই তাঁর মধ্যেও পাণ্ডিত্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। আর তাঁর রচিত এ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যসাহিত্য ফারসি সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছে সমুন্নত। ফারসি সাহিত্যের এ অমর কবি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

নিযামী গাঞ্জুবীর দার্শনিক চিন্তাধারা

নিযামী গাঞ্জুবী ছিলেন মূলত: একজন রোমান্টিক কবি। প্রেম, ভালবাসা ও রোমান্টিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর কবিতা। এরপরও তাঁর কবিতায় দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কিত বিষয় পরিলক্ষিত হয় অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। যা তাঁর কবিতাকে করেছে আরও মানসম্মত এবং পাঠক ও সাধারণ মানুষকে দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে করেছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ। নিম্নে গাঞ্জুবীর কাব্যে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লিখিত দার্শনিক চিন্তাধারা সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

মানুষ সম্পর্কিত অন্বেষণ

মানুষ সমাজের প্রধান উপকরণ ও নিয়ন্ত্রক। মানব জীবনের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণকে ভিত্তি করেই সমাজের সৃষ্টি, ব্যাপ্তি এবং শ্রী বৃদ্ধি।[৪] নিযামী গাঞ্জুবীর দৃষ্টিতে এ মানুষ দু'টি মৌলিক উপাদান থেকে তৈরী, এদের মধ্যে একটি আকাশ ও অপরটি মাটির সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ একটি দৈহিক তথা মানুষের মাটির তৈরী দেহ অপরটি আত্মিক তথা মহান আল্লাহর দেয়া প্রাণ। মাটি ও পানি দ্বারা আল্লাহ মানুষের অবয়ব তৈরী করে সেখানে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এ প্রাণ দু'ধরনের চিন্তার অধিকারী। কখনো ভাল চিন্তা করে জীবনে সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে। আবার কখনো খারাপ চিন্তার মাধ্যমে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়ে বসে। এ দু'ধরনের চিন্তারই স্বাধীনতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।[৫] সামান্য একটু পানি ও মাটির তৈরী তিন গজ দৈর্ঘ ও এক গজ প্রস্থের সমন্বয় হচ্ছে মানুষ। এর মাঝে মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর নিয়ামক বলে কথিত রস চতুষ্টয় তথা বায়ু পিত্ত, কফ ও রক্ত এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

ای سه گز خاک وپهنی تو گزی   چارخم دردکان رنگرزی

هرنواله که معده توپزد   خلطی آن را به رنگ خود برزد[৬]

'হে তিন গজ দৈর্ঘ ও এক গজ প্রস্থ (মানুষ)।
চার স্তর বিশিষ্ট দোকানের রং মিস্ত্রী।
তোমার পাকস্থলির প্রত্যেকটা খামিরের গোলা যা তৈরী করা হয়েছে,
ঐ শ্লেষাগুলো নিজস্ব রঙে ঝরতেছে।'

পবিত্র কুরআনেও মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين- ثم جعلناه نطفة فی قرار مكين[৭]

'আমি মানুষকে তৈরী করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত
স্থানে টপকে পড়া ফোটায় পরিবর্তিত করেছি।'

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। সৃষ্টি জীবের প্রত্যেকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি জীবই একে অপরের সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষও এ প্রেমের সাথে সম্পৃক্ত গভীরভাবে। কবি এ প্রসঙ্গে বলেন,

پیشتر از جنبش این تازگان   نو سفران وکهن آوازگان

پایگاه عشق نه ما کرده ایم؟   دستکش عشق نه ما خورده ایم؟[৮]

‘সজীবতার এ স্পন্দন অনেক আগে থেকেই,
নতুন ভ্রমণকারী এবং পুরাতন আওয়াজকারী।
সমাজের প্রতি ভালবাসা আমরাই স্থাপন করেছি,
ভালবাসার দাস্তানা আমরাই স্থাপন করেছি।’

নিযামী গাঞ্জুবীর দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে তাঁকে চেনা। যদি কোন মানুষ নির্জনে একান্তে ধ্যানে মগ্ন থেকে মহান আল্লাহকে চিনতে পারে তবেই সে জীবনে খুঁজে পাবে সফলতা। আর আল্লাহকে চিনতে হলে প্রথমে নিজেকে চিনতে হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে চেনার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে চিনতে পারল না তার মানব জনম বৃথা, মূল্যহীন।[৯] এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

هرکه خود را چنانکه بود شناخت   تا ابد سربه زندگی افراخت

فانی آن شد که نقش خویش نخواند   هرکه این نقش خواند باقی ماند

چون تو خود را شناختی بدرست   نگذری گرچه بگذری ز نخست

وانکسان کز وجود بی خبرند   زین در آیند وزان دگر گذرند.[১০]

‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এমনভাবে চেনা উচিত,
যাতে সে অনন্তকাল প্রজ্জ্বলিত থাকে।
ঐ অস্তিত্ব ধ্বংস হয়েছে যে তার নিজের চিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ,
যে এ চিত্র সম্পর্কে অবগত সেই স্থিতিশীল থাকে।
যখন তুমি নিজেকে সঠিক ভাবে জানতে পারবে,
শুরুতে যেখানে ছিলে সেখানে নিজেকে রেখো না।
ঐ ব্যক্তি যে অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ,
এটি অনাগত ভবিষ্যত উহা অতিক্রান্ত অতীত।’

মানুষ নিজেকে চেনার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে চেনার উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এ চেনার পরিসমাপ্তি ঘটে নিজেকে আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে তাঁকে পাওয়ার মাধ্যমেই। আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও মেধা দিয়েছেন এগুলোর সমন্বয়ে মহান আল্লাহকে চিনতে পারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের সার্থকতা। মানুষ জ্ঞানের মাধ্যমেই এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপায়ণে পরিণত হয়েছে। এজন্য মানুষেরও উচিত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জ্ঞানের জগতে বিচরণ করা। তাহলেই সে আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টি, তাঁর প্রভূত্ব, বড়ত্ব, মহত্ব, একত্ববাদ, প্রকৃতি ও তাঁকে চেনার মৌলিক পথসমূহ জানতে পারবে। আর নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য হিসেবে। এ কথাগুলোর সাথেই একমত পোষণ করেছেন কবি নিযামী গাঞ্জুবী।[১১] এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

عقل آبله پای وکوی تاریک   وآنگاه رهی چو موی باریک

توفیق توگرنه ره نماید   این عقده به عقل کی گشاید

عقل از در تو بصر فروزده   گرپای درون نهد بسوزد

ای عقل مرا کفایت از تو   جستن ز من وهدایت ازتو

من بیدل وراه بیمناکست   چون راهنما تویی چه باکست

عاجز شدم از گرانی بار   طاقت نه چگونه باشد این کار[১২]

‘জ্ঞান যখন পায়ের গুটিবসন্ত ও গলিপথ যখন অন্ধকার,
রাস্তা তখন চুলের ন্যায় সরু হয়।
তোমার খোদায়ী সাফল্য যদি রাস্তা খুঁজে না পায়,
জ্ঞানের এ জটিলতাকে উন্মোচিত করবে।
জ্ঞান তোমার কাছ থেকেই চক্ষু প্রজ্জ্বলিত করেছে,
যদিও তার ভিতরে স্থাপিত হয়েছে প্রজ্জ্বলন।
হে জ্ঞান আমার এ অবস্থান তোমার থেকেই,
আমাকে খুঁজে পাওয়া ও হেদায়েত তোমার থেকেই।
আমি নির্দয় তুমি পথভ্রষ্ট কে,
যখন তুমি পথ প্রদর্শনকারী কে এবং কার।
মূল্যস্ফীতির ভারে আমি নিরুপায়,
শক্তি নেই কিভাবে সম্পাদিত হবে এ কাজ।’

রাসূল (সা.) এর মূল্যায়ন

মানুষ এ ধরণীতে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর এ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হলেন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি হলেন সকল নবীগণের নবী ও সমগ্র জাতির শিক্ষক। এ পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জেযা হলো আল-কুরআন। আর এ কুরআনকে অবলম্বন করে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে মূর্খ, অজ্ঞ, কুরুচিপূর্ণ ও অসভ্য জাতিকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দক্ষ শাসক, সমর নায়ক, শ্রেষ্ঠ সমাজপতি, উৎকৃষ্ট রাজনীতিবিদ, সফল সংগঠক, পরিবারের উত্তম কর্তা ও সফল কূটনৈতিক। এক কথায়, ভাল গুণের যতগুলো দিক আছে সব কিছুই তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি নিযামী গাঞ্জুবী। মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ [১৩]

‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।’

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا[১৪]

‘তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (আল-কুরআন) ও সত্য দ্বীনসহ (আল-ইসলাম) পাঠিয়েছেন। যাতে একে অন্য সব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। এ কাজের জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।’

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ[১৫]

'আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।'

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন,

كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى قال من اطاعنى دخل الجنة.ومن عصانى فقد ابى. [১৬]

> 'আমার উম্মতের সকল লোকই বেহেশতবাসী হবে। কিন্তু যে অস্বীকার করে (সে বেহেশতে যাবে না)। জিজ্ঞাসা করা হল, কে অস্বীকার করেছে হে রাসূল? উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করল, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অনুসরণ করল না সেই অস্বীকার করল।'

রাসূল (সা.) সম্পর্কে এ একই দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন কবি নিযামী গাঞ্জুবী যা তাঁর বাস্তব জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

مُحَمَّد كافرينش هست خاكش　　هزاران آفرينش بر جان پاكش

چراغ افروز چشم اهل بينش　　طراز كارگاه آفرينش

سر و سرهنگ ميدان و نارا　　سپه سالار و خيل انبيارا

مرقع بركش نرمادهٔ چند　　شفاعت خواه كار افتاده چند[১৭]

'মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছি তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে,
তাঁর পবিত্র আত্মার বদৌলতে এমন হাজারো আত্মা সৃষ্টি হয়েছে।
তাঁর পরিবার পরিজন তাঁকে প্রজ্জ্বলিত আলো হিসেবে দেখেন,
তিনিই এ সৃষ্টিজগৎ তৈরীর মাধ্যম।
যুদ্ধের ময়দানে, সৈন্য সামন্তের মাঝে,
সকল নবীদের মাঝে তিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত।
তাঁর জোড়াতালি দেয়া জামা নারী-পুরুষ সবাই পরিধান কর,
তাঁর শাফায়াত কামনা কর তবেই কিছুটা সফল হবে।'

মে'রাজ সম্পর্কে ভাবনা

মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সমগ্র জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে এ ধরায় পঠিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাই তাঁকে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য তাঁর দ্বারা মে'রাজ সংঘটিত করিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক অলৌকিক ঘটনা মে'রাজ । তাঁর জীবনে মে'রাজ নিয়ে যত তর্ক-বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে আর কোন বিষয়ে হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন, মে'রাজ সংঘটিত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্বপ্নযোগে। আবার কেউ কেউ ধারণা করেন, মে'রাজ বলতে কোন কিছুই নেই, এটি সম্পূর্ণ একটি অবান্তর ঘটনা। তবে চরম সত্য কথা হলো মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে দিয়ে এ মহাঅলৌকিক ঘটনাটি স্বশরীরে সম্পাদন করিয়েছিলেন যার যথেষ্ট প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير [১৮]

'তিনি (আল্লাহ) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারিদিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।'

মে'রাজ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن جابر بن عبدالله انه سمع رسول الله (صلعم) يقول لما كذبنى قريش قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اباته و انا انظر اليه.[১৯]

'হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছেন, মেরাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো বলে দিতে থাকলাম।'

কবি নিযামী গাঞ্জুবীও মে'রাজ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের এ দর্শনের সাথে ছিলেন সম্পূর্ণ একমত। মহান আল্লাহ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ঘোষণা করেছেন। তিনি ইসলাম তথা মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণস্বরূপ মে'রাজের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবতারণা করেন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে বিশ্বের গূঢ়রহস্য সম্পর্কে অবগত করান। যা অন্য কোন নবীর সৌভাগ্য হয়নি। যেমন মে'রাজ সম্পর্কে কবি বলেন,

نيم شبان كان ملک نيمروز — كرد روان مشعل گيتى فروز

خود فلک از ديده عماريش كرد — زهره ومه مشعله داريش كرد

كرد رها در حرم كاينات — هفت خط و چاره حد وشش جهات

روز شده با قدمش در وداع — ز آمدنش آمده شب در سماع[২০]

'মধ্যরাত যেন পরিণত হলো মধ্যাহ্নে,
গতিশীল হলো আলোকোদ্ভাসিত প্রজ্জ্বলিত এ পৃথিবী।
নভোমণ্ডল নিজেই তাঁর বাহনের ব্যবস্থা করল,
শুক্র ও চাঁদ তাঁকে আলো দিল।
বিশ্বজগৎ হেরেমের দরজা উন্মোচিত করল,
সাতস্তর চারসীমা ও ছয় দিক।
তাঁর আগমনে বিদায় হলো দিবস,
তারঁ আগমনে রাত্রি গেয়ে উঠল।'

ঈসা (আ.) সম্পর্কে অভিমত

হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত একজন নবী ও রাসূল। তাঁর উপর মহান আল্লাহ আসমানী কিতাব ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেন। তারপরও যখন তিনি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতদের মর্যাদার কথা শুনেন, তখন শেষ নবীর উম্মত হওয়ার জন্য তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আর মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যান। পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে আবারও তাঁকে আল্লাহ এ দুনিয়ায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হিসেবে প্রেরণ করবেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে এটি সকলে বিশ্বাস করে না। তবে যারা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে তারা প্রত্যেকেই এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং মনে প্রাণে এ কথাকে নিঃসঙ্কোচচিত্তে বিশ্বাস করেন। ফারসি কাব্যের অমর কবি নিযামী গাঞ্জুবীও এর সাথে পরিপূর্ণভাবে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং এ দর্শনে বিশ্বাস করেন। অনেকে মনে করেন ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর পুত্র। কেননা তাঁর জন্মদাতা কোন পিতা ছিল না; বরং তিনি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বিবি মরিয়মের গর্ভ হতে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন। মূলত তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী ও রাসূল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ[২১]

> ‘আর যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) বললেন, হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে আগমন করেছি। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী। আর আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বললো এতো এক প্রকাশ্য যাদু।’

ঈসা (আ.) সম্পর্কে নিযামী গাঞ্জুবী বলেন,

پای مسیحا که جهان می نبشت　　　بر سر بازار چه میگذشت

گرگ سگی بر گذر افتاده دید　　　یوسفش از چه پدر افتاده دید[২২]

‘দীর্ঘজীবি ঈসা (আ.) কে পৃথিবী কবর খুড়ে তুলে আনবে,
বাজারের মাঝখানে কিভাবে রাখবে।
নেকড়ে বাঘ ও কুকুর তাঁর উত্থানকে দেখেছিল,
ইউসুফ কিভাবে তাঁর উত্থানকে দেখল।’

নিযামী গাঞ্জুবী তাঁর এ কবিতায় এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, ঈসা (আ.) এ পৃথিবীতে একবার নবী ও রাসূল হিসেবে এসেছিলেন এবং পুনরায় শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এ পৃথিবীতে আগমন করবেন। এ ব্যাপারে নিযামীর দর্শন ও কুরআনের বর্ণনা পুরোপুরিভাবে মিলে যায়। এতে কোন ধরনের দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়নি। সুতরাং নিযামী গাঞ্জুবীর দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

পার্থিব জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

নিযামী গাঞ্জুবীর দৃষ্টিতে পার্থিব জগৎ কোন সুখকর স্থান নয়। এটি পাপ-পঙ্কিলতা ও জঘন্যতায় পরিপূর্ণ। এর নিকৃষ্টতা ও নোংরামী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি একে তুলনা করেছেন বিভিন্ন উপমার সাথে। যেমন পার্থিব জগৎ সম্পর্কে নিযামী বলেন, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ স্বার্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর

সাথে শত্রুতা তৈরী করতে দ্বিধাবোধ করে না বিন্দুমাত্র। এখানে প্রেম ও ভালবাসার তীব্রতা যেমন অনেক বেশি, পাশাপাশি ঘৃণার পরিমাণও কোন অংশে কম নয়। ভালবেসে একজন নারী যখন কোন পুরুষের ঘরে বউ হয়ে যায়, দীর্ঘকাল সংসার করার পরও সময়ের ব্যবধানে স্বার্থের টানে উভয়ের মাঝে তৈরী হয় ব্যবধান, ঘটে বিচ্ছেদ। একজন মুসাফিরকে ডেকে নিয়ে বাড়ীতে মেহমানরূপে আপ্যায়ণ করে তৃপ্তি সহকারে খাবার খাওয়ান, আবার এ মুসাফিরের সাথেই মতপার্থক্য হওয়ায় তার মুখের আহার কেড়ে নিয়ে তাকে করেন বিতাড়িত। এটিই নিষ্ঠুর এ পার্থিব জগতের চরিত্র। নিযামী দুনিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র বলেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়া একজন কুৎসীত বৃদ্ধা নারীর আকৃতিতে বেরিয়ে আসবে, সবাই তাকে দেখে বলবে নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক (আমরা এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পানা চাই)। জাগতিক জীবনে যে ব্যক্তিই এ দুনিয়াকে যত বেশী পেতে চেয়েছে এবং তার প্রতি আসক্ত হয়েছে, সে তত বেশী ধ্বংস হয়েছে। তাই দুনিয়ার নিকট থেকে শান্তি পাওয়া এ লোকগুলো বলবে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হউক, যাতে সে লজ্জা পায় তার কৃতকর্মের জন্য।[২৩] নিযামী আরও বলেন, এ দুনিয়া হচ্ছে তৃষ্ণার্ত দোযখের ন্যায়। দোযখ যেমন তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সবসময় কাতরাবে, ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর এ দুনিয়াও মানুষকে তার লোভ-লালসা ও নিষিদ্ধ কর্মের দিকে ডাকে তার মনুষত্বকে বিলীন করে দেয়ার জন্য।[২৪] যেমন এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

جهان دیواست و وقت بستن   به خوشخویی توان زین دیو رستن[২৫]

'দুনিয়াটা একটি দৈত্য এবং বন্ধনের সময়,
মার্জিত স্বভাবের লোক এ দৈত্য হতে মুক্তি পেত পারে।'

সর্বোপরি, নিযামী গাঞ্জুবীর বক্তব্য বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যায় যে, দুনিয়া এমন একটি দুঃসহ জায়গা যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে হাজারো নিকৃষ্টতম ঘটনা। আর এর অনিষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা অনেক কঠিন কাজ। কেননা এখানে এমন কোন অপকর্ম নেই যা সংঘটিত হয় না। মানুষ আল্লাহর ভয়কে পরোয়া না করে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে দিনে দিনে ধ্বংস থেকে ধ্বংসের অতল গহীনে তলিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য নিযামী একে দোযখের সাথে তুলনা করেছেন।

পরকালের অস্তিত্ব

পৃথিবীতে এমন কোন ভয়ানক জিনিস নেই যা মৃত্যুর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। অনেক দানশীল মানুষ রয়েছেন যাঁরা সম্পদের বিশাল একটি অংশ মানবতার কল্যাণে দান করে দেন। কিন্তু এমন কোন মানুষ নেই যে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য নিজেরই হায়াত অন্যজনকে উদারচিত্তে দান করেন। কেননা, মৃত্যু এতই ভয়ানক যে কেউ তার কাছাকাছি হতে চায় না। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হলো প্রত্যেককেই তার নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু বরণ করতে হবে। কেউ শত ইচ্ছে করেও এর থেকে মুক্তি পাবে না।[২৬] পবিত্র কুরআনেও মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে একাধিকবার। যেমন মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

كل نفس ذائقة الموت[২৭]

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।'

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر[২৮]

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না।'

এ প্রসঙ্গে নিযামী বলেন,

اورفت و رویم وکس نماند   وامی که جهان دهد ستاند

از وام جهان اگر گیا هیست   می ترس که شوخ وام خواهیست.[২৯]

'সে চলে গেছে আমরাও যাব কেউ থাকবে না,
পৃথিবী যে ঋণ দিয়েছিল তা নিয়ে নিয়েছে।
পৃথিবীর ঋণ হতে যদি উদ্ভিদ থাকে,
ভয় পাচ্ছে যে ঋণ যদি উচ্ছলতা চায়।'

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নামই হলো পরকাল বা আখিরাত। জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যু ও পরকালও তেমন সত্য। যদিও পৃথিবীর সকল মানুষই জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে পরকাল তথা আখিরাতের জীবন সম্পর্কে অনেকেই একমত নন। তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মানুষই কেবল আখিরাতের জীবনকে বিশ্বাস করেন। আর কবি নিযামী গাঞ্জুবী ছিলেন আখিরাতের প্রতি নিঃসঙ্কোচচিত্তে বিশ্বাসী ও এ দর্শনের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী একজন মানুষ। যিনি এ সম্পর্কে সবসময় কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। আখিরাত সম্পর্কে আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ [৩০]

'বরং পরকাল সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে এবং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।'

পরকাল সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ [৩১]

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে অত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য জাহান্নামের অধিবাসী। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম।'

পরকাল সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন,

لا تزول قدما ابن ادم حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابده وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه و ما عمل فيما علم [৩২]

'কিয়ামতের দিন মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: নিজের জীবন সে কোন পথে অতিবাহিত করেছে, যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন পথে ব্যয় করেছে, সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে। যে জ্ঞান লাভ করেছে, তদনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।'

পরকাল সম্পর্কে নিযামী গাঞ্জুবী বলেন,

مجلس خلوت نگر آراسته   روشن و خوش چون مه ناکاسته

شمع فروزان و شکر ریخته   تخت زده غالیه آموخته[৩৩]

'লক্ষ্য কর নির্জন মজলিস সুসজ্জিত হয়েছে,
উজ্জ্বলতা ও আনন্দ যেন ঘাটতিহীন চাঁদ।
প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি ও ছড়ানো ছিটানো চিনি,
আঘাতপ্রাপ্তি সিংহাসন বিজয়ী হতে শিখিয়েছে।'

উপরিউক্ত কবিতায় নির্জন মজলিশ দ্বারা মূলত কবি পরকালকেই বুঝিয়েছেন যা এখন ফাঁকা রয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সেখানে সকল মানুষের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর এ পরিপূর্ণটাকে তিনি সুসজ্জিত বুঝিয়েছেন। নিযামী গাঞ্জুবী পরকালকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন যা তাঁর কবিতায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

তাক্বদীর বা ভাগ্য সম্পর্কিত ধারণা

নিযামী গাঞ্জুবী ছিলেন তাক্বদীর তথা ভাগ্যে বিশ্বাসী একজন মানুষ। দৈনন্দিন জীবনে যা কিছুই ঘটে তা সম্পূর্ণ পূর্ব থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তাই তিনি মনে করেন মহান আল্লাহ মানুষের ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন তা ব্যতীত কোন কিছুই ঘটে না। এজন্যই তাঁর মতে অপরাধমূলক যে সমস্ত কাজ মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে তার জন্য না মানুষকে তথা অপরাধকারীকে ঘৃণা করা যাবে, না আল্লাহকে; বরং শুধু সেই অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজকে ঘৃণা করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বান্দার অন্যায়ের জন্য যেমনি সাজা দিবেন তার ভাল কাজের জন্য আবার প্রতিদানও দিবেন। আর আল্লাহ পাপ-পূণ্য কোন ক্ষেত্রেই কঠোর নন; বরং ন্যায়পরায়ণ। আর দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন কবি নিযামী গাঞ্জুবী।[৩৪] যেমন এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

سرشت مرا کافریدی زخاک   سرشته تو کردی بناپاک و پاک

اگر نیکم وگربدم در سرشت   قضای تو این نقش در من نبشت[৩৫]

'আমার প্রকৃতিকে তুমি সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে,
আমাকে তুমি পবিত্র ও অপবিত্রের সমন্বয় করেছ।
আমি কখনো পূণ্যবান আবার অপূণ্যবান প্রকৃতির,
আমার ভাগ্যের লিপিকে তুমি এভাবেই চিত্রিত করেছ।'

উপসংহার

নিযামী গাঞ্জুবী ছিলেন ফারসি কাব্যসাহিত্যের মধ্যমণি। যিনি ফারসি ভাষায় এ অমূল্য সম্পদ তথা পঞ্চরত্ন ও একটি *দীওয়ান* রচনা করে বিশ্ব কাব্যসাহিত্যে হয়েছেন সমাদৃত। তাঁর এ পঞ্চরত্নের কাব্যিক মান এত উঁচুস্তরের যে, বলা হয়ে থাকে যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন মহাকালের ঘর্ষণেও তা মুছে যাবার নয়। বর্ণনা, প্রকাশ-ভঙ্গী ও দর্শনচিন্তা সবমিলিয়ে তাঁর কাব্যে এক অনবদ্য মূল্যমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে তাঁর কাব্যে উল্লেখিত বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়াবলী তাঁর কাব্যের মূল বিষয়বস্তুকে করেছে আরও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও মৌলিকতা সমৃদ্ধ। আর এজন্যই তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ ফারসি কাব্যের পরিমণ্ডলে হয়েছে

আরও সার্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি বলা যায়, কবি নিযামী গাঞ্জুবী তাঁর এ অসাধারণ প্রতিভার জন্য কাব্যপিপাসু মানুষের হৃদয়ে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যনির্দেশ

১ Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Naaz Publishing Centre, 2nd edit., 1991), p. 145.

২ ড. বারাআৎ যানযানী, *আহওয়াল ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী* (তেহরান: মুয়াসসাসেয়ে এন্তেশারাত ওয়া চাপে দানেশগাহে তেহরান, ৩য় সং. ১৩৭২ হি.শা./ ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১।

৩ নিযামী গাঞ্জুবী, *মাখযানুল আসরার*, প্রফেসর রুস্তম আলী উফ (সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে বেইনুল মিলালী আল হুদা, ১৩৭৪ হি.শা./ ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ৯।

৪ মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসাহিত্যের নানা দিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১।

৫ মানসুর সারভাত, *গাঞ্জীনেয়ে হেকমাত দার অসারে নিযামী* (তেহরান: মুয়াসসাসেয়ে এন্তেশারাতে আমীর কবীর, ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৮১।

৬ *সাবয়েয়ে হাকীম নিযামী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।

৭ সূরা আল মুমিনুন, আয়াত: ১২-১৩।

৮ *সাবয়েয়ে হাকীম নিযামী*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৯ *গাঞ্জীনেয়ে হেকমত দার অসারে নিযামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

১০ *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩।

১১ *গাঞ্জীনেয়ে হেকমত দার অসারে নিযামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

১২ *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

১৩ সূরা তওবা, আয়াত: ১২৮।

১৪ সূরা আল ফাতাহ্, আয়াত: ২৭।

১৫ সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।

১৬ মুহম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ২৪৮।

১৭ *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

১৮ সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১।

১৯ *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯।

২০ *মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২১ সূরা আসসাফ, আয়াত: ৬।

২২ *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

২৩ *গাঞ্জীনেয়ে হেকমত দার অসারে নিযামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

২৪ *তদেব*, পৃ. ১০৪।

[২৫] *সাবয়েয়ে হাকীম নিযামী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

[২৬] *গাঞ্জীনেয়ে হেকমত দার অসারে নিযামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

[২৭] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫।

[২৮] সূরা নূহ, আয়াত: ৪।

[২৯] *সাবয়েয়ে হাকীম নিযামী*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

[৩০] সূরা নামল, আয়াত: ৬৬।

[৩১] সূরা হাশর, আয়াত: ১৯, ২০।

[৩২] মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৮ম খণ্ড (দেওবন্দ: কুতুবখানা রশিদিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৪৩।

[৩৩] *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

[৩৪] *গাঞ্জীনেয়ে হেকমত দার অসারে নিযামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

[৩৫] *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

ঈশ্বরের স্বরূপ : হিন্দু ধর্ম-দর্শনের আলোকে একটি পর্যালোচনা

ড. জুয়েলী বিশ্বাস*

Abstract: Most of the people of the world believe that there is a power beyond the created universe and creatures. He guides and controls everything. He is known by different names by different people. Some people call him Ishwara, some call him Allah, some other call him God etc. In the Hindu Shatras He has innumerable name. A question arises in the mind of the thoughtful men what the nature of Him. There are different opinions regarding the nature of God which are as follows – (1) Is He corporeal or incorporeal? (2) Is He attributed or non-attributed (3) Is He in the mind's eye or out of the mind's eye and so on. It is not possible to give answers to these questions for general people. Only a devoted person who has attained spritual knowledge can give answer to these questions. Yet they have different opinions regarding this. Some philosophy like Charvaka, Samkhya, Mimamsa do not believe in God. But Vedanta, Yoga, Nyaya, Vaisheshika philosophy believe in God. In Hindu religion and philosophy there are different opinions regarding the nature of God. In this article an attempt has been made to explain the nature of God only according to that philosophy that beliefs in God.

ভূমিকা

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে এই জগৎ ও জীব সৃষ্টির পিছনে এক অতীন্দ্রিয় সত্তা বিদ্যমান। সেই অতীন্দ্রিয় সত্তাকে আমরা বলি ঈশ্বর। যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা তিনি নানা নামে অভিহিত। কেউ তাঁকে ঈশ্বর, কেউ ভগবান, কেউ আল্লাহ্, কেউ গড বলে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ তাঁকে নানা নামে ডেকে থাকে। পৃথিবীর চিন্তাশীল সকল মানুষেরই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা তাঁর স্বরূপ কী। তিনি সাকার না নিরাকার, তিনি সগুণ না নির্গুণ, তিনি মানসগোচর না অবাঙ্মনসগোচর। ঈশ্বরের স্বরূপ কী– তা জানতে হলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রয়োজন। সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনি-ঋষিরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরাই পারেন ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে। তবে তাঁদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কারণ যাঁকে আমরা চোখে দেখতে পাই না, ধরতে পারি না, ছুঁতে পারি না, কেবল অনুভব করতে পারি তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্যই বটে। কোন কোন ধর্ম ও দর্শন আবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। চার্বাক, সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু বেদান্ত, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বেদান্ত দর্শন উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে তার আলোকে বর্তমান প্রবন্ধে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাঁদের যুক্তি এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। যে সব হিন্দু দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে তার আলোকেই বর্তমান প্রবন্ধে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা যিনি তাঁকে কেউ ঈশ্বর, কেউ ভগবান, কেউ আল্লাহ, কেউ বা গড বলে থাকে। ঈশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রেষ্ঠ, প্রভু, স্বামী ইত্যাদি।

ঈশ+বরচ্= ঈশ্বর। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নানা অভিধায় অভিহিত। ভক্তিবাদীরা ঈশ্বরকে ভগবান বলে ডাকতে ভালবাসেন। বেদ এবং উপনিষদে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত।

---

* প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বেদ, উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ

বেদ হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ। 'বেদো'খিলো ধর্মমূলং.......' ।[১] বেদকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন। উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বেদান্ত দর্শন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা গাভীরূপ উপনিষদের অমৃত বা দুগ্ধস্বরূপ। ভারতীয় ষড় দর্শনের ভিত্তিও বেদ। পুরাণসমূহে দেবতাবাদ ঘোষিত হয়েছে। তবে দেবতারা সেই পরম সত্তারই বিভিন্ন রূপভেদমাত্র।

ঋগ্বেদসংহিতায় বিভিন্ন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। বৈদিক দেবতারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ। অগ্নি, বরুণ, বায়ু, সূর্য, ঊষা প্রভৃতি দেবতা প্রাকৃতিক শক্তিরই প্রতিভূ। তবে এসব দেবতারা এক পরম সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে বলা হয়েছে–

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।[২]

অর্থাৎ সেই সদ্‌বস্তু বা ব্রহ্ম এক, বিপ্রেরা তাঁকে বহু বলে থাকেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে–

মানবের বাক্য ও মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"[৩]

রামপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থে বলেন,

"যিনি বলেন যে, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যিনি বুঝেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তায় আয়ত্ত করিবার বস্তু নয়, তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।"[৪]

কেনোপনিষদে বলা হয়েছে–

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।"[৫]

অর্থাৎ যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানতে পারিনি বস্তুত তিনিই তাঁকে জেনেছেন। আর যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জেনেছি তিনি তাঁকে জানেন না।

ব্রহ্মজ্ঞান দুঃসাধ্য হলেও সাধকেরা তাঁর স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা সাধনা করেছেন তাঁকে জানতে এবং পেতে। সাধনার দ্বারা অনেক মহৎ কাজ সাধিত হতে পারে। সাধকদের মতো দার্শনিকেরাও এই জীবন ও জগতের অন্তরালে যে মহতী সত্তা রয়েছেন তাঁর স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন। দার্শনিকেরাও প্রকৃতপক্ষে সাধক। দর্শন হচ্ছে বুদ্ধির আলোকে সত্যের অনুসন্ধান (an intellectual quest for truth)। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা প্রধানত বুদ্ধির (Intution) দ্বারা এবং ভারতীয় দার্শনিকেরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান (Spritual knowledge) দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন।

উপনিষদের ঋষিরা 'নেতি নেতি' (ন ইতি, ন ইতি) করে ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে–

"তদক্ষরংগার্গি,ব্রাহ্মণাঅভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমো'বায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রম্ অবাগমনো'তেজস্কমপ্রাণমমুখমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"[৬]

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হে গার্গি– সেই ব্রহ্ম স্থূল নন, অণু নন, হ্রস্ব নন, দীর্ঘ নন, লোহিত নন, স্নেহ নন, ছায়া নন, তমঃ নন, বায়ু নন, আকাশ নন, রস নন, শব্দ নন, গন্ধ নন, চক্ষু নন, শ্রোত্র নন, বাক্য নন, মন নন, তেজঃ নন, প্রাণ নন, মুখ নন, মাত্রা নন, অন্তর নন, বাহির নন, অতএব তিনি নির্বিশেষ।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে বলা হয়েছে–

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যম্ অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যমলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"[৭]

অর্থাৎ ইনি বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা নন, অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতাও নন, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী নন, সুষুপ্ত অবস্থায় প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ নন, সর্বজ্ঞ নন, অচৈন্যও নন। ইনি দর্শনের অতীত, লৌকিক ব্যবহারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনুমানের অতীত, লক্ষণের অতীত, মনের অগোচর, প্রমাণ বহির্ভূত, একমাত্র আত্মারূপেই ইনি অনুভবযোগ্য, জগৎ চরাচর হতে ইনি ভিন্ন। ইনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত। তাঁকেই আত্মা বলে জানবে।

কেনোপনিষদে বলা হয়েছে–
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।"[৮]

সেই ব্রহ্মে চক্ষু গমন করে না অর্থাৎ তাঁকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। বাক্য দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না, মন দ্বারাও তাঁকে চিন্তা করা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। যে প্রকারে আচার্য ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দেন তাও জানি না। এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা বিদিত সমস্ত বস্তু হতে পৃথক, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বিষয়েরও উপরে। যে সব পূর্বগামী আচার্য ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন তাঁদেরে নিকট থেকে এ কথাই আমরা শুনেছি।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে–
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥[৯]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও তিনি গ্রহণীয়

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে–
অশব্দমস্পর্শম্ অরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধমচ্চ যৎ।
অনাদ্যন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥[১০]

অর্থাৎ যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ বর্জিত, যিনি নিত্য অব্যয়, যিনি আদিহীন ও অন্তহীন, যিনি মহৎ তত্ত্ব হতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁকেই আত্মাকে জানতে পারলে জীব মৃত্যুর অধিকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

উপনিষদের ঋষিরা এভাবে নেতি নেতি করে ব্রহ্মকে জানতে চাইলেও অবশেষে বলেছেন,

"তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্।"[১১]

অর্থাৎ এই আত্মাই ইন্দ্রিয়, এই আত্মাই বহু ও অনন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, কারণরহিত, কার্যরহিত, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত; এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সর্বানুভূ। ইহাই অনুশাসন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে– "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"[১২]

অর্থাৎ বিশ্বজগতের সবই ব্রহ্ম।

"স এব অধস্তাৎ স উপবিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বম্।"[১৩]

অর্থাৎ তিনি অধোদেশে, উর্ধ্বদেশে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি সর্বত্র আছেন।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি সৎস্বরূপ, তিনিই একমাত্র সত্য– "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।[১৪]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, একখণ্ড লবণ জলে ফেললে যেমন তা জলেই বিলীন হয়, আর তা তুলে আনা যায় না; কিন্তু কোনো স্থান থেকে জল নিলে তাতে লবণস্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানময়। এই সর্বভূত হতে জীবাত্মা উত্থিত হয়ে তাতেই আবার বিলীন হয়। মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা থাকে না।[১৫]

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে– যা থেকে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাতে গমন করে ও যাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।[১৬]

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, এই সব কিছুই ব্রহ্ম, কারণ তাঁর থেকেই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, তাতেই লীন হয় এবং তাঁতেই জীবিত থাকে।[১৭]

ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব

উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মকে সগুণ এবং নির্গুণ দু'ভাবেই দেখেছেন। তাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মকে 'তৎ' এবং সগুণ ব্রহ্মকে 'সঃ' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। উভয়ই এক। উভয়ের মধ্যে কেবল ভাবের প্রভেদ। মায়া বলে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন। ঊর্ণনাভ যেমন জাল বুনিয়ে সেই জালে নিজেকে আবৃত করে রাখে, তেমনি নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াজালে আপনাকে আবৃত রেখে সগুণ হন। বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদের প্রবাদপুরুষ শঙ্করাচার্য ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অনন্ত, অসীম ও নির্গুণ। ব্রহ্ম এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, আত্মাই ব্রহ্ম– "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। ব্রহ্ম ও আত্মা সমার্থক। অত্ ধাতুর অর্থ সর্বব্যাপী। অৎ+মনিন্= আত্মা। যিনি সর্বব্যাপী তিনিই আত্মা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে– যিনি আত্মা তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম। ইনি অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্ম।[১৮]

শঙ্করাচার্য ছিলেন কেবলাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ– "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। শঙ্করের মতে দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি হতে ব্রহ্মকে বিচার করা যায়। যথা, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি হল জ্ঞান-প্রসূত। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জগৎ সত্য এবং ব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং সংহারকর্তা। এ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নানাবিধ গুণবান। এই ব্রহ্মকেই শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলেছেন। এই ঈশ্বরেরই আমরা পূজার্চনা করে থাকি। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ। তাঁর কোন প্রকার ভেদ নেই। এ দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে 'পরব্রহ্ম' (Supreme Lord) বলা হয়েছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ বলে শূন্য নয়।[১৯] তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন, মন্দমতিরাই নির্গুণ ব্রহ্মকে শূন্য বলে থাকেন। ব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ। আলোচনার সময় আমরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই নাম-রূপ এবং কর্মদ্বারা বিশেষিত করি। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ এবং স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক তাঁর তটস্থ-লক্ষণ। বেদান্তমতে ব্রহ্মের দুটি রূপ– পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম হল নির্গুণ ব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম হল সগুণ ব্রহ্ম।

> "পরব্রহ্ম নির্বিশেষ, উপাধিহীন ও নির্গুণ। অপরব্রহ্ম হল অবিশেষ, উপাধিযুক্ত এবং সগুণ। পরব্রহ্ম হল অবিশেষিত এবং দুর্জ্ঞেয়। অপরপক্ষে অপরব্রহ্ম হল বিশেষিত ও জ্ঞেয়। পরব্রহ্ম হল নিস্প্রপঞ্চ, অপরব্রহ্ম হল

সপ্রপঞ্চ। পরব্রহ্ম হল অ-দৈশিক, অ-কালিক ও কারণরহিত। অপরব্রহ্ম হল দৈশিক, কালিক এবং জগৎ সৃষ্টির কারণ। পরব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।"[২০]

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক রামানুজের মতে ব্রহ্মাই চরম সত্য ও সত্তা। ব্রহ্মাতিরিক্ত বা ব্রহ্ম ভিন্ন কোন সত্তা নেই। ব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছিন্ন অংশ– চিৎ ও অচিৎ। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের অচিৎ অংশ বিভিন্ন জড়বস্তুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন জীবাত্মা ব্রহ্মের চিৎ অংশ। চিৎ ও অচিৎ অংশ অব্যক্তরূপে যখন ব্রহ্মে অবস্থান করে তখন তাঁকে 'কারণ-ব্রহ্ম' বলা হয়। আর জগৎসৃষ্টিকালে যখন ব্রহ্মের অচিৎ অংশ জড়জগতে পরিণত হয় এবং চিৎ অংশ জীবাত্মারূপে প্রকাশিত হয় তখন তাঁকে 'কার্য-ব্রহ্ম' বলা হয়।

বেদান্তের পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় একটু ভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। গীতায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে পুরুষরূপে অভিহিত করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনেও আত্মাকে পুরুষ বলা হয়েছে।[২১] ভগবদ্গীতায় তিন প্রকার পুরুষের কথা বলা হয়েছে– (১) ক্ষরপুরুষ (২) অক্ষরপুরুষ ও (৩) পুরুষোত্তম।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।[২২]
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থো'ক্ষর উচ্যতে ॥

ইহলোকে **ক্ষর** ও **অক্ষর** এই দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে। সর্বভূতে বিরাজমান পুরুষ হচ্ছেন **ক্ষর** পুরুষ আর কূটস্থ বা অবিকারী পুরুষ **অক্ষর** পুরুষ বলে কথিত।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতো'মক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতো'স্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥[২৩]

যেহেতু আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, তাই লোক-ব্যবহারে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলে খ্যাত।

ক্ষর পুরুষ হচ্ছে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের পরিণামী রূপ। চেতন এবং অচেতন সকল ভূত (সর্বভূতানি) জল-বুদ্বুদের ন্যায় তাঁর (পরব্রহ্ম) থেকেই উৎপন্ন হয়ে তাতেই বিলীন হয়। পরব্রহ্মের ক্ষরভাব বা অপরিণামী (বিকাররহিত), নির্বিশেষ, কূটস্থ ও নির্গুণ রূপই **অক্ষর-পুরুষ**। আর পুরুষোত্তমভাবে তিনি নির্গুণ হয়েও সগুণ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা।

গীতাশাস্ত্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তিন প্রকার পুরুষের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে–

"ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী– আত্মার বহুভূত বহুরূপে যে পরিণাম, তাহাকেই ক্ষরপুরুষ বলা হইতেছে। এখানে পুরুষ বলিতে ভগবানের বহুরূপ (Multiplicity of the Divine Being) বুঝাইতেছে– পুরুষ এই প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রকৃতিরই অন্তর্গত। অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী, নীরব, নিষ্ক্রিয় পুরুষ– ইহা ভগবানের এক-রূপ (The Unity of the Divine Being), প্রকৃতির স্বাক্ষী; কিন্তু প্রকৃতি ও তাহার কার্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমপুরুষই উত্তম, উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণামী একত্ব এই দুই-ই উত্তমের। তাঁহার প্রকৃতির, তাঁহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে, তাঁহার ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার মহান্ নীরবতা ও অচলতার দ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন; তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুইয়েরই উপরে।"[২৪]

ভগবদ্গীতায় পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বরের স্বরূপকে আরও নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। গীতায় যিনি অব্যক্ত, বেদান্ত দর্শনে তিনি নির্গুণ বা পরব্রহ্ম। আবার বেদান্ত দর্শনে যিনি সগুণ বা অপরব্রহ্ম গীতায় তিনি ব্যক্ত বা ক্ষরপুরুষ।

মহাত্মা গুরুনাথের অভিমত

মহাত্মা গুরুনাথ ঈশ্বরের সগুণত্ব এবং নির্গুণত্ব ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। সগুণ বলতে সাধারণত আমরা গুণযুক্ত পদার্থকে বুঝে থাকি এবং নির্গুণ বললে গুণহীন পদার্থ বা যার কোন গুণ নেই তাকে বুঝে থাকি। কিন্তু জগতে গুণ ভিন্ন কোন পদার্থ নেই। আমরা যে সমস্ত পদার্থকে দ্রব্য বলে বিবেচনা করি, সে সব পদার্থ কতকগুলো গুণসমষ্টিমাত্র। জগতের যাবতীয় পদার্থই ঈশ্বরের সগুণ অংশ থেকে সৃষ্ট। ঈশ্বর যেহেতু গুণময় তাই তাঁর অংশভূত বস্তুনিচয়ও গুণসংযুক্ত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, তুমি, আমি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই কতকগুলো গুণের সমষ্টিমাত্র। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য এবং তার গুণকে আলাদা হিসেবে দেখা হয়েছে। তাই আমরা বলে থাকি, কাষ্ঠের গুণ, জলের গুণ, অগ্নির গুণ, আত্মার গুণ ইত্যাদি। আমরা বলি না যে, কাষ্ঠগুণ, জলগুণ, অগ্নিগুণ, আত্মগুণ। সুতরাং দ্রব্য এবং তার গুণ পৃথক। মহাত্মা গুরুনাথ এ মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন–

> “দ্রব্য এবং তার গুণ বাস্তবিক একই পদার্থ। প্রভেদ এই যে গুণ ব্যাষ্টিভাব-জ্ঞাপক এবং দ্রব্য গুণের সমষ্টিপ্রকাশক। দ্রব্য বলিলে ক,খ, গ, ঘ, ইত্যাদি গুণ-সমষ্টি বুঝায়, আর গুণ বলিলে, হয় ‘ক’, না হয় ‘খ’ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ানুসারে উচ্চারিত গুণ বা গুণাবলি বুঝায়। আবার দ্রব্যমাত্রই যে গুণের আধার, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কেন না ঐ গুণ-সমষ্টিই প্রত্যেক গুণের আধার। সুতরাং এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কর্তা তিনিও অনন্ত গুণেরই আধার।”[২৫]

তিনি বলেন আরও,

> “এ জগতে যা কিছু আছে সবই গুণযুক্ত ও গুণময়। গুণ ভিন্ন কোন দ্রব্য নাই, গুণ ব্যতীত কোন ক্রিয়া হতে পারে না। যে দ্রব্যের ক্রিয়া হবে তাই গুণসমষ্টি। দ্রব্যত্বাদি জাতিও গুণসাপেক্ষ। পদার্থের সম্বন্ধও গুণ ছাড়া অসম্ভব। অভাব পদার্থও গুণ বা গুণসমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কি জড় পদার্থ, কি আত্মা, যেদিকে তাকানো যায়, দেখা যাবে সবই গুণসমষ্টি। কি সৃষ্ট, কি স্রষ্টা, যার বিষয়ই ভাবা হোক না কেন, দেখা যাবে সবই গুণসমষ্টি। অতএব যে গুণ হতে সৃষ্টি, যে গুণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, যে গুণ দ্বারা সৃষ্টি, যে গুণেতে সৃষ্টি, যে গুণ সম্বন্ধে সৃষ্টি, যে গুণ স্রষ্টা ও যে গুণই সৃষ্ট, সেই নিখিল জগতের একমাত্র পরম পদার্থ, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় পদার্থও যে গুণময় তাতে আর সন্দেহ কি।”[২৬]

ঈশ্বর নির্গুণ বলতে ঈশ্বরকে গুণহীন বুঝায় না। গুরুনাথের মতে যাঁর অনন্ত গুণের সম্যক জ্ঞান বা অবধারণ এ পর্যন্ত কারও হয়নি এবং হতেও পারে না, তিনিই নির্গুণ। পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন লিখেছেন, “পূর্ব্ব-পদান্তর্গতস্য প্রাদিভ্যঃ পরস্য উত্তরভাগস্য ধাতুজস্য বা লোপঃ”। অর্থাৎ প্রাদির (প্র,পরা, নির্, দুর্ প্রভৃতির) পরস্থিত পূর্ব পদান্তর্গত উত্তরভাগ যদি ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তবে বহুব্রীহি সমাসে তার বিকল্পে লোপ হয়। যেমন, প্র-পতিতং পর্ণং যস্মাৎ সঃ প্রপতিতপর্ণঃ প্রপর্ণো বা (বৃক্ষঃ)। এ নিয়মানুসারে মহাত্মা গুরুনাথ ‘নির্গুণ’ পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে–

“নির্ব্বিদিতাঃ নির্বেদ্যাঃ বা (নিরবধারিতাঃ নিরবধার্য্যাঃ বা ইয়ত্তয়া সংখ্যয়া বা) গুণাঃ যস্য তৎ নির্গুণঃ, তস্মৈ নির্গুণায়”।[২৭]

অর্থাৎ নির্বিদিত বা অজ্ঞাত হয়েছে গুণ যাঁর অথবা এ পর্যন্ত যাঁর গুণরাশি সংখ্যায় অবধারিত হয়নি, তিনি নির্গুণ। সুতরাং নির্গুণ শব্দের দ্বারাও ঈশ্বরকে গুণময়ই বুঝায়।

যোগ দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঈশ্বর পরমপুরুষ; তিনি অন্যান্য সাধারণ পুরুষ হতে ভিন্ন। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হয়েছে। দেহরূপ পুরিতে যিনি বাস করেন তিনি পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা। উপনিষদ ও অন্যান্য দর্শনে এই আত্মাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, সাধারণ পুরুষ বা জীবাত্মা অবিদ্যা, অস্মিতা,

কর্মফল, বাসনা প্রভৃতির দ্বারা প্রপীড়িত। কিন্তু ঈশ্বর এসবের উর্ধ্বে। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, অনাদি ও অনন্ত। তাঁর ইচ্ছায়ই এই জগৎ চলে। তিনি জগতের শাসক।

ন্যায় দর্শনেও পরমাত্মাকে ঈশ্বর বলা হয়েছে এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন ও আত্মা জগতের উপাদান কারণ; ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ।

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কণাদ তাঁর 'বৈশেষিক সূত্রে' ঈশ্বর সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালের বৈশেষিক ভাষ্যকারগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তঁদের ভাষ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী। তিনি সকল প্রকার রাগ, দ্বেষ ও সংস্কারমুক্ত। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ আর পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। ঈশ্বর ও পরমাণু সহ-অবস্থানকারী।

ঈশ্বরের একত্ব ও বহুত্ব

হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করে থাকেন। তাই অনেকে মনে করেন হিন্দুরা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা তিনি এক। ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মজীবনের প্রথম স্তরে মানুষ বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত ছিল না। কোন কোন মতে, ভয় এবং অলৌকিক বিশ্বাস থেকে ঈশ্বরের ধারণা জন্ম নিয়েছে। আদিম মানুষ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, নদ-নদী, সাগর, জলপ্লাবন, মহামারী, ভূকম্পন, ঝড় প্রভৃতির নৈসর্গিক বস্তুর রূপ ও শক্তি দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। তখন তারা এসবকেই ঈশ্বর বলে মনে করেছে। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে ধারণারও পরিবর্তন হয়। তারপর মানুষ বিশ্বাস করে এ সবের পিছনে এক অতিবর্তী সত্তা বিদ্যমান। সেই অতিবর্তী সত্তাই ঈশ্বর।

প্রাথমিক স্তরে প্রাচীন গ্রীস, মিশর ও ভারতবর্ষের মানুষেরা বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তখনকার মানুষ আকাশের বিশালতা, গহীন অরণ্যের গভীরতা, শ্বাপদ জন্তুর হিংস্রতা এবং প্রকৃতির ভয়াবহতা দেখে বিস্মিত হয়েছে এবং ভয়ে ও অন্ধ বিশ্বাসে প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করেছে। পরবর্তীতে সে সব প্রাকৃতিক শক্তিই এক এক জন দেবতায় উন্নীত হয়েছে। এখনও হিন্দুরা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গাছপালা, বিভিন্ন জীবজন্তুর পূজা করে থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতি ও প্রশংসা আছে। পুরাণ সাহিত্য তো দেবদেবীদের এক বিরাট এনসাইক্লোপিডিয়া। নিরুক্তকার যাস্ক দেবতা বিচারকালে বলেছেন–

> "দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে"– অর্থাৎ দেবতাগণের এক আত্মা বহুরূপে কীর্তিত।[২৮] যেমন একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই দেহেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ এবং অঙ্গাঙ্গিরূপে সম্বন্ধ, সেরূপ সকল দেবদেবী সেই এক আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ– "একস্যাত্মনো'ন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি"।[২৯]

বেদের সংহিতা ভাগেও দেবতাদের স্বরূপ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"– অর্থাৎ সেই এক শাশ্বত সত্তাকে বিপ্রগণ অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহু প্রকার বলে থাকেন।[৩০]

"একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি"– সেই এক সৎকে ঋষিগণ বহুরূপে কল্পনা করেন।[৩১]

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" – ব্রহ্ম এক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।[৩২]

প্রাচীন পারসিক ধর্মে দ্বি-ঈশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল এই জগৎ শুভ ও অশুভ, ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সংমিশ্রণ। যে ঈশ্বর কল্যাণের প্রতীক তাকে 'আহুর মজদা' এবং যে ঈশ্বর অকল্যাণের

প্রতীক তাকে 'আর্হিমান' বলা হত। আহুর মজডা সব সময় মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায় এবং আর্হিমান মানুষকে অকল্যাণ বা খারাপ পথে নিয়ে যায়- এই ছিল তাদের ধারণা।

বহু-ঈশ্বরবাদ বা বহু-দেবতাবাদ এবং দ্বি-ঈশ্বরবাদ নানা দোষে দুষ্ট। এজন্য একেশ্বরবাদের উদ্ভব। বর্তমানে একেশ্বরবাদ অধিকাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করেছে। এ মতানুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ।

পরমেশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং সদাশিব বলেছেন–
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পার্ত্তৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিষ্ফলং নির্বিকল্পম্॥[৩৩]

পুরাণকারেরাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদেরকে পরমেশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। এখনও হিন্দু সমাজের অনেকে যিনি যে দেবতার ভক্ত তাঁকে পরমেশ্বরের আসনে বসিয়ে থাকেন। সমাজের অনেকে আবার মনুষ্যদেহী গুরুকেও পরমেশ্বরের আসনে বসাতে অভিলাষ করেন।

ঈশ্বরের সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব

পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার– এ ব্যাপারেও নানা মতভেদ আছে। হিন্দুধর্মে সাকার এবং নিরাকার উভয় প্রকার উপাসনার অনুমোদন আছে। হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতারপুরুষ, সাধক এবং দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের সমষ্টিই হিন্দুধর্ম। এই ধর্ম কোন মতকেই অগ্রাহ্য করেনি। এ কারণে এই ধর্মে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানে সাকার উপাসনাও আছে, আবার নিরাকার উপাসনাও আছে। বৈদিক যুগে কোন মূর্তি পূজা ছিল না। বৈদিক দেবতারা ছিলেন অশরীরী। ঋষিরা তাঁদের রূপ কল্পনা করে অঙ্গ-প্রতঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু বর্তমানকালের মতো তাঁদের কোন মূর্তি ছিল না। তখন যজ্ঞবেদী তৈরি করে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হতো। সেখানে কোন দেবতার মূর্তি থাকত না। উপনিষদের ঋষিরা কখনও কখনও ঈশ্বর বা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেছেন বটে, কিন্তু তা রক্ত-মাংসে গড়া মানব-মানবী নয়। অথবা হিন্দুরা বর্তমানে যেভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করেন, সেরূপ নয়। উপনিষদে 'ওঙ্কার' শব্দ দিয়ে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়েছে।[৩৪] কঠ, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, প্রশ্ন প্রভৃতি উপনিষদে ওঙ্কার (ওম্-কার) শব্দের ব্যাখ্যা আছে। মাণ্ডূক্যোপনিষদে বলা হয়েছে–

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যনম্ ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি।
সর্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥[৩৫]

অর্থাৎ 'ওম্' পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রতীক বা নাম। এ সমস্ত জগৎই 'ওম্' এই অক্ষরস্বরূপ। যা কিছু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ সবই ওঙ্কার, ত্রিকালের অতীত আরও যা কিছু আছে তাও ওঙ্কার। 'উপনিষদ' গ্রন্থে উপর্যুক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক বলে মনে করা হয়। শালগ্রামকে অবলম্বন করে যেমন বিষ্ণুপূজা করা হয় (এখানে শালগ্রাম বিষ্ণুর প্রতীক) সেরূপ ওঙ্কারকে অবলম্বন করে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়।[৩৬]

হিন্দুধর্মে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতে সাকার উপাসনার বিধান রয়েছে। এ মতে বলা হয়, ঈশ্বরের নিরাকার ভাব সকলে ধারণা করতে পারে না। তাই নিকৃষ্টচেতা উপাসকদের হিতের জন্য নিরাকার পরম সত্তার রূপ কল্পনা করা হয়। প্রথমে সাকার উপাসনা করলে জ্ঞানযোগ হয়, সেই জ্ঞানযোগ ছাড়া মানুষ

কখনও নিরাকার ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারে না। যোগশাস্ত্র প্রণেতা পতঞ্জলি এবং তাঁর ভাষ্যকারেরা নিরাকারবাদের সমর্থক হয়েও বলেছেন যে, প্রথম অবস্থায় নির্গুণে চিত্ত প্রবেশ করতে পারে না। সে কারণে সগুণে চিত্ত মনোনিবেশ করতে হয়। চিত্ত সগুণে নিবিষ্ট হলে একাগ্রতা জন্মে। তখন উপাসিত ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সমাধিযোগ সিদ্ধ হবে। মহাত্মা গুরুনাথ নিজেই সাকারবাদের পক্ষে যুক্তি উল্লেখ করে তা আবার খণ্ডন করে বলেছেন–

> "ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, তেমনই শাস্ত্রসিদ্ধ। সাকারবাদের অনুকূলে নিম্নলিখিত বাক্যনিচয় লিপিবদ্ধ হইতে পারে– যাঁহার জ্ঞানাভিমান আছে, তিনি সাকার না মানিতেও পারেন। কিন্তু, হে ভক্ত, হে প্রেমিক! তুমি কিছুতেই সাকার না মানিয়া পার না। যখন অভীষ্ট-দর্শনার্থে তোমার অতি মহতী বাসনা জাগিবে, যখন তুমি আরাধ্য দেবকে নয়ন-গোচর না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে না, প্রত্যুত মুহুর্মুহুঃ মোহপ্রাপ্ত হইবে, যখন তোমার নয়ন-যুগল হইতে গঙ্গা-সলিলের ন্যায় বেগে অশ্রুধারা পতিত হইবে, মুখে হাহাকার-শব্দ হইতে থাকিবে, কি করিতেছ, কি না করিতেছ, কিছুরই দিকে লক্ষ্য থাকিবে না, কেবল 'হা নাথ! হা দেব'! বলিয়া ভীমনাদে চীৎকার, ক্রন্দন, ও হুঙ্কার করিতে থাকিবে, তখন কি কেহ তোমাকে বুঝাইতে পারিবে যে, তোমার উপাস্য দেবকে তুমি কখনও দেখিতে পাইবে না? অথবা কেহ ঐরূপ বলিলে কি তুমি তাহার কথা সত্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করিবে? কখনই নহে। গুণের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম অতি প্রধান, সুতরাং গুণীর মধ্যে ভক্ত ও প্রেমিক শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা না মানিয়া পারেন না তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব সাকারবাদ সত্য। সাকারবাদ সত্য বলিয়া যে নিরাকারবাদ মিথ্যা তাহা নহে। তবে বক্তব্য যে, ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বশক্তিমান; সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্তা ধর্ম্ম থাকায় তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার হইতে পারেন"।[৩৭]

গুরুনাথ উক্তরূপ মন্তব্য করে পুনরায় নিরাকারবাদের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন–

> "ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি প্রেমিক, ইঁহারা স্বাবলম্ব্য গুণে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই ঐ সকল গুণের চরমোৎকর্ষ-স্থান অর্থাৎ ঈশ্বর নিরীক্ষিত হন। এতদ্বিষয়ে মতান্তর নাই। কিন্তু উক্ত দর্শনকালে কি ঈশ্বর তোমার আমার মতো পরমাণু সমুৎপন্ন দেহ ধারণ করেন? যদি বল, করেন, তবে তো তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেন। কিন্তু যিনি 'অবাঙ্মনসগোচর' তিনি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য– এ কথা কি উন্মত্তবৎ নহে? তবে তুমি বলতে পার যে, ঈশ্বর-দর্শনও স্বীকার করিতেছ, অথচ তাহাকে সাকার মানিতেছ না, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর দর্শনের সময় ইন্দ্রিয়গণ মনে লীন হয়। পরে জীব স্বীয় প্রভুর কৃপায় তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মুক্ত হয়। এই সাক্ষাৎকার সময়ে লীনেন্দ্রিয় মনের জীবাত্মায় লীনতা-নিবন্ধন দর্শন, শ্রবণ, মননাদি সর্ব্বশক্তিই জীবে থাকে। একারণ সে দর্শন এক অনির্ব্বচনীয় দর্শন। সে 'অ-রূপ-রূপদর্শন' যাঁহার অদৃষ্টে ঘটে, সে ব্যক্তিই তাহা অনুভব করিতে পারে, কিন্তু বলিতে পারে না। এ কারণ ইহা নিশ্চিত যে, সাধারণতঃ যে সকল মূর্তি কল্পনা করা হয়, তাহা ঈশ্বর নহেন। তবে তদীয় সর্ব্বব্যাপিত্বের জন্য সর্ব্বত্রই তৎসত্তা স্বীকারে কোনও দোষ নাই"।[৩৮]

ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা

উপনিষদে জগৎ-স্রষ্টাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ অতি বৃহৎ বা মহৎ। তিনি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন–'সর্বমিদং ততম্'। এই বিশ্বজগৎ কত বড় তার ধারণা বিজ্ঞানীরাও আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি। যেটুকু দিতে পেরেছেন তার আলোকে আমরা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাই। আমরা পৃথিবী নামক একটি গ্রহের অধিবাসী। পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। সৌরজগৎ সূর্য এবং তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গঠিত। সূর্য একটি নক্ষত্র। ১৩ লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে সূর্যের সমান হয়। এ থেকে সূর্য কত বড় তা অনুমান করা যায়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। অনেক নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও অনেক বড়। এসব নক্ষত্রেরও রয়েছে বহু সংখ্যক গ্রহ-উপগ্রহ। এ থেকে আমরা এই বিশ্বজগতের আকার সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি। সুতরাং এই বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা তিনি কত বড় তা অনুমেয়। কিন্তু তিনি নিরাকার। এখানে নিরাকার শব্দের অর্থ যাঁর আকার নেই তা নয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাত্মা গুরুনাথ নিরাকার শব্দের অর্থ করেছেন, যাঁর আকার নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উপনিষদের ঋষিরা তাঁকে সর্বব্যাপী বলেছেন– 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। তিনি অসীম অনন্ত। আবার তিনি

সসীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চেতন ও অচেতন সমস্তই তাঁরই অংশ। মহা সমুদ্র থেকে এক গ্লাস জল তুলে নিলে সমুদ্রের যেমন সমুদ্রত্ব নষ্ট হয় না, তেমনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকে জীব ও জড় জগতের সৃষ্টি হলেও তাঁর ব্রহ্মত্ব ম্লান হয় না। বিভিন্ন দেবদেবী সেই পরম সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা কার্যপ্রতিনিধি মাত্র। এসব দেবদেবী এবং অবতার পুরুষদের ভেতর দিয়ে আমরা সেই পরমেশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি।

ঈশ্বরের অবতার রূপ

অবতারবাদ হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভগবদগীতায় এবং পুরাণে অবতারতত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বর্ণনা আছে। গীতার অন্যতম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি মানবরূপে এই পৃথিবীতে এসে অধর্মের গ্লানি দূর করে সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের দমন করেছেন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেছেন। অনেকে রামকেও বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করেন। পুরাণে দশ অবতারের কথা আছে। শাস্ত্রে এটাও বলা হয়েছে যে অবতার অসংখ্য। হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের ধর্মগুরুকেও ভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করে থাকেন।

ঈশ্বরের মাতৃরূপ

হিন্দুধর্মে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে তাঁর পূজা করা হয়। দুর্গা, কালী, চণ্ডী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সেই ব্রহ্মশক্তিরই মাতৃরূপ। পুরাণে এই মাতৃরূপকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। বেদে বিশ্বস্রষ্টাকে ব্রহ্ম,পরমাত্মা, আত্মা, পুরুষ প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। দেবী দুর্গা এবং বিভিন্ন মাতৃদেবী ব্রহ্মশক্তিরই মূর্ত প্রতীক। শাক্তগণের মতে ব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি অভিন্ন। তাঁদের মতে যেমন জল ও তার তরলতা, দুগ্ধ ও তার ধবলত্ব, মণি ও তার জ্যোতি, সমুদ্র ও তার তরঙ্গ; তেমনি ব্রহ্ম ও তার শক্তি অভিন্ন। ব্রহ্মের তিনটি শক্তি– জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজিত। দেবী দুর্গা এই শক্তিত্রয়েরই সমষ্টি। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে–

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥[৩৯]

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥[৪০]

উপসংহার

বাতাসের অস্তিত্ব আছে। বাতাস সর্বব্যাপী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বাতাসকে দেখতে পাই না। সেরূপ ঈশ্বর আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু তিনি নিরাকার। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই নিরাকার হয়েও তিনি সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। সাধক বা ভক্তের আকুল আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না। সাধকের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি তাঁকে সেভাবেই দর্শন দিতে পারেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃশক্তিরূপে পূজা করে তাঁকে লাভ করেছিলেন। আসলে হিন্দুধর্মের সাধক-সাধিকা ও শাস্ত্রকারেরা তত্ত্বজ্ঞানী ও কল্পনাবিলাসী। স্রষ্টাকে তাঁরা একভাবে দেখে তুষ্ট হতে পারেননি। একই স্রষ্টা ও তাঁর শক্তিকে তাঁরা বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নরূপে দেখেছেন। তাই বিশ্বনিয়ন্তার এতো রূপ ও বৈচিত্র্য।

হিন্দু ধর্ম ও দর্শন উদারবাদী। সে কারণে হিন্দুদের কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী, কেউ জ্ঞানবাদী, কেউ ভক্তিবাদী, কেউ বা কর্মবাদী। হিন্দুরা ঈশ্বরকে একভাবে দেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তাই তাঁদের কাছে ঈশ্বরের বহু রূপ। যিনি তাঁকে যে-ভাবে দেখতে চেয়েছেন, যে-ভাবে উপলব্ধি করেছেন ঈশ্বর তাঁকে সেভাবেই ধরা দিয়েছেন। উপনিষদের ঋষিরা তাঁকে নিরাকার জ্ঞান করেছেন। তার পূর্বে ঋগ্বৈদিক যুগের ঋষিরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের সত্তা খুঁজে পেয়েছেন। তাই তাঁরা অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, ঊষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে পূজা করেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে, তিনি জীব ও জগৎ হতে আলাদা সত্তা। তিনি জগতের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, শাসনকর্তা ও সংহারকর্তা।

তিনি আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন, অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন, ভাল কাজের পুরস্কারস্বরূপ আমাদের স্বর্গে স্থান দেন। সুতরাং সমাজরক্ষক পার্থিব রাজার প্রতি আমাদের যেমন একটি কর্তব্য আছে, সেরূপ জগৎরক্ষক ঈশ্বরের প্রতিও আমাদের একটি কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য হচ্ছে– তাঁকে ভক্তি করা, তাঁর গুণগান করা, তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া ইত্যাদি। বস্তুত সকল ধর্মে এবং সকল সমাজে ঈশ্বর সম্পর্কে এরূপই একটি ধারণা বর্তমান।

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত *মনুসংহিতা* (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩) , ২/৬ পৃ. ২০।

২ রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৩) ১/১৬৪/৪৬ পৃ. ২৯৯।

৩ অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত *উপনিষদ* (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৮) (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/৪/১) পৃ. ২৯৪ ।

৪ রামপদ চট্টোপাধ্যায়, *বেদান্ত প্রবেশ* (কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রা. লি. ১৯৯৬) পৃ. ১১।

৫ অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, *উপনিষদ*, অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, *উপনিষদ*, প্রাগুক্ত (কেনোপনিষদ, ২/৩,) পৃ. ৪২ ।

৬ অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, *উপনিষদ*, প্রাগুক্ত, (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ৩/৮/৮), পৃ. ৭৬৯।

৭ *তদেব*, (মাণ্ডূক্যোপনিষদ, মন্ত্র নং৭), পৃ. ২৫৮।

৮ *তদেব*, (কেনোপনিষদ, ১/৩), পৃ. ৩৬।

৯ *তদেব*, (মুণ্ডক উপনিষদ, ৩/১/৮), পৃ. ২৪৩।

১০ *তদেব*, (কঠোপনিষদ, ১/৩/১৫), পৃ. ১১৪।

১১ *তদেব*, (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২/৫/১৯), পৃ. ৭৪৩।

১২ *তদেব*, (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১), পৃ. ৪৯৩।

১৩ *তদেব*, (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭/২৫/১), পৃ. ৬২২ ।

১৪ *তদেব*, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/১/২), পৃ. ২৮৮।

১৫ "স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে।"

তদেব, (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২/৪/১২) পৃ. ৭৩৪।

১৬ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।"

তদেব, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩/১/১), পৃ. ৩০৯ ।

১৭ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিনিতি শান্ত উপাসিত।"

তদেব, (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১), পৃ. ৪৯৩।

১৮ "স বা এস মহানজ আত্মাজরো'মরো'ভয়ো বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ।"

তদেব, (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/২৫), পৃ. ৮২০ ।

[১৯] বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শূন্যবাদ (Nihilism) অনুসারে এই জগতের কোন কিছুর সত্তা নেই, সবই শূন্য। জড়জগৎ বা মনোজগৎ বলে কিছু নেই। এই মতবাদকে শূন্যবাদ বলা হয়।

ড. নীরোদবরণ চক্রবর্তী, *ভারতীয় দর্শন* (কলকাতাঃ দত্ত পাবলিশার্স, ১৯৯৫) পৃ. ১০৭।

[২০] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, তৃতীয় খণ্ড (কোলকাতাঃ এম. সরকার পালিশিং হাউজ, ২০০৬) পৃ. ৫৮।

[২১] দেহরূপ পুরীতে যিনি বাস করেন তিনি পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। পুরুষ শব্দের এখন অর্থ বিপর্যয় ঘটেছে।

[২২] গীতাশাস্ত্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (কলকাতাঃ প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৯৬) ১৮/১৬ পৃ. ৪৬১

[২৩] *তদেব*, ১৫/১৮ পৃ.

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৪৬১।

[২৫] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, *তত্ত্বজ্ঞান*, (প্রকাশক– জ্ঞানেন্দ্রনাথ অধিকারী, সভাপতি, সত্যধর্ম্ম মহামণ্ডল, বাংলাদেশ) ১ম খণ্ড (উপাসনা) পৃ. ১৫২।

[২৬] *তদেব*, পৃ. ১৫২–৫৩।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ১৫৫– ৫৬।

[২৮] যাস্ক, নিরুক্ত, (কলকাতাঃ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৭) দৈবতকাণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, প্রথমপাদ, পঞ্চম খণ্ড পৃ. ২৭০।

[২৯] তদেব, পৃ. ২৭০।

[৩০] *প্রাগুক্ত, ঋগ্বেদ-সংহিতা* (কলকাতা, হরফ প্রকাশনী) ১/১৬৪/৪৬ পৃ, ২৯৯।

[৩১] *তদেব*, ১০/১১৪/৫ পৃ. ৬২৪ ।

[৩২] *প্রাগুক্ত*, (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬/২/১), পৃ. ৫৭৭।

[৩৩] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

[৩৪] ওংকার শব্দ দিয়ে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাণ্ডূক্যোপনিষদেই প্রথম দেখা যায়।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, (মাণ্ডূক্যোপনিষদ, মন্ত্র সংখ্যা ১) পৃ. ২৫৪।

[৩৬] *তদেব*, পৃ. ২৫৪।

[৩৭] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

[৩৮] তদেব, পৃ. ১৩৭

[৩৯] স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত ও অনূদিত *শ্রীশ্রীচণ্ডী* (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৭) ৫/৩৪ পৃ. ১৩৭।

[৪০] তদেব, ৫/৭৩ পৃ. ১৯৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

ভাসের অবিমারক নাটকে সমাজভাবনা

ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস*

Abstract: Bhāsa is a renowned dramatist of Sanskrit literature in pre-Kālidasa era. Thirteen dramas written by him are the invaluable asset of Sanskrit literature. The drama *Avimāraka* is one of them. The hero of drama is Avimāraka. His family got degraded caste being cursed by the Sage. Living a life of low caste he also keeps implicit relationship with his family. Then incidentally he developed deep love relationship with princess Kurangī. The hero and the heroine's unequal social status and caste became a hindrance to the recognition of their marriage. In this context the hero's real identity was revealed through the presence and truth telling of the sage. By order of the sage the social marriage of hero and heroine was completed. It is true that literature is bound on the society. That is why a picture of the society can be found through the analysis of litlerature. The drama *Avimāraka* by Bhāsa is not an exception. Therefore, a picture of the contemporary society can be found through the analysis of this play's characters, dialogues and plot. The picture of that social life is neatly presented step by step in this paper.

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস একজন প্রথিতযশা নাট্যকার। ভারতীয় সাহিত্যের বহু কবি সাহিত্যিক তাঁরভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গদ্যকাব্যকার বাণভট্টভাসের নাট্যশিল্পকে দেবমন্দিরের সাথে তুলনা করেছেন। মন্দির নির্মাণের সূত্রপাত হয় দক্ষ সূত্রধারের হাতে, ভাসের নাট্যকাব্যগুলিও শুরু হয়েছে সূত্রধারের মাধ্যমে। মানসম্মত মন্দিরে থাকে বহুতলা, বহু কক্ষ। সেখানে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। ভাসের নাটকেও রয়েছে বহু চরিত্র, বহু সংলাপ, নানা কাহিনী। মন্দির পতাকা দ্বারা শোভিত হয়। ভাসের নাটকেও বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রভৃতি নাট্যাঙ্গিক সুপ্রযুক্ত হয়েছে। এভাবে একজন সুদক্ষ নির্মাণশিল্পীর শিল্পকর্ম দেবমন্দির-তুল্য নাট্যকাব্য রচনা করে বিদ্বৎসমাজে ভাস প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছেন[১]। *অবন্তীসুন্দরী* কাব্যের রচয়িতা দণ্ডীর মতে, মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি সন্ধি ভাসের নাট্যকাহিনীকে সুবিভক্ত করেছে, বিভিন্ন বৃত্তি নাটকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ-ধরনের মানসম্পন্ন নাট্যকর্ম সৃষ্টির জন্যনাট্যপিপাসুদের মাঝেভাস বহুদিন বেঁচে থাকবেন[২]। *প্রসন্নরাঘব* নাটকের রচয়িতা জয়দেব ভাসকে দেবী সরস্বতীর নির্মল হাস্যের সাথে তুলনা করেছেন[৩]। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের এমন একজন বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ১৯১০ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রশংসার অক্ষরে সীমাবদ্ধ ছিল। সে-পর্যন্ত তাঁর কোনো রচনা আমাদের হাতে পৌঁছে নি। শেষে ১৯০৯ সালে টি. গণপতি শাস্ত্রী পুরাতন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের মনলিক্কর নামক মঠে তেরোখানি রূপক আবিষ্কার করেন। রূপকগুলোকে নিম্নরূপ ভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়–

রামায়ণ-কাহিনীভিত্তিক নাটক–*প্রতিমানাটক* ও*অভিষেকনাটক*।

মহাভারত-কাহিনীভিত্তিক নাটক–*কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ, মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র* ও *বালচরিত।*

উদয়নকথা-ভিত্তিক নাটক–*প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* ও*স্বপ্নবাসবদত্ত*।

লোকবৃত্তান্ত আশ্রিত নাটক–*অবিমারক* ও *চারুদত্ত*।

* প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রূপকগুলোর রচয়িতা ভাস নাকি অন্য কেউ–এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে[৪]। কিন্তু রূপকগুলোর সূচনা-সমাপ্তি, রূপকগুলোতে নাট্যশাস্ত্রের নিয়মনীতি লঙ্ঘন এবং রূপকগুলোতে একই ধরনের সংলাপের ব্যবহার থেকে প্রমাণিত হয় সবগুলো রূপক একই ব্যক্তির রচনা। আবার, রাজশেখরের *সূক্তিমুক্তাবলী*-তে বলা হয়েছে–

> "ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
> স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভুন্ন পাবকঃ ॥"[৫]

উপর্যুক্ত শ্লোক থেকে প্রতিপন্ন হয়, *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের রয়য়িতা ভাস। অতএব, *স্বপ্নবাসবদত্ত*-সহ তেরোখানি রূপকের রচয়িতা একই ব্যক্তি এবং তিনি ভাস, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত।

ভাসের আবির্ভাব কাল

নাট্যকার ভাসের আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতোভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিকপন্থী দুটি শ্রেণি স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত দিয়েছেন। প্রাচীনপন্থীদের অনুসারী হলেন– টি. গণপতি শাস্ত্রী, হরপ্রসাদশাস্ত্রী, এ. বি.কিথ, এ. ডি.পুসলকর, এ. বি. যোগেন্দ্রগাড়ুকর প্রমুখ। তাঁদের মতে, খ্রি.পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রি. ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী যে-কোনো সময়ে ভাসের জন্ম হতে পারে। আধুনিকপন্থীদের অনুসারী হলেন[৬]– রামাবতার শর্ম্মা, পি. ভি. কানে, সি. আর.দেবধর প্রমুখ। তাঁদের মতে, খ্রি. ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রি. একাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে কোনো সময়ে ভাসের আবির্ভাব হতে পারে। যুক্তিতর্ক যা-ই হোক, একথা বলা যায় যে, নাট্যকার ভাস মহাকবি কালিদাসের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ, কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের প্রস্তাবনায় ভাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে কালিদাস নিজেকে বর্তমান সময়ের এবং ভাসকে পুরাতন কালের কাব্যকার বলে উল্লেখ করেছেন[৭]। আবার,ভাসের নাটকে অশ্বঘোষের রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিতে* বলা হয়েছে–

"কাষ্ঠং হি মথ্নন্ লভতে হুতাশং ভূমিং খনন্ বিন্দতি চাপি তোয়ম্ ॥

নির্বন্ধিনঃ কিঞ্চন নাস্ত্যাসাধ্যং ন্যায়েন যুক্তং চ কৃতং চ সর্বম্ ॥"[৮]

> (কাঠ ঘষলে আগুন, মাটি খুঁড়লে জল পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আগ্রহশীল ব্যক্তির কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। ন্যায়ের সাথে তিনি সবকিছুই লাভ করতে পারেন।)

ভাসের *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে* বলা হয়েছে-

> "কাষ্ঠাদগ্নির্জায়তে মথ্যমানাদ্ভূমিস্তোয়ং খন্যমানা দদাতি।
> সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং মার্গারব্ধাঃ সর্বযত্নাঃ ফলন্তি ॥"[৯]

> (কাঠ ঘষলে আগুন সৃষ্টি হয়, মাটি খুঁড়লে জালদান করে। উৎসাহযুক্ত পুরুষের কাছে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়। মানুষের সব শুভ চেষ্টা সুপথে পরিচালিত হলে সাফল্য অবশ্যই আসে।)

উপর্যুক্ত শ্লোকদুটির শব্দ ও অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভাসের রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব রয়েছে[১০]। অতএব ভাস অশ্বঘোষের পরবর্তী। এখন, প্রশ্ন হলো ভাস কি কালিদাসের কাছাকাছি, নাকি অশ্বঘোষের? এ. বি. কিথ মনে করেন, ভাস অশ্বঘোষের কাছাকাছি। ভাসের নাটকের গঠনশৈলী, নাট্য-আঙ্গিকের প্রয়োগ, ভাষা ইত্যাদি দিক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কালিদাসের সাথে তাঁর সাদৃশ্য বেশি। অতএব, বলা যায় ভাস কালিদাসের কাছাকাছি। গুপ্তযুগের কবি হিসাবে কালিদাস যদি খ্রি. চতুর্থ শতকের হন তবে ভাসকে তার পূর্ববর্তী সময়ের মনে করে খ্রি. তৃতীয় শতকের কাব্যকার মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

ভাসের তেরোখানি রূপক আবিষ্কার সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশাল মাইলফলক। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিচিত্র শাখাযুক্ত, নাট্যগুণে সুসমৃদ্ধ রচনা উপহার দেওয়ার যোগ্যতা একমাত্র ভাসই দেখিয়েছেন। নাট্যপিপাসুদের কাছে সে-কারণে তিনি নমস্য হয়ে আছেন। আবার, রূপকগুলির নান্দীশ্লোক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–*চারুদত্ত, অভিষেক, প্রতিমানাটক*ব্যতীত বাকি দশটি রূপকে ভগবান নারায়ণ বা বিষ্ণুর স্তুতি করা হয়েছে। এ-থেকে সমালোচকরা মনে করেন, নাট্যকার ভাস বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কাব্যকার অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁর রচনায় বৌদ্ধধর্মেরই কথাবলা হয়েছে। কিন্তু ভাসের রূপকে সনাতন ধর্মেরই মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। সমালোচকরা সে-কারণে তাঁকে ব্যাস বা বাল্মীকির সমতুল্য মনে করে মুনি বিশেষণে আখ্যায়িত করেন[১১]।

ভাসের *অবিমারক* নাটকের বিষয়বস্তু

অবিমারকের সাথে কুরঙ্গীর প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক কাহিনী নিয়ে রচিত ছয় অঙ্কের নাটক *অবিমারক*। অবিমারকের প্রকৃত নাম বিষ্ণুসেন। অবি(মেষ)-রূপধারী অসুরকে বধ করার কারণে তিনি অবিমারক উপাধি পান।যৌবনবয়সে পরিবারের উপর বর্ষিত ঋষি-অভিশাপের প্রভাবে চণ্ডালত্ব গ্রহণ করে তিনি পরিবারের সাথে প্রচ্ছন্ন ভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই সময়ে বৈরন্ত্য নগরীর রাজা কুন্তিভোজের কন্যা কুরঙ্গী হস্তিকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাঁর সামনে পড়লে তিনি অসমসাহসিকতার সাথে রাজকুমারীকে রক্ষা করেন।সেই ঘটনা থেকে দুজনে পরস্পরের প্রেমে পড়ে যান। অতঃপর কুরঙ্গীর ধাত্রীমাত্রা ও ধাত্রীকন্যার সফল দৌতকর্মে পর অবিমারক আত্মশক্তিকে আশ্রয় করে মধ্যরাতে কুরঙ্গীর বাসভবন কন্যাপুর প্রসাদে চলে আসেন। দুজনের গান্ধর্ব বিবাহও সম্পন্ন হয়। পরে লোকলজ্জার ভয়ে অবিমারক চলেও আসেন। আবার,বিদ্যাধর মেঘনাদের দেওয়া অলৌকিক আংটির প্রভাবে অদৃশ্য হয়ে অবিমারক দ্বিতীয়বার কন্যাপুর প্রসাদে কুরঙ্গীর কাছে পৌঁছে যান। এই পর্যায়ে কুন্তিভোজ-ভবনে দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি অবিমারক ও রাজকুমারীর প্রেম, প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃপুরে অবস্থান, অগ্নিদেবতার আশীর্বাদে কাশিরাজমহিষী সুদর্শনার গর্ভে অবিমারকে জন্ম, নিজের মাসী সৌবীররাজমহিষী সুচেতনার কোলেবেড়ে উঠা– সার্বিক ঘটনা খুলে বলেন। শেষে আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে অগ্নিসাক্ষী করে অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রাজাপত্য বিবাহ সম্পন্ন হয়।

***অবিমারক*নাটকে সমাজ**

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা

অবিমারকের সমাজে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মন্ত্রী, সচিব, সেনা, পাহারাদার, গুপ্তচর, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশ্বস্তজন প্রমুখদের নিয়ে রাজা রাজ্য পরিচালনা করতেন। ভাসের *অবিমারক* নাটকের মন্ত্রিসভার কলেবর খুব দীর্ঘ নয়। কৌঞ্জায়নও ভূতিক– এই দুই জন মন্ত্রীর নাম আমরা জানতে পারি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে বারো, ষোলো বা বিশ জন।অথবা রাজ্যের সামর্থ্য বা মন্ত্রীদের দক্ষতা অনুসারেও পরিষদের সংখ্যা বাড়ানো-কমানো যেতে পারে[১২]। মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে *অবিমারক* নাটকে হ্রস্বতাকে অনুসরণ করা হয়েছে। রাজ্য পরিচালনার গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তখনকার রাজাদের মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়। কুরঙ্গীর বিবাহ বিষয়ে রাজা কুন্তিভোজ নিজের সহধর্মিণীসহ মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন–একথাই তার প্রমাণ।

রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা হিসাবে কিছু গুণ তখনকার সমাজের রাজাদের মধ্যেলক্ষ করা যায়। রাজা হবেন– শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং পরহৃদয়-বীক্ষণে পারদর্শী। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার ফলে তিনি সুগঠিত

শরীরের অধিকারী হবেন[১৩]। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি কঠোর হবেন, আবার কোমল আচরণও করবেন। প্রজাপালক রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে সবার অগ্রভাগে অবস্থান করবেন। নাটকে বলা হয়েছে–

> "ধর্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতিগতিঃ প্রেক্ষিতব্যা স্ববুদ্ধ্যয়া
> প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ কালযোগেন কার্যৌ।
> জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং পরচরনয়নৈর্মণ্ডলং প্রেক্ষিতব্যং
> রক্ষ্যো যত্নাদিহাত্মা রণশিরসি পুনঃ স্বেহপি নাবেক্ষিতব্যঃ ॥"[১৪]

স্বরাজ্য ও পররাজ্য বিষয়ে রাজাদের দুরকম নীতিসমাজে লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণদের দানের মাধ্যমেবা ধৈর্য্যের সাথে, আশ্রিতদের দয়ার সাথে জয় করা ছিল স্বরাজ্যনীতি।তবে, পররাজ্যের ক্ষেত্রে শৌর্য প্রদর্শন করাই রাজার ধর্ম। নবজামাতা অবিমারককে আর্শীবাদ করতে গিয়ে সৌবীররাজের মুখে রাজ্য পরিচালনার এসকল গূঢ়নীতি প্রকাশ পেয়েছে–

> "ক্ষময়া জয় বিপ্রেন্দ্রান্ দয়য়া জয় সংশ্রিতান্।
> তত্ত্ববুদ্ধয়া জয়াত্মানং তেজসা জয় পার্থিবান্ ॥"[১৫]

আবার, যাগ্যজ্ঞের মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য এবং সত্যের ধারক হিসাবে রাজা দশরথতুল্য হওয়া ছিল তখনকার রাজাদের আদর্শ[১৬]।

রাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় তখনকার রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। আবার, পারস্পরিক শত্রুতা, এমনকি আক্রমণ প্রতি-আক্রমণও পরিচালিত হতে দেখা যায়। রাজা কুন্তিভোজ, সৌবীররাজ, কাশীরাজ–এদের মধ্যে আত্মীয়তার ঊর্ধ্বেপারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আবার,"আমি একাই শত্রুসৈন্যদের ধ্বংস করেছি। এখনও পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের হৃতগৌরবকে উদ্ধার করতে পারে নি।"[১৭]– অবিমারকের এই উক্তি শত্রুরাজ্য কর্তৃক কুন্তিভোজের বৈরন্ত্য নগরী আক্রমণ এবং বীর অবিমারকের তা প্রতিহত করার উদাহরণ। আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও রাজাকে শত্রুতার মোকাবেলা করতে হতো। রাজার ঘনিষ্ঠজন, আত্মীয়স্বজন বা উচ্চপদস্থ রাজপার্ষদেরা রাজার সাথে গোপন শত্রুতা করতেন। ব্যসনাসক্ত রাজাকে সংশোধন করার পরিবর্তে কখনও কখনও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাজক্ষমতা দখলের সুযোগে থাকতেন। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, দূরদর্শী রাজারা স্বার্থলোভী, সুযোগসন্ধানী ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশলেরও আশ্রয় নিতেন [১৮]।

তখনকার সমাজেরাজা-সহ রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নাটকে উল্লিখিত বৈরন্ত্যনগরীর উদ্যান একটি সার্বজনীন উদ্যান। রাজকুমারী কুরঙ্গী সেখানে ভ্রমণে গেলে তাঁর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হয়।উদ্যানে গমনাগমনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। রাজকুমারীর ভ্রমণ শেষ হলে সর্বসাধারণের জন্য তাআবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বিষয়টি রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা প্রদানের উদাহরণ।

পারিবারিক বন্ধন ও মানবতাবোধ

অবিমারক নাটকের সমাজে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের চিত্র লক্ষ করা যায়। পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, সহোদর-সহোদরা এদের মধ্যে এই সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। সাবালিকা কন্যা কুরঙ্গীকে সুপাত্রস্থ করার জন্য বাবা-মায়েরদুশ্চিন্তা, সন্তানের বিপদের আশঙ্কায় তাঁদের উৎকণ্ঠা– সবই অপত্য স্নেহের উদাহরণ। আবার দেখা যায়, পরিবারের উপর বর্ষিত ঋষির অভিশাপের প্রভাবে অবিমারক চণ্ডালত্ব মেনে নিয়েছেন। "সন্তানের জন্য আমার স্তনদুগ্ধ নিঃসরিত হচ্ছে; আজ আমি পুত্রধনরস অনুভব করছি"[১৯]– এসবও অপত্য স্নেহের

উদাহরণ। আপন ভগ্নীর জন্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত নাটকটিতে রয়েছে? অগ্নিদেবতার আর্শীবাদে জন্ম নেওয়া সুদর্শনা তাঁর প্রথম সন্তানকে বোন সুচেতনাকে দান করেন। ফলে সন্তানহীনা সুচেতনার কোলপুত্র স্নেহে ভরে উঠে। বোনের প্রতি এমন ত্যাগ ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের দৃষ্টান্ত।

পারিবারিক গণ্ডীর বাইরেও তখনকার সমাজের মানুষদের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা লক্ষ করা যায়। নাটকের বিদূষক সন্তুষ্ট নিজের প্রিয়বয়স্য অবিমারকের বিপদের দিনে এগিয়ে এসেছেন। বন্ধুর নিরুদ্দেশে তিনি বলেছেন– "আমি সারা পৃথিবী জুড়ে অবিমারককে বা অবিমারকের শরীরকে খুঁজে আনব। যদি তা না পারি, তবে পরজন্মে তার সহায় হবো।"[২০]দেবযোনী বিশিষ্ট বিদ্যাধর মেঘনাদ নায়ক-নায়িকার মিলনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। মেঘনাদের দেওয়া অলৌকিক আংটির প্রভাবেই অবিমারক দ্বিতীয় বার রাজকুমারীর কাছে অদৃশ্য হয়ে যেতে পেরেছেন। বিদায় বেলায় তিনি অবিমারককে উপদেশ দিয়ে বলেছেন–"প্রীতিসহকারে রাজকুমারী কুরঙ্গীকে ভালবাসবে। যখনই প্রয়োজন হবে আমি তোমাকে সাহায্য করব।"[২১] দেবর্ষি নারদও কুন্তিভোজের রাজভবনে নেমে এসে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করে নায়ক-নায়িকার মিলনের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

স্থাপত্যশিল্প

নাটকটিতে উন্নত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। কুন্তিভোজের রাজধানী বৈরন্ত্য নগরী উন্নত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনে ভরপুর। বৈরন্ত্য একটি জনবহুল নগরী। নরগীতে রয়েছে সুদৃশ্য রাজপথ, পথের দুধারে দধিপিণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ প্রাসাদ, প্রাসাদের নিচে পণ্যে ভরপুর বিপণিবিতান। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক নগরের শোভা দেখতে বেরিয়েছেন। সেখানে রাজবাড়ির চেটী চন্দ্রিকা বিদূষককে ঠকিয়ে তাঁর হাতের আংটি হাতিয়ে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

রাজা কুন্তিভোজের রাজভবনে সুকারুকার্যখচিত উন্নত স্থাপত্য শিল্পেরসাক্ষ্য রয়েছে। রাতের আঁধারে বৈরন্ত্য নগরীসহ রাজভবনের সৌন্দর্য দেখেঅমিবারক তার বর্ণনা দিয়েছেন। রাস্তাগুলি যেন নদী হয়ে বয়ে চলেছে। সু-উচ্চ প্রাসাদগুলি যেন ধ্যানে মগ্ন। প্রাসাদগুলি ভাগে ভাগে নির্মিত। প্রাসাদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু কন্যাপুর। 'কন্যাপুর প্রাসাদ'– এই নামটির মধ্যে তৎকালীন সমাজের রাজভবন নির্মাণে স্থাপত্যশিল্পের সুপরিকল্পনা ধরা পড়ে। অর্থশাস্ত্রের 'নিশান্তপ্রণিধি' অনুসারে রাজার বাসভবনের পাশে আলাদা ভাবে নির্মিত হবে স্ত্রীনিবেশ (রাজমহিষীদের বাসস্থান), গর্ভসংস্থা (সূতিকাগার), ব্যাধিসংস্থা (মহিষীদের রুগ্নালয়), বৈদ্যপ্রত্যাখাত সংস্থা (বৈদ্যকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা দেবীদের বাসস্থান), বৃক্ষস্থান ও উদকস্থান (উপবন ও জলাশয়)। এরই পশ্চাতে কন্যাপুর এবং কুমারপুর প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে, যেখানে রাজকুমারী ও রাজকুমারেরা থাকবেন[২২]। নাটকটিতে দেখা যায়, কন্যাপুর প্রাসাদে রয়েছে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা। জানালাগুলি খুব কাছাকাছি। প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যও মনোমুগ্ধকর কারুকার্যখচিত কাঠের আসবাবপত্র, বৈদূর্য্যমণিসহ মূল্যবান রত্ন দিয়ে তৈরী সৈকতভূমি সদৃশমেঝে, প্রবাল পাথর দিয়ে তৈরী স্তম্ভ– যার সৌন্দর্য স্বর্গীয় সুষমাকেও হার মানায়[২৩]। এছাড়া, নগরীর দর্শকগৃহ এবং সার্বজনীন উদ্যানও উন্নত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদন

শিল্পসংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রথমেই সঙ্গীত-চর্চার কথা উল্লেখ করা যায়। রাতের বেলা বাদ্য-বাজনার সাথে সাথে তখনকার সুখী দম্পতিরা পারস্পরিক সঙ্গীতানন্দ উপভোগ করতেন। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে মাঝরাতে বৈরন্ত্য নগরীতে প্রবেশ করে অবিমারক এ সকল দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। সেখানে একজন রমণী সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে মনের সুখে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, তাঁর স্বামীধনটি বীণা বাজিয়ে তাকে সঙ্গ দিয়েছেন। নাটকের ভাষায়– "কো নু খল্বয়ং সর্বকালসুখী পুরুষঃ কান্তয়া সহ গান্ধর্বমনুভবতি। ব্যক্তং স্বয়ং

বীণাং বাদয়তি।"[২৪] সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি সে যুগের মেয়েরাও খেলাধুলায় অভ্যস্ত ছিলেন। সাবালিকা কন্যারা খেলাধুলা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখতেন না। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, দাসদাসীদের সাথে নিয়ে রাজপার্ষদদের নিরাপত্তায় বিবাহযোগ্যা রাজকুমারী কুরঙ্গী পার্শ্ববর্তী উদ্যান-বিহারে গিয়েছেন এবং সেখানে খুশিমতো খেলাধুলাও করেছেন।

নাটকটিতে হস্তিপালন ও হস্তি-নিয়ন্ত্রণ বা বশীভূতকরণ বিদ্যার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুন্তিভোজেররাজভবনেহস্তিশালা ছিল। রাতের আঁধারে রশি বেয়ে ভবনের উপরে উঠে অবিমারক ঐ হস্তিশালা থেকে আসা মদগন্ধ আঘ্রাণ করেন এবং নিজের কোমরে বাঁধা রশি খুলে গজশালায় ছুড়ে দেন। ভাসের *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নাটকে দেখা যায়,হস্তিনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নায়ক উদয়নের ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল। বীণা বাজিয়ে তিনি বন্যহস্তীকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। বাসবদত্তার পিতা রাজা প্রদ্যোত নকল হাতির ফাঁদে ফেলে উদয়নকে কারাবন্দী করেন। অন্যদিকে প্রদ্যোতের রাজভবনের মত্তহস্তীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কারারুদ্ধ উদয়নকে বাইরে নিয়ে এসে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সুযোগ বুঝে উদয়ন প্রেমিকা বাসবদত্তাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। ভাসের *অবিমারক* নাটকের নায়ক অবিমারকেরও হস্তিনিয়ন্ত্রণের বাস্তব দক্ষতা দেখা যায়। মদমত্ত হস্তীকর্তৃক রাজকুমারী কুরঙ্গী আক্রান্ত হলে অবিমারক কন্যাকে রক্ষা করেন। মন্ত্রী ভূতিকের বর্ণনা অনুসারে, "সেই পুরুষ কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শান্তভাবে লীলাভরে প্রিয়বন্ধুর মতো সেই হাতিটির সাথে খেলা করলেন। কখনও সামনে, কখনও পিছনে গিয়ে হাতিটিকে একেবারে মোহিত করে তুললেন।"[২৫] এভাবে অবিমারকের হস্তিনিয়ন্ত্রণ কৌশলের ফলে রাজকুমারী কুরঙ্গী রক্ষা পেলেন। আবার, হস্তিনীর আকর্ষণে মদমত্ত হস্তীকে বন্ধনশালায় নিয়ে আসার কৌশলও হস্তিবিদ্যার অংশ[২৬]।

ধর্ম

সনাতন ধর্মের অন্তর্গত বৈদিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক যাগ্‌যজ্ঞ তখনকার সমাজে অনুষ্ঠিত হতো। রাজা কুন্তিভোজ নিজে বৈদিক যাগ্‌যজ্ঞের অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজে বলেছেন– "অনেক যাগ্‌যজ্ঞ সম্পন্ন করেছি, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দানদক্ষিণার মাধ্যমে প্রসন্ন করেছি।"[২৭] কাশিরাজও বৈদিক যাগ্‌যজ্ঞের অনুসারী ছিলেন। যজ্ঞকর্মে ব্যস্ততার কারণে তিনি বরবেশী জয়বর্মার সাথে কুন্তিভোজ-আলয়ে আসতে পারেন নি। সনাতন ধর্মের পাশাপাশি সে সমাজে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও প্রচলন ছিল। বিদূষক সন্তুষ্ট হাস্যরসাত্মকভাবে বলেছেন–"যজ্ঞোপবীতেন ব্রাহ্মণঃ চীবরেণ রক্তপটঃ। যদি বস্ত্রমপনয়ামি শ্রমণকো ভবামি।"[২৮] উক্ত বাক্যে যজ্ঞোপবীত (পৈতা) যুক্ত ব্রাহ্মণ, চীবর (গেরুয়া) পরিহিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের কথা বলা হয়েছে। এ-থেকে প্রমাণিত হয় সনাতন ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মানুসারীরা তখনকার সমাজে বর্তমান ছিলেন।

বৈদিক দেবস্তুতির পাশাপাশি *অবিমারকের* সমাজে পৌরাণিক দেবভক্তির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতিতে নানা রূপে নানা শক্তিতে বিরাজিত। পূর্ব-গগনে সূর্য উদিত হয়, মধ্য গগনে কিরণ দেয়, আবার পশ্চিম গগনে অস্ত যায়। সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশে কেমন এক আলো-আঁধারের খেলা। আবার, মেঘের মধ্যকার আন্তঃআণবিক শক্তি ভেদ করে একটি নির্দিষ্ট আকর্ষণের প্রভাবে জলরাশি পৃথিবীতে নেমে আসে। এছাড়া, পার্থিব জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তি রয়েছে, যা মানুষের উপকারে আসে অথবা যা-থেকে মানুষের ভীতি উৎপন্ন হয়; দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ্য স্থানের এই শক্তি, যা ঋষি-মানসের মাধ্যমে জগতে প্রতিভাত হয়েছিল– তাই বৈদিক দেবতা। যেমন– অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, রুদ্র, মণ্ডূক প্রমুখ। কিন্তু পৌরাণিক দেবতার স্বরূপ এ থেকে ভিন্ন। পৌরাণিক দেবতা অনেকটা ভক্তের ভগবান। কখনও কখনও তিনি ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু। পঞ্চলক্ষণ-সম্বলিত, আখ্যান-উপাখ্যান ভিত্তিক দেবতাই পৌরাণিক দেবতা। তাই

অনেক ক্ষেত্রে নামের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বৈদিক দেবতা থেকে পৌরাণিক দেবতা আলাদা। এ প্রসঙ্গে জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেন–

> "বেদের বিষ্ণু ও রুদ্র পৌরাণিক বিষ্ণু ও রুদ্র হইতে স্বতন্ত্র। বেদে বিষ্ণু সূর্যের প্রকারভেদ, পুরাণে বিষ্ণু স্থিতির দেবতা। বেদের ত্রিপাদক্ষেপী বিষ্ণু, পুরাণে ত্রিবিক্রম, তিনি বলির শাস্তা, বামন অবতার। শুধু তাই নয় তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, প্রেমিক কমলাপতি এবং ভক্তবৎসল ভগবান।"[২৯]

অবিমারক নাটকে অগ্নিদেবতার আশীর্বাদে কাশিরাজমহিষী সুদর্শনার গর্ভে অবিমারকের (বিষ্ণুসেনের) জন্ম হয়েছে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, জীবনের প্রতি হতাশাগ্রস্ত অবিমারক আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু অগ্নিদেবতা তাঁকে দগ্ধ না করে পুত্রস্নেহে বাঁচিয়ে রাখেন। বিদ্যাধর মেঘনাদ অবিমারককে একটি অলৌকিক আংটি দেন, যার প্রভাবে অদৃশ্য হয়ে অবিমারক দ্বিতীয় বার কুরঙ্গী আলয়ে চলে আসতে সক্ষম হন। নাটকের শেষ অঙ্কে ঋষি নারদ কুন্তিভোজ আলয়ে আবির্ভূত হয়ে সার্বিক ঘটনা প্রকাশ করে অবিমারক ও কুরঙ্গীর মিলনকে ত্বরান্বিত করেছেন। এই যে অগ্নিদেবতা, বিদ্যাধর, ঋষিনারদ–সবই পৌরাণিক চরিত্র। আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণ একটি। উক্ত পুরাণে অগ্নি উপাস্য দেবতা। আবার পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট[৩০] পুরাণের লক্ষণের বংশ-অংশে দেববংশ, ধর্ম ও অধর্মের বংশ, পুরাতন ঋষিদের বংশ প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দেববংশের অন্তর্ভুক্ত হলেন বিদ্যাধরেরা, পুরাতন ঋষিবংশের অন্তর্ভুক্ত হলেন ঋষি নারদ[৩১]। এসকল দেবতা, ঋষি বা দেবযোনীবিশিষ্ট বিদ্যাধরেরা ভক্তের ভগবান হিসেবে, বিপদের ত্রাণকর্তা হিসেবে পার্থিব মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই বৈদিক দেবস্তুতির পাশাপাশি সে-সমাজের মানুষ পৌরাণিক দেবভক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।

অলৌকিক বিশ্বাস

পৌরাণিক দেবভক্তি ও আখ্যান-উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে নানাঅলৌকিক বিশ্বাস তখনকার সমাজে স্থান পেয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে দৈববাণীর কথা বলা যেতে পারে। রাজকুমারী কুরঙ্গীর সাথে অন্তঃজকুলের অবিমারকের মিলন কী করে সম্ভব, এবিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধমনে ধাত্রীমাতা ও ধাত্রীকন্যা নলিনিকাযখন অবিমারক-আলয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দৈববাণীতে শোনা যায়–

> "যদি চ বিভবরূপজ্ঞানসত্ত্বাদয়ঃ স্যু-
> র্ন তু কুলবিকলানাং বর্ততে বৃত্তশুদ্ধিঃ।"[৩২]

(যদি ঐশ্বর্য, রূপ, জ্ঞান, পরাক্রম প্রভৃতি থাকে কুলহীনদের আর চরিত্রশুদ্ধির দরকার হয় না।)

সেই বিশ্বাসে ভর করে মা-মেয়ে দুজনে অবিমারক ও কুরঙ্গীর মিলনের বিষয়ে আস্থাশীল হয়ে কাজে অগ্রসর হন। দ্বিতীয়টি ঋষির অভিশাপ। নাটকে দেখা যায়, চণ্ডভার্গব নামে একজন মহাপ্রতাপশালী ঋষির এক শিষ্য গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্রাক্রান্ত হয়ে মারা যান। ঘটনাক্রমে সৌবীররাজ সেখানে উপস্থিত হলে ঋষি তাঁর উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকেন। "কোন কারণ না দেখিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করা চণ্ডালত্বের সমান।"[৩৩]– সৌবীররাজ ঋষিকে এমন কথা বললে ঋষি ক্ষুব্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন–"স্ত্রীপুত্রসহ অচিরেই তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হবে"[৩৪]। শাপান্ত দিয়ে বলেন, "এক বৎসর প্রচ্ছন্নভাবে কাটানোর পর এই অভিশাপের অবসান হবে।"[৩৫] আবার, বিদ্যাধর মেঘনাদঅবিমারককে একটি অলৌকিক আংটি উপহার দেন। আংটিটি ডান হাতে পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়, আবার বাম হাতে পরলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা যায়। আংটি-পরিহিত ব্যক্তিকে কেউ স্পর্শ করে থাকলে তিনিও অদৃশ্য হয়ে যান। এই আংটির অলৌকিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অবিমারক ও বিদূষক অদৃশ্য হয়ে কুরঙ্গীর কাছে উপস্থিত হন। পৌরাণিক আখ্যান ভিত্তিক এসকল অলৌকিক ঘটনা নাটকে সংযোজিত হওয়া থেকে মনে হয় *অবিমারকের* সমাজের মানুষেরা অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছিল।

বর্ণভেদ প্রথা

তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র–সনাতন ধর্মের এই চার বর্ণের মানুষদের পরিচয়পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈদিক এবং অবৈদিক দুটি শ্রেণি নাটকটিতেলক্ষ করা যায়।যাগ্‌যজ্ঞসহ পৌরোহিত্য কর্মে দক্ষ ব্রাহ্মণেরা হলেন বৈদিক। "ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা উত্তর কলিঙ্গ বা উড়িষ্যায় বসবাস করতেন। অন্যদিকে যাগ্‌যজ্ঞ ও পৌরোহিত্য কর্মে অদক্ষ ব্রাহ্মণেরা হলেন অবৈদিক। এঁরা রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করতেন।"[৩৬] বৈদিক ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোএকটি পুণ্যের কাজ– সমাজের মানুষেরা তা বিশ্বাস করতেন। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বিদূষকের সাথে চন্দ্রিকা নামে একজন চেটীর সংলাপ জমে উঠেছে। চেটী জানান, একজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে তিনি ভোজন করাতে চান। ভোজনবিলাসী অথচ সহজসরল বিদূষক নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য নিজেই উৎসাহী হয়ে উঠেন। কিন্তু চতুরা চেটী জানান, তাঁকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি অবৈদিক ব্রাহ্মণ। চেটীর এই কথার ভিতর দিয়ে বৈদিক ও অবৈদিক দুটি শ্রেণির ব্রাহ্মণদের কথা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।সমাজে ব্রাহ্মণদের আসন ছিল সবার উপরে। ক্ষমতাধর নরপতিরাও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সম্মান করতেন এবং যথোপযুক্ত দানদক্ষিণার মাধ্যমে তাঁদের প্রসন্ন রাখতেন। রাজা কুন্তিভোজ স্বয়ং বলেছেন, অনেক যাগ্‌যজ্ঞ সম্পন্ন করেছি, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি প্রসন্ন রয়েছেন। ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি মুনি-ঋষি, গুণিজনেরা সম্মানিত হতেন। দেবর্ষি নারদ রাজা কুন্তিভোজের ভবনে উপস্থিত হলে তাঁকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা জানান হয়। দেবর্ষির আবির্ভাবে তাঁর গৃহ আজ পবিত্র হলো, রাজা কুন্তিভোজ এমন মন্তব্য করেন। মানুষেরা যেমন ঋষিদের অর্চনা করতেন, দেবযোনী বিশিষ্ট বিদ্যাধরেরা ও তেমনি মহান, আত্মত্যাগী, সারাবিশ্বের কল্যাণকামী ঋষিদেরকে সমবেতভাবে বন্দনা করতেন। ঋষি অগস্ত্যকে বন্দনা তার উদাহরণ। পুরাণ অনুসারে, বিন্ধ্য পর্বতের অপরিসীম ঊর্ধ্ববর্ধনশীলতার কারণে সূর্যের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা তখন ঋষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। কারণ, বিন্ধ্যের এই স্বেচ্ছাচারিতা গুরু হিসেবে একমাত্র অগস্ত্যের মাধ্যমেই রোধ করা সম্ভব। অগস্ত্য বিন্ধ্যের কাছে উপস্থিত হলে শিষ্য হিসেবে তিনি তাঁকে প্রণাম জানান। এই সুযোগে ঋষি তাঁকে মাথা নত করে থাকতে বলেন, যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসেন। অগস্ত্যের আর ফিরে আসা হলো না। বিন্ধ্যও অবনত মস্তকে থেকে গেলেন। ফলে বিন্ধ্য-পর্বতের ঊর্ধ্ববর্ধশীলতা রোধ হলো এবং সূর্যের গতিপথ অটুট রইল[৩৭]। আবার, সমুদ্রের জল পান করে অগস্ত্যঋষি কালকেয় নামক অসুরদের গোপন আশ্রয় নষ্ট করে দেন। ফলে অসুরদের অত্যাচার থেকে দেবতারা রক্ষা পান।*অবিমারক* নাটকে দেখা যায়, দেবযোনীবিশিষ্ট বিদ্যাধরেরা মলয়পর্বতে সমবেত হয়ে অগস্ত্যঋষির বন্দনা করছেন[৩৮]। মহান, আত্মত্যাগী ঋষিদেরকেবন্দনা করে সম্মান জানানো এর উদাহরণ।

রাজা কুন্তিভোজ, সৌবীররাজ, কাশিরাজ ও এঁদের পরিবার সবাই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ। ক্ষত্রিয়দের শরীর গঠন, জ্ঞানচর্চা, রাজ্য পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। বৈরন্ত্য নগরীর রাস্তার দুপাশে সারি সারি বিপণিবিতান, সেখানে পসরাসম্ভার সমাজে বৈশ্য শ্রেণিদের উপস্থিতি প্রমাণ করে। আবার দাস-দাসী, বিট, চেট প্রভৃতি নিম্নজাতি শূদ্র-শ্রেণির উদাহরণ।

জাতিভেদপ্রথা

সে সমাজে জাতিভেদ প্রথা বড় প্রকট আকার ধারণ করেছিল। তখনকার শাস্ত্রপীড়িত, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী মহলের ধারণা– আচার-আচরণে, দৈহিক অবয়বে নির্দিষ্ট জাতি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ধারক। মন্ত্রী ভূতিকের মতে- কুলীনরাই সুশ্রী, সুভাষী, সুশীল, বিনয়ী, বলবান, উদ্যমী এবং সৎসাহসী। হস্তি-আক্রান্ত রাজকুমারীকে রক্ষাকারী অবিমারক আত্মপরিচয় গোপন করে নিজেকে চণ্ডাল বলে পরিচিত করলেও মন্ত্রী ভূতিক তা মেনে নিতে রাজি নন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ করে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন, অবিমারকের স্বর্গীয় রূপ, মিষ্টি

কথা, ক্ষাত্র তেজ, সৌকুমার্য ও বলবত্তা প্রভৃতি যদি অন্ত্যজত্বের পরিচয় হয়, তবে তাঁর পরিশ্রমলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানই বৃথা। নাটকের ভাষায়–

"দৈবং রূপং ব্রহ্মজং তস্য বাক্যং
ক্ষাত্রং তেজঃ সৌকুমার্যং বলং চ।
যদ্যেবং স্যাৎ সত্যমস্যান্ত্যজত্বং
ব্যর্থোঽস্মাকং শাস্ত্রমার্গেষু খেদঃ ॥"[৩৯]

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও তখনকার মানুষেরা বর্ণবিচার করতেন। অসম-বর্ণে বিবাহ সমাজস্বীকৃত ছিল না। বিশেষ প্রেমানুরাগ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও অবিমারক ও কুরঙ্গীর মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে একমাত্র অন্তরায় দুজনের বর্ণের পার্থক্য– একজন চণ্ডালকুমার, অন্যজন রাজকুমারী। এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে দূতরূপী ধাত্রী ও ধাত্রীকন্যা নলিনিকা যখন অবিমারকের বাড়ি যাচ্ছিলেন তখনদৈববাণীতে শোনা যায়– যদি ঐশ্বর্য, রূপ, জ্ঞান, সত্ত্বা প্রভৃতি থাকে তবে কুলহীনদের আর চরিত্রশুদ্ধির দরকার হয় না। যথাকালে অবিমারকের বংশপরিচয় জানতে পারবে। অতএব, কুল সম্পর্কে সন্দেহ ত্যাগ করে তোমরা অবিমারক ও কুরঙ্গীর শুভপরিণয়ের দিকে অগ্রসর হও। নাটকের ভাষায়–

"ধ্রুবমিহ কুলমস্য শ্রোষ্যসি প্রাপ্তকালে
ত্যজ কুলগতশঙ্কাং সাধ্যতাং স্বন্তমেতৎ ॥"[৪০]

এই নির্দেশনার উপর আস্থা রেখেই ধাত্রী ও নলিনিকা দুটি বিরহিত মনের মিলনের ব্যাপারে নিষ্কলুষ মনে অগ্রসর হন। আবার,নাটকের শেষ অঙ্কে ঋষি নারদের মাধ্যমেও আমরা অবিমারক উপাধিধারী বিষ্ণুসেনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি। এ-সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অবিমারক ও রাজকুমারী কুরঙ্গীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, এখানে দৈববাণীর তাৎপর্য হলো, ঐশ্বর্য, রূপ, জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থাকলে কুলহীন ব্যক্তিও সৎকুলের মর্যাদা পেতেন।

বিবাহ

তখনকার সমাজে গান্ধর্ব বিবাহের পাশাপাশি অগ্নিসাক্ষী করে প্রাজাপত্য বিবাহের প্রচলন ছিল। প্রেমাসক্ত অবিমারক ও কুরঙ্গীর মিলনের পূর্বেই তাঁদের গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। ফলে, শাস্ত্রসম্মতভাবে তাঁদের মিলন বৈধতা পেয়েছিল। আবার, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নাটকের শেষ অঙ্কে পারিবারিক সম্মতিতেতাঁদের প্রাজাপত্য বিবাহ[৪১] সম্পন্ন হয়েছিল।এধরনের সামাজিক বিবাহ একজন **উপাধ্যা**য়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো। বৈদিক শাস্ত্রের বিধিবিধান ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যিনি জীবিকার জন্য নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান তিনিই উপাধ্যায়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে–

"একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥"[৪২]

অবিমারক নাটকে দেখা যায়, একজন উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অবিমারক ও কুরঙ্গীর সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে[৪৩]। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা অপেক্ষা বরের বয়স বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কুরঙ্গী অপেক্ষা কাশিরাজ-পুত্র জয়বর্মা কনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁদের বিবাহ হওয়া সমীচীন নয়[৪৪]– ঋষি নারদ এই মন্তব্য করেন । মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক আপত্তি

ছিল না। সৌবীররাজ এবং রাজা কুন্তিভোজ পরস্পর শ্যালক এবং ভগ্নিপতি। কিন্তু তাঁদের সন্তানদের মধ্যে সমাজস্বীকৃত বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল। সনাতন ধর্মের প্রচলিত বর্তমাননিয়ম থেকে তা ব্যতিক্রম।

প্রাকৃতিক সভ্যতা

অবিমারক নাটকে মনুষ্যনির্মিত সুকার্যখচিত স্থাপত্যশিল্পের পাশাপাশি মনোরমনৈসর্গিক সৌন্দর্যদেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়, গুহা, নদী, সরোবর, সাগর, বন-বনানী– প্রাকৃতিক পরিবেশের এসকল উপদান মিলে সামগ্রিকভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। মন্দাকিনী নদী বিধৌত, দারুপর্বত শোভিত বৈরন্ত্য নগরী। রাতের আঁধারে সুউচ্চ প্রসাদ থেকে অবিমারক কুন্তিভোজের রাজধানীর এ সৌন্দর্য দেখতে পান। অন্যদিকে বিদ্যাধর মেঘনাদসমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন ভিন্ন অবস্থান থেকে, ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণকালে তিনি পর্বতগুলিকে হস্তিশাবরেক মতো, সমুদ্রগুলিকে ক্রীড়াসরোবরের মতো, নদীগুলিকে সীমান্তরেখার মতো, বৃক্ষগুলিকে শৈবালের মতো দেখতে পেয়েছেন। নাটকের ভাষায়–

> "শৈলেন্দ্রাঃ কলভোপমা জলধয়ঃ ক্রীড়াতটাকোপমা
> বৃক্ষাঃ শৈবলসন্নিভাঃ ক্ষিতিতলং প্রচ্ছন্ননিম্নস্থলম্।
> সীমন্তা ইব নিম্নগাঃ সুবিপুলাঃ সৌধাশ্চ বিন্দূপমা
> দৃষ্টং বক্রমিবাভিভাতি সকলং সংক্ষিপ্তরূপং জগৎ ॥"[৪৫]

আবার, জীবন কখনও কখনও চায় সুখানুভূতি। পার্থিব মানুষ বা দেবযোনীবিশিষ্ট বিদ্যাধর যিনিই হোক না কেন আহারে, বিহারে, শয়নে, ভোজনে, প্রেমে, ক্রীড়াকৌতুকে তাঁর চাই সর্বোত্তম সুখ। সুখাভিলাষী বিদ্যাধর নিজের পছন্দ অনুসারে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট স্থানও বেছে নিয়েছেন। প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ, সুপ্রসিদ্ধ এবং একক নামে বিখ্যাত এমন কিছু জায়গার কথা নাটকে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন– উত্তরকুরু, মানসসরোবর, মন্দরপর্বত, হিমালয়ের গুহা, মলয় পর্বতের চন্দনবন ইত্যাদি। নাটকের ভাষায়–

> "প্রাক্সন্ধ্যা কুরুষূত্তরেষু গমিতা স্নাতঃ পুনর্মানসে
> ভূয়ো মন্দরকন্দরান্তরতটেষ্বামোদিতং যৌবনম্ ।
> ক্রীড়ার্থং হিমবদ্গুহাসু চরিতা দৃষ্টিশ্চ সংলোভিতা
> যাস্যাবো মলয়স্য চন্দনবনগান্ধ্যাহ্নিদ্রাসুখান্ ॥"[৪৬]

এসকল স্থান উল্লেখের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের দৃশ্য নাটকটিতেপ্রকাশ পেয়েছে।

উপসংহার

একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। ইলেকট্রোনিক্স প্রযুক্তির আবিষ্কার, আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি– প্রভৃতি কারণে এ-সময়ে সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা সমাজব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ভাসের *অবিমারক* নাটকের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমানের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই তার সাদৃশ্য রয়েছে। অথবা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপে ভিন্ন আঙ্গিকে পূর্বের সামাজ-সংস্কৃতই সমাজের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমত রাজ্যশাসন ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যাভিষিক্ত হওয়া, বহির্রাজ্য আক্রমণ, রাজ্যাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলো বর্তমান সমাজে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু গণতন্ত্রের আবরণে বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরশাসনই প্রচলিত। অথবা, রাজ্যদখলের পরিবর্তে পণ্য-আগ্রাসন বা বাজার দখল রয়েছে। কিন্তু তখনকার বিদ্বান, শক্তিমান, সাহসী রাজাদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা, জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করা। দৈবনির্ভরতা ও অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস তখনকার মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সমীম ক্ষমতাসম্পন্ন জীব অসীম বিশ্বপ্রকৃতি মাঝে নিজের অফুরন্ত চাহিদার আশু সমাধান চায়, নির্ভর করে

দৈব বা অলৌকিক শক্তি ওপর। অগ্নিদেবতার আশীর্বাদে অবিমারকের জন্ম নেওয়া, অবিমারককে অগ্নিতে দগ্ধ না করা, অলৌকিক আংটির প্রাপ্তিতে অদৃশ্য হয়ে প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদি তার উদাহরণ। বর্তমান সমাজেও ঝাড়ফুঁক, দৈবপ্রাপ্তবস্তু, তাবিজকবচ– বিষয়গুলো রয়েছে। ধান্ধাবাজ ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা করে চলেছে। বর্তমান সভ্যতার মতো তখনকার সময়ে উন্নত স্থাপত্যশিল্প বিদ্যমান ছিল। কারুকার্যযুক্ত সুউচ্চ প্রসাদ, উন্নত রাস্তাঘাট, বিপণিবিতানসহ বৈরন্ত্য নগরীর সার্বিক নগরায়ণই তার প্রমাণ। এসবের পাশাপাশি নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী প্রভৃতি মিলে সে-সমাজের মানুষগুলো প্রকৃতির খুব কাছাকাছি ছিল। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে ছিল অপূর্ব মেলবন্ধন। তাই নগরায়ণ ঘটলেও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অটুট ছিল। সমাজে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকলেও মানুষ তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। কুল সর্ম্পকে সন্দেহ ত্যাগ করো, অবিমারক ও কুরঙ্গীর বিবাহ বিষয়ে অগ্রসর হও– এই দৈববাণী থেকে প্রমাণিত হয় তখনকার মানুষেরা জাতিভেদপ্রথা থেকে বেরিয়ে এসে সার্বজনীন মানবধর্ম বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হয়েছিল। অতএব, সেই সুদূর অতীত-দিনের সাহিত্যে বিধৃত সমাজব্যবস্থা থেকে বর্তমান যুগের মানুষদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে– এটাই আমাদের বক্তব্য।

তথ্যনির্দেশ

১ "সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ। সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥"–বাণভট্ট, *হর্ষচরিত, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১৮'শ খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধানউপদেষ্টা), জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পা. (কলকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২), ১/১৫।

২ "সুবিভক্তমুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্তলক্ষণবৃত্তিভিঃ। পরেতোঽ পি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ ॥"–দণ্ডী, *অবন্তীসুন্দরীকথা*, এম রামকৃষ্ণকবি সম্পা. (মাদ্রাজঃ মঙ্গলোদয়ম্ প্রেস, ১৯২৪), ১১ ।

৩ "ভাসো হাসঃ, কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।"–জয়দেব, *প্রসন্নরাঘবম্*, শেষরাজশর্মাশাস্ত্রী সম্পা. (বনারসঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৫৬), ১/২২ ।

৪ বিপক্ষবাদীরা মনে করেন রূপকগুলোর রচয়িতা ভাস নন। তাঁদের যুক্তি, উদ্ধারকৃত রূপকগুলোর কোনটিতে ভাসের নাম উল্লেখ করা হয় নি। ভাসপরবর্তী রচনায় উক্ত রূপকগুলো থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হলেও কোন উৎসের কথা বলা হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ধৃত শ্লোকের উৎস *স্বপ্নবাসবদত্ত*-এর কথা বলা হলেও, ত্রিবেন্দাম হতে প্রকাশিত টি. জি. শাস্ত্রীর *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকে উক্ত শ্লোক অনুপস্থিত।

৫ ভগদত্ত জল্হণ, *সূক্তিমুক্তাবলী*, কৃষ্ণমাচার্য সম্পা. (বরোদাঃ গাইকোয়ার্ড অরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৯৩৮), ৪/৪৮

৬ A. D.Pusalker, *Bhāsa–A Study* (Lahore: Sanskrit book deport, 1940), page– 61; Bhāsa, *Ūrubhańgam,* S. Rangachar ed. (Mysore: Sanskrit Sahitya Sadana, 1967), page– 13.

৭ "প্রথিতযশসাং ভাসকবিপুত্রসৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।"–কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১১' শ খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা–২৫৯; "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।"–*তদেব*, ১/২

8 অশ্বঘোষ, *বুদ্ধচরিতম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১ম খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), মুরারিমোহন সেন সম্পা. *প্রাগুক্ত*, ১৩/৬০।

৯ ভাস, *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১০ম খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পা. *প্রাগুক্ত*, ১/১৮।

১০ "An upper limit is given by the fact that Bhāsa is doubtless later than Açvaghoṣa, whose Buddhacarita is probably the source of a verse in the Pratijñāyaugandharāyaṇa."– A. Berriedale Keith, *The Sanaskrit drama* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1992), page–93- 94.

১১ "Precious little is known about Bhāsa's life. All that can be said about him is that he is a very ancient writer, even a *Muni* of the class of Vyāsa or Vālmīki. He has strong predilections for the Viṣ ṇuite cult."–Bhāsa, *Ūrubhańgam*, S. Rangachar ed. op. cit., page–15.

১২ "মন্ত্রিপরিষদং দ্বাদশামত্যান্কুর্বীত ইতি মানবাঃ । ষোড়শ ইতি বার্হস্পত্যাঃ। বিংশতিম্ ইতৌশনসাঃ। যথাসামর্থ্যম্ ইতি কৌটিল্যঃ।"–*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পা.,*প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২), ১/১৫/৭।

১৩ "ব্যায়ামস্থিরবিপুলোচ্ছ্রিতায়তাংসো

জ্যাঘাতপ্রচিতকিণোল্বণপ্রকোষ্ঠঃ।

প্রচ্ছন্নোঽপ্যনুকৃতিলক্ষ্যরাজভাবো

মেঘান্তর্গতরবিবৎ প্রভানুমেয়ঃ ॥"–ভাস, *অবিমারকম্*, *ভাসনাটকচক্রম্*, সি. আর.দেবধর সম্পা. (পুনা: অরিএন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৩৭), ১/৮।

১৪ *তদেব*, ১/১২।

১৫ *তদেব*, ৬/১৭।

১৬ *তদেব*, ৬/৯।

১৭ "ভগ্না ময়ৈকেন পরাঃ সসৈন্যা

অদ্যাপি গন্ধেন ন সংশ্রয়ন্তে।

কিং মানুষৈঃ সোঽপ্যসুরেশ্বরো মে

হতো ভুজাভ্যামবিরূপধারী ॥"–ভাস, *অবিমারকম্*,*প্রাগুক্ত*, ২/৯।

১৮ "কামাহতঃ কুমতিভিঃ সচিবৈর্গৃহীতো

রোগাতুরঃ স্বজনরাগমবেক্ষতে বা।

শপ্তো দ্বিজৈর্ব্রতমুপেত্য করোতি শান্তিং

কো বা ভবেন্নরপতের্গৃহরোধহেতুঃ ॥"–*তদেব*, ১/১১

১৯ "সম্প্রস্রবদ্দুগ্ধপয়োদযুগ্মাম্ ।"–*তদেব*, ৬/২০।

"অদ্য ময়ানুভুতঃ পুত্রসম্পত্তিরসঃ" (সংস্কৃতছায়া)–*তদেব*, ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃষ্ঠা–১৮৬।

২০ "অহমপি কুমারং বা কুমারস্য শরীরং বা প্রেক্ষিষ্যে তাবৎ সর্বলোকং পরিভ্রম্য। যদি ন প্রেক্ষে, তত্রভবতঃ পরত্র সহায়ো ভবামি।"(সংস্কৃতছায়া)–*তদেব*, চতুর্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা১৫৮।

২১ "ক্রীড়ারসৈঃ প্রতিবিলোভয় রাজপুত্রীং

কার্যান্তরেষু পুনরপ্যহমস্মি পার্শ্বে ॥"–*তদেব*, ৪/১৮,

২২ "পৃষ্ঠতঃ কক্ষ্যাবিভাগে স্ত্রীনিবেশো গর্ভব্যধিবৈদ্যপ্রতাখ্যাতসংস্থা বৃক্ষোদকস্থানং চ। বহিঃ কন্যাকুমারপুরম্।"–*কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সম্পা., *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, ১/২০/৩।

[২৩] ভাস, *অবিমারকম্,প্রাগুক্ত*, তৃতীয় অঙ্ক,পৃ– ১৩৮-৪৩

[২৪] *তদেব*, পৃষ্ঠা–১৩৯।

[২৫] "স মুহূর্তমনাদরমত্বরিতং সললিতং প্রিয়বয়স্যেনেব তেন হস্তিনা প্রক্রীড্য নিবর্তনানুবর্তনগতিবিশেষৈর্বিমোহ্য লজ্জিত ইব তেন কর্মণা মহাজনপ্রশংসামসহমানঃ সমবনতশিরস্কঃ স্বৈরং স্বমেবাবাসং গতঃ।"– *তদেব*, প্রথম অঙ্ক, পৃ–১১৪।

[২৬] "অথ তদনন্তরমুপলভ্য হস্তিনীভিস্তং গজবরং সংগ্রাহ্যেমাং গজশালাং প্রবেশ্যাহং তস্য পুরুষস্য প্রবৃত্তিমন্বয়ং চ জ্ঞাতুমন্যাপদেশেন গতবানস্মি।"–*তদেব।*

[২৭] "ইষ্টা মখা দ্বিজবরাশ্চ ময়ি প্রসন্নাঃ"–*তদেব*, ১/২।

[২৮] *তদেব*, পঞ্চম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-১৬৯।

[২৯] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার*, *প্রথম খণ্ড* (কলকাতাঃ ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা–২৫৫।

[৩০] "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ –*বায়ুপুরাণ*, ৪/১৩, *বিষ্ণুপুরাণ*, ৩/৬/২৫।

[৩১] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, *২৪৫।*

[৩২] ভাস, *অবিমারকম্,প্রাগুক্ত*, ২/৫

[৩৩] "ন ভাষসে বৃত্তমুপৈষি রোষং নিষ্কারণং প্রক্ষিপসি প্রকামম্।

অভাজনং ত্বং তপসাং প্রকোপাদ্ ব্রহ্মর্ষিরূপেণ ভবাঞ্ছ্বপাকঃ॥"–*তদেব*, ৬/৫

[৩৪] "যস্মাদ্ ব্রহ্মর্ষিমুখ্যোঽহং শ্বপাক ইতি ভাষিতঃ ।

তস্মাৎ সপুত্রদারস্ত্বং শ্বপাকত্বমবাপ্স্যসি ॥"–*তদেব*,৬/৬

[৩৫] "যাবৎ প্রচ্ছন্নরূপেণ তাবৎ সংবৎসরং ব্রজেঃ।

ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে মুক্তশাপো ভবিষ্যসি ॥"–*তদেব*, ৬/৮

[৩৬] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২), পৃষ্ঠা–২৪৩।

[৩৭] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান* (কলকাতাঃ এম. সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, নবম সংস্করণ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ), পৃ–৪।

[৩৮] "অদ্য ভগবন্তমগস্ত্যমারাধয়িতুং মলয়পর্বতে বিদ্যাধরৈরুৎসবঃ প্রারব্ধঃ"–ভাস, *অবিমারকম্,প্রাগুক্ত*, চতুর্থ অঙ্ক,পৃষ্ঠা–১৫৩।

[৩৯] *তদেব*, ১/৭

[৪০] *তদেব*, ২/৫

[৪১] "সহাভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥"– সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *মনুসংহিতা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ২০০২), ৩/৩০, ৩/৩২।

৪২ *তদেব*, ২/১৪১

৪৩ "তথাপি স্বজনপরিতোষণার্থমভ্যন্তরসময়মাত্রমুপাধ্যায়েন কারয়িত্বা শীঘ্রমানীয়তামিহ কুমারঃ সহ ভার্যয়া।"– ভাস, *অবিমারকম্*,*প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ অঙ্ক,পৃষ্ঠা–১৮২

৪৪ "কথমিদানীং জ্যেষ্ঠপত্নী কনীয়সে দীয়তে।"– *তদেব*, ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃ– ১৮৪

৪৫ *তদেব*, ৪/১১

৪৬ *তদেব*, ৪/১০

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম *সংখ্যা, জুন-*২০১৯, *ISSN 1813-0402*

ভবভূতির মহবীরচরিত নাটকে রাবণ চরিত্র

ড. বেবী বিশ্বাস*

Abstract: Sanskrit rhetoricals considered dramatic literature as a part of poetic literature. According to their opinion drama is one kind of visual poetry. Dialogue is one of the most significant parts of drama. This dialogue presented through the characters used in the drama. This characters take the story forward with the dialogues. Raban is a very important character in the Mahavircharita drama by Bhavabhuti which keeps the drama momentum. He acted as a villain to get Seeta. He frequently misused his power though he was possessed in domitable power. He is craved for Seeta by hook or by crook which is not the sign of the flourising character. He involved immoral conflict with Ram frequently. But his heart determined techinics and the planning materialisation strategy really adorable. Thus the dramatist capables to upholds Raban as powerful and eventual character by dint of his own merit which enlightened this treatise.

ভূমিকা

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে দুইভাগে ভাগ করেছেন— দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। নাটকের চরিত্রচিত্রণের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ রয়েছে যার মাধ্যমে ঐ চরিত্রের আচার-আচরণ, কর্মদক্ষতা, দোষ-গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর চরিত্রচিত্রণে এই লক্ষণের পাশাপশি চরিত্রের সংলাপ, পার্শ্বচরিত্রের মন্তব্য, নাট্যকাব্যে চরিত্রের সার্বিক অবস্থান বা কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। চরিত্রচিত্রণের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে নাট্যকার ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকের রাবণের চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

ভবভূতির জীবন ও কর্ম

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, বিশাখদত্ত প্রমুখ খ্যাতিমান নাট্যকারের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ যুগকে শাসন করলেও কালিদাসোত্তর যুগের একজন অসাধারণ নাট্যকার ছিলেন ভবভূতি। *মহাবীরচরিত*, *উত্তররামচরিত* ও *মালতীমাধব*— এই তিনটিমাত্র দৃশ্যকাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। আদিকবি বাল্মীকি-রচিত *রামায়ণ*কাহিনীর প্রথম ভাগকে অবলম্বন করে রচিত ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটক। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাম ও লক্ষ্মণকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে আসা থেকে এর কাহিনী শুরু। অতঃপর মহান বীর রামের হাতে তাড়কাসুরবধ, হরধনুভঙ্গ, রাম-সীতার বিবাহ, পরশুরামের সাথে রামের যুদ্ধ, পরশুরামের পরাজয়, অযোধ্যায় রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামের বনগমন, রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব, বালীবধ, রামের হাতে রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু, সীতাসহ রামের অযোধ্যায় ফিরে আসা এবং রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন পর্যন্ত এর কাহিনী বিস্তৃত। নাট্যকার সাতটি অঙ্কের মাধ্যমে এই কাহিনী গ্রথিত করেছেন। আবার *রামায়ণের* কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্র, যার উত্তর বা পরবর্তী জীবনকে অবলম্বন করে ভবভূতি রচনা করেছেন সাত অঙ্কের নাটক *উত্তররামচরিত*। রাম ও সীতার বিয়োগাত্মক মূল কাহিনীকে নাট্যকার তাঁর স্বীয় প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এখানে মিলনাত্মকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া নৈসর্গিক দৃশ্যে জীবজন্তুর প্রতি অনুভূতি, ছায়াসীতা, লব-কুশের সাথে চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, গর্ভনাটক (নাটকের মধ্যে নাটক) ইত্যাদি বিষয়গুলো

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অভিনবভাবে উপস্থাপন করেছেন। মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভবভূতির *মালতীমাধব* প্রকরণ। কাহিনীর মাঝখানে এসেছে— রাজশক্তির ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী কামন্দকীর সাহসিকতা, বামাচারি কাপালিক গোষ্ঠীর জিঘাংসা, মকরন্দের সাহসিক ভূমিকা প্রভৃতি। প্রকরণকার বকুলবীথি, ধবলগৃহ, শার্দূল-বিদ্রাবণ, শার্দূল-বিভ্রম, শ্মশানবর্ণনা, মালতী-উপহার/চৌরিকা-বিবাহ, নন্দনবিপ্রলম্ভ, মালতী-অপহরণ, সৌদামিনীদর্শন এবং সম্মেলন এই দশটি অঙ্কে তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এমন একজন প্রতিভাবান নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবন ও কাল সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। তবে কবির নিজের লেখা দৃশ্যকাব্য তিনটিতে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। দক্ষিণপথের বিদর্ভ অঞ্চলের পদ্মপুর নামক গ্রামে ছিল তাঁর বাসস্থান। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা ছিল তাঁদের বংশানুক্রমিক চর্চার বিষয়। তাঁর বংশের উপাধি ছিল উদুম্বর। তাঁর পিতামহের নাম ভট্টগোপাল এবং পিতার নাম গোপাল। তাঁর মাতার নাম ছিল জাতুকর্ণী। ভবভূতির প্রকৃত নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ। আবার শিবের উপাসক বলে তাঁকে ভবভূতি আখ্যাও দেওয়া হয়। তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

ভবভূতির কাল নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হলে সমালোচকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। ভবভূতির কাব্যে কালিদাসের রচনার প্রভাব রয়েছে। দৃশ্যভাবনা, চরিত্র চিত্রণ অথবা অন্তর্নিহিত কোন উপকরণের ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক স্থানে ভবভূতি কালিদাসের অনুকরণ করেছেন। কালিদাসের *মেঘদূত*, *রঘুবংশ*, *অভিজ্ঞানশকুন্তল* এবং ভবভূতির *মালতীমাধব*, *মহাবীরচরিত* ও *উত্তররামচরিত* এই কাব্যগুলোর মধ্যে তা লক্ষ করা যায়। অতএব ভবভূতির রচনায় কালিদাসের প্রভাব থাকার কারণে ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের কাব্যকার মনে করা যেতে পারে। উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চতুর্থ শতককে কালিদাসের আবির্ভাবকাল ধরে নিয়ে ভবভূতিকে তার সমসাময়িক বা পরবর্তী সময়ের মনে করা যেতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যকার বাণভট্ট তাঁর কাব্যে ভাস, কালিদাস প্রমুখ কাব্যকারদের নাম উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ভবভূতির নাম উল্লেখ করেন নি। বিখ্যাত নাট্যকার ভবভূতির নাম বাণভট্ট জানতেন না অথবা জেনেও উল্লেখ করবেন না— এমনটি হওয়া অযৌক্তিক। অর্থাৎ ঐ সময়ে ভবভূতির জন্মই হয় নি। তাই ভবভূতিকে বাণভট্টের পরবর্তী সময়ের মনে করা যেতে পারে।[১] ঐতিহাসিকেদের তথ্যানুসারে বাণভট্ট কাণ্বকুজ রাজ্যের (৬০৬-৬৪৮) সভাকবি ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি হর্ষচরিত রচনা করেন। তাই বাণভট্টের কাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক ধরে ভবভূতিকে তার পরবর্তী সময়ের মনে করা যেতে পারে।

আলঙ্কারিক রাজশেখর রচিত *কাব্য*মীমাংসা গ্রন্থে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। শ্লোকটির উৎস উল্লেখ করা না হলেও তা ভবভূতির *মালতীমাধবের* তৃতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়।[২] আবার আলঙ্কারিক বামনাচার্যের *কাব্যালঙ্কারে* কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে তারও উৎস উল্লেখ করা হয় নি, যা ভবভূতির *মহাবীরচরিত*[৩] ও *উত্তররামচরিতে*[৪] পাওয়া যায়। রাজশেখরের কাল খ্রিষ্টীয় নবম শতকে এবং আচার্য বামনের কাল খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে ধরে নেওয়া হয়। সেই হিসেবে ভবভূতিকে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী সময়ের বা সমসাময়িক মনে করা যেতে পারে।

কলহনের *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাণ্বকুব্জরাজ যশোবর্মা বাক্‌পতিরাজ, ভবভূতি প্রমুখ কাব্যকারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আবার *গৌড়বহোকাব্যের* রচয়িতা বাক্‌পতিরাজ তাঁর কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ভবভূতির উৎসাহ পেয়েছেন। এই ঋণ তিনি তাঁর *গৌড়বহো* কাব্যে স্বীকার করেছেন এবং পৃষ্ঠপোষক যশোবর্মার গুণকীর্তন করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, কার্কটবংশীয় উত্তরপুরুষ ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়) কর্তৃক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে যশোবর্মা পরাজিত হন। আবার যশোবর্মার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ভবভূতিকে তাই খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের

শেষভাগের বা অষ্টম শতকের প্রথমভাগের কবি বলা যেতে পারে। কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দিকটি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। এ বিষয়ে কোন জটিলতার সুযোগ নেই। তাই তাঁকে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগের অথবা অষ্টম শতকের কবি বলাই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত।

মহাবীরচরিত নাটকের বিষয়বস্তু

আদিকবি বাল্মীকি-রচিত *রামায়ণ* কাহিনীর পূর্বভাগকে অবলম্বন করে ভবভূতি রচনা করেছেন *মহাবীরচরিত নাটক*। কাহিনীর শুরুতে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি যথাক্রমে জনক-তনয়া সীতা ও উর্মিলার পারস্পরিক অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে। গুরুজনদের মনে মনে ইচ্ছা শুভমণিকাঞ্চনযোগ সম্পন্ন। কিন্তু পরিস্থিতি তখন প্রতিকূল। কারণ রাবণের দূত সর্বমায় এসে বলেন, "লঙ্কেশ্বর রাবণ অযোনিসম্ভূতা সীতাকে কামনা করেন।"[৫] সে সময়ে বিশ্বামিত্রের অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানে তাড়কাসুরের আক্রমণ শুরু হয়। বিশ্বামিত্রের আদেশে রামের বাণে তাড়কাসুর নিহত হন। আবার বিশ্বামিত্রেরই আদেশে রাম-লক্ষ্মণ দুজনে জৃম্ভকাস্ত্র লাভ করেন। এবার রাম-সীতার বিবাহের পালা। শর্তানুযায়ী হরধনু ভেঙে রামকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু ধনুটি আশ্রমে নেই। বিশ্বামিত্র যোগবলে তা নিয়ে আসেন। রাম তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেন। শেষে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সাথে যথাক্রমে সীতা, উর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ সম্পন্ন হয়। জনকরাজ্যে কেবল বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। বিবাহ-পরবর্তী কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়েছে। এ সময় সেখানে উপস্থিত হন পরশুরাম। তিনি চান রামকে বিনাশ করতে। কারণ, হরধনু ভেঙে রামচন্দ্র শিবকে তথা শিবভক্তদের অপমান করেছেন। আসলে লঙ্কেশ্বরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং রাম-সীতার বিবাহের কথা দূত সর্বমায়ের মাধ্যমে রাবণের মন্ত্রী মাল্যবান জানতে পারেন। তাই কূটকৌশলী মাল্যবান পরম শিবভক্ত পরশুরামকে উত্তেজিত করে রামকে বিনাশের জন্য পাঠিয়েছেন। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হলেও ভীষণ যোদ্ধা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। শিবকে অপমান করা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই নানা বাগ্-বিতণ্ডার পর পরশুরামের সাথে রামের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত হন। শেষে রামের গুণে মুগ্ধ পরশুরাম রামকে তাঁর ধনু উপহার দিয়ে বলেন, "বৎস, এখন এই ধনু নিয়ে রাক্ষস বধের অধিকার তোমাতেই ন্যস্ত।"[৬] গুরুজনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বিদায় নেন। নববিবাহিত রামের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান তখন আসন্ন। আবার শুরু হয় মাল্যবানের চক্রান্ত। রাবণের ভগ্নি শূর্পণখার সাথে পরামর্শ করে তাঁকে দিয়ে অযোধ্যার বিশ্বস্ত দাসী মন্থরা সাজিয়ে দশরথের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মন্থরারূপী শূর্পণখা রামের মধ্যম মাতা কৈকেয়ীর কথা বলে পূর্বপ্রাপ্ত বর দুটি চেয়ে নেন। এতে রামের পরিবর্তে ভরত রাজা হবেন এবং একমাত্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হবেন— একথা বলা হয়। পিতৃসত্য পালন করতে রাম বনে গমন করেন। পঞ্চবটী বনে রামের হাতে খর, দূষণসহ চৌদ্দ হাজার চৌদ্দ জন রাক্ষস নিহত হয়। আবার একদা শূর্পণখা উক্ত বনে এসে রামকে কামনা করলে লক্ষ্মণের বাণে তাঁর নাক-চুল কাটা যায়। এখান থেকে পৌলস্ত্যবংশের সাথে রঘুবংশের ঘোর শত্রুতা শুরু হয়। একদা রাবণ মায়ামৃগের ছলনায় রাম ও লক্ষ্মণকে গৃহের বাইরে নিয়ে আসেন। সেই সুযোগে রাবণ সন্ন্যাসীর রূপ ধরে সীতাকে অপহরণ করেন। সীতার অন্বেষণে রাম-লক্ষ্মণ বের হন। পথে মুমূর্ষু জটায়ু তাঁদের সীতা অপহরণের সংবাদ দেন। এসময় কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালী রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন। বালী ও রাবণ পরস্পরের বন্ধু । মাল্যবানের মাধ্যমে প্ররোচিত হয়েই বালী-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ আক্রান্ত হন। কিন্তু রামের হাতে বালী পরাজিত হন। এ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব, হনুমান ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ। মৃত্যুর আগমুহূর্তে বালী সুগ্রীবকে রামের হাতে সমর্পণ করে বলেন, "রামচন্দ্র, আজ থেকে সুগ্রীবকে তোমার কাছে দিলাম, একে তুমি গ্রহণ কর।"[৭] রাম-রাবণের আসন্ন যুদ্ধে সুগ্রীব রামের সহযোগী হবে। ফলে রাম-লক্ষ্মণের সাথে সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণের মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাগর বন্ধন করে তাঁরা লঙ্কায় উপস্থিত হন। কিন্তু লঙ্কেশ্বর তখনও সীতার প্রতি কামনাদৃষ্টি নিয়ে অশোকবনের

দিকে তাকিয়ে আছেন। একপর্যায়ে শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধের শেষ দিকে রামের বাণে রাবণ নিহত হন। লঙ্কানগরী তখন প্রায় পুরুষশূন্য। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ কেউই আর বেঁচে নেই। তাই মানবীরূপী লঙ্কাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন বড় বোন অলকা। অলকা জানান, রাবণ তাঁর প্রকৃত প্রাপ্তিই পেয়েছেন এবং তার অভিশপ্ত জীবনেরও অবসান ঘটেছে।

যুদ্ধশেষে অযোধ্যায় ফেরার পালা। নতুন রাজা বিভীষণের নির্দেশে পুষ্পকরথ প্রস্তুত করা হয়। সাগর, নদী, সরোবর, বন-বনানী, কৃষিক্ষেত ইত্যাদি অতিক্রম করে পুষ্পকরথ রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রমুখদের নিয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হয়। হনুমানের কাছ থেকে খবর পেয়ে অযোধ্যানগরী আগেই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। গুরুজনেরা রাম-সীতাকে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর পুনরায় রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন শুরু হয়। ভবভূতি সাতটি অঙ্কের মাধ্যমে এই কাহিনী গ্রথিত করেছেন। কাহিনীতে মাল্যবানের বিজ্ঞতা, শূর্পণখার নেতৃত্ব ইত্যাদি নতুন সংযোজন। আবার নানা যৌক্তিক কাহিনী সংযোজনের মাধ্যমে রামের চরিত্রকে রামায়ণ থেকে আরও মহত্তর করা হয়েছে। নানা অপশক্তিকে নিধন করার মাধ্যমে রামের মহাবীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্যই নাটকটির নাম *মহাবীরচরিত* একথা মনে করা যেতে পারে।

রাবণ চরিত্র বিশ্লেষণ

পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার ঔরসে এবং রাক্ষস সুমালীর কন্যা কৈকসীর গর্ভে রাবণের জন্ম। পুরাণ অনুসারে পিতামহ ব্রহ্মার দশজন মানসপুত্রের মধ্যে পুলস্ত্য একজন।[৮] *রামায়ণের* কাহিনী অনুসারে ধার্মিক পুলস্ত্য সুমেরু পর্বতে অবস্থিত তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপস্যা করতেন। সেখানে অপ্সরাকন্যা, নাগকন্যা, রাজর্ষিকন্যারা প্রতিনিয়ত নৃত্যক্রীড়া করার ফলে পুলস্ত্যের সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। আগত কন্যাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যে কন্যা তাঁর সামনে আসবে সেই গর্ভবতী হবে। কিন্তু তৃণবিন্দুর কন্যা বেদশ্রুতি তা শুনতে না পেয়ে সেখানে এসে নির্ভয়ে পুলস্ত্যের বেদপাঠ শুনেছিলেন। ফলে বেদশ্রুতি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তৃণবিন্দু যোগবলে কন্যার এই অবস্থা জানতে পারেন। তৃণবিন্দুর অনুরোধে পুলস্ত্য বেদশ্রুতিকে সহধর্মিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর বেদশ্রুতির গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয় (বেদ পাঠকালে গর্ভের সঞ্চার হয়)। বিশ্রবা ও ভরদ্বাজকন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র হলেন বৈশ্রবণ, যিনি ধনেশ্বর কুবের নামে পরিচিত।[৯] এই বৈশ্রবণের দ্বিতীয় স্ত্রী রাক্ষস বংশের কন্যা কৈকেসীর গর্ভে রাবণের জন্ম।

ভবভূতিপ্রণীত *মহাবীরচরিত* নাটকের শুধু ষষ্ঠ অঙ্কে সরাসরি রাবণ চরিত্রকে দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মুখে পরোক্ষাভাবে রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত তিনি একজন আত্মশ্লাঘাকারী, দাম্ভিক ব্যক্তি। নিজের ধৈর্য, উপাসনা, শক্তি, রণদক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, দেবাদিদেব মহাদেবকে উপাসনাকালে তিনি নিজের মস্তক ছিন্ন করেন। কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে মহাদেবের পাদোদক করেন। তবুও রাবণের কাটা মুণ্ডের মধুমিশ্রিত হাসি এবং সেখানে শিবের বন্দনাগীতি উচ্চারিত হয়। নাটকে বলা হয়েছে—

> হসে তু উৎপুষ্যদ্গলধমনিস্ফুটপ্রসর্পৎপ্রত্যগ্রক্ষতজঝরনিবৃত্তপাদ্যঃ।
> হর্ষাশ্রুপ্রচুরমধুস্মিতস্ফুটশ্রীবক্ত্রাব্জার্চিতচরণঃ শিবঃ প্রমাণম্ ॥[১০]

নিজের শৌর্য সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দিগ্‌গজের দাঁত উত্তোলন করেছি, ইন্দ্রকে রুখে দিয়েছি, ইন্দ্রের জ্বলন্ত বজ্র তাঁর বক্ষে পতিত হলেও সামান্য মাত্রই ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। নাটকের ভাষায়—

> যোঽহং দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং মৃধভুবি যুগন্মত্তদিগ্দন্তিদন্তান্
> রুদ্ধ্বা দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ সরভসমজিতান্দিক্পতীনপ্যরৌৎসম্।
> দীপ্যদ্বজ্রাদিচণ্ডপ্রহরণপতনক্ষুণ্ণবক্ষস্ত্বচো মে

তস্যাপি প্রাতিভাট্যাদ্রিপুরিতি কলিতঃ কোঽপ্যপূর্বঃ প্রমাদঃ ॥[১১]

মদগর্বিত রাবণ তাই ব্রহ্মাণ্ডকে পিষে ফেলতে চান। ভূমণ্ডলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে চান। বিশ্বস্রষ্টার কান্তিময় যশকে ম্লান করে দিয়ে চন্দ্র বা সূর্যের মত নিজের প্রতাপ সৃষ্টি করতে চান। নাটকের ভাষায়—

পিষ্টাব্য ব্রহ্মাণ্ডমস্মাদথ ভুবনবিভাগাদুদস্যাপি কিঞ্চিদ্-
ব্রহ্মাণং চাতিকৃত্যাপ্রতিমরুচিতরং স্বং প্রতাপং যশশ্চ।
সূর্যেন্দু সংবিধায় স্বয়মধিকতরং নির্বৃতঃ স্যামহং চে-
ন্ন স্যাদালস্যদোষঃ সকরুণমথবা কোঽনুকম্প্যেষু কোপঃ ॥[১২]

রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ নর এবং বানর। কিন্তু ব্রহ্মার বরে দেব, দানব যক্ষ থেকে তাঁর কোন ভীতি নেই; নর-বানরতো দূরের কথা। তাই দশমাথা বিশহাত বিশিষ্ট রাবণ ক্রোধের সাথে বলেন, বাহুর আঘাতে মুখ্য বানরদের দূরে ছুড়ে ফেলবেন। যুদ্ধনিপুণ অন্য বাহু দিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করবেন। দেবতারা সুযোগ বুঝে আজ রামের পক্ষ অবলম্বন করা সুযোগসন্ধানী, ছিদ্রান্বেষী বাকি দেবতদাদের বাহু দিয়ে ধরে কারাগার পূর্ণ করবেন। নাটকের ভাষায়—

কৈশ্চিন্দোর্ভিঃ প্রমত্তান্প্লবগপরিবৃঢ়ান্দিক্ষু বিক্ষিপ্য দক্ষে-
রণ্যৈঃ পিষ্ট্বাপি যুদ্ধাভিনয়বিধিনটৌ তৌ তপস্বিপ্ররোহৌ।
শিষ্টৈঃ কৃষ্টবা স্বচেতঃপ্রতিফলিতবৃথারব্ধমাত্রপ্রবিষ্টান্-
দুষ্টাংস্ত্রৈবিষ্টপানপ্যগতকরুণস্তৈর্বিভর্মি স্বকারাম্ ॥[১৩]

এখানে ভবভূতির *মহাবীরচরিতে* দশমাথা বিশহাতবিশিষ্ট দাম্ভিক রাবণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাল্মীকি*রামায়ণে* দেখা যায়, রাবণ দেবতাদের পরাজিত করেছেন। কুবের পুষ্পক রথ অধিকার করেছেন। দিগ্বিজয়ে বের হয়ে সূর্য বংশের সন্তান (রামের পূর্বপুরুষ) অনরণ্যককে বধ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের কাছে পরাজিত হয়ে কৌশলী রাবণ সন্ধি করে মিত্রতাও স্থাপন করেছেন। *মহাবীরচরিতে* ইন্দ্রপুত্র বালীর সাথে রাবণের মৈত্রতা তার একটি উদাহরণ। কৈলাস পর্বত উত্তোলনের পর মদগর্বিত রাবণ বালীর সাথে যুদ্ধে অভিলাষী হন। বালী সেই সময় সমুদ্রের তীরে সন্ধ্যাবন্দনায় রত ছিলেন। উপাসনার বিঘ্ন সৃষ্টি না করে তিনি রাবণকে বাহুমূলের গর্তে রেখে সাত সমুদ্রের উপাসনা শেষ করে ফেলে দেন। বালীর সামর্থের প্রমাণ পেয়ে রাবণ তাঁর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। নাটকের ভাষায়—

কৈলাসে তুলিতে জিতে ত্রিভুবনে দৃপ্যন্তমভ্যুদ্যতং
দোর্যুদ্ধায় দশাস্যমিন্দ্রতনয়ঃ প্রক্ষিপ্য কক্ষান্তরে।
সান্ধ্যং কর্ম সমাপ্য সপ্তসু নদীনাথেম্বথোমুক্তা-
নুন্মুক্তায় নতায় নাথিতবতে সখ্যং চ তস্মৈ দদৌ ॥[১৪]

সবচেয়ে বড় বিষয় রাবণ একজন কামান্ধ ব্যক্তি। সীতার সম্ভোগে লালায়িত রাবণ একেবারেই নিয়ন্ত্রণহীন। ভবভূতির *মহাবীরচরিত* অনুসারে রাবণের কনিষ্ঠ মাতামহ মাল্যবান নিজের দৌহিত্রের এই কামান্ধতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। এক্ষেত্রে রাবণ চান সীতাকে অপহরণ করতে। কিন্তু মাল্যবানের ইচ্ছা সীতার সাথে রাবণের পারবারিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলে অপহরণের প্রয়োজন পড়বে না। রাবণের দূত হিসেবে সর্বমায় বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হয়ে কুশধ্বজের কাছে প্রস্তাব দিয়ে বলেন, কোথাও যদি রত্ন থাকে তা ইন্দ্রকে ছেড়ে রাবণের অধিকারে আসে; আর কন্যাতো পরের ধনই। জনক বংশের যে অযোনিসম্ভূতা কন্যা রয়েছে রাবণ তাঁর পাণিপ্রার্থী। এর মাধ্যমে জনক বংশের সাথে পৌলস্ত্য বংশের আত্মীয়তার সম্মন্ধ স্থাপন করা হোক। নাটকের ভাষায়—

কন্যারত্নমযোনিজন্ম ভবতামাস্তে বয়ং চার্থিনো
রত্নং চেতকৃচিদস্তি তৎপরিণমত্যস্মাসু শক্রাদপি।
কন্যায়াশ্চ পরার্থতৈব হি মতা তস্যাঃ প্রদানাদহং
বন্ধুর্বো ভবিতা পুলস্ত্যপুলহপ্রষ্টাশ্চ সম্বন্ধিনঃ ॥[১৫]

কিন্তু মাল্যবানের প্রস্তাব ব্যর্থ হলে রাবণ তা মেনে নিতে পারেন নি। তাই ভোগ-বাসনায় অন্ধ রাবণ বনবাসী সীতাকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করেন। তিনি মায়ারূপ ধারণে পারদর্শী মারীচকে কাজে লাগিয়ে কৌশলে রাম ও লক্ষ্মণকে কুটিরের বাইরে নিয়ে অসেন। ব্রহ্মার বরে রাবণ নিজেও বিভিন্নরূপ ধারণে পারদর্শী। সেই লক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশ দরে তিনি সীতার পর্ণকুটিরে উপস্থিত হন। রামায়ণে দেখা যায় ব্রাহ্মণবেশী অসংযমী রাবণ একপর্যায়ে নিজের কামবাসনা প্রকাশ করে সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলেছেন—

বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
এতাবুপচিতৌবৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্ভিতৌ ॥
কীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ ॥
রূপমগ্র্যঞ্চ লোকেষু সৌকুমার্য্যং বয়শ্চ তে।
ইহ বাসশ্চ কান্তারে চিত্তমুন্মাথয়ন্তি মে ॥[১৬]

(বিশাল, নির্মল, কৃষ্ণবর্ণতারাসম্পন্ন ও প্রান্তভাগ রক্তিমাভ, জঘন স্থূল ও বিস্তৃত; ঊরু দুইটি করীকরতুল্য সুগোল; ঘনসন্নিবেশিত তোমার স্তনযুগল পরস্পর মিলিত স্নিগ্ধতালফলতুল্য রমনীয় সমুন্নত, উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত, স্থূলাগ্র ও অতি মনোহর যেন আলিঙ্গনাদি ব্যাপারে প্রগল্‌ভ। তোমার এই ত্রিভুবন বিখ্যাত রূপ, সুকুমারত্ব, বয়ঃক্রম এবং এই নির্জন বনে বাস, আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ করছে অসিতনয়নে।)

এক্ষেত্রে সীতাহরণের এই দৃশ্য নাটকের পঞ্চম অঙ্কে জটায়ুর মুখ থেকে জানা যায়—

অহো প্রমাদঃ প্রমাদঃ।
পরঃসহস্রৈরায়ুক্তং পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ।
রথং বধূটীমারোপ্য পাপঃ ক্বাপ্যেষ গচ্ছতি ॥[১৭]

(হায়-হায়, কী বিপদ কী বিপদ! এক হাজারের বেশি পিশাচমুখো গাধা রথ টানছে। তাতে নবোঢ়া বধূ সীতাকে চাপিয়ে এই দুরাচার দশানন কোথায় যেন চলেছে।)

সীতার প্রতি এই আকর্ষণ রাবণ ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু অপ্সরা রম্ভা ধর্ষণের পর নরকুলের অভিশাপ ছিল। কোন অননুরক্ত নারীর প্রতি রাবণ উপগত হলে তার মাথা সাত খণ্ডে বিভক্ত হবে। *রামায়ণের* ভাষায়–

যদা হ্যকামাং কামার্তৌ ধর্ষয়িষ্যতিযোষিতম্ ॥
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য সকলীভবিতা তদা।[১৮]

তাই *মহাবীরচরিতে* দেখা যায়, অশোকবনে রক্ষিত সীতাকে রাজি করার জন্য চেরীদের নিয়োগ করা হয়েছে। এর পরেও সার্বক্ষণিক সীতাসম্ভোগের চিন্তায় মনকে তিনি আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। শত্রুকর্তৃক লঙ্কা আক্রান্ত, চারিদিকে ভীষণ কলরব, হনুমান লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছেন— সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। আর এসব ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি অশোকবনের দিকে তাকিয়ে কামার্ত হৃদয়ে বলেছেন—

মুখং যদি কিমিন্দুনা যদি চলাঞ্চলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈর্যদি তরঙ্গভঙ্গী ভ্রুবৌ।
কিমাত্মভবধন্বনা যদি সুসংযতাঃ কুন্তলাঃ

কিমম্বুবহদম্বরৈর্যদি তনুরিয়ং কিং শ্রিয়া ॥[১৯]

(যদি সীতার আনন থাকে তবে চন্দ্রের কী দরকার? নীল কমলগুলোর কী প্রয়োজন, যদি তাঁর চঞ্চল অপাঙ্গময় দুটি নয়ন থাকে? তরঙ্গের মত বক্র ভ্রূদু'টি থাকে— কী দরকার কামদেবের ধনুতে? যদি তাঁর সুসংযত কুন্তলদাম থাকে, মেখমালার বা কী প্রয়োজন? এই যদি তাঁর দেহ কী দরকার লক্ষ্মীতে?)

দাম্ভিক ও কামুক হলেও রাবণের কিছু দক্ষতা ও গুণাবলীর কথাও *মহাবীরচরিতে* বর্ণিত হয়েছে। রাম নিজেই বলেছেন, রাবণ অতি বীর্যবান; কঠোর তপস্যার আধার এবং সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাটকের ভাষায়— "অতিবীর্যপ্রমেয়তপসমপ্রাকৃতম্।"[২০] জটায়ু তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন, রাবণের জন্ম পৌলস্ত্য বংশে। তাঁরা সকলে বিদ্যাবিশারদ। এঁরা বৈদিক আচরণের অনুসারী। বেদকে অনুসরণ করে তাঁরা নিয়ত স্নান করেন। প্রলয়কালে বেদস্তুতির মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করেন। তিনি পাতালবাসী কালকেয়কেও জয় করেছেন। তপস্যায় দীপ্যমান এমন রাজা কী করে দুর্মতি হয়ে উঠল। নাটকের ভাষায়—

ধর্তারঃ প্রলয়েষু যে ভগবতো বেদস্য বিদ্যেশ্বরা-
স্তেষামন্বয়কেতনস্য ভবতঃ স্নাতস্য বেদব্রতৈঃ।
জেতুর্বৈতলসন্মনোঽপি তপসা দীপ্তস্য রাজ্ঞঃ সতো
নিন্দ্যা দুশ্চরিতাবতারজননী জাতা কথং দুর্মতিঃ ॥[২১]

লঙ্কার সুরক্ষার ব্যবস্থাও *মহাবীরচরিতে* প্রকাশ পেয়েছে। সুদৃঢ় কপাট, কপাটে দ্বাররক্ষী, প্রাচীরে ঘেরা লঙ্কার রক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। তাছাড়া, রাবণের রয়েছে সুদক্ষ মন্ত্রী, সেনা, অস্ত্রশস্ত্র, আত্মীয়-স্বজন। সৈন্যসামন্তসহ রাক্ষসরাজ রাবণ যখন যুদ্ধে রওনা হলেন তখন সাতসমুদ্রের তরঙ্গমালার গর্জনের মত ভীষণ শব্দের সৃষ্টি হল। সমুদ্রের জল পাক খেতে খেতে ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ শব্দের সৃষ্টি করল। ইন্দ্রের সারথী মাতলী দশাননের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমণের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন এভাবে—

সংবর্তপ্রকটবিবর্তসপ্তপাথোনাথোর্মিব্যতিকরবিভ্রমপ্রচণ্ডঃ।
নির্ঘোষঃ স্ফুরতি ভৃশং পরসহস্রব্যাবল্গৎপ্রবলগতাগতাস্রপাণাম্ ॥[২২]

রামায়ণে বিভীষণ ও রাবণের শক্তি-সামর্থের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নিজের অসৎ দুরাচারী ভ্রাতাকে ছেড়ে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। রাবণের শক্তি-সামর্থের কথা বর্ণনা করে তিনি রামের কাছে বলেছেন— "ব্রহ্মার বরে রাবণ, গন্ধর্ব, উরগ, পক্ষী সকল ভূতেরই অবধ্য। ছোটভাই কুম্ভকর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের মত বলবান। পুত্র ইন্দ্রজিৎ কবজশূন্য। অথচ গো-সাপে নির্মিত চর্মাবরণ ধারণ করে রণভূমিতে যুদ্ধ করে ইচ্ছামত অদৃশ্যও হতে পারে। অন্তরীক্ষ হতে শক্রকে নিধন করতে পারে। দশ সহস্রকোটি সেনা নিয়ে যুদ্ধ করে তিনি দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন।"[২৩] রাম নিজেও বলেছেন, "দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ বিশ হাজার ঘোড়া, সস্ত্রধারী এক কোটি নিশাচর সৈন্য নিয়ে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন।"[২৪] কিন্তু যতই শক্তি-সামর্থ থাকুক না কেন চাতুরী দিয়ে, অসততা দিয়ে কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। রাবণের উপাসনা, বেদচর্চা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসা, সমস্ত গুণাবলী দাম্ভিকতা ও কামলালসার দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। দেবতা, ঋষি, পৃথিবীর প্রাণিকুল সবই তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তাই *মহাবীরচরিতের* ষষ্ঠ অঙ্কে যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে হত্যার উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হয়েছে— "সীতাকে লাভ করার জন্য, ত্রিভুবনের লোকের প্রীতির জন্য, বিভীষণের লঙ্কাপুরী লাভের জন্য, ব্রহ্মতত্ত্ব ঋষিদের প্রসন্নতার জন্য রাবণকে বধ করা কর্তব্য।"[২৫] পণ্ডিতপ্রবর সুখময় ভট্টাচার্য তাই বলেছেন— "দৈব বা নিয়তির বিধান স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দর্পোদ্ধত লোককন্টক দশানন আত্মবিনাশের নিমিত্তেই নিয়তি পরিচালিত হইয়া সীতা হরণ করেছিলেন।"[২৬] রামের হাতে রাবণের বিনাশে পৃথিবীতে প্রশান্তির বাতাস বইতে শুরু করল। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় সূচিত হল।

তথ্যনির্দেশ

১. We may say that he must have flourished later than Bana (generally placed in the first half of the 7th century) who mentions several authors and works such as Kalidasa, Bhasa, Pravarasena,Vasavadatta and Bihatkatha but is silent about Bhavabhuti; and who must have lived before the second quarter of the 8th century, for, he is referred to by Vakpatiraja (Bappairaa) belonging to the second quarter of the 8th century.—Vimla Gera, *Mind and Art of Bhavabhuti* (Delhi: The Sanskrit book depot. 1973), p. 19.

২. ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার সম্পা. (বোম্বেঃ গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল বুক ডিপার্টমেন্ট, ১৯০৫), ৩/১৬।

৩. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, সীতানাথ আচার্য, দেবকুমার দাস সম্পা. (কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১), ১/৩৮; বামন, কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি, অনিল চন্দ্র বসু সম্পা. (কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম সংস্করণ, মার্চ, ১৯৭৭), ৪/৩/৬।

৪. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পা. (কলকাতাঃ সরস্বতীযন্ত্রে, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬০), ১/৫৪; বামন, কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি, *প্রাগুক্ত*, ১/২/১২।

৫. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, আগস্ট, ১৯৮২), ১/২৮।

৬. *তদেব*, ৪/৩৮।

৭. *তদেব, পৃ. ৯৪।*

৮. *পৌরাণিক অভিধান*, সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত (কলকাতাঃ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৫), পৃ. ৩৭০।

৯. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. (কলকাতাঃ বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ), ৭/২/৪-৩৩।

১০. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, ৬/১৪।

১১. *তদেব*, ৬/১১।

১২. *তদেব*, ৬/১০।

১৩. *তদেব*, ৬/২৫।

১৪. *তদেব*, ৫/৩৭।

১৫. *তদেব*, ১/৩০।

১৬. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, *প্রাগুক্ত*, ৩/৪৬/১৯-২০।

১৭. *ভবভূতি*, *মহাবীরচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, ৫/১৭।

১৮. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, দ্বারকাপ্রসাদ শর্মা অনুদিত (এলাহাবাদঃ রামনারায়ণ লাল প্রকাশিত, ১৯৮৭), ৭/২৬/৫৫-৫৬।

১৯. *ভবভূতি*, *মহাবীরচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, ৬/৯।

২০. *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ১২।

২১. *তদেব*, ৫/১৮।

২২. *তদেব*, ৬/২৬।

২৩. বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, *প্রাগুক্ত*, ৬/১৯/৯-১৬।

২৪. *তদেব*, ৬/৩৭/১৬-১৭।

২৫. *ভবভূতি*, *মহাবীরচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, ৬/৬২।

২৬. সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, *রামায়ণের চরিতাবলী* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬), পৃ. ২০৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭তম সংখ্যা, জুন-২০১৯, ISSN 1813-0402

মনুসংহিতায় নারীর মর্যাদা ও অমর্যাদা: একটি পর্যালোচনা

ড. জয়শ্রী দাষ*

Abstract : Smritishastra is the part of Hindu scriptures. The authors of the Smritishastras wrote the same accordance with the principles of Grihyasutra. Manusamhita is main Smritishastra of the Hindu community. It contains the social rules of the Hindus.From the age of Manusamhita till now Hindu society has been conducted by it. There was an honourable position of the women in the age of the Veda. But in the age of the Smritishastra the women have lost it. Somewhere the authors of the Smritishastra had given higher position in their writings but they were very conservative in the question of the freedom of the women. In this article it has been tried to focus the honourable position and also dishonourable position of the women in the Manusmritishastra.

'স্মৃতিশাস্ত্র' হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। মনুসংহিতায় বেদকে 'শ্রুতি' এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহকে 'স্মৃতি' বলা হয়েছে।[১] বেদ বা শ্রুতি হিন্দুদের মূল ধর্মশাস্ত্র। বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলা হয়েছে– 'বেদঃ অখিলো ধর্মমূলম্'।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যাগযজ্ঞাদির বিস্তৃত বিবরণ ও যাগযজ্ঞের নানা কাহিনি বিধৃত আছে। ব্রাহ্মণ ভাগের আখ্যায়িকা অংশ বাদ দিয়ে কেবল যজ্ঞের প্রক্রিয়াদি যে গ্রন্থে সূত্রাকারে গ্রথিত আছে তাকে কল্পসূত্র বলে। কল্পসূত্রের দুটি ভাগ– শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লিখিত শ্রৌত যাগের বিধিবিধান যে সূত্রে লিপিবদ্ধ তাকে শ্রৌতসূত্র বলে এবং গৃহস্থের করণীয় সংস্কার ও যাগাদি যাতে সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েছে তাকে গৃহ্যসূত্র বলে। গৃহ্যসূত্রেরই সমধর্মী আর এক প্রকার গ্রন্থ কল্পসূত্র বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে এসব গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র। "ব্যাপক অর্থে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি বেদোত্তর গ্রন্থসমূহকে স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"[২] বেদ পরবর্তীকালে বৈদিকধর্মের মূলতত্ত্ব সাধারণ মানুষের কাছে দুরূহ হয়ে ওঠে এবং ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান সকলের পক্ষে করা সম্ভবপর হয় না। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মবাদ সাধারণের কাছে অধরাই থেকে যায়। পুরাণকারেরা ধর্মকে সাধারণের কাছে নিয়ে আসার জন্য রচনা করেন বিভিন্ন দেবদেবীর চরিতকাহিনি ও আচারধর্মী পূজাপার্বণ। স্মৃতিকারেরা গৃহ্যসূত্রের নীতি অনুসরণ করে তৈরি করেন স্মৃতিশাস্ত্র। এসব শাস্ত্রে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সামাজিক বিধিবিধান, গৃহীর আচরণীয় ধর্ম ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ 'স্মৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। স্মরণার্থক স্মৃ ধাতুর সঙ্গে ক্তিন্ প্রত্যয় যোগ করলে স্মৃতি শব্দটি পাওয়া যায়। সুতরাং শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল স্মরণ বা অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান। রসমঞ্জরীতে স্মৃতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'স্বাম্যাশ্রিতক্রিয়াজন্যসংস্কারজন্যজ্ঞানম্'। স্মরণ কখনও অনুভব ছাড়া হয় না। প্রতিটি স্মরণের মূলে থাকে অনুভবাত্মক আর একটি জ্ঞান। তাই স্মরণ পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্র হল সংস্কারের জন্য একটি বিশেষ জ্ঞানের অভিব্যক্তি। এদিক থেকে বেদ-পরবর্তী যে সব গ্রন্থ

বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে রচিত হয়েছে তাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলা যায়। সেদিক থেকে তাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহ স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকে বাদ দিলে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে আপস্তম্ভ, গৌতম ও বৌধায়নসূত্র সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য। এগুলোর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ছয়শত থেকে তিনশত শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়।[৩] বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব, গৌতম, বৌধায়ন প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রগুলোকে মনু অনুসরণ করেছেন। মনুর পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ মনুসংহিতাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন।

মনুসংহিতার কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত হিন্দুসমাজ মনুসংহিতার দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। ধর্মের কোন বিধিবিধানের প্রশ্ন দেখা দিলে সাধারণত মনুসংহিতারই আশ্রয় নেয়া হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত মনুসংহিতায় ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আমরা জানি বৈদিক সাহিত্যে সমাজে নারীদের স্বাধীনতা ও সম্মানজনক অবস্থান ছিল। নারীরা যে সৃষ্টিকর্তার অর্ধাংশ সে কথা মনুও স্বীকার করেছেন। মনু বলেন-

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমৰ্দ্ধেন পুরুষো’ভবৎ।
অৰ্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥[৪]

সেই পরমপুরুষ নিজ দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করে অর্ধাংশ দ্বারা পুরুষ এবং অপর অর্ধাংশ দ্বারা নারী সৃষ্টি করেছেন এবং এই নারীর গর্ভেই বিরাটের জন্ম হয়েছিল।

বৈদিকসমাজে নারীরা উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তখন নারীরা পুরুষ ঋষিদের মতো বৈদিক সূক্ত রচনা করতেন। পুরুষের সঙ্গে একত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, অধ্যাপনা করতেন, শিল্প ও কলাবিদ্যার চর্চা করতেন। এমনকি যুদ্ধবিগ্রহেও অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে এসে নারীরা তাঁদের এ মর্যাদা বহুলাংশে হারিয়েছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের উচ্চাসন দেয়া হলেও নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে স্মৃতিকারেরা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারতে ক্ষেত্র বিশেষে নারীর প্রতি যে অনুকম্পা দেখানো হয়েছে, মনুসংহিতায় তা একেবারে মুছে ফেলা হয়নি। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, “প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধতম বিধি-তাত্ত্বিক মনু নীতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন, প্রায়ই সে নীতি অত্যন্ত কঠোর। ... কিন্তু মনুও বিশেষ বিশেষ নীতির যথার্থ্য বিচার করতে গিয়ে পরিণাম এবং ন্যায়ের প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি।”[৫]

বস্তুত সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী এবং পুরুষ এই দুটি সত্তার মধ্যে দেনা-পাওনা, ভাব-ভালবাসার দ্বন্দ্ব-সৌহার্দ্য চলে আসছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মায়েরাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। সেখানে নারীদের আধিপত্য ছিল বেশি। আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্য বেশি থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজ বিনির্মাণে, সভ্যতার অগ্রগতিতে নারী-পুরুষের রয়েছে সমান অবদান। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাম্যবাদী কাব্যে ‘নারী’ কবিতায় বলেছেন –

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।[৬]

মনু নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস না করলেও নারীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা একেবারে নেতিবাচক ছিল না। মনুসংহিতায় তার বহু উদাহরণ আছে।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥

কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর নারীদের বিশেষভাবে সম্মান করবেন এবং তাঁদেরকে ভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত রাখবেন। যাঁরা কন্যার সমাদর করেন তাঁরা অশেষ কল্যাণ লাভ করেন। মনু আরও বলেন,

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥[৭]

যে বংশে স্ত্রীজাতি পূজিত হন, সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন হন। দেবতারা প্রসন্ন হলে গৃহী অভীষ্ট ফল লাভ করেন। কিন্তু যে পরিবারে নারীরা অসম্মানিত হন সেখানে দেবতাদের উদ্দেশে অর্পিত যাগযজ্ঞাদিও নিষ্ফল হয়।

মনুর মতে বিবাহের সময় কেবল বরই যে কন্যাকে ধন-বস্ত্র-অলংকারাদি দান করবেন তা নয়, কন্যার পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, দেবর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন কন্যাকে ভূষণাদি দ্বারাও অলংকৃত করবেন।

মনুর মতে, গৃহস্থাশ্রমে অবশ্য পালনীয় ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ স্ত্রীরই অধীন। তাই সকলেরই উচিত নিজ নিজ স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানো। মনু বলেন, যে পরিবারে পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতি দুঃখিত হয়ে থাকেন এবং পরিতাপ করেন সে পরিবার অল্পকাল মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে যে পরিবারে নারীরা দুঃখ ভোগ করেন না বা পরিতাপ করেন না সে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিকামী পুরুষের উচিত নানাভাবে নারীদের তুষ্টিবিধান করা। মনুর উক্তি–

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্ ।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥[৮]

হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহকে খুবই মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেয়া হয়েছে। বিবাহসংস্কারের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দুটি প্রাণের মিলনের মধ্য দিয়ে এক প্রাণতার উপলব্ধি ঘটে। বিবাহের মন্ত্রে বলা হয়েছে–

'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম'
অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমার হোক , আমার হৃদয় তোমার হোক ।

বৈদিক মন্ত্রে স্ত্রীর উদ্দেশে আরো বলা হয়েছে- "হে বধূ, তুমি সুমঙ্গলী হয়ে পতিগৃহে প্রবেশ কর। আমাদের (মনুষ্যকুলের) এবং চতুস্পদ জীবের মঙ্গলবহ হও। তুমি কল্যাণনেত্রা হও, পতির মঙ্গল বিধান কর। গৃহপালিত

পশুদের হিতকারিণী হও। তোমার মন সুন্দর হোক, তোমার তেজ শোভন হোক। তুমি বীরজননী, দেবপরায়ণা এবং সকলের সুখদায়িনী হও ।"[৯]

স্মৃতিকার মনুও বিশ্বাস করতেন, যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর দ্বারা এবং স্ত্রী স্বামীর দ্বারা প্রীত হন অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকে সেই পরিবারে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে।

সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥[১০]

মনু মনে করতেন, বস্ত্র-ভূষণাদির দ্বারা যদি স্ত্রীর শোভা ও তৃপ্তি সম্পাদন করা না হয় তাহলে সেই স্ত্রী স্বামীকে আনন্দ দিতে পারে না। আর স্বামী প্রসন্ন না হলে সুসন্তানের উৎপাদনও সম্ভবপর হয় না।

মনু বলেন, নারী হল গৃহের দীপ্তি অর্থাৎ অলংকারস্বরূপা। নারীরা বংশ রক্ষা করে বলে মহাভাগ্যবতী সকলের পূজার যোগ্য।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষো'স্তি কশ্চন ॥[১১]

পুত্র পিতাকে পুৎ নামক নরক থেকে রক্ষা করে, সেজন্য ব্রহ্মা স্বয়ং তাকে পুত্র বলেছেন।

পুন্নামো নরকাদ্‌যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।[১২]

হিন্দুশাস্ত্র মতে এ কারণেই নারীর জন্য পুত্র সন্তানের জন্মদান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুত্র সন্তানের জন্মদান ও এর মাধ্যমে উত্তরাধিকার রক্ষার প্রয়োজনেই স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে স্ত্রীলোককে সযত্নে রক্ষা করতে বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র মতে, স্ত্রীর সুরক্ষাবিধানে যে ব্যক্তি যত্নবান হয় সে তার দ্বারা নিজ বংশপরম্পরা আত্মচরিত্র এবং ধর্ম এ সবই রক্ষা করে–

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি ॥[১৩]

নারীজাতি সম্পর্কে মনুর উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ আমাদের এই ধারণা দেয় যে, নারী জাতির মর্যাদার ব্যাপারে মনু অনুদার ছিলেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনু নারীজাতি সম্পর্কে উদারতার পরিচয় দিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত অমানবিক, কঠোর ও ন্যাক্কারজনক উক্তি করেছেন এবং বিধিবিধান প্রদান করেছেন। নারীজাতির মর্যাদার ব্যাপারে মনু যেমন উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, নারী স্বাধীনতার ব্যাপারেও আবার অত্যন্ত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

মনু বলেন, বলপূর্বক কোনও নারীকে ঘরে রুদ্ধ রাখলেই নারীর রক্ষাবিধান হয় না। যেসব নারী নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ তারাই সম্মানজনকভাবে সুরক্ষিতা হয়ে থাকেন–

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥[১৪]

মনু বিবাহসংস্কারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবাহের ক্ষেত্রে তিনি নারী স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কন্যা ঋতুমতী হলে তিন বছরের মধ্যে যদি পিতামাতা তাকে বিবাহ না দেন তাহলে ঐ কন্যা নিজেই তার উপযুক্ত পতি মনোনীত করতে পারবে। এতে কোন পাপ হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে ঐ কন্যা পিতা, মাতা বা ভ্রাতার কাছ থেকে অলংকারাদি গ্রহণ করতে পারবে না–

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥[১৫]

মনুসংহিতা অনুসারে পুরুষের ন্যায় (উপনয়নাদি) সংস্কারের মাধ্যমে সংস্কৃত বা পবিত্র হবার কোন ব্যবস্থা নেই নারীর ক্ষেত্রে। মনু বলেন, বিবাহই নারীর প্রধান সংস্কার এবং বিবাহই তাদের উপনয়নস্বরূপ। বিয়ের পর পতিগৃহে বসবাস করাই তাদের গুরুগৃহে বাস এবং পতির গৃহকর্মই তাদের যজ্ঞস্বরূপ–

স বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থো'গ্নিপরিক্রিয়া ॥[১৬]

অতএব নারীর পক্ষে বিবাহ একান্ত কর্তব্য। স্ত্রী যদি সাধ্বী হয়, তবে পতির কর্তব্য তার ভরণপোষণের উত্তম ব্যবস্থা করা এবং তাতে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়।

মনুর মতে, বিবাহ নারীদের পক্ষে মুখ্য প্রয়োজন হলেও, পিতামাতার উচিত উৎকৃষ্ট, রূপবান এবং উপযুক্ত বরের হাতেই কন্যা সম্প্রদান করা। কিন্তু বিবাহযোগ্যা হওয়া সত্ত্বেও যদি সেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায় তবে নির্গুণ পাত্রে তাকে সমর্পণ করা উচিত নয়। বরং আমৃত্যু পর্যন্ত সে পিতৃগৃহে থাকবে ॥[১৭]

মনু নারীদের মর্যাদার আসনে বসালেও নারীদের সম্পর্কে অনেক হীন উক্তিও করেছেন এবং নারী স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বলেন, স্ত্রীলোক বালিকাই হোক বা যুবতীই হোক অথবা বৃদ্ধাই হোক গৃহে থেকে তার কোন কাজই স্বাধীনভাবে করা উচিত নয়–

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কতর্ব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি ॥[১৮]

স্ত্রীলোক বালিকা অবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের বশে থাকবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বাধীনভাবে থাকবে না–

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥[১৯]

স্ত্রীলোক কোন অবস্থাতেই পিতা, স্বামী বা পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার চেষ্টা করবে না। তিনি বলেন, যতদিন কন্যাকে সৎপাত্রে দান না করা হয় ততদিন পিতার কর্তব্য তাকে রক্ষা করা। সধবা অবস্থায় নারী স্বামী কর্তৃক এবং বৃদ্ধা অবস্থায় পুত্র কর্তৃক রক্ষণীয়া–

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥[২০]

মনুর সময়ে সমাজে দুশ্চরিত্রা নারীর অভাব ছিল না। তাদের যৌন আবেদনে সাড়া দিয়ে দুর্বলচিত্ত বহু পুরুষের পদস্খলন হত। নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক সাধু ব্যক্তিও কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছেন। মনুর মতে, সংসারে সকলেই দেহধর্মবশত কামক্রোধের বশীভূত হয় এবং নারী যদি ইচ্ছা করে তাহলে বিদ্বান বা মূর্খ সকলকেই বিপথে চালিত করতে পারে –

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতং কামক্রোধবশানুগম্ ॥[২১]

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ খুবই শক্তিশালী এবং তারা বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে। মনু পুরুষকে সর্বদা নিজ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত দেখতে চেয়েছেন। তিন বলেন–

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা ।
পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া ॥ [২২]

নারীরাও যাতে নিজ স্বামীর প্রতি অনুরক্ত থাকে মনু সে উপদেশও দিয়েছেন। ব্যভিচার দোষে দুষ্ট নারী ও পুরুষ উভয়কে মনু কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে নারী নিজের পিতৃকূলের ধনৈশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে অথবা স্বীয় সৌন্দর্যগর্বে নিজের পতিকে ত্যাগ করে পরপুরুষের সাথে মিলিত হবে তাকে জনাকীর্ণ স্থানে কুকুর দিয়ে দংশন করাতে হবে–

ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা ।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে। [২৩]

আর ঐ স্ত্রীলোক যে পুরুষকে আশ্রয় করেছিল সেই ব্যভিচারী ব্যক্তিকে তপ্ত লৌহ-শয্যায় শায়িত করে তার উপর কাঠের স্তূপ ফেলে তাকে পুড়িয়ে মারতে হবে–

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্তায়স ।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ।[২৪]

যে দুশ্চরিত্রা নারী বহু পুরুষের ভোগ্যা মনু তাকে 'ব্রাত্যা নারী' বলে অভিহিত করেছেন এবং তাদের কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা করেছেন।

নারী জাতি সম্পর্কে মনুর আরও কিছু উক্তি আমাদের বিস্মিত করে। নারী জাতি সম্বন্ধে সেখানে খুবই নিন্দাসূচক উক্তি করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– নারী জাতি পুরুষের রূপ বিচার করে না, পুরুষের বিশেষ বয়সের উপর নির্ভর করে না। নারী যে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে সুন্দরই হোক বা কুৎসিতই হোক, সে যেহেতু পুরুষ তাই তার সাথে সম্ভোগ করে। মনু নারীর স্বভাব সম্পর্কে বলেছেন,এরা কোন প্রকার সৌন্দর্যের বিচার করে না,বয়সবিশেষেরও এদের আস্থা নেই,সুরূপই হোক আর কুরূপই হোক পুরুষ পেলেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে থাকে-

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা কুরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।[২৫]

নারীরা পুরুষ দর্শন মাত্রই সম্ভোগ বিলাসিতা দোষহেতু এবং স্বভাবত চিত্তচাঞ্চল্য ও স্নেহশূন্যতা বশত স্বামী কর্তৃক সুরক্ষিত হয়েও স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে থাকে।

মনু স্ত্রীজাতিকে 'পুংশ্চালী' বলেছেন। কারণ নারী পুরুষের দেখামাত্রই তার সাথে সম্ভোগের ইচ্ছা করে।

পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ
রক্ষিতা যত্নতো'পীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্বতে ॥[২৬]

মনুর মতে, শয়ন, আসন,ভূষণশীলতা,কাম,ক্রোধ,পরহিংসা,কুটিলতা,কুৎসিতা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে-

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ ॥[২৭]

মনুর অভিমত, শাস্ত্রোক্ত বিধি মোতাবেক স্ত্রীজাতির জাতকর্মসমূহ মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না; স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে এদের কোন অধিকার নেই এবং অন্য কোন মন্ত্রেও এদের অধিকার নেই। তাই এরা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ।

নাস্তিং স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়ো'নৃতমিতি স্থিতিঃ॥[২৮]

মনু বলেন, স্ত্রীজাতির স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা। তাই পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনও অসাবধান হন না।

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতো'র্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥[২৯]

সংসারে দেহধর্মবশতঃ সকলেই কাম ও ক্রোধের অনুবর্তী। তাই বিদ্বান হোক বাঅবিদ্বান হোক নারীরা তাকে বিপথে নিতে পারে।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥[৩০]

মনু নারীদের এতটাই অবিশ্বাস করতেন যে, জননী,ভাগিনি ও কন্যার সঙ্গেও নির্জনগৃহে একাকী বাস করতে নিষেধ করে গেছেন –

মাত্রা স্বস্রা দুহিতা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥[৩১]

উপরোক্ত উক্তিগুলিতে নারী জাতি সম্পর্কে মনুর বিকৃত মানসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। তখন রাজাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সমস্ত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। অর্থাৎ রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু। মনুসংহিতায় ‘রাজধর্ম’ নামক সপ্তম অধ্যায়ে রাজার রাজ্যশাসন প্রণালী, বিচারিক কার্যক্রম, রাজার যুদ্ধনীতি, চারবর্ণের মানুষদের প্রতি রাজার দায়িত্ব, কর্তব্য প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও কৌতূহলের বিষয় যে, মনু মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করলেও তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করেননি। মনু রাজকার্যে নারীদের অংশগ্রহণ বা রাজকার্যে নারীদের গুরুত্ব একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন।

মনু রাজার রাজকার্যের আশেপাশে নারীজাতির উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে মনুর অভিমত, নারীজাতি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ গোপন রাখতে পারেন না। এটি নারীজাতির স্বভাবদোষ এবং এ কারণে তিনি নারীজাতিকে পশু, পাখি প্রভৃতি তির্যক প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারীজাতি সম্পর্কে মনুর এরূপ মন্তব্য যতটুকু সত্য বা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রাজ মহিষী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনুর মত, রাজা ‘সুপর্যাপ্ত’ গৃহে বসবাস করা, শুভলক্ষণ-বিশিষ্ট, উচ্চবংশ জাত, লাবণ্যময়ী, মনোহারিণী, রূপ ও গুণযুক্ত স্ত্রী গ্রহণ করবেন। মনু মনে করেন সমবর্ণের বা উচ্চবর্ণের নারীরাই রাজমহিষী হবার উপযুক্ত।

মনু রাজার রাজকার্যে দাসী নিযুক্তির কথা বিশেষভাবে উলেখ করেছেন এবং তাদের কার্যানুসারে বিভিন্ন পদমর্যাদা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে দৈনন্দিন ভাতা প্রদানের কথা বলেছেন।

বিভিন্ন প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য গ্রহণের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত তার একটি দিক নির্দেশনা মনু প্রদান করেছেন। যেমন, তিনি বলেন স্ত্রীলোকের বিবাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরাই সাক্ষী প্রদান করবেন।[৩২] কিন্তু যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের বিবাদ হয় তাহলে স্ত্রীলোকের সাক্ষী অপরিহার্য।

আবার যদি কোন নির্জন স্থানে কেউ আক্রান্ত হয় তাহলে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে।[৩৩]

আবার যদি খুব প্রয়োজন না থাকে তাহলে নারীদের সাক্ষ্য নেওয়া যাবে না। এর কারণ হিসেবে মনু বলেন, নারীদের বুদ্ধি নিতান্তই চঞ্চল।[৩৪] মনুর সময় পুরুষ কর্তৃত্বাধীন শাসন ব্যবস্থা ছিল। একারণে মনু সবসময় পুরুষ কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন এবং রাজকার্যে নারীকে অনুপস্থিত রেখেছেন। মনু অত্যন্ত সুকৌশলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাজকার্য পালনে নারীজাতির ভূমিকা একেবারেই এড়িয়ে গেছেন অথবা তাদের অনুপযুক্ত মনে করেছেন।

মনুসংহিতায় নারীদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পিতার অবর্তমানে বা স্বামীর অবর্তমানে কিংবা পিতা স্বামী উভয়ের অবর্তমানে নারীরা যাতে দুঃখকষ্টে দিনাতিপাত না করেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মনু নারীদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির বিধান রেখেছেন। হয়তো এ সম্পদ নারীর সোপার্জিত নয়, হয়তো তারা এর মালিকও নন, কিংবা তারা এই সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় অধিকারী রয়েছে তা সে অধিকার যতই নগণ্য হোক না কেন সেটা একান্তই তাদের।

তাই বলা যায়, নারীজাতি সম্পর্কে মনুর নেতিবাচক মনোভাব যতই থাকুক না কেন নারীর জীবনধারণের জন্য বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে অসহায় নারীদের জীবনধারণের কথাও মনু বলেছেন। তাই তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি মনুর এক ধরনের উদারতা ছিল বলেই মনে করা হয়।

আবার কোন কোন স্থলে মনুর ধর্মশাস্ত্রে নারীর প্রতি যে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে তার কোন তল খুঁজে পাওয়া যায় না। মনুসংহিতায় নারীর স্ত্রীধনের অধিকার থাকলেও তা পরিপূর্ণতা পায়নি। সবকিছু থেকেই নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে । তাই অশোক রুদ্র বলেছেন,
''সবদেশেই সবকালেই নারীদের পুরুষেরা অনেকভাবেই বঞ্চিত করে এসেছে। কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা আমাদের দেশের সমাজ-শাসক পুরুষেরা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর নারীরা তাদের এই অবস্থানকে যেভাবে মেনে নিয়ে এসেছেন তাও তুলনাবিহীন।"[৩৫]

তথ্যনির্দেশ

[১] 'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতি', পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত) মনুসংহিতা (কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯১৩) ২/১০, পৃষ্ঠা-২১।

[২] তদেব, মনুসংহিতা, পৃ. প্রাক্কথন- ক।

[৩] Pandurang Vaman Kane, History of Dharmasastra, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1941, p. 6.

[৪] শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, মনুসংহিতা, (কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার), ১/৩২, পৃ.৮।

[৫] অমর্ত্য সেন, The Idea of Justice: নীতি ও ন্যায্যতা, বাংলা সংস্করণ, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩) পৃষ্ঠা-৩৩।

[৬] কাজী নজরুল ইসলাম, সাম্যবাদী কাব্যের 'নারী ' কবিতা, আরজুমান আরা বানু সম্পাদিত (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১০) পৃঃ ২।

[৭] প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৩/৫৬, পৃষ্ঠা-৬২।

[৮] তদেব, মনুসংহিতা, ৩/৫৭, পৃষ্ঠা-৬২।

[৯] রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত, ঋগ্বেদ, ২য় খণ্ড, (কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬), ১০/২৮/০৫, পৃ. ৫০৪।

[১০] প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৩/৬০, পৃষ্ঠা-৬২।

[১১] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/২৬, পৃষ্ঠা-২৫১।

[১২] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১৩৮, পৃষ্ঠা-২৬৫।

[১৩] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/৭, পৃষ্ঠা-২৪৯।

[১৪] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১২, পৃষ্ঠা-২৪৯।

[১৫] তদেব, মনুসংহিতা ৯/৯০. পৃষ্ঠা-২৫৮।

[১৬] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুদিত), মনুসংহিতা, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭) ২/৬৭, পৃ. ৬৪।

[১৭] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/৮৮, পৃ. ২৫৭।

[১৮] তদেব, মনুসংহিতা ৫/১৪৭, পৃ. ১৬২।

[১৯] তদেব, মনুসংহিতা, ৫/১৪৮, পৃষ্ঠা-১৬২।

[২০] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/৩, পৃষ্ঠা-২৪৮।

[২১] তদেব, মনুসংহিতা, ২/২১৪, পৃষ্ঠা-৭৯।

[২২] তদেব, মনুসংহিতা, ৩/৪৫, পৃষ্ঠা-৯০।

[২৩] তদেব, মনুসংহিতা, ৮/৩৭১, পৃষ্ঠা-২৪০।

[২৪] তদেব, মনুসংহিতা,৮/৩৭২, পৃষ্ঠা-২৪০।

[২৫] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১৪, পৃ. ২৪৯।

[২৬] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১৫, পৃ. ২৫০।

[২৭] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১৭, পৃ.২৫০।

[২৮] তদেব, মনুসংহিতা, ৯/১৮, পৃ.২৫০।

[২৯] তদেব, মনুসংহিতা, ২/২১৩, পৃ.৪৭।

[৩০] তদেব, মনুসংহিতা, ২/২১৪, পৃ. ৪৭।

[৩১] তদেব, মনুসংহিতা, ২/২১৫, পৃ.৪৮।

[৩২] প্রাগুক্ত, ৮/৬৯, পৃ.২০৬।

[৩৩] তদেব, ৮/৭০,পৃ.২০৬।

[৩৪] তদেব, ৮/৭৭,পৃ.২০৭।

[৩৫] কঙ্কর সিংহ,মনুসংহিতা ও নারী, কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ.৭৯।